নিবেদিতা রচনা সংগ্রহ

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক
শ্রীগোপাল হালদার
সহযোগী সম্পাদক
ড. রবীন্দ্র গুপ্ত
শ্রীঅশোক ঘোষ

বইপত্র ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ চৈত্র, ১৩৮৪
৬ এপ্রিল, ১৯৭৮

প্রকাশক
শ্রীবিকাশ ঘোষ
বইপত্র
৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীঅলোক করণ্ডী
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
শ্রীপ্রণব ঘোষ
কমল প্রেস
৩০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

গ্রাহক মূল্য—পাঁচ খণ্ডে মোট ৫০ টাকা

Nivedita Rachana Samgraha
the Works of Sister Nivedita :
Vol. II

নিবেদন

ভগিনী নিবেদিতার রচনাসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। প্রকাশনাক্ষেত্র আজ বিপর্যস্ত। কাগজের দাম শুধু আকাশছোঁয়া নয়—প্রায়শই নাগালের বাইরে কোন অন্ধকারের জীবেদের গুদামবন্দী থাকে। এত বিঘ্নের মধ্যে প্রকাশনায় যে ত্রুটি রয়ে গেল, আশা করি গ্রাহকরা তা মার্জনা করবেন।

এই খণ্ডের অনুবাদকার্যে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী সুকুমার গুপ্ত, অহীন্দ্র মিত্র, গীতা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী বসু ও তপতী সেনগুপ্ত। প্রথম খণ্ডের অনুবাদকর্মেও অহীনবাবু সাহায্য করেছিলেন—তার স্বীকৃতি ছিল না। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। অনুবাদকরা যে সহযোগিতা করে চলেছেন—সেজন্য সত্যই আমরা কৃতজ্ঞ।

নিবেদক
বিকাশ ঘোষ
প্রকাশক পক্ষে

২৩ চৈত্র, ১৩৮৪
৬ এপ্রিল, ১৯৭৮
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র



স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণের
স্মৃতিচিত্রণ

ভূমিকা

সঙ্গীগণ: স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ, কয়েকজন ইউরোপীয় অতিথি ও শিষ্যা, তাঁদের মধ্যে আছেন ধীরামাতা, (মিসেস বুল) জয়া (মিস ম্যাকলিওড্) এবং নিবেদিতা।

স্থান: ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল।

কাল: ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

এ বছরের দিনগুলি ছিল ভারী সুন্দর, আদর্শ যেন বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে গঙ্গার ধারে বেলুড়ে আমাদের কুটিরে, পরে হিমালয়ের সন্নিহিত নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, এবং তারপরে কাশ্মীরের এখানে-ওখানে ভ্রমণ—সর্বত্রই প্রতিটি ঘণ্টা যেন ভোলবার নয়। প্রতিটি কথা সারা জীবন প্রতিধ্বনিত হবে এবং অন্তত একবারও সেই পরম দর্শন লাভ হবে।

সবই হচ্ছিল খেলার ছলে।

আমরা তাঁর সান্নিধ্যে যেই পরম ভালোবাসার রূপ প্রত্যক্ষ করেছি যা বর্ষিত হত একজন অতি নগণ্য ও অজ্ঞ ব্যক্তির উপর, যে অন্তত একমুহূর্তের জন্যও সারা বিশ্বকে একবারও দেখত, সেখানে কোন সমালোচনা ছিল না। আমরা তাঁর বিশাল প্রতিভার খামখেয়ালিপনায় হেসেছি, আমরা তাঁর সাহসের আগুনে নিজেদের উত্তপ্ত করেছি—আর যেন মনে হত পবিত্র শিশুর জাগরণের মধ্যে আমরা উপস্থিত ছিলাম।

কিন্তু এসব কিছুর মধ্যেই কোন আতিশয্য ও গুরুগাম্ভীর্য ছিল না। দুঃখ ও যন্ত্রণা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এসেছে, পবিত্র বাৎসরিকও আমরা উদ্‌যাপন করেছি। কিন্তু তবুও দুঃখ রূপান্তরিত হয়েছে সোনার কিরণে—আর তখন তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—বিলীন হয়নি।

আমি চেষ্টা করব আমাদের ভ্রমণকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে। এখন এই লেখার সময়ও আমি যেন দেখতে পাচ্ছি বারমুলাতে আইরিস ফুল ফুটেছে, ইসলামাবাদে পপলার গাছের নীচে ধানের শীষ উঁকি মারছে, আর হিমালয়ের অরণ্যে সেই তারকা উজ্জ্বল দৃশ্যাবলী; আর দিল্লী ও আগ্রার রাজকীয় মহিমা। একজনের খুব ইচ্ছা করছে—ঐসব ঘটনা ও দৃশ্যগুলির স্মৃতিচারণ করতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা করা! ভাষার গণ্ডীতে নয়, আমার মানসলোকে এই স্মৃতি চিরজাগরিত থাকবে। আর সেই সঙ্গে মনে থাকবে এই সকল স্থানে বাস করে যে সহৃদয় সাধারণ কিন্তু ভদ্র মানুষেরা, যারা আমার বিশ্বাস, আমাদের আসাতে আরো খুশি হয়ে ওঠে।

যে ভাবাবেগের বশে নতুন বিশ্বাস জন্ম নেয়, এবং যে মনীষীরা সেই বিশ্বাসকে প্রেরণা জোগায়—এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু ধারণা হয়েছে। তার কারণ হল, আমরা একজনের সংস্পর্শে এসেছি যিনি সবাইকে কাছে টানতেন, সবার কথা শুনতেন, কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। এমন এক নম্রতা প্রত্যক্ষ করেছি—যা সকল ক্ষুদ্রতাকে ধুয়ে মুছে দিত; সে বৈরাগ্য অত্যাচারের ক্ষোভে অত্যাচারিতের প্রতি দয়ায় মৃত্যু

বরণও করতে পারত। সে ভালোবাসা এমনকি উৎপীড়নের ও মৃত্যুর প্রাগ্রসর পদধ্বয় পারত আশীর্বাদ করতে। আমরা সেই রমণীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি যিনি নিজের চোখের জলে প্রভুর পা ধুইয়ে দিতেন, আবার নিজের মাথার চুল দিয়ে দিতেন গা মুছিয়ে। আমরা সেই সকল ঘটনাই শুধু পাইনি তা নয়, সেই আবেগতপ্ত আত্ম-অবচেতনাও আয়ত্ত করতে পারিনি।

মৃত সম্রাটদের বাগানে গাছের তলায় বাস আমাদের কাছে একটা অলৌকিক দর্শন হত—যেন জগতের সমস্ত ধনদৌলত, ঐশ্বর্যরাশি মহান আত্মার বেদীরূপে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। গীর্জার ধাপে ধাপে সাজানো জানালাগুলি, মণি-মানিক্যখচিত রাজসিংহাসন, মহান সৈন্যাধ্যক্ষদের পতাকা, পুরোহিতদের পোশাক—নগরের সমারোহ, এবং ধনীদের বিশ্রামস্থল—সব এল—আবার সবই বাতিল হয়ে গেল!

বিরোধীদের কাছে ঘৃণিত, জনগণের দ্বারা পূজিত ভিক্ষুকের বেশে তাঁকে আমরা দেখেছি। একমাত্র পরিশ্রমলব্ধ খাদ্য, কুঁড়েঘরের আশ্রয়, আর শস্যক্ষেতের ভিতর দিকে যে সাধারণ পথ—মনে হয় এইগুলিই এই মহান জীবনের পশ্চাদপটের পক্ষে যথেষ্ট সত্য।…তাঁর নিজের লোকেদের মধ্যে—বিদ্বান ও রাজনীতিজ্ঞেরা যেমন ভালোবাসতেন—একজন অজ্ঞ ঠিক তেমনি এবং ততখানিই তাঁকে ভালবাসত। তাঁর অনুপস্থিতিতে, তাঁর ফেরার অপেক্ষায় মাঝি নৌকা নিয়ে নদীর পারে অপেক্ষা করত, আর চাকর-বাকরেরা কিভাবে তাঁকে সেবা করবে, সেই নিয়ে অন্যান্য অতিথিবর্গের সঙ্গে তর্ক জুড়ত। আর এ সবকিছুর মধ্যেই সর্বদা ছিল সেই খেলা ভাব। 'তারা প্রভুর সঙ্গে খেলা করত'—এবং অন্তরেও সেটা উপলব্ধি করত।

যারা এই ঘটনা ও সময়ের সাক্ষী তাদের কাছে জীবন হয়ে উঠেছে আরো মূল্যবান, আরো মধুর। মনে হয় দীর্ঘ রজনীতে পাম গাছের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বাতাস যেন কেঁদেকেঁদে বলছে—'মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব।'

প্রথম অধ্যায়

বেলুড়ে গঙ্গার ধারে বাড়িটি

স্থান : বেলুড়ে গঙ্গার ধারে একটি কুটির।
কাল : মার্চ—১১ই মে।

গঙ্গার ধারে এই বাড়িটি সম্বন্ধে গুরুদেব একজনকে (নিবেদিতা) বলেছিলেন, "ধীরামাতার এই ছোট্ট বাড়িটিকে তোমার স্বর্গ বলে মনে হবে, কারণ এখানে কেবল ভালোবাসা—আগাগোড়াই ভালোবাসা।"

সত্যিই তাই বটে। বাড়ির ভিতরে এক অখণ্ড একতা বিরাজমান, আর বাইরে সবুজ ঘাসের প্রান্তর,—দীর্ঘ নারিকেলতরুর শ্রেণী, বনের মধ্যে বাদামী রঙের ছোট্ট গ্রাম, আর মহাদেবের আশীর্বাদ আমাদের এনে দেবার জন্য যে নীলকণ্ঠ পাখিটি গাছের মগডালে বাসা বেঁধেছে—ঠিক তেমনই সব সুন্দর। সকালে বাড়ির পিছনে ছায়া পড়ে; কিন্তু দ্বিপ্রহরে আমরা কলনাদিনী মহানদী স্বয়ং মা গঙ্গাকে পূজা করে, বাড়ির সামনে বসতাম—ওপারে দেখা যেত দক্ষিণেশ্বর।

পুরোনো প্রথানুযায়ী একের পর এক আসতেন আর গুরুদেবের আট বছরের ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ে, গ্রাম থেকে গ্রামের নাম পরিবর্তন সম্বন্ধে, নির্বিকল্প সমাধি বিষয়ে কত কি জানতে পারতাম। বাক্যের অতীত সেই পবিত্র দুঃখ অথবা দৃশ্য একমাত্র যে ভালোবেসেছে সেই দেখতে পায়। আর এসব ছাড়া গুরুদেব নিজেও আসতেন, তিনি তাঁর গল্প বা কবিতা কিংবা উমা আর শিবের, কখনো রাধাকৃষ্ণের গল্প নিয়ে। মনে হত তিনি জানতেন যে একটা নতুন চেতনার প্রাথমিক উপাদান হওয়া উচিত বিস্তারিত কিন্তু বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহ, এবং তার প্রয়োগও হবে পারম্পর্যহীনভাবে, যাতে শিক্ষার্থীর মনকে তার নিজের ধারণা ও পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

যাই হোক সে নিজে জানুক বা নাই জানুক—এটাই হল শিক্ষাবিজ্ঞানের নিয়ম বিধির শর্ত, যা সে নিজের অজ্ঞাতেই পূরণ করে চলছিল। কারণ অধিকাংশ সময়েই তিনি ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধেই আমাদের কাছে নানা চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করতেন। আজ বলতেন এক বিষয়ে, কাল বলবেন অপর একটি বিষয় নিয়ে। তাঁর পছন্দ মুহূর্তের খেয়ালে চলত। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র ধর্ম নিয়েই আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন না—কখনো বলতেন ইতিহাস নিয়ে, কখনো বা লোকগাথা সম্বন্ধে; আবার কখনো অসংখ্য নিয়মবহির্ভূত বিষয়, বৈচিত্র্য, অসংগতি নিয়ে আলোচনা করতেন। জাতি ধর্ম বর্ণ কিংবা আচার-ব্যবহার প্রথা সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে নানা আলোচনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ, যেমনটি তিনি বলেছিলেন—হয়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম পুরাণ, তাঁর মুখনিঃসৃত পুরাণ।

আরো একটা বিষয়ে তিনি একটা মনস্তাত্ত্বিক গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেন—সেটা হল, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের পক্ষে যা বোঝা শক্ত বা প্রতিকূল মনে হত, তিনি কখনো সেটা সহজ করে বলবার চেষ্টা করতেন না। আমাদের অভিজ্ঞতার প্রাথমিক

পর্যায়েই ভারতীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা তিনি বরং চরম আকারের মধ্যে নিয়ে যেতেন।

তিনি এমন বিষয়ে বলতেন যা কিনা ইউরোপীয় সামাজিকতার পক্ষে উপভোগ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একদেহে গৌরীশঙ্করের বিষয়ে স্তোত্র পাঠ করতেন,

"একদিকে দীর্ঘ কালো কেশ অন্যদিকে মাথায় তাঁহার জটা
একদেহে গলায় দোলে মালা,—অন্য দেহে অস্থিকর্ণভূষা
সাপের মত জটা !
এক অঙ্গ শুভ্র ভস্ম মাখা,—যেন তুষারগিরি
অপর অঙ্গ প্রাতঃকালের আলোর মত সোনা,
কারণ সেই প্রভু—তিনি এমন রূপ ধারণ করেছিলেন,
যা ছিল বিভক্ত দুইরূপ—
অর্ধনর—অর্ধনারীশ্বর।"

তাঁর জলন্ত উৎসাহে প্লাবিত হয়ে, এইসব বিষয়ে, সামান্য হলেও তাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে এবং তাদের ভিতর প্রবেশ করতে আমাদের পক্ষে সম্ভব হত।

আলোচনার বিষয় যাই হোক না কেন, অন্তত অসীমের কথাতেই তা পরিসমাপ্ত হত। সত্যিই আমি জানতাম না যে আমাদের গুরুদেবের অদ্বৈত দর্শনের উপলব্ধি, তাঁর পৃথিবী সম্বন্ধে ব্যাখ্যার থেকেও অনেক বেশি প্রামাণিক ও বিশ্বস্ত।

সাহিত্য, জাতিতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে কোন বিষয়েই বলুন না কেন—তিনি ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমাদের মনে করিয়ে দিতেন যে এটা পরম দর্শনেরই একটা উদাহরণ। তিনি কখনোই সাংসারিক ছিলেন না ; বন্ধনের প্রতি ছিল তাঁর ঘৃণা, এবং যারা 'শৃঙ্খলকে ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে রাখে' তাদের প্রতি ছিল তাঁর দারুণ আতঙ্ক ; কিন্তু জাগতিক বিষয়ে এবং শিল্পকথার চরম আকারের মধ্যে প্রভেদটি তিনি সহজেই বুঝতেন। একদিন আমরা ইউরোপীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলাম, এবং তিনি পারসীয় কবিতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ আলোচনা সুরু করলেন। 'আমার প্রেয়সীর মুখে একটি কৃষ্ণতিলের জন্য সমগ্র সমরখন্দ দিয়ে দিতে পারি—' এই কবিতাটি হঠাৎ আবৃত্তি করে ফিরে তাকিয়ে দীপ্ত উৎসাহে বললেন, 'যে সাধু প্রেম-সংগীত উপলব্ধি করতে পারে না, তাকে আমি কিন্তু কানাকড়িও দেব না, বুঝলে ?'

সেই দ্বিপ্রহরেই একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক বাদানুবাদ প্রসঙ্গে বললেন—'একটি জাতিতে পরিণত হতে হলে আমাদের সাধারণ ঘৃণার সঙ্গে সাধারণ ভালোবাসারও প্রয়োজন।'

কয়েকমাস পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, যার জীবনে একটা লক্ষ্য আছে তার কাছে তিনি উমা ও শিব ব্যতীত অন্য কোন দেবতার কথা বলতেন না। কারণ শিব এবং জগন্মাতা উমাই মহৎ কর্মীদের সৃষ্টি করেছেন। তবুও আমার আশ্চর্য লাগত এই ভেবে যে প্রতি বস্তুরই সমাপ্তি হল ভক্তিতে—তিনি তা জানতেন কিনা ! অধ্যাত্ম আবেগের বিলাসিতায় অনেকেই মনের জোর হারিয়ে ফেলে এটা তিনি জানতেন ও

তাই ভয় পেতেন। কিন্তু তবুও ভগবৎ-মাদকতার আভাসটুকুও না দিয়ে পারতেন না। তাই তিনি আমাদের এইরকম কবিতা শোনাতেন—

"বৃন্দাবনের রমণীয় কুঞ্জবনের রানী হয়েছেন রাধারানী
কৃষ্ণ দ্বারে প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে আছেন।
তাঁর বাঁশিতে সর্বদা এই সুর বাজে—
রাধা প্রেমের অসীম ধন বিলোচ্ছেন;
যদিও আমি দ্বারে—কিন্তু সারা পৃথিবীটাই কুঞ্জের ভিতরে যাচ্ছে,
তৃষাতুর জন এস শুধু বল—'রাধারানীর জয় হোক।
প্রেমের রাজ্যে চলে এস।'

অথবা তিনি তাঁর বন্ধু (বাঙালী নাট্যকার বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ) রচিত সেই গানটি শোনাতেন—

পুরুষ ॥ তুমি হলে পরমাত্মা, নীললোচন পীতাম্বর,
স্ত্রী ॥ তুমি কালা বৃন্দাবনের গোপী
গোপিনীর পদতলে নতজানু হয়ে বসে আছ।
পুরুষ ॥ নরদেহধারী নারায়ণের জয়গান গায় আমার প্রাণ।
স্ত্রী ॥ তোমার রূপ আমাদের জন্য—ও গোপী।
পুরুষ ॥ তুমি জগতের ত্রাণকর্তা—আত্মোৎসর্গের প্রভু
স্ত্রী ॥ যিনি রাধাকে ভালোবেসেছিলেন— সেই তোমার
অশ্রুজলে নিজদেহ ভাসছে।"

এমন একটি দিনের কথা (৯ই মে) আমরা কখনো ভুলব না। আমরা গাছের তলায় বসে বসে গল্প করছিলাম—তখন হঠাৎ ঝড় উঠল। আমরা প্রথমে গঙ্গার ধারে ছাদের ওপর, তার পরে বারান্দায় চলে গেলাম, এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না।

দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার ওপার আর দেখতে পেলাম না। অন্ধকারের মধ্যে শুনতে পেলাম অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে আর বজ্রপাত হচ্ছে, থেকে থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম বিদ্যুতের ঝলকানি।

কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাঝে ছোট বারান্দাটিতে আমরা আরো গভীর এক নাটকের মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ছোট্ট কথাটিতে একটি মানুষই এক-দিক থেকে অন্যদিকে যাওয়া আসা করছিলেন, একটি কণ্ঠস্বরই সকল অভিনেতাদের কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছিল, এবং যে নাটিকাটি আমাদের সামনে অভিনীত হচ্ছিল সেটি হল —'ঈশ্বরের জন্য আত্মার ভালোবাসা'।...আজ ক্রমে ক্রমে আমাদের মনেও আবেগ উত্তাপ সঞ্চারিত হল, আর মুহূর্তের জন্য এমন উদ্দীপ্ত আবেগে আমরা ভালোবাসলাম যাকে প্রবহমান নদী নিবিয়ে দিতে পারে না অথবা প্রবল ঝঞ্ঝাও উত্যক্ত করতে পারে না। অনেকজন কি ভালোবাসার তৃষ্ণা মেটায়? বন্যা কি তাকে জয় করতে পারে? আর প্রেমিথিয়ুস আমাদের ছেড়ে চলে যাবার আগে আমরা তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসি—তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন।

১৮ মার্চ

কুটির বাসের প্রথমদিকে একদিন স্বামীজী ধীরামাতা এবং যাঁর নাম জয়া তাঁকে নিয়ে সারদা দেবীর কাছে প্রথম অভ্যর্থিত হবার জন্য নিয়ে গেলেন। সারদা দেবী স্বামীজীর আহ্বানে গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, যেখানে তাঁরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন এমন একজনকে, যার কাছে ঐদিনটি জীবনের মহা উৎসবের দিনের স্মৃতি হয়ে বিরাজিত। সে গঙ্গার সৌরভ, গুরুর সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনের কথা কখনো ভুলতে পারে না। কিংবা জয়া, সেইদিন সকালে বিদেশিনী শিষ্যাদের সঙ্গে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার জন্য হিন্দু রমণীদের সবথেকে গোঁড়া মানুষটিকে জয় করে যে কাজ করেছিলেন তাও কোনোদিন ভোলা সম্ভব নয়। সেইদিন যা ঘটেছিল আর পবিত্রীকৃত হয়েছিল, সেই দিনের সুখের বন্ধনগুলো কখনো ভুলতে পারেনি।

২৫ শে মার্চ

এক সপ্তাহ পরে ঐ একই অতিথি সেখানে ছিলেন, বুধবার বেলা করে এল আর শনিবার সন্ধ্যায় চলে গেলেন। ঐ সময়ে স্বামীজীর কুটিরে সকাল-সকাল আসতেন আর সকালটা যেখানেই কাটাতেন, আবার সন্ধ্যা নাগাদ আস্‌তেন। এই রকম আগমনের দ্বিতীয় দিন সকালে, সেটা ছিল শুক্রবার—খ্রীষ্টানদের যীশুর আগমন বার্তা ঘোষণার পর্বের দিন, স্বামীজী আমাদের তিনজনকে মঠে নিয়ে গেলেন; সেখানে পূজার ঘরে একটি ক্ষুদ্র দীক্ষাপর্ব হল, একজন হল ব্রহ্মচারিণী। সেই সকালটি ছিল সব থেকে সুখের সকাল। অনুষ্ঠান অন্তে আমাদের দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল। যেখানে স্বামীজী বিভূতি মেখে, অস্থিকর্ণভূষণ পরে শিবযোগীদের মত জটাজুট ধারণ করলেন। যেখানে তিনি আমাদের প্রায় একঘণ্টা ধরে গান শোনালেন এবং ভারতীয় যন্ত্রে ভারতীয় সুর বাজিয়ে শোনালেন।

বিকেলে গঙ্গার ওপর নৌকায় তিনি আমাদের সঙ্গে মনের কথা বলতে লাগলেন। তিনি তাঁর গুরুলব্ধ বিশ্বাস, অস্থিরতা ও প্রশ্ন সম্বন্ধে অনেক কথা শোনালেন।

এর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দার্জিলিং চলে গেলেন, আর প্লেগ মহামারী ঘোষণার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

৩রা মে

আমাদের শ্রীমার বাড়িতে আবার তাঁর সঙ্গে আমাদের দুজনের দেখা হল। তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ অন্ধকার। মনে হচ্ছিল যে ঝড়ের আশঙ্কা এতদিন ধরে করা হচ্ছিল এবার তা উঠল বলে। নাগরিক জীবনের বিপর্যয়ের পূর্ণ সূচনা নানাভাবে দেখা দিয়েছিল—প্লেগ, বিভীষিকা, দাঙ্গা ইত্যাদি ভয়াবহ ব্যাপার ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গুরুদেব আমাদের দুজনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'অনেকেই মা কালীর

অস্তিত্বের প্রতি অবজ্ঞা দেখায়—আজ তিনি লোকের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন, লোকে ভয়ে ত্রস্ত। কে বলতে পারে যে ঈশ্বর কেবল ভালোর মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করেন—অসতের মধ্যে করেন না? কিন্তু কেবল হিন্দুরাই মন্দের মধ্যেও তাকে পূজা করতে সাহস করে।"

তিনি আবার ফিরে এসেছেন এবং পুরোনো জীবনের ধারা মোটামুটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল মহামারীর আশঙ্কা প্রবল এবং জনসাধারণের মনে আশ্বাস ফিরিয়ে আনবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছিল।

এই সম্ভাবনা যতদিন পর্যন্ত দিগন্ত কালো করে রেখেছিল, ততদিন তিনি কলকাতা ছেড়ে যেতে পারেন নি। যাই হোক সেটা কেটে গেলে সেই সঙ্গে আমাদের সুখের দিনও চলে গেল, এবং আমাদেরও যাবার সময় এল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈনীতাল ও আলমোড়া

সঙ্গীগণ : স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ।
কয়েকজন ইউরোপীয়, তাঁদের মধ্যে আছেন ধীরামাতা, জয়া এবং নিবেদিতা।

স্থান : হিমালয়-সন্নিহিত অঞ্চল।

কাল : ১১ই মে—২৫শে মে, ১৮৯৮

১১ ই মে

আমাদের দলটি বেশ বড়—অবশ্য বলতে গেলে সেটি দুটি দল। আমরা বুধবার সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশন ছাড়লাম এবং শুক্রবার সকালে হিমালয় পর্বতশ্রেণী আমাদের চোখে পড়ল। হিমালয় পর্বতশ্রেণী দেখলে মনে হয়, যেন সমতলভূমি থেকে কয়েকশত গজ দূরে হঠাৎ উঠে গেছে।

১৪ ই মে—১৬ ই মে

তিনটি বিষয়ে নৈনীতাল সুন্দর হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, খেত্‌রির রাজার সঙ্গে গুরুদেবের শিষ্যাদের সানন্দে পরিচয় করিয়ে দেবার পর্ব ; দ্বিতীয়ত, নটী মেয়েরা আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে ; তাদের গুরুদেব অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন—যদিও অন্যরা এতে বেশ আপত্তি জানিয়েছিল ; আর তৃতীয়ত, সেই মুসলমান ভদ্রলোক, যিনি বলেছিলেন 'স্বামীজী, যদি এরপর আপনাকে অবতার হিসাবে দাবি করা হয় জানবেন, আমি একজন মুসলমান—কিন্তু আমার দাবি সর্ব প্রথম।'

এইখানেই আমরা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ আলোচনা শুনেছিলাম ; তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে এই শিক্ষাদাতার বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে তিনটি প্রধান বিষয়ের নির্দেশ করেছিলেন। সেগুলি হল তাঁর বেদান্ত গ্রহণ, দেশপ্রেমের প্রচার এবং যে ভালোবাসা হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানকেও সমানভাবে গ্রহণ করে—সেই ভালোবাসা। এই সব কিছুর মধ্যেই রামমোহন রায়ের দূরদৃষ্টি এবং উদারতা যা ছক এঁকে রেখেছিল —তিনি সেই কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন।

তবু-এর শিখরে দুটি মন্দির দর্শন কালেই নটী মেয়েদের ঘটনা ঘটেছিল। মন্দির দুটি স্মরণাতীত কাল থেকে সুন্দর ছোট নৈনী হ্রদকে পবিত্র করে তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত হয়ে আসছিল। এখানে পূজা দেবার পর আমরা দুটি নটী স্ত্রীলোককে দেখলাম। তারা পূজা দিয়ে আমাদের কাছে এলে, আমরা ভাঙা-ভাঙা ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। আমরা তাদের শহরের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ভেবেছিলাম। পরে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন দেখলাম স্বামীজী তাদের সঙ্গে

কথাবার্তা বলার জন্য ও তাদের তাড়িয়ে দিতে অস্বীকার করায় কি গোলমালেরই না ঝড় উঠেছিল।

আমি কি মনে করতে ভুল করছি যে নৈনীতালের নটী মেয়েদের প্রসঙ্গেই স্বামীজী আমাদের কাছে বহুবার উক্ত, খেতরির নটী মেয়েটির কথা বলেছিলেন? তিনি প্রথমে মেয়েটিকে দেখবার আমন্ত্রণ পেয়ে বেশ রাগ করেছিলেন, কিন্তু অগত্যা যখন এলেন, মেয়েটি গেয়েছিল—

প্রভু মেরা অবগুণ চিত না ধরো
সমদর্শী হৈ নাম তুম্‌হারো
এক মোহ্ পূজা মে রহত হৈ, এক রহে ব্যাধ ঘর পরো
পারকা কে মন দ্বিধা নেহী হোয়—
দুহু এক কাঞ্চন করো।
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভয়ো
সব মিলি এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো
এক মায়া এক ব্রহ্ম কহত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞান মে ভেদ হোয়, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

গুরুদেব নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, আর তখনই তাঁর চোখের পর্দা সরে গেল, এবং যখন দেখলেন যে সবাই সমান তাঁর রাগও দূর হয়ে গেল।

যাঁর নাম জয়া তিনি এই সাক্ষাৎপ্রসঙ্গে অন্য একজনের কাছে শুনেছিলেন যে স্বামীজী যখন উপস্থিত স্ত্রীলোকদের কাছে শক্তি সম্বন্ধে কথা বলছিলেন সেই বাণী সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, সেই বাণী ছিল প্রেম ও কোমলতায় পূর্ণ, তাতে বিচ্ছেদ ছিল না—ছিল না কোন ভৎসনা।

১৬ই মে, সোমবার

বিকালে, একটু দেরী করেই আমরা নৈনীতাল থেকে আলমোড়া যাত্রা করলাম। যখন বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, রাত হয়ে এল। বারবার আমরা এগোচ্ছিলাম গভীর নদীখাতের পথ ধরে, পাহাড়ের গা ঘুরে ঘুরে, বড় বা গাছের ছায়ার তলা দিয়ে, আর বাঘ ভাল্লুক তাড়াবার জন্য বড় বড় লণ্ঠন ও মশাল জেলে নেওয়া হয়েছিল। যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ গোলাপের বন, ঝরনার ধারে 'মেডেনহেয়ার ফার্ন' আর বেদানা গাছে লাল লাল ফুল ধরেছে দেখতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু যখন রাত হয়ে এল তখন ঐ ফুল ফল আর 'হনি সাক্‌ল'-এর সৌরভটুকুই অনুভব করছিলাম, আমরা এগিয়েই রয়েছি, এগিয়েই চলেছি—শুধুমাত্র তারার আলো, নীরবতা আর পর্বতের শোভা ছাড়া কিছু জানতেও চাইনি যতক্ষণ না আমরা পাহাড়ের পাশে, গাছপালায় ঢাকা, পুরোনো অদ্ভুতভাবে অবস্থিত একটা ডাক-বাংলোয় এসে উপস্থিত হলাম। একটু পরে দলবল নিয়ে হাসিখুশি মেজাজে স্বামীজী এসে পৌঁছলেন। তাঁর অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে সব কিছুর প্রশংসা করলেন; কিন্তু সকলের সামনেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বহিঃপ্রকৃতির অপার্থিব নৈশ শোভার

কাব্য, অগ্নিকুণ্ডের পাশে কুলিরা, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, অদূরে দরিদ্র মানুষের কুটির, মর্মরিত বৃক্ষরাজি, আর নীরব রাত্রির গম্ভীর অন্ধকার।

১১ই মে, মঙ্গলবার

আমাদের আলমোড়া পৌঁছনোর দিন থেকে স্বামীজী আবার তাঁর পুরোনো অভ্যাস সুরু করলেন। প্রাতরাশের সময় আমাদের কাছে আসতেন এবং কয়েক ঘণ্টা আলোচনাদি চলত। তখন এবং অন্যসময়ও তিনি ঘুমোতেন খুবই কম। আমার মনে হত, অত ভোরে আমাদের কাছে আসবার আগে তিনি অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আরো ভোরে উঠে, ঘুরে বেড়িয়ে, ফেরবার পথেই আমাদের কাছে আসতেন। কখনো কখনো, অবশ্য সেটা কমই হত, বিকাল বেলায়ও তাঁকে আবার দেখতে পেতাম, হয়ত যখন বেড়াতে বেরিয়েছি তখন, অথবা ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের বাড়িতে যেখানে স্বামীজী ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা ছিলেন সেখানেই দেখা হত। একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আলমোড়ায় এইসব প্রাতঃকালীন কথাবার্তার মধ্যেই যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু মনে রাখার পক্ষে মঙ্গল, একটা নতুন বিষয়ের উদয় হল। একপক্ষে একটা অদ্ভুত তিক্ততা আর অবিশ্বাস, অন্যপক্ষে বিরক্তি এবং জেদ। এই সময় স্বামীজীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে মনে হয় কনিষ্ঠতমা ছিল এক ইংরাজ রমণী। বিচারশক্তির দিক থেকে এই তথ্যটির (যে রমণী ইংরাজ জাতিভুক্ত) কি অর্থ, এবং কি দৃঢ় পক্ষপাত এই তথ্যের ভিতর সব সময়ই নিহিত আছে, ইংরাজজাতির আদর্শবাদ কর্ম ও ইতিহাসের মধ্যে, ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানের মধ্যে, মঠে তার দীক্ষার দিনের পর থেকে, সেদিন পর্যন্ত স্বামীজীর কোন ধারণা ছিল না। তিনি বিজয়গর্বে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন তখন, তার কি জাতি, এবং সচমকে দেখলেন ইংরাজদের পতাকার প্রতি সেই রমণীর মনে কতটা আনুগত্য ও উপাসনার মনোভাব বর্তমান। এই অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ভারতীয় রমণীর ঠাকুর পূজা করার অনুভূতির সঙ্গে। সেই মুহূর্তে স্বামীজীর বিস্ময় ও হতাশা সহজে অনুমান করা যাবে না। একটা সচমকিত দৃষ্টি—আর কিছু নয়। এই শিষ্য তাঁর লোকজনদের সঙ্গে কেমন ওপর-ওপর মেলামেশা করেছে—এই আবিষ্কারও সমতলে বাকি কয়েকটি সপ্তাহ অতিবাহিত করবার সময় তাঁর বিশ্বাস ও সৌজন্য-বোধকে কোনভাবে প্রভাবিত করেনি। কিন্তু আলমোড়াতে যেন 'স্কুলে আসা যাওয়ার' মত শুরু হয়েছিল, আর শিক্ষার্থীর পক্ষে শুধুমাত্র স্কুলে যাওয়া যেমন খারাপ লাগে, তেমনি এখানেও যদিও রীতিমত কষ্টসাপেক্ষ হয়েছিল, তবুও আধ-বোঝার ব্যাপারটা শেষ করে ফেলা উচিত ছিল। মনকে আকর্ষণের কেন্দ্রে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এটা তার বেশি কিছুই ছিল না; ধর্ম ও বিশ্বাস বিষয়ক আদেশও নয়,—পক্ষপাতশূন্যতা ছাড়া কিছুই নয়; এমন কি এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শেষে যখন জাতি ও দেশ সম্বন্ধে এই প্রথা আর কখনো নিয়মানুসারে ধরা হবে না বলে পরিত্যক্ত হল, স্বামীজী বিশ্বাস সম্বন্ধে কোনও কৈফিয়ৎ এবং নতুন মতবাদের কোন স্বীকারোক্তিও চাইলেন না। তিনি সম্পূর্ণ প্রশ্নটা ছেড়েই দিলেন। তাঁর শ্রোত্রী রেহাই পেল।

কিন্তু চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনি এমন একটা পৃথক কিন্তু জোরালো ও সম্পূর্ণ মতবাদ প্রকাশ করলেন যে শিক্ষার্থিনী শিষ্যার পক্ষে বিশ্রাম নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল—যতক্ষণ না সে নিজের চেষ্টায় একটা ধারণা তৈরি করে নিয়েছিল, যে ধারণার মধ্যে এই দুই আংশিক উপস্থাপনাগুলি যুক্তিগ্রাহ্য ও সঙ্গত বলে মনে হয়েছিল। অনেকদিন পরে, যখন কোন ঘটনার পক্ষপাতহীন বিচারের ধারা বেশ বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন "সত্যি, তোমার মত দেশপ্রেম কিন্তু পাপ। আমি চাই যে তুমি বুঝবে যে অধিকাংশ লোকের কাজই স্বার্থচিন্তার প্রকাশক, আর তুমি সব সময় এই ধারণার প্রতিবাদ কর, যেন কোন একটা জাতির লোকেরা সবাই দেবদূত! এই বদ্ধমূল অজ্ঞতাই বজ্জাতির নামান্তর!" এই একই শিষ্যা আর একটি বিষয়েও অতি তিক্ত একঁগুয়েমি দেখিয়েছিল, সেটি হল স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাম্প্রতিক পশ্চিমী মতবাদ। যে মুক্ত ও নির্মোহ মন সত্যকে স্বাগত জানায়, সেই মনের তুলনায় এই শিষ্যার সহানুভূতির সীমাবদ্ধ রূপ এখন অতি তুচ্ছ ও অশালীন মনে হয়।

কিন্তু এক সময় সেই ত্রুটিগুলিই যেন সার্থক অর্থে পথে আটকে বসে থাকা সিংহের মত ছিল, আর সেই রকমই রয়ে গিয়েছিল যতক্ষণ না যে ব্যক্তিত্ব এখানে স্বয়ং প্রকাশমান সেটার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় যে ত্রুটিগুলো, তাদের উপলব্ধি করতে সেই শিষ্যা সক্ষম হয়েছিল। একবার এই ত্রুটিগুলো দেখার পর যা গ্রহণ-যোগ্য নয় বা যা বোঝা যায় না, এমন বিষয়ের প্রতি উদাসীন হওয়া সহজ এবং তাদের বিচারের ভার সময়ের উপরেই ছেড়ে দেওয়া যায়। প্রতি ঘটনার মধ্যেই সব সময়ই অতীতের আদর্শ তার সহানুভূতির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এটা হল এক যুগের প্রতি পূজা করার মনোভাব—যা অন্য যুগের পথেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন আলোচনাগুলি তখন সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প-কলা সম্বন্ধে দৃঢ় মূল ধারণার বিরুদ্ধে আক্রমণের রূপ নিত, অথবা ভারতীয় ও ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভাবপ্রবণতার দীর্ঘ তুলনামূলক কিন্তু প্রায়ই বিস্তৃত ও মূল্যবান পর্যবেক্ষণের আকার নিত। স্বামীজীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যে দেশে তিনি থাকতেন সেই দেশের দোষ-ত্রুটিগুলির খোলাখুলিভাবে ও প্রবলভাবে আক্রমণ করা; আবার দেশ ছেড়ে যখন চলে আসতেন, সেই দেশের ভাল ছাড়া তাঁর আর কিছু মনে থাকত না। তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের প্রায়ই পরীক্ষা করতেন; এই বিশেষ আলোচনার ধারা সম্ভবত গ্রহণ করেছিলেন একজনের জন্য, যে নারী এবং ইউরোপীয় দুই-ই, তারই সাহস ও আন্তরিকতার প্রমাণ নেবার জন্য।

তৃতীয় অধ্যায়

আলমোড়ার প্রাতঃকালীন আলোচনা

স্থান : আলমোড়া

সময় : মে ও জুন, ১৮৯৮

১৮ই মে, বুধবার

প্রথম সকালে আলোচনা হচ্ছিল সভ্যতার মূল আদর্শ নিয়ে—পশ্চিমে সত্য, পূর্বে পবিত্রতা। তিনি হিন্দুবিবাহ প্রথাকে স্ত্রীলোকের রক্ষাকবচ এবং এই আদর্শ অনুধাবনের সমন্বয় বলে বর্ণনা করলেন। তারপর এই সমগ্র বিষয়টিকেই চরম দর্শনের দিকে নিয়ে গেলেন।

আর একদিন সকালে, তিনি বলতে সুরু করলেন, আগে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বানিয়া এবং শূদ্র—এই চারটি প্রধান জাতি ছিল তেমন চারটি মহৎ জাতীয় কর্মযজ্ঞ ছিল। ধর্ম অথবা পৌরোহিত্যের কাজ করেছিল হিন্দুরা, রোমান সাম্রাজ্য সম্পাদন করেছিল সামরিক কাজটি, ইংল্যাণ্ড করেছিল বণিকবৃত্তি আর ভবিষ্যতে আমেরিকানের গণতান্ত্রিক কাজের ভার। এখানে তিনি একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে আমেরিকা শূদ্রদের সমস্যা সমাধান করবে, সেই সঙ্গে স্বাধীনতা ও সহযোগিতার সমস্যাও; আমেরিকাবাসী নয় এমন একজনের কাছে স্বামীজী বিবৃত করলেন—দেশের আদিবাসীদের জন্য ও দেশের লোকেদের উদার ব্যবস্থার চেষ্টা করার কথা।

আবার হয়ত ভারতের কিংবা মুঘল ইতিহাসের আগ্রহপূর্ব আলোচনা শুরু করে দিতেন; এইসব আলোচনার বিশালত্ব ও মহত্ত্ব কখনো তাঁকে ক্লান্ত করেনি। সারা গ্রীষ্মকালে প্রায়ই তিনি দিল্লী অথবা আগ্রার বর্ণনা করতেন। একদিন তিনি তাজমহলকে 'ম্লান অন্ধকার এবং একটি সমাধি'—এইভাবে বর্ণনা করলেন। অন্য এক সময়ে শাহজাহান সম্বন্ধে আলোচনার সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'আহ্, তিনি তাঁর বংশের গৌরব ছিলেন। সৌন্দর্যবোধ আর শিল্প সমালোচনায় তিনি ইতিহাসে অদ্বিতীয়। নিজেই তিনি একজন শিল্পী। আমি তাঁর চিত্রিত একটি পুঁথি দেখেছি—সেটি ভারতের একটি শিল্পসম্পদ বিশেষ। কি প্রতিভা!'

আগ্রায় সেকেন্দার সমাধিভূমিতে,—সেই সূর্য ও বাতাসের কাছে উন্মুক্ত আচ্ছাদনহীন সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে, আকবর সম্বন্ধে বলার সময় তাঁর কণ্ঠ অশ্রুতে আর্দ্র হয়ে এল, তাঁর আবেগ আমরা সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলাম।

গুরুদেব মানবিক অনুভূতির বিশ্বজনীনতা আত্মস্থ করেছিলেন। একদা তিনি চীন সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন চীন বিশ্বের ধনাগার। চীনা মন্দিরদ্বারে প্রাচীন বাঙালী (কুটিল?) চরিত্রের ছবি দেখে কেমন অভিভূত হয়েছিলেন সে কথাও জানালেন। যখন শ্রোতাদের একজন অভিযোগ করলেন যে ঐ জাতির মধ্যে একটা স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হল তাদের মিথ্যাচরণ,—প্রাচ্য দেশীয় লোকজন সম্বন্ধে পশ্চিমী ধারণার অস্পষ্টতা এই কথাটিতে সরব হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে চীনারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ী জাতি

হিসাবে খুবই বিখ্যাত, কারণ বাণিজ্য-বিষয়ক ঐক্য, লিখিত চুক্তির পশ্চিমী প্রয়োজনের থেকেও এক বিষয়ে অনেক অগ্রসর। সুতরাং ঐ প্রতিবাদটি ভুল উপস্থাপনারই একটা উদাহরণ, এটা যদিও গ্লানিকর তথাপি অতি সাধারণ। কিন্তু যাই হোক না কেন, স্বামীজী সেসব গ্রাহ্য করবেন না। অসত্য! সামাজিক কড়াকড়ি। এগুলো অতি আপেক্ষিক মন্দ ছাড়া আর কি? আর বিশেষ করে ক্ষমতা সম্বন্ধে বলা যায়—বাণিজ্যিক জীবন, সমাজজীবন, অথবা সহযোগিতার যে কোন দিকেই যদি মানুষ মানুষকে না বিশ্বাস করে, তবে একদিন ও কি বলতে পারে? অসত্য শিষ্টাচারের অঙ্গ? তাহলে পাশ্চাত্য ধারণার সঙ্গে তার তফাত কোথায়? একজন ইংরাজ কি উপযুক্ত স্থানমত হৃষ্ট বা দুঃখিত হয়? তাহলে মাত্রার তফাৎ আছে? সম্ভবত কেবল মাত্রারই তফাৎ।

অথবা তিনি অনেকদূরে "ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দেশ, ধর্ম ও শিল্পের দেশ, সাম্রাজ্য-গরিমার সংগঠন ও মাৎসিনীর দেশ, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির জননী" ইতালীতে মানসভ্রমণ করতেন।

একদিন তিনি মারাঠা এবং শিবাজীর সম্বন্ধে এবং তাঁর সর্বব্যাপী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমণের কথা বলছিলেন। এই সন্ন্যাসীরূপেই তিনি রায়গড়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। স্বামীজী বললেন, 'আজ পর্যন্ত শাসক সম্প্রদায় সন্ন্যাসীদের ভয় পায়, কারণ তারা ভাবে সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্রের অন্তরালে আর একটি শিবাজী লুকিয়ে আছেন।' মাঝে মাঝেই তিনি প্রশ্ন করতেন "আর্যরা কে এবং কি ছিলেন," এই প্রশ্ন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করত। আর্যদের উৎপত্তির বিষয়টা যে বেশ জটিল, এই ধরে নিয়ে, তিনি আমাদের বলতেন, সুইজারল্যাণ্ড থাকার সময় তাঁর কেমন মনে হত যে তিনি চীন দেশে আছেন—দুই জাতির মধ্যে এত মিল!

নরওয়ের অংশবিশেষ সম্বন্ধেও তাঁর এই ধারণা ছিল। কখনো কখনো বিভিন্ন দেশ এবং দেশের মানুষদের আকারগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে টুকরো টুকরো খবর দিতেন। একজন হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকর গল্প বলতেন, যিনি নাকি তিব্বতে হুনদের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলেন, দার্জিলিঙে তাঁর সমাধি আছে—এইসব আরো অনেক কথা।

সারা গ্রীষ্মকাল জুড়েই একটা মজার ব্যাপার ছিল এই যে, শুধু স্বামীজীর বিষয়েই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যায় এমন সব মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যেত এই জাতি ধর্ম বিষয়ক অনুসন্ধানজাত মোহ কি জোরাল ছিল! মনে হত প্রাচ্যের বুদ্ধিগত জীবনের, জাতি, প্রথা ও মানবজাতির উৎপত্তিগত ও সম্ভাবনাসূচক প্রশ্নসমূহ বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হত—যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় পশ্চিমী দেশে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণের ওপর। এই ধারণা থেকে বোঝা যায় যে পূর্বদেশের পণ্ডিতগণ বা রাজনীতিবিদ্‌গণ তাদের অদ্ভুত সমস্যার মধ্যে এই প্রাথমিক বিষয়টিকে কখনো অবহেলা করেন না, আর সময়বিশেষে এই মূল্যবান বিভেদশক্তি কাজে লাগাতে পারতেন।

মাঝে মাঝে স্বামীজী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যে বিভেদ আছে তার

আলোচনা করতেন, সমগ্র ইতিহাসকে তুলে ধরতেন এই দুই শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস বলে। শেষোক্ত শ্রেণীকে জাতির উত্থান ও শৃঙ্খলমোচনকারী প্রতীক বলে বর্ণনা করতেন। বর্তমান বঙ্গদেশের ক্ষত্রিয়েরা যে প্রাক্-মৌর্য যুগের ক্ষত্রিয়, এই তাঁর ধারণা ছিল, আর এর সপক্ষে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের দুই সংস্কৃতির চিত্র আঁকতেন। একটি ছিল প্রাচীন, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক, প্রথা ও আচারের বোধ ছিল যেখানে গভীর-ভাবে সম্পৃক্ত, অন্যটি ছিল স্পন্দিত, উত্তেজনা-উদ্রেককারী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। ঐতিহাসিক অগ্রগমনের একটা গভীর নিহিত নিয়ম এই যে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ—এরা কেউ পুরোহিত বা ব্রাহ্মণশ্রেণীতে জন্মান নি। সকলেই রাজবংশোদ্ভূত। আর এই আপাতবিরুদ্ধ কিন্তু প্রকৃত সত্য মুহূর্তে, বৌদ্ধধর্ম একটা জাতি অভিমান ধ্বংসকারী নীতি, ক্ষত্রিয় কর্তৃক আবিষ্কৃত একটা ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটা প্রচণ্ড বিরুদ্ধ সংযোজন হিসাবেই গণ্য হয়েছিল।

যখন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে বলতেন—সত্যিই সেটা শোনার মত ছিল। তাঁর একটি উক্তিকে ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী প্রবণতা হিসাবে ধরে নিয়ে তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করতে অপারগ এক শ্রোতা বলে উঠেছিলেন—'ওমা, স্বামীজী, আপনি যে বৌদ্ধ মতাবলম্বী, তা আমি জানতাম না!' স্বামীজীর মুখ বুদ্ধের নামোল্লেখেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বক্তার দিকে ফিরে বললেন, "মহাশয়, আমি বুদ্ধের দাসানুদাসের দাস।···তাঁর মত আর কে আছে? প্রভু বুদ্ধ, যিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেন নি। সারা জগৎকে বুকের মধ্যে টেনে নেবার মত সেই করুণাঘন হৃদয়, তিনি সন্ন্যাসী রাজপুত্র—একটি ছাগশিশুকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এত মমতা যে বাঘিনীর ক্ষুধা মেটাবার জন্য আত্মদান করতে গিয়েছিলেন, ডোমের আতিথ্য স্বীকার করেছেন দ্বিধাহীনভাবে। আমি যখন বালকমাত্র, আমার ঘরে একদা তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমি তাঁর পদতলে পড়েছিলাম, আমি জানতাম তিনি স্বয়ং প্রভু বুদ্ধ।"

এইভাবে অনেক সময় তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে নানা গল্প বলতেন, কখনো বেলুড়ে বা কখনো অন্য সময়ও। একদা তিনি সুন্দরী নাগরিকা অম্বপালি, যিনি বুদ্ধকে ভোজন করিয়েছিলেন, তার গল্প বলেছিলেন। এমনভাবে বলেছিলেন যে মেরী ম্যাগ্‌ডালেনের ওপর লেখা, কবি রসেটির অর্ধ-চতুর্দশপদী কবিতাটির কথা মনে পড়েছিল।

ওগো ছেড়ে দাও—দেখোনা তুমি
আমার বঁধুর মুখ।
যে আমাকে তাঁর কাছে টানে, কারণ
তাঁর পদ চুম্বন করে—
আমার চুল; আমার ক্রন্দন,
তিনি কামনা করেন আজ,
আর, আহা—
কথা কি বলতে পারে
কবে আর কোথায়,

আমি দুই হাতে জড়াব তাঁর
রক্তরাঙা চরণ দুটি।
তিনি আমাকে চাইছেন, ডাক দিয়েছেন,
আমায় ভালোবেসেছেন
আমাকে যেতে দাও।

জাতীয়তাবোধ সবসময় ঠিকভাবে চলেনি। কারণ, একদিন যখন বিভেদটা বেশ প্রবল ছিল সেদিন ভক্তির ওপর একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। প্রেমিকের সঙ্গে অখণ্ড একাত্মবোধ যা প্রাক্-চৈতন্যযুগে সম্ভ্রান্ত বাঙালী রায় রামানন্দ বর্ণনা করেছেন:

চারিচক্ষের মিলন হল, দুই আত্মার মধ্যে পরিবর্তন হল।
আর আমি তো জানি না তিনি পুরুষ,
আর আমি নারী, অথবা তিনি নারী, আমি পুরুষ।
আমি যা জানি তা হল—দুই ছিল এল প্রেম, হয়ে গেল একাত্ম।

সেইদিন সকালে তিনি পারস্যের বার-পন্থীদের কথা বললেন। তাদের শহীদীয়ানার যুগে যে রমণী অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেই পুরুষ তিনি (তাঁকে) পূজা করতেন ও কাজ করতেন, সেই কথা বললেন। অনভ্যস্ত মনের কাছে সেই রীতি-নীতির বিস্তারিত বর্ণনা খানিকটা আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত লাগত, বক্তব্য বিষয়ের জন্য যত না হোক বরং তরুণ প্রাণের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, কল্যাণ, মহত্ত্ব ও উচ্চ সম্ভাবনার জন্যই যারা ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রকাশ ছাড়াই ভালোবাসে তার জন্য।

আর একদিন সূর্যোদয়ের সময়, যখন বাগান থেকে উষার আলোয় আলোকিত তুষার দেখা যায়, তিনি এসে উমা ও শিবের কথা বলতে লাগলেন; সেই উচ্চে দেখা তুষারগিরি যেন শিব, আর যে আলো তার ওপর এসে পড়ল যেন জগন্মাতা। সেই সময় একটা ধারণার কথাই তিনি বারবার বলতেন, জগৎ ব্রহ্মময়, তিনি বাইরেও নেই, ভিতরেও নেই। ঈশ্বরের কোন স্বরূপ নেই, আর জগৎও ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের প্রতিমা নয়, কিন্তু তিনি আছেন—তিনি এক।

সারা গ্রীষ্মকাল ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কখনো কখনো আমাদের হিন্দুধর্মের নানা উপকথা শোনাতেন। সে গল্পগুলো ইউরোপীয় শিশু-ভোলানো গল্পের মত নয়, বরং প্রাচীন গ্রীকজগতের মানুষ তৈরি করা গল্পের মতই ছিল। আমার সব থেকে ভালো লেগেছিল শুকদেবের গল্প; যখন প্রথম গল্পটি শুনি তখন আমরা শিবপর্বত আর আলমোড়ার জনহীন দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

শুকদেব ছিলেন যথার্থ 'পরমহংস, তিনি মাতৃগর্ভ থেকে দীর্ঘ পনের বছর ধরে ভূমিষ্ঠ হতে চাননি, কারণ তিনি জানতেন, তাঁর জন্ম হলে মাতার মৃত্যু হবে। তখন তাঁর পিতা ব্যাসদেব জগন্মাতা উমার কাছে আবেদন জানালেন। উমা মাতৃগর্ভ-স্থিত শুকের সম্মুখ থেকে বার বার মায়া আবরণ সরিয়ে দিচ্ছিলেন। ব্যাসের অনুরোধে মুহূর্তের জন্য তিনি থামলেন আর তখনই শুক জন্ম নিলেন। দিগম্বর, ষোলবছরের তরুণের রূপ ধারণ করে পিতা-মাতার কথা জানতেও না চেয়ে সোজা চলতে শুরু করলেন। পুত্রকে অনুসরণ করলেন ব্যাসদেব। একটি গিরিবর্ত্মের কাছে এসে

শুকদেব লীন হয়ে গেলেন, কারণ তাঁর দেহ তো জগৎ থেকে পৃথক ছিল না। তাঁর পিতা তখন 'পুত্র! পুত্র!' বলে কাতর ক্রন্দন করতে লাগলেন। পিতার আহ্বানের উত্তরে পর্বত থেকে 'ওম্ ওম্' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তখন শুক পুনর্বার দেহ ধারণ করে পিতার কাছে এলেন জ্ঞান লাভ করতে। কিন্তু ব্যাস দেখলেন পুত্রকে তার পক্ষে জ্ঞানদান করা অসম্ভব, তখন পুত্রকে তিনি মিথিলারাজ জনকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনদিন শুক রাজপুরীর দ্বারে উপস্থিত হয়ে বসে রইলেন। চতুর্থ দিনে হঠাৎ তাঁকে মহা আড়ম্বরে রাজসমীপে নিয়ে যাওয়া হল; এতেও তিনি রইলেন অবিচল।

রাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এক বিচক্ষণ মুনি। তিনি এক মনোরমা রমণীর মূর্তি ধরলেন। তাঁর রূপ দেখে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ ও হতবাক্ হলেন। কিন্তু স্থিরচিত্ত শুকদেব তাঁর কাছে গিয়ে, একাসনে বসে, তাঁকে ঈশ্বরের কথা বলতে লাগলেন।

তখন মন্ত্রী রাজাকে বললেন, 'হে রাজন্, যদি আপনি সব থেকে মহান ব্যক্তিকে চান তো ইনিই সেই ব্যক্তি।'

শুকদেব সম্বন্ধে অল্পই বলা হল। তিনিই প্রকৃত পরমহংস; মানুষের মধ্যে তিনিই সৎ-চিৎ-আনন্দ অর্থাৎ অস্তিত্ব, জ্ঞান ও পরম আনন্দ-রূপ অখণ্ড মহাসমুদ্রের এক গণ্ডুষ জল পান করেছিলেন। বহু মুনি এই মহাসমুদ্রের তরঙ্গ হিল্লোল শুনেই দেহত্যাগ করেন, কেউ পান সমুদ্রের দর্শন, খুব অল্পজন পান এর আস্বাদ, কিন্তু স্বর্গীয় মুখের আনন্দ পান করা—?'

শুকদেবই স্বামীজীর আদর্শ তাপস ছিলেন। জগৎ ও জীবন যে কেবল খেলা—এই বোধ উপলব্ধির আদর্শস্থল ছিলেন শুকদেব। অনেকদিন পরে আমরা শুনেছিলাম কেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বালকাবস্থায় তাঁকে বলতেন 'আমার শুকদেব'। আর একদিন স্বামীজী সহসা উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করেছিলেন—শিব বলেছিলেন, "আমি জানি, শুকদেব জানতেন—আর সম্ভবত ব্যাসদেব অল্পই জানতেন"; সেই আনন্দময় অনুভূতির দৃষ্টির কথা আমি কখনো ভুলতে পারি না।

আলমোড়ায় আর একদিন, স্বামীজী হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন তীরভূমিতে আধুনিক চৈতন্যের প্রথম তরঙ্গ-প্লাবন উত্থিত বাঙালী মনীষীগণ সম্বন্ধে বলেছিলেন। রাজা রামমোহনের কথা নৈনীতালে আগেই শুনেছিলাম, এখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন—"আমার সমকালে উত্তর ভারতে এমন কোন মানুষ নেই যার ওপরে তাঁর ছায়া পড়েনি।" এই সকল মহাপুরুষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান ছিল কয়েক মাইলের মধ্যেই—এই বিষয়টি তাঁকে মহা আনন্দ দিত।

স্বামীজী আমাদের কাছে বিদ্যাসাগরের গল্পের প্রস্তাবনা করলেন এইভাবে যে, তিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ নিরোধের সংগ্রামী বীর। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর প্রিয় গল্পটি ছিল যখন লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল থেকে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন এই কথা ভাবতে ভাবতে যে, তিনি এইসব সময়ে ইংরাজী পোশাক পরবেন কিনা। এমন সময় দেখলেন—এক স্থূলকায় মুসলমান ব্যক্তি মহা আড়ম্বরে

হেলেদুলে চলেছেন। একজন লোক তাঁর কাছে দৌড়ে এসে বললে, 'হুজুর, আপনার বাড়িতে আগুন লেগেছে।' খবরটা শুনে হুজুর ব্যস্তও হলেন না, আস্তেও চললেন না, যেমন চলছিলেন, তেমনই চলতে লাগলেন। তাঁর চলা দেখে বার্তাবহ লোকটিকে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখে মুসলমান ভদ্রলোকটি খুব রেগে বললেন—'দূর হতভাগা। কয়েকটা কাঠ পুড়ছে বলে আমি পিতৃপুরুষের চলার কায়দা আজ ছেড়ে দেব?' বিদ্যাসাগর পিছনে পিছনে আসছিলেন; তিনি মুসলমান ব্যক্তিটির কথা শুনে কোট বা চটি পর্যন্ত না ব্যবহার করে যথারীতি ধুতি-চাদর ও বিদ্যাসাগরী চটিই ব্যবহার করবেন স্থির করে ফেললেন।

যখন বিদ্যাসাগরের জননী তাঁর কাছে বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রস্তাবনা করেন তখন শাস্ত্রপাঠের জন্য একমাসের ছুটিতে যাওয়ার চিত্রটি খুবই সতেজ। তিনি শাস্ত্রপাঠ করে বুঝেছিলেন যে শাস্ত্রকারগণ পুনর্বিবাহের বিরোধী নন। তখন তিনি যে পণ্ডিতবর্গ সম্মতি দিয়েছিলেন তাঁদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। পরে অবশ্য কতিপয় দেশীয় রাজন্যবর্গের প্ররোচনায় পণ্ডিতগণ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করেন। যদি না সরকার ঐ আন্দোলনে সহায়তা করতেন, তাহলে (বিধবা বিবাহ) আইনটি পাশ হত না। এই বলে স্বামীজী বলতেন 'এই অসুবিধার পিছনে সামাজিক ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান।'

আমরা বুঝতে পারতাম যে, নৈতিক শক্তির জোরেই একজন মানুষ বহুবিবাহ রোধে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই 'ঘোরতর অধ্যাত্মবাদী' আর ১৮৬৪ সনের দুর্ভিক্ষে যখন ১৪০০০০ লোক ক্ষুধা ও রোগে প্রাণ হারিয়েছিল, তখন এই মহামানব কেমন করে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা হারিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন; প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই ভারতীয় লোকের পক্ষে এই ঔদাসীন্য সত্যিই আশ্চর্যজনক বটে।

বাংলাদেশের এই শিক্ষাবিদের সঙ্গে স্বামীজী ডেভিড্ হেয়ারের নাম যোগ করেছিলেন। ডেভিড্ হেয়ার ছিলেন এক নিরীশ্বরবাদী বৃদ্ধ স্কচ্ ভদ্রলোক, যাঁকে কলিকাতার খ্রীষ্টীয় পুরোহিত সম্প্রদায় ক্রীশ্চান প্রথায় সমাহিত করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তিনি কলেরা রোগাক্রান্ত এক পুরোনো ছাত্রকে সেবা করতে গিয়ে মারা যান। তাই তাঁর ছেলেরাই (ছাত্ররা) তাঁর দেহ বহন করে একটা জলা জায়গায় সমাহিত করেছিল আর ঐ সমাধি তাদের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে ঐ জায়গাটির নাম কলেজ স্কোয়ার, শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, আর তাঁর স্কুল এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত, ছাত্রসমাজ তাঁর সমাধিকে তীর্থস্থান বলেই মনে করে।

এইদিন আমরা সুযোগ পেয়ে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্বামীজীর ওপরে খ্রীষ্টধর্মের কোন সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে কিনা। এই রকম একটা কথা যে আমরা সাহসভরে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে স্বামীজী খুব মজা পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের গর্বভরেই বলেছিলেন, মিশনারী প্রভাবের সংস্পর্শে তিনি একবারই এসেছিলেন। সেই ব্যক্তি হলেন তার প্রাচীন শিক্ষক মিঃ হেস্টি। সেই বৃদ্ধ মানুষটির নিজের বলতে কিছুই ছিল-না; তার নিজের ঘরটিকে তিনি ছাত্রদের ঘর বলেই মনে করতেন।

তিনিই সর্বপ্রথম স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ভারতবাসের শেষ দিকে তিনি বলতেন 'হ্যাঁ, বৎস তুমি ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ,—সত্যিই ঈশ্বরই সব।'

স্বামীজী আবেগভরে বলতেন "আমি তাঁর জন্য গর্ববোধ করি কিন্তু তোমরা বলতে পার না যে তিনি আমাকে খ্রীষ্ট মনোভাবাসম্বী করে তুলেছেন।" প্রকৃত পক্ষে স্বামীজী এত অনিয়মিতভাবে কলেজ যেতেন যে তিনি মাত্র ছয় মাস হেস্টি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। এই অনিয়মিত উপস্থিতির জন্যই প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁকে ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে পাঠাতে চায়নি—যদিও তিনি পাশ করে গিয়েছিলেন।

তিনি আমাদের সাধারণ বিষয়ের গল্পও শোনাতেন। আমেরিকার একটি শহরে, এক আবাসন-গৃহে তিনি ছিলেন, যেখানে তিনি নিজেই রান্না করে খেতেন। সেইখানে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, সেই অভিনেত্রী রোজ টার্কীর রোস্ট খেতেন। আর এক দম্পতি ছিলেন, তাঁরা ভূত নামাতেন। একদা স্বামীজী ভদ্রলোকটিকে কথাপ্রসঙ্গে আপত্তি জানিয়ে, লোকদের প্রতারণা করতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁকে বলেন, 'আপনার এমন কাজ করা উচিত নয়।' এই কথা শুনেই ভদ্রলোকের স্ত্রী পিছন থেকে ছুটে এসে বলেন "হ্যাঁ মহাশয়, এই কথাই আমি ওঁকে বলছিলাম ; কারণ উনি যা টাকাই পান মিসেস উইলিয়ম এসে নিয়ে যান।"

তিনি একজন শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার সম্বন্ধেও একটি গল্প বলেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটি একটি প্রেতচক্রে আসেন। মিসেস উইলিয়ম পর্দার পিছনে থেকে তাঁর মা রূপে আবির্ভূত হলে তরুণটি সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন, 'ওমা, তুমি প্রেতলোকে গিয়ে কি মোটাই না হয়েছ।' এই দেখে স্বামীজী বলেছিলেন যে লোকটির আর কোনই আশা নেই দেখে আমার যা দুঃখ হয়েছিল!

তিনি আবার এক রুশ চিত্রশিল্পীর কথা বলেছিলেন। এই শিল্পীকে এক চাষীর বাবার ছবি আঁকতে বলা হয়েছিল। মৃত পিতার সম্বন্ধে সে একটা বর্ণনাই দিয়েছিল যে বাবার নাকে একটা বড় আঁচিল ছিল। শিল্পী যা হোক করে এক চাষার ছবি এঁকে নাকে একটা বড় আঁচিল দিয়ে ছেলেকে খবর পাঠান যে ছবি শেষ হয়েছে, এসে দেখে যাও। ছেলে বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অভিভূত স্বরে বলে উঠল—'বাবা! বাবা! তোমাকে যা শেষ দেখেছি তার থেকে তুমি কত বদলে গেছ!' এই গল্প শুনে ঐ তরুণ ইঞ্জিনীয়ার স্বামীজীর সঙ্গে আর কথা বলেনি। সে বুঝতে পেরেছিল তিনি কি বলতে চাইছেন। কিন্তু তার এই ব্যবহারে হিন্দু সন্ন্যাসী অবশ্য খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

এতসব সত্ত্বেও কিন্তু বেশ মতবিরোধ ঘনিয়ে উঠেছিল। আমাদের দলের এক প্রাচীন সদস্যের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে স্বামীজীর তখন নিজেরই সেবা এবং শান্তির প্রয়োজন। কত সময়ে তিনি বিস্ময় ও জীবনযন্ত্রণার কথা বলেছেন—হয়ত তার মধ্যেই আত্যন্তিক প্রয়োজনের আভাস দেওয়া হয়েছিল। একটি দুটি কথা বললেন, ব্যস। তারপর অনেকক্ষণ পরে তিনি ফিরে এসে বললেন—তাঁর মন শান্তি চাইছিল, তাই তিনি বনের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন শান্তি ও আরামের সন্ধানে।

তারপর মুখ তুলে মাথার ওপর নতুন চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন—"মুসলমান-

দের কাছে নতুন চাঁদের অর্থ অনেকখানি! এস, নতুন চাঁদের সঙ্গে আমরাও নতুন জীবন সুরু করি।" এই বলে তিনি তাঁর কন্যাকে (নিবেদিতা) বিশেষ আশীর্বাদ জানালেন। কন্যা ভাবল যে পুরোনো সম্পর্ক ছিন্ন হল আর মাত্র বুঝল যে এটি কি মধুর ও আশ্চর্য ক্ষণ, কিন্তু স্বপ্নেও বুঝল না যে এক গভীর ও নবজীবনের সূত্রপাত হল।

সুতরাং বিরোধের শেষ হল। স্থির হল যে, স্বামীজীর মতবাদ ও আদর্শ সব কিছুই অবসর সময় মত খুঁটিয়ে দেখা হবে, স্থির করা হবে—প্রথম দিকে সেটা যতই অপ্রিয় অথবা অসম্ভব হোক না কেন!

২৫শে মে

তিনি চলে গেলেন, শনিবার আবার ফিরে এলেন। তিনি প্রতিদিন নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে গিয়ে অন্তত দশ ঘণ্টা করে কাটাতেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর তাঁবুতে ফিরে আসার পর সবাই মিলে এমন ব্যস্ত হয়ে তাকে ঘিরে ধরতেন যে, তাঁর সেই অনুভূতিটা নষ্ট হয়ে যেত, তিনি তখন পালিয়ে যেতেন। তবুও তিনি হাসিখুশি উজ্জ্বল মেজাজে থাকতেন। তিনি আবার নিজের মঠে, পশ্চিমী সভ্যতার দ্বারা অবিনশ্বর সেই পুরোনো সন্ন্যাসীকে আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি নগ্নপদে, শীতাতপ সহ্য করে স্বল্পাহারে দিন কাটাতেন। এই বোধ আর তাঁর যা ছিল তাঁর পক্ষে বর্তমানে যথেষ্ট ছিল; তাঁকে আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা ও শান্তিতে শ্রীমতী সেভিয়রের বাগানে ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ ও গোলাপ বাগিচার মধ্যে রেখে চলে এলাম।

৩০শে মে

পরের সোমবার তিনি তাঁর গৃহস্বামী ও গৃহস্বামীনীকে নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য রেত্তার্তে চলে গেলেন; আমরা আলমোড়ায় রয়ে গেলাম পড়তে, আঁকতে আর উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কাজে লাগাতে।

২রা জুন

এই সপ্তাহেরই এক সন্ধ্যায়, সান্ধ্যভোজনের পর আমরা বসেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন পড়ে শোনাচ্ছিলেন 'ইন মেমোরিয়ম' কবিতাটি:

তবুও এই দুই কানে, যতক্ষণ শ্রুতি আছে,
মানুষের চোখ ভরে দেখা—
মধুরতম প্রাণের বিয়োগবার্তা ঘোষণা করে
যেন কে করে ঘণ্টাধ্বনি।
আমি বারবার শুনি,
মৃতের প্রতি অনন্ত অভিনন্দন,
'মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক' বলে,
আর বলে—'বিদায়, চির বিদায়।'

ঠিক এই সময়েই সুদূর দক্ষিণ ভারতে, আমাদেরই একজন দৃশ্যজগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সীমানা ছেড়ে, সুন্দরতর উজ্জ্বলতা ও আনন্দময়তার দিকে, জগতের সীমানার বাইরে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সে কথা তখনো আমরা জানি না। আরো একটা দিন যে কি কালো ছায়া আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বুঝতে পারিনি। শুক্রবার সকালে যখন আমরা কাজে ব্যস্ত, একদিন দেরী করে টেলিগ্রাম এল: 'গুডউইন গতকাল রাতে, উতকামণ্ডে পরলোক গমন করেছেন।' আমাদের বন্ধুবেচারা সংক্রামক টাইফয়েড্ রোগের প্রথম শিকার হয়েছেন। মনে হয়েছিল তিনি শেষনিঃশ্বাসেও স্বামীজীর নাম উচ্চারণ করেছেন, আর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে তাঁর উপস্থিতিই কামনা করেছেন।

৫ই জুন

রবিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী ফিরে এলেন। সোজা বাগান পেরিয়ে উঠে এলেন যেখানে আমরা বসেছিলাম, আমাদের সঙ্গে অল্প কথাবার্তা হল। তিনি এখানকার খবর জানতেন না, কিন্তু একটা অন্ধকার ছায়া যেন ইতিমধ্যেই তাঁর ওপর পড়েছিল। নিস্তব্ধতা ভেঙে তিনি সেই সাধুর গল্প মনে করিয়ে দিলেন, যিনি গোখ্‌রো সাপের ছোবলকে বলেছিলেন—'প্রিয়তমের দূত।' সেই সাধুকে তিনি ভালোবাসতেন—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমপর্যায়ভুক্ত। স্বামীজী বললেন, "এইমাত্র আমি চিঠি পেলাম পওহারীবাবা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে, সব বিসর্জন শেষ করেছেন। তিনি জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।"

তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠেছিলেন—"স্বামীজী, এটা ভুল নয় ?"

স্বামীজী বেশ অস্থির হয়েই বললেন—"আমি কি করে বলি বল ? তিনি মহামানব, আমার বুদ্ধিতে তাঁকে বিচার করা যায় না। তিনি নিজেই জানতেন—কোনটা তার পক্ষে ভাল কি মন্দ।"

এরপর বিশেষ কথাবার্তা হল না। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা চলে গেলেন। তখনো কেউ তাঁর কাছে গুড্‌উইনের খবর ভাঙল না।

পরের দিন ভোরে বেশ তাড়াতাড়ি এলেন তিনি, বেশ ভালো মেজাজে ছিলেন। পরে শুনলাম তিনি ভোর চারটায় উঠেছেন। একজন উঠে গিয়ে তাঁকে গুড্‌উইনের মৃত্যুসংবাদ জানাল। বেশ শান্তভাবেই আঘাতটা নিলেন তিনি। কিন্তু কদিন পরে তিনি এই জায়গায় আর থাকতে পারলেন না, তাঁর অনুগত প্রিয় শিষ্যের চিন্তা তাঁর মনে সব সময় জেগে রয়েছে—এই দুর্বলতার বিষয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। মৎস্য অথবা শ্বাপদের বৈশিষ্ট্য রেখে দেবার চেয়ে কারো স্মৃতিতাড়িত হওয়া আদৌ মনুষ্যোচিত নয়—তিনি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন। মানুষের এই মোহ জয় করা উচিত। মানুষের জানা উচিত যে আগের মতই মৃতরাও আমাদের পাশে পাশেই রয়েছে। তাদের বিচ্ছেদ ও অনুপস্থিতিটা যেন গল্পে পরিণত হয়েছে। তারপর বিশ্বনিয়ন্ত্রা হিসাবে এক একক শক্তির কল্পনা করে তার নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে তিক্তভাবে কথা বলতেন। তিনি বলে উঠতেন—"যেন গুডউইনকে মেরে ফেলার জন্য

এমন এক ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বা তাঁকে নিধন করতে কারো যেন ক্ষমতা বা কর্তব্য নেই। যদি গুডউইন বেঁচে থাকত সেই এই কাজ করতে পারত।" 'সব থেকে কঠিন সত্য অনুভব বলে'—ভারতবর্ষে কেউ এই মনোভাবকে সবথেকে ধর্মপরায়ণ বলে মনে করতে পারে।

আর একদিনের কথাও মনে পড়ে। যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা নিজেদের সান্ত্বনা দিই। একবছর পরে তার প্রতি একই উত্তেজনাপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে বলেছিলেন—"ছোট বিচারক অথবা প্রশাসকদেরও বিশ্রামের ও অবসরের সময় আছে, শুধু চিরকালের বিচারক ঈশ্বর—অনন্তকাল একভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন, তাঁর ছুটি নেই!"

যাই হোক প্রথমদিকটা স্বামীজী তাঁর বিয়োগ সংবাদে বেশ শান্ত ছিলেন; আমাদের সঙ্গে বসে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তিনি সেই সকালে ভক্তিপ্রসঙ্গে আলোচনাকালে তপস্যার কথায় চলে গেলেন, তপস্যা দিব্যভাব,—মানুষের নাগালের বাইরে প্রবল প্রবাহে আত্মাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আবার ব্যক্তিত্বের মধুর মায়া এড়াবার প্রবল চেষ্টা করে তবুও ছেড়ে যায়।

সেদিন সকালে তিনি ত্যাগ সম্বন্ধে যা বলছিলেন জনৈক শ্রোতৃর কাছে তা কঠিন বলে মনে হল। তিনি যখন ফিরে এলেন সেই মহিলা তাঁর দৃঢ় অভিমত জানালে যে —বন্ধনহীন প্রেমে কোন যন্ত্রণা নেই, তা স্বয়ং আদর্শায়িত।

স্বামীজী তার দিকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ফিরে তাকালেন, "ত্যাগ ছাড়া ভক্তির ধারণা কি রকম? এটা অতি ক্ষতিকর।" সেইখানে প্রায় ঘণ্টাধিককাল দাঁড়িয়ে প্রবল আত্মসংযম—যা মানুষের নিজের করা উচিত, স্বার্থপর চিন্তার নগ্ন আবশ্যকতা থেকে যদি কেউ সত্যিই অনাসক্ত থাকে, আর বললেন সেই বিপদের কথা যার ফলে যে কোন মুহূর্তে হয়ত ফুলের মত আত্মার পাপড়িগুলি জীবনের মালিন্যে অপবিত্র হয়ে যেতে পারে। তিনি এক ভারতীয় সন্ন্যাসিনীর কথা বলছিলেন; তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এই জীবনের পথে নিরাপত্তা সম্বন্ধে মানুষ কখন নিশ্চিন্ত হতে পারে? তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে একপাত্র ছাই পাঠিয়েছিলেন। কারণ রিপুর বিরুদ্ধে মানুষকে প্রবল ও দীর্ঘ সংগ্রাম চালাতে হয় এবং যে কোন মুহূর্তে বিজেতা নিজেই বিজিত হয়ে যেতে পারে।

যখন তিনি কথা বলছিলেন মনে হচ্ছিল বৈরাগ্যের পতাকা যেন মহাবিজয় পতাকা, দারিদ্র্য ও আত্মপ্রভুত্ব যেন সেই আত্মার উপযুক্ত পোশাক বা শাশ্বত বরসাজ; জীবন যেন কেবল দেবারই জন্য—আর আমাদের কাছ থেকে যা চলে গেছে, তা হারিয়ে গেছে বলে শোক করা উচিত নয়। কয়েক সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে একই উদ্দীপ্ত ভাবে যখন তিনি কথা বলছিলেন আমাদের মধ্যে একজন সাহস করে প্রশ্ন করেছিল, যিনি উপলব্ধি থেকে উদ্দীপ্ত হয়েছেন সেটা কি যন্ত্রণারই পূজা নয় আর তাকেই তো ইউরোপে অসুস্থতা বলে ঘৃণা করা হয়।

"তাহলে সম্ভোগের পূজাই বড় মহৎ কেমন?" তিনি তৎক্ষণাৎ এই উত্তর করলেন। একটু থেমে আবার বললেন, "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যন্ত্রণা বা সম্ভোগের পূজা করি না। আমরা দুই-এর মধ্যেই তাকেই খুঁজি যা আমাদের উত্তরণের পথে নিয়ে যায়।"

৯ই জুন

আজ বৃহস্পতিবার সকালে কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা হল। স্বামীজীর মানসিক বৈশিষ্ট্য ছিল, শুধু স্বামীজী কেন, যে হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ছিলেন তিনি, সেই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আজ কোন মতবাদের কথা বলে আনন্দ পাবেন, আবার কালই তাঁর নির্মম সমালোচনা করে সব কিছুই ধূলিসাৎ করে দেবেন। তিনি ভারতীয় হিসাবে সেই ধারণার পূর্ণ অংশীদার ছিলেন, ধারণা আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সত্য এবং দৃঢ় হলে, তার বাহ্যিক যথার্থতা আছে কিনা তাতে কিছু এসে যেত না। বালক বয়সেই এই চিন্তার ধারা তাঁর গুরুদেবই তাঁকে বুঝিয়েছিলেন। তিনি একদা কোন ধর্মীয় ইতিহাসের প্রামাণিকতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'সেকি, তুই কি তাহলে বুঝিস না যে যাঁরা এই ধারণার স্রষ্টা তাঁরা নিজেরাই স্বয়ং তাই ছিলেন?'

তখন কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবেই তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। ধর্মগুরুদের মধ্যে বুদ্ধ ও মহম্মদের বন্ধুও যেমন ছিল শত্রুও ছিল, তাই তাঁদের ঐতিহাসিক জীবন ছিল তর্কের অতীত। কৃষ্ণ ছিলেন সব থেকে ছায়াচ্ছন্ন চরিত্র। রাখাল বালক, মহা শাসক, বীর পুরুষ, আবার সাধক এই সব রূপই গীতাহস্ত এক সুন্দর দেহে নীল হয়ে গেছে।

কিন্তু বর্তমানে কৃষ্ণই সকল অবতারের মধ্যে সর্বসুন্দর। স্বামীজী এই সারথির এক অপূর্ব ছবি তুলে ধরলেন, যিনি অশ্বের বলগা নিয়ন্ত্রণ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করতেন এবং এক পলকেই যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যবিন্যাসের কৌশল বুঝে ফেলতেন। আবার একই সঙ্গে তাঁর রাজশিষ্যকে গীতার আধ্যাত্মিক সত্য ব্যাখ্যা করে শোনাতেন।

সত্যই আমরা যখন গ্রীষ্মকালে উত্তরভারতের পল্লীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম—লোকের মনে কৃষ্ণকথা কেমন গভীর প্রভাব ফেলেছে অনেকবারই তা লক্ষ্য করেছি। পথের ধারে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে নর্তকেরা নাচতে নাচতে যে গান গাইত তা অধিকাংশ ছিল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। স্বামীজীর একটি প্রিয় অভিমত ছিল যে কৃষ্ণ উপাসকেরা গীতিকবিতার রোমান্টিক ধারা শেষ করে দিয়েছে—অবশ্য এ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা ছিল না।

তখন কি গোপীদের প্রাচীন আশ্চর্য গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধারায় লীন হয়ে কেবল গোষ্ঠ উপাসনার অংশমাত্র হয়ে উঠেছিল? উনিশ শতকীয় আলোর মধ্যে নাটকীয় কোমলতা ও আনন্দময়তা নিয়ে অধিকতর যত্নবান হয়ে বেঁচেছিল?

কিন্তু এই কদিন ধরেই স্বামীজী কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন আর একা থাকবার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। যেখানে তিনি গুডউইনের বিয়োগবার্তা শুনেছিলেন সেখানে তিনি আর থাকতে পারছিলেন না—তাঁর অসহ্য লাগছিল। এ ছাড়া বার বার এ প্রসঙ্গে চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া তাঁর আঘাত আরও বাড়িয়ে চলেছিল। তিনি একদিন বললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে মনে হত কেবলই ভক্তি—কিন্তু তাঁর ভিতরে ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞান। কিন্তু স্বামীজীর নিজের বাইরেই

কেবল জ্ঞান, প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন ভক্তিতে পরিপূর্ণ,—তাই স্ত্রীলোকদের মত কেবলই দুর্বল হয়ে পড়ছেন।

একদিন তিনি একজনের লেখা (নিবেদিতার) ভুলে-ভরা কয়েকটি ছত্র তুলে নিয়ে গেলেন, আর ফিরিয়ে আনলেন একটি ছোট কবিতা। সেটি স্মরণচিহ্ন স্বরূপ গুডউইনের বিধবা মাতাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

"শান্তিতে সে বিশ্রাম করুক"

ধাও দ্রুত, মুক্ত আত্মা নক্ষত্র-শোভিত পথে,
ধাও হে আশিসধন্য চিন্তাশূন্য যেথা,
মহাশূন্য মহাকাশ দৃষ্টি নাহি রোধে,
চিরশান্তি আশীর্বাদে ধন্য হও তুমি!
সত্য বটে তব সেবা কর্ম সমাপন,
গৃহ তব খুঁজে লও প্রেমের মাঝারে,
দেশ কাল ঊর্ধ্বে যায় সুমধুর স্মৃতি,—
সুরভি মিশিয়া থাকে, পুষ্পঅর্ঘ্য সম।
ছিন্নবাধা, লভিয়াছ সুখের সন্ধান,
তাঁহাতে মিশেছ যিনি জনম মরণ,
তুমি প্রিয় সহায়ক স্বার্থচিন্তাহীন
অগ্রসরি আন প্রেম সংসারসমরে।

তারপর যখন দেখলেন মূল কবিতার কিছুই অবশিষ্ট রইল না, তখন ভাবলেন যার কবিতা সংশোধন করলেন সে হয়ত মনোকষ্ট পাবে (কারণ, তার কবিতাটি ত্রিমাত্রিক ছিল)! এই ভেবে তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে আন্তরিকভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বললেন যে ছন্দ বা অন্ত্যমিলের ঝঙ্কারের থেকে কাব্যিক উপায়ে চিন্তা করা অনেক ভাল। তাঁর চোখে যদি কোন মতবাদ বা সহানুভূতি মিথ্যা বা ন্যাকামি বলে মনে হত, তিনি তার প্রতি খুবই কঠোর হতেন। কিন্তু যদি কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হত, তাহলে গুরুদেব সহৃদয়ভাবে তার পক্ষ সমর্থন করতেন।

সন্তানহারা জননীর স্বীকৃতি কত সুখের হয়েছিল যখন তাঁর দুঃখের মধ্যেও তিনি স্বামীজীকে চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, যে পুত্র সুদূর বিদেশে মৃত্যু বরণ করেছে, তার চরিত্রে স্বামীজীর প্রভাব কতখানি পড়েছিল!

১০ই জুন

আলমোড়া বাসের শেষ বিকালে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুকারক রোগের কথা শুনেছিলাম। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে আনা হয়েছিল। তিনি বললেন রোগটা গলার ক্যান্সার। তরুণ শিষ্যদের রোগের সংক্রামক দিকটা সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আধঘণ্টা পরে 'নরেন' এসে দেখলেন যে শিষ্যরা একজোট হয়ে রোগের বিপদ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। তিনি কি হয়েছে শুনলেন, আর

দেখলেন যে পায়ের নীচে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আংশিক খাওয়া পথ্যের পাত্রটি রাখা আছে, তার মধ্যে মারাত্মক বীজাণু কফ্-পুঁজ মিশ্রিত হয়েছিল, কারণ গলার খাদ্যনালীতে সঙ্কোচন হওয়ার দরুন খাওয়াবার ব্যর্থ চেষ্টার সময় তা বেরিয়ে এসেছে। তিনি সেই পাত্রটি তুলে নিয়ে সকলের সামনেই পান করলেন। শিষ্যদের মধ্যে আর কখনো সংক্রমণের কথা উচ্চারিত হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

কাঠগুদামের পথে

১১ই জুন

শনিবার সকালে আমরা আলমোড়া থেকে যাত্রা শুরু করলাম। কাঠগুদাম পৌঁছাতে আমাদের আড়াই দিন লাগল। আহা, ভ্রমণটি বড় সুন্দর হয়েছিল! প্রায়ান্ধকার প্রায় ক্রান্তীয় অরণ্য—বানরের পাল আর চিরসুন্দর ভারতীয় রাত্রি।

পথে যেতে যেতে এক জায়গায় একটা অদ্ভুত ধরনের পুরোনো পানি চাকীর কাছে এলাম, স্বামীজী ধীরামাতাকে একটা প্রাচীন গল্প বললেন। পাহাড়ের এই অঞ্চলে নাকি অর্ধ-অশ্ব অর্ধনর জাতীয় অশরীরীদের বাস ছিল। তিনি একজনের অভিজ্ঞতার কথা বললেন, সে নাকি প্রথমে ঐ অশরীরীদের দেখেছিল, তারপরে প্রচলিত লোককথা তার কানে এসেছিল।

তখন গোলাপের সময় চলে গেছে; কিন্তু এক রকম ফুল ফুটেছিল—স্পর্শ মাত্র ঝরে যায়। স্বামীজী সেই ফুল দেখিয়ে বললেন ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে এই ফুল অনেকখানি স্থান নিয়েছে।

১২ই জুন

রবিবার সমতলভূমির কাছে—একটি হ্রদ এবং ঝরনার উপরে পথের থেকে একটু দূরে একটি পান্থশালায় আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। তিনি সেখানে রুদ্রস্তোত্র থেকে আমাদের অনুবাদ করে শোনাতে লাগলেন—

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়,
আবিরাবির্ম এধি,
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্
তেন পাহি মাং নিত্যম্।"

তিনি চতুর্থ ছত্রের অনুবাদ—"আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এসে আমাদের আলিঙ্গন কর—" এই হবে ভেবে বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিধার কারণ আমাদের কাছে ব্যক্ত করে সসঙ্কোচে জানালেন—প্রকৃত অর্থ হবে 'আমাদের ভিতর দিয়েই আমাদের কাছে আবির্ভূত হও।' তিনি সত্যই ভেবেছিলেন যে এই বাক্যটির যে অসাধারণ গভীর অর্থ আছে ইংরাজীতে তা ভাল অর্থে ব্যক্ত নাও হতে পারে। কিন্তু সেই বিকালে আমাদের দ্বিধাহীন নির্বাচন আমার চোখে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হল যখন আমি উপলব্ধি করলাম যে অধিকতর সঙ্গত আক্ষরিক অনুবাদ হবে—"যে তুমি স্বয়ং প্রকাশ, সেই তুমি আমাদের মধ্যেও প্রকাশিত হও।" আমার মনে হয় স্বামীজীর অনুবাদ ভাবসমাধির অভিজ্ঞতারই

যথার্থ এবং দ্রুত প্রতিরূপ। এটি সংস্কৃতের সজীব হৃদয় বিদীর্ণ করে যেন আবার ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

সেই বিকালে স্বামীজী অনেক কিছু অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন। হিন্দুশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সব থেকে সুন্দর যে মন্ত্র, শ্লোকের পর যে আশীর্বচন, সেইটির কিছু অংশ আমাদের শোনাচ্ছিলেন:

'সুখদ বায়ু আমাদের কাছে মধুর হউক,
সমুদ্র আমাদের মধু বর্ষণ করুক,
আমাদের শস্যক্ষেত্রগুলি আমাদের মধু বহন করুক,
লতা ও ওষধিসমূহ সুখদ হউক,
গাভীরা আমাদের সুখদায়িনী হউক,
স্বর্গস্থিত হে পিতা, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর
পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা সুখদা হউক।'

(ধ্যানমগ্ন কণ্ঠে স্বামীজী বললেন) ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

তারপর আবার আমরা সেই নটী মেয়েটির গাওয়া সুরদাসের ভজনটি শুনলাম স্বামীজীর মুখে:

ও প্রভু মেরা প্রভু অবগুন চিতন ধরো
সমদর্শী হৈ নাম তুম্‌হারো।
এক লোহ পূজানে রহত হৈ এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নেহী হোয়, দুহু এক কাঞ্চন করো।
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভয়ো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো।
এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানমে ভেদ হোয়, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।
প্রভু মেরা অবগুন চিত ন ধরো, সমদর্শী হৈ নাম তুম্‌হারো।

সেইদিনই কি অন্য আর একদিন তিনি বেনারসের সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলেছিলেন। সেই সন্ন্যাসী স্বামীজীকে বানরের পাল কর্তৃক উত্যক্ত হতে দেখেছিলেন; স্বামীজী হয়ত তাদের কাছ থেকে দৌড়ে চলে যাবেন এই ভেবে তিনি তাঁকে চেঁচিয়ে বলেছিলেন—"সর্বদাই পশুর সম্মুখীন হও—নির্ভয়ে!"

আমাদের ভ্রমণ কিন্তু সত্যই বড় আনন্দপূর্ণ হয়েছিল; গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে আমাদের মোটেই ভাল লাগত না। এই সময় রেলপথে, তরাই-এর ম্যালেরিয়া প্রকোপগ্রস্ত অঞ্চল পার হতে একটা সম্পূর্ণ বিকাল কেটে গিয়েছিল। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে সেটাই বুদ্ধের জন্মস্থান। পার্বত্যপথ থেকে নেমে এসে দেখি দলে দলে গ্রাম্য লোক পাহাড়ের উঁচু অংশে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের পরিবার-পরিজন, জিনিসপত্র, সব কিছু নিয়ে। তাদের ভয় বৃষ্টি হলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে তারা কাবু হয়ে পড়বে। ট্রেন থেকে আমরা গাছপালা কেমন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে দেখতে দেখতে আসছিলাম। আর গুরুদেবের সে কি আনন্দ যখন

তিনি মাঝে মাঝে এখানে একটা বুনো ময়ূর, ওখানে একটা হাতি কিংবা উটের সারি দেখাচ্ছিলেন।

খুব তাড়াতাড়ি আমরা তালগাছের সীমানায় এসে পড়লাম। ইতিমধ্যেই আমরা ফণীমনসা ও ফুলগাছ প্রধান অঞ্চল আগের দিন দেখে নিয়েছিলাম, দেবদারু আর ঐ জাতীয় গাছ দূর আচ্ছাবল না পৌঁছালে আর দেখতে পাব না।

পঞ্চম অধ্যায়

বারামূলার পথে

সঙ্গীগণ: স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুভ্রাতা এবং শিষ্যগণ, কয়েকজন ইউরোপীয় সঙ্গী; তাদের মধ্যে আছেন ধীরামাতা, জয়া আর নিবেদিতা।

স্থান: বেরিলী থেকে বারমূলা, কাশ্মীর।

কাল: ১৪ই—২০শে জুন, ১৮৯৮।

১৪ই জুন

পরের দিন আমরা পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করলাম, তখন স্বামীজীর খুব আনন্দ হয়েছিল। এই প্রদেশের জন্য তাঁর বিশেষ এবং প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল, মনে হত যেন তিনি সেখানেই জন্মেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এখানে মেয়েরা চরকা কাটতে কাটতে শোনে—সোঽহম্ সোঽহম্' ধ্বনি। তারপর খুব তাড়াতাড়ি অতীত প্রসঙ্গে চলে গেলেন, আর আমাদের সামনে সিন্ধু উপত্যকায় গ্রীকদের অগ্রগতি, চন্দ্রগুপ্তের উত্থান এবং বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিস্তারের মহা ঐতিহাসিক ছবিটি মেলে ধরেছিলেন। এই গ্রীষ্মে, যেখানে আলেকজাণ্ডার প্রতিহত হয়েছিলেন। সেই আটক অঞ্চলে যেতে এবং নিজের চোখে সেই স্থানটি দেখতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি গান্ধার ভাস্কর্য শিল্প সম্বন্ধে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, এই ভাস্কর্য নিদর্শন তিনি পূর্ব বৎসর লাহোর সংগ্রহশালায় দেখেছিলেন; ইউরোপীয়রা যে দাবি করে ভারত শিক্ষানৈপুণ্যে গ্রীসের কাছে লাগে না, এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন তিনি।

দীর্ঘপ্রতীক্ষিত শহরগুলিও দ্রুত দর্শন হচ্ছিল, লুধিয়ানা, সেখানে তাঁর বিশ্বস্ত ইংরাজ শিষ্যেরা শিশুর মত বাস করছেন; লাহোর—যেখানে তাঁর ভারত-বিষয়ক বক্তৃতাগুলি শেষ হয়েছিল—এই রকম আরো কত। আমরা শুকনো নুড়ি-ভরা বহু নদী পার হয়েছিলাম, আর শুনলাম দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় দোয়াব আর নদীমাতৃক পুরো অঞ্চলটাই পাঞ্জাব। এক গোধূলিবেলায় এই রকম নদী পার হবার সময় তিনি আমাদের বলেছিলেন, অনেকদিন আগে, যখন সবে মাত্র তাঁর সন্ন্যাস জীবন সুরু,—তাঁর কেমন দিব্য দর্শন ঘটেছিল; তিনি পরে বিশ্বাস করতেন, যে প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের রীতি সেই মহাদর্শন থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি বলে চলেছিলেন, "যখন আর্যগণ সবেমাত্র হিন্দু অঞ্চলে পৌঁছেছেন, আমি মহানদীর তীরে উপবিষ্ট এক প্রাচীন মানুষকে দেখেছিলাম। আঁধারের তরঙ্গপ্রবাহ তাঁর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে—তিনি ঋকবেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। তখন আমি জেগে উঠে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করলাম। আমরা বহুদিন আগে এইভাবেই মন্ত্র উচ্চারণ করতাম।"

অনেকদিন পরে, একজন শ্রোত্রী স্বামীজীর এই দিব্যদর্শনের গল্পটি শোনে।

স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে তার গভীর পর্যবেক্ষণের জন্য তার মনে হয়েছিল যে এটা একটি নিজস্ব অনুভবসিদ্ধ গুরুত্বেরই অভিজ্ঞতা। সম্ভবত স্বামীজীর কাছে সেটি হল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন উত্তরণের স্মারকচিহ্ন; এটি তাঁকে বহু জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন করে আর সহস্র বছরের কালক্ষেপের মধ্যেও ব্যর্থ হতে দেয়নি। যদি তাই হত তাহলে বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁকে এত সুস্পষ্ট হতে দেখা যেত না। যারা সর্বদা নিজেদের অতীত বিষয়ক কল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি তাদের বিশেষ অবজ্ঞা করতেন। কিন্তু গল্পটি দ্বিতীয়বার বলবার সময়, তিনি অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়েই আভাস দিয়েছিলেন।

স্বামীজী বলেছিলেন "শঙ্করাচার্য বেদের ছন্দটি, জাতীয় সুরটি ঠিক বুঝেছিলেন।" তিনি স্বপ্নময় কণ্ঠে, দূরনিবদ্ধ দৃষ্টিতে হঠাৎই বলে চললেন, "সত্যি আমি সব সময় ভাবি যে শঙ্করাচার্য তরুণ বয়সে আমারই মত এক দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন আর সেইভাবেই প্রাচীন সুরটি খুঁজে পেয়েছিলেন। যাই হোক তাঁর সমগ্র জীবন বেদ ও উপনিষদের সুরস্পন্দিত সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই নয়।"

অবশ্য স্বামীজীর এই জাতীয় উক্তিগুলি কল্পনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আর এইভাবে উত্তেজনা ও আবেগতাড়িত মুহূর্তে যে অনুমানের জন্ম হত—সে সম্বন্ধে পরে মনে মনে করিয়ে দিলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অন্য লোকের কাছে অবশ্য এগুলি মূল্যহীন মনে হত না।

সুদূর পশ্চিমের এক ভক্ত আবেগভরে একদা বলে উঠেছিলেন "বন্ধনভঙ্গকারী না বললে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না।" এই দিনের ভ্রমণের মধ্যে একটা সামান্য ঘটনার কথাটা মনে পড়ে গেল। পাঞ্জাবে প্রবেশ করে একটা স্টেশনে একজন মুসলমান খাদ্য-বিক্রেতাকে ডেকে স্বামীজী তার হাত থেকে খাবার কিনে খেলেন।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে আমরা টাঙ্গা করে মরী গেলাম; কাশ্মীর যাত্রার আগে সেখানে কয়েকদিন আমরা কাটালাম। এখানে স্বামীজী এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে তিনি যদি রক্ষণশীলদের ইউরোপীয় শিষ্য গ্রহণে ও স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে উদ্বুদ্ধ করতে চান তো সেটা বাংলাদেশেই করবেন। কার্যে সফল হবার পক্ষে পাঞ্জাবে ইউরোপীয়দের প্রতি প্রবল অবিশ্বাস বিশেষ বাধাস্বরূপ ছিল। এই চিন্তাটি মাঝে মাঝেই তাঁর মনে জাগত, তিনি সময়ে সময়ে বাঙালী চরিত্রের এক আপাত বিরোধী কিন্তু পরিণামে সত্য যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ইংরাজদের প্রতি রাজনৈতিক বিরুদ্ধতা ও আমার তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বিচিত্র সমন্বয়ের সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন।

১৫ই জুন বিকালে আমরা মরী পৌঁছলাম; শনিবার, ১৮ই জুন কাশ্মীর রওনা হলাম।

১৮ই জুন

আমাদের দলের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায়, আমায় অল্প দূরই এগোলাম, সীমানা পার হয়ে প্রথম ডাকবাংলোতেই আমরা থেমে গেলাম। সময়টা বড়

অদ্ভুত লাগল, একটা রৌদ্রতপ্ত ধূলিধূসর সেতু পার হয়ে ব্রিটিশ ভারত পিছনে রেখে এলাম। আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, এই সীমানা নির্দেশের কতটা অর্থ।

আমরা আজ বিতস্তা নদীর উপত্যকায় ছিলাম। কোহালা থেকে বারমূলা পর্যন্ত আগাগোড়া যাত্রাটাই যেতে হল একটা সরু, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী গিরিপথের খাড়াই নদীখাতের ভিতর দিয়ে। এখানে দুলাইতে, নদীর প্রবল স্রোত, আর বড় বড় জলধৌত নুড়ি-বিছানো একটা পথের মতও তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

অধিকাংশ দিন বিকালে ঝড়ের জন্য আমাদের ভিতরে থাকতে হত, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের একটা নতুন অধ্যায় আমাদের সামনে খুলে গেল, কারণ স্বামীজী গম্ভীর হয়ে খোলাখুলিভাবে হিন্দুধর্মের আধুনিক অপব্যবহারের ও দোষের দিকটা আলোচনা করতেন। বামাচারের নামে যে বীভৎস প্রথাগুলি প্রচলিত ছিল—সেগুলি সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব অসহিষ্ণু বিদ্বেষের কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন।

তখন আমরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণ তো অন্যলোকের প্রতি কখনো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন নি, তাঁর মত লোক এসব কিছু কি দৃষ্টিতে দেখতেন। স্বামীজী বললেন, সেই প্রাচীন মানুষটি বলতেন—'আহা, প্রতি বাড়িতেই জমাদার যাবারও তো একটা দরজা থাকে!' তিনি সবদেশেই সব ধর্মসম্প্রদায়ের বীভৎসতাকে একই শ্রেণীভুক্ত বলে জানিয়েছিলেন। এটি একটা ভয়ানক কিন্তু প্রয়োজনীয় সত্যজ্ঞান লাভ, পরে আর এ সম্বন্ধে কোন কথাই উচ্চারিত হয়নি। এখানে এই কথাটি প্রকৃত স্থানেই বিবৃত করা হল যাতে কেউ না মনে করে যে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, তাঁদের তিনি নিজের কোন লোকের বা ধর্মীয় বিশ্বাসের নিকৃষ্টতম দিকটা দেখাবার বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

১৯শে জুন

আমরা পালা করে স্বামীজীর সঙ্গে টাঙ্গা করে যেতাম, আর এই পরের দিনটি যেন স্মৃতিচারণেই পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ব্রহ্মচর্য, একের দর্শন, সেই প্রকৃত এক সম্বন্ধে বলছিলেন। তিনি আরো বললেন—প্রেমই পাপের একমাত্র ঔষধ। বিদ্যালয়ের এক সহপাঠীর কথা বললেন, তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটা রোগে তাঁর জীবনীশক্তি ও ক্ষমতা যেন শুষে নিয়েছিল, চিকিৎসকদের কৌশল কোন কাজেই লাগছিল না। অবশেষে, স্বামীজী যে সর্বদাই ধর্মপ্রাণ এই কথা জেনে, তাছাড়া, যখন সবকিছুই ব্যর্থ হয় তখন মানুষ ধর্মের দিকে ঝোঁকেই, এজন্য তিনি স্বামীজীকে একবার অনুরোধ করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গুরুদেব তাঁর কাছে পৌছালে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

'যিনি নিজেকে ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র ভাবেন, ব্রহ্ম তাঁকে পরাভূত করেন; যিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় থেকে স্বতন্ত্র ভাবেন, ক্ষত্রিয় তাঁকে পরাভূত করে; যিনি নিজেকে জগৎ থেকে পৃথক ভাবেন জগৎ তাকে পরাভূত করে'—এই মূল বচনটি তাঁর মনে পড়ে গেল। অসুস্থ মানুষটি এই বচন উপলব্ধি করলেন আর রোগমুক্ত হলেন। স্বামীজী বললেন—"সুতরাং দেখছ, যদিও আমি অদ্ভুত কথা বলি আর ক্রোধবাক্য বলি

তবু জানবে মনে মনে আমি ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই গভীরভাবে প্রচার করতে চাই না! সব জিনিসই ঠিক হয়ে যায়, তখন আমরা বুঝি যে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।"

সেইদিন অথবা হয়ত পূর্বদিন তিনি মহাদেব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, যখন তিনি শিশু ছিলেন তাঁর দুষ্টুমি দেখে তাঁর মাতা হতাশ হয়ে পড়তেন। তিনি বলতেন—'এত প্রার্থনা, এত উপবাসের পরে, একটি ভাল ছেলের বদলে শিব তোমাকে পাঠালেন।' তখন থেকে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি প্রকৃতই শিবের এক ভূত অনুচর। তিনি ভেবেছিলেন যে কোন কারণে শাস্তি-স্বরূপ কৈলাস থেকে শিব তাঁকে নির্বাসিত করেছেন, তাঁকে এখন এই জীবনে চেষ্টা করতে হবে সেইস্থানে ফিরে যাবার জন্য। তিনি একবার বলেছিলেন যে পাঁচ বছর বয়সে প্রথম তিনি প্রচলিত নিয়মের বিরোধিতা করেন ও তা ভঙ্গ করেন। তিনি মায়ের সঙ্গে প্রবল তর্ক করেন যে খাবার সময় যখন ডানহাতে খাদ্যবস্তু লেগে আছে, তখন তিনি বাঁহাতে জলের গ্লাস ধরবেন—সেটাই অধিকতর পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। এই তর্ক অথবা এই রকম গোলযোগ করলেই জননীর চরম প্রতিকার ব্যবস্থা ছিল যে তিনি পুত্রকে জলের তলায় বসিয়ে দিতেন; ঠাণ্ডা জলের ধারা তখন তাঁর মাথার উপরে পড়ত, মা বলতেন 'শিব! শিব!' স্বামীজী বলতেন এই ব্যবস্থাটি খুব কার্যকরী ছিল। মাতার প্রার্থনা তাঁর নির্বাসনের কথা মনে করিয়ে দিত। তিনি মনে মনে বলতেন "না, না, এবার আর নয়!" এই ভেবে তিনি বাধ্য ও শান্ত হয়ে যেতেন।

মহাদেবের প্রতি ছিল স্বামীজীর অসীম ভালোবাসা। একদা তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ নারীজাতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, যদি তাদের নতুন কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে শুধু 'শিব' 'শিব' মনে করেন, তাহলেই তাঁদের যথেষ্ট পূজা করা হবে। তাঁর কাছে হিমালয়ের বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত সেই 'অনন্ত ধ্যানমগ্নতার' প্রতিরূপে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল—যা কোন সুখের চিন্তাই ভাঙতে পারে না। তিনি বলেছিলেন, এই গ্রীষ্মকালেই, তিনি সেই প্রাকৃত কথার অর্থ উপলব্ধি করলেন—যে গঙ্গা নীচে সমতল ভূমিতে নামবার পথ খুঁজে পাবার আগে, মহাদেবের মাথার উপর পতিত হয়ে তাঁর জটিল জটাজালের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি পর্বতে নদী ও জলপ্রপাত সমূহের ধ্বনির অর্থ দীর্ঘকাল খুঁজে অবশেষে বুঝেছেন যে তারা 'বোম্! বোম্! হর! হর!' ধ্বনি উচ্চারণ করে। স্বামীজী একদিন 'শিব' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জানালেন—"হ্যাঁ, তিনি প্রকৃত মহাদেব, শান্ত, সুন্দর এবং নীরব! আর আমি তাঁর একনিষ্ঠ সাধক।"

আবার তিনি 'বিবাহ যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্কের আদর্শ' এই বিষয়ে কিছু বললেন। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "যদিও মাতৃস্নেহ আরো মহৎ কিন্তু এই কারণেই সারা পৃথিবী পুরুষ ও নারীর প্রেমকেই আদর্শ রূপ বলে মনে করে। অন্য কিছুর মধ্যেই আদর্শরূপে গ্রহণ করার এমন মহান শক্তি নেই। প্রেমিককে যা কল্পনা করা হয়—সে প্রকৃতই তাই হয়ে ওঠে। এই প্রেম প্রেমাস্পদের রূপের পরিবর্তন ঘটায়।"

তারপর তিনি জাতীয়তাবিষয়ক নানা কথা বললেন। গৃহাভিমুখী পথিক যখন তার নিজের দেশের স্ত্রী-পুরুষদের দেখে ও অভিবাদন জানিয়ে কত আনন্দ পায়— সেই আনন্দের বিষয়ে বললেন। একজন যাতে দেহ ও মুখের প্রকাশভঙ্গির ক্ষীণতম আভাসটুকুও বুঝতে সক্ষম হয়—সারা জীবনটাই মানুষের সেই অবচেতন শিক্ষারই মূর্ত রূপ।

তারপর আমরা পদব্রজে ভ্রমণকারী এক সন্ন্যাসীকে অতিক্রম করে গেলাম। তিনি কঠোর তপস্যার বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনায় ফেটে পড়লেন ও বললেন—"এটা নিষ্ঠুরতা।" ভারতের এটা একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যে শুধুমাত্র ধর্মজীবনই সম্পূর্ণভাবে সচেতন ও সম্পূর্ণ ক্রমবিকশিত। অন্য কোন দেশে, একজন মানুষ ব্যবসায়ে, উদ্যমে অথবা খেলাধুলায় সাফল্য অর্জন করবার জন্য যত কষ্ট পারে সহ্য করে, সম্ভবত সেই মানুষের সহ্যক্ষমতাও বেশি হয়। কিন্তু আদর্শের নামে পথচারীদের পদব্রজে ধীরে ধরে অগ্রগতি তাঁর মনে যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল। মনুষ্যত্বের নাম নিয়েই ধর্মের উৎপীড়ন চলে। তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। তারপর এই ভাবটা চলে গেল, যেমন ভাবটি তাঁর মনে জেগেছিল তেমনই তাঁর মনে এক প্রবল দৃঢ় বিশ্বাস জেগে উঠল যে এই 'নিষ্ঠুরতা' বা 'বর্বরতা' না থাকলে বিলাসিতা মানুষকে পৌরুষহীন করে দিত।

আমরা সেদিন সন্ধ্যায় উরি ডাকবাংলোয় থামলাম। প্রদোষকালে আমরা খোলা মাঠে এবং বাজারে ঘুরলাম। জায়গাটা বড় সুন্দর। ইউরোপীয় সামন্ত-তান্ত্রিক ধাঁচের একটা মাটির কেল্লা পথের উপর খোলা মাঠ পাহাড়ের ওপর ঝুঁকে আছে। নদীর ওপরে পথের ধারে বাজার বসেছে, আমরা প্রস্ফুটিত গোলাপ বাগান ঘেরা কুটিরগুলির পাশ দিয়ে খোলামাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে ফিরলাম। আমাদের চলার পথে এখানে-ওখানে আমাদের থেকেও রোমাঞ্চপ্রিয় দু-একটি শিশু আমাদের সঙ্গে খেলা করছিল।

২০শে জুন

পরের দিন, গিরিপথের গা থেকে সুন্দর অংশটির মধ্যে দিয়ে যাবার সময়, বড় বড় পাহাড় আর একটি প্রাচীন জীর্ণ সূর্যমন্দির দেখে আমরা বারমূলা পৌঁছলাম। কাশ্মীর সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্পটি এই যে, কাশ্মীর উপত্যকাটি ছিল একটি হ্রদ; বরাহ-অবতার রূপী ভগবান বিষ্ণু তাঁর দাঁত দিয়ে পর্বত বিদীর্ণ করে বিতস্তা নদীর পথ কেটে দিয়েছিলেন। পুরাণ থেকে আর একটি ভৌগোলিক গল্প, অথবা এই গল্পটি কি প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস?

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাশ্মীর উপত্যকা

সঙ্গীগণ : স্বামী বিবেকানন্দ, কয়েকজন ইউরোপীয়, তার মধ্যে আছেন ধীরামাতা, জয়া এবং নিবেদিতা।

কাল : ২০শে জুন।

স্থান : বিতস্তা নদী, বারমূলা থেকে শ্রীনগর।

'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়'—উল্লসিত হয়ে এই কথা উচ্চকণ্ঠে বললেন স্বামীজী, ডাকবাংলায় আমাদের ঘরে ফিরে এসে, ছাতাটি তাঁর হাঁটুর উপরে রেখে। তাঁর সঙ্গে কোন সঙ্গী না আসায় ছোটখাট পুরুষোচিত কাজগুলি তিনি নিজেই করতেন; তিনি ডোঙা ভাড়া করতে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি সারতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পথে বার হতেই, তাঁর সঙ্গে একটি লোকের দেখা হয়ে গেল। স্বামীজীর নাম শুনেই সেই ব্যক্তি তাঁকে সব দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে, নিজেই সব ব্যবস্থা করে দেবার ভার নিলেন।

তাই আমাদের দিনটা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল। আমরা সামোভার থেকে কাশ্মীরী চা পান করলাম আর দেশীয় জ্যাম্ খেলাম। বেলা চারটার সময় তিনটি ডোঙার একটি নৌবহর নিয়ে শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রথম সন্ধ্যাটি স্বামীজীর বন্ধুর বাগানের পাশে নোঙর করলাম, সেখানে আমরা শিশুদের সঙ্গে খেলা করলাম, অনেক ফুল তুললাম, আর সদ্য ফসল-তোলা মাঠে একদল কৃষকের ফসল তোলার গান শুনলাম। স্বামীজী রাত্রি এগারটার সময় ফিরে আমাদের পাশ দিয়ে অন্ধকারে যাবার সময় গ্রাম্য লোকের উপর টাকা খাটানোর প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের উত্তপ্ত আলোচনা শুনতে শুনতে গেলেন।

পরের দিন দেখলাম একটা সুন্দর উপত্যকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আর চারদিকে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। এই স্থান কাশ্মীর উপত্যকা নামে পরিচিত, কিন্তু সম্ভবত শ্রীনগর উপত্যকা বলাই অধিকতর সঙ্গত। নদীর উজানে ইস্‌লামাবাদ শহরটি নিজস্ব উপত্যকায় অবস্থিত, যেখানে পৌছবার জন্য পাহাড়ের এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে আমরা এগোতে লাগলাম। মাথার উপরে আকাশ নীলিমায় নীল—আর নদীর যে জলপথে আমরা এগিয়ে চলছিলাম তারই প্রভাবে নীল। মাঝে মাঝে আমাদের পথে বড় বড় সবুজ পদ্মপাতার ঝাঁক ভাসছিল—গোলাপের মত একটি-দুটি ফুল ফুটে রয়েছে, নদীর দুধারে শস্যক্ষেত, দু-একটিতে শস্যকাটাও সুরু হয়ে গেছে। সমগ্র প্রকৃতি যেন নীল, সবুজ আর সাদারঙের অখণ্ড যোগসূত্রে বাঁধা, এত সুন্দর আর এত পবিত্র—আর এমনই প্রত্যক্ষ যেন সেই সৌন্দর্যের আহ্বানে সাড়া দিতে অন্তরাত্মা অধীর যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে উঠছিল।

প্রথম সকালে, মাঠের ওপর দিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণান্তে আমরা বিস্তীর্ণ গোচারণ প্রান্তরের মাঝে একটা বড় চীনার গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। মনে হল সত্যিই

এই গাছের কোটরে প্রবাদকথিত বিশটা গরু আশ্রয় পেতে পারে। স্বামীজী এই জায়গাটিকে কেমন এক তপস্বীর বাসস্থান হতে পারে সেই সম্বন্ধে স্থাপত্যবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সত্যিই সেই কোটরে একটি ছোট কুটির নির্মিত হতে পারে। পরে তিনি ধ্যানের বিষয়ে বলতে লাগলেন—যাতে প্রতি চীনার গাছ দেখলেই আমাদের মনে পবিত্রভাবের উদয় হয়।

আমরা তাঁর সঙ্গে নিকটস্থ খামারবাড়িতে গেলাম। সেখানে আমরা এক অপূর্ব সুন্দরী বর্ষীয়সী রমণীকে গাছের তলায় উপবিষ্ট দেখলাম, তিনি বিবাহিত। কাশ্মীরী স্ত্রীলোকের কালো মস্তকাবরণ ও সাদা ওড়না পরিধান করেছিলেন। মহিলা চরকা কাটছিলেন, তাঁর পাশে তাঁকে সাহায্য করছিল দুই পুত্রবধূ ও তাদের ছেলে-মেয়েরা। স্বামীজী গত বছরের শরৎকালে এই গোলাবাড়িতে এসেছিলেন আর এই মহিলার ধর্মবিশ্বাস ও গর্ব বিষয়ে প্রায়ই আমাদের বলতেন। তিনি এখানে জল-পান করতে চেয়েছিলেন, ঐ মহিলা তৎক্ষণাৎ তাঁকে জল পান করতে দিয়েছিলেন। সবার আগে স্বামীজী তাঁকে শান্তভাবে প্রশ্ন করেছিলেন 'মা, তুমি কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত?' প্রাচীন কণ্ঠে গর্ব ও উল্লাসভরে ধ্বনিত হয়েছিল 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রভুর দয়ায় আমি মুসলমানী!' সারা পরিবারটিই এখন তাঁকে পুরোনো বন্ধুর মত অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁর সঙ্গে যে বন্ধুদের এনেছেন তাঁদের প্রতিও যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেন। শ্রীনগর যেতে দু'তিন দিন সময় লাগল। একদিন সন্ধ্যায় খাবার আগে যখন আমরা মাঠে বেড়াচ্ছিলাম, একজন যিনি কালীঘাট দেখেছেন, স্বামীজীর কাছে অনুযোগ করলেন সেখানে উচ্ছ্বাসের বড় বাড়াবাড়ি—যেটা তাঁর কাছে অত্যন্ত গোলমালের ঠেকেছে। তিনি বলে উঠলেন, লোকে মূর্তির সম্মুখে মাটি চুম্বন করে কেন? স্বামীজী তখন তিলের ক্ষেত্রের দিকে নির্দেশ করে বলছিলেন 'তিলকে ইংরাজী ভিল লতার মত মনে হয়—' আর বলছিলেন যে তিলই আর্যদের প্রাচীনতম তৈলবাহী বীজ। কিন্তু এই প্রশ্ন শুনে ছোট নীল ফুলটি হাত থেকে ফেলে দিলেন। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গভীর স্বরে বলে উঠলেন, এই বিশাল পর্বতশ্রেণীর সামনে দাঁড়িয়ে ভূমি চুম্বন করা আর প্রতিমার সম্মুখস্থ ভূমি চুম্বন করা কি একই রকম নয়?

আমাদের গুরুদেব আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে গ্রীষ্মাবসানের পূর্বেই আমাদের নির্জনে নিয়ে যাবেন ও ধ্যান অভ্যাস শেখাবেন। আমাদের শ্রীনগর যেতে হবে দীর্ঘদিনের জন্য সুতরাং ছুটির ব্যবস্থারও প্রশ্ন উঠল। স্থির হল যে আগে আমরা দেশটা দেখব, তারপর নির্জনবাস সুরু হবে।

শ্রীনগরে, প্রথম সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন বাঙালী রাজকর্মচারীদের সঙ্গে নৈশ ভোজন করেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে একজন পশ্চিমী অতিথি মন্তব্য করলেন যে, প্রতি জাতির ইতিহাসই কয়েকটি আদর্শের বিকশিত ও উদাহরণ স্বরূপ চিত্রিত রূপ, তাদের প্রতি জাতির সত্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ। বেশ মজার ব্যাপার হল যখন উপস্থিত হিন্দুব্যক্তিরা এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে উঠলেন। তাঁদের কাছে এই বক্তব্য তো একেবারে বন্ধন, এর কাছে মানুষ চিরকাল আত্মসমর্পণ করে কি থাকতে পারে।

অবশেষে স্বামীজী মধ্যস্থতা করলেন। তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, চূড়ান্ত এককের বিষয়টা মনস্তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক বিষয়ের থেকেও এটা অধিকতর স্থায়ী। তারপর তিনি আমাদের সকলের জানা কতকগুলি ঘটনার কথা বলতে লাগলেন। একজনকে তিনি তাঁর দেখা খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের আদর্শরূপ মনে করতেন, কিন্তু সেই মহিলা ছিলেন বাঙালী। আর একজন পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তির কথা বললেন যিনি স্বামীজীর থেকেও গোঁড়া হিন্দু। তাহলে কি উভয়ের অপরের দেশে জন্মগ্রহণ করে প্রচলিত আদর্শের যথাসম্ভব প্রচার করাই উচিত ছিল না?

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীনগরের জীবনযাত্রা

কাল : ২২শে জুন—১৫ই জুলাই, ১৮৯৮
স্থান : শ্রীনগর।

সকালে, আগের মতই আমাদের দীর্ঘ আলোচনা চলত—কখনো কখনো কাশ্মীর কেমনভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় অবস্থার মধ্যে চলেছে, অথবা বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতা, অথবা শিব উপাসনার ইতিহাস, অথবা কণিষ্কের আমলে শ্রীনগরের অবস্থা নিয়েও কথা হত।

একদিন তিনি আমাদের একজনের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে কথা বলছিলেন, তিনি সহসা বলে উঠলেন, "প্রকৃত পক্ষে অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম যা করবার চেষ্টা করেছিল এখনো পর্যন্ত জগৎ তার জন্য প্রস্তুত নয়।" তিনি সর্বক্ষণ সমন্বয়ের কথা বললেন। অশোকের ধর্মীয় একাধিপত্য কিভাবে খ্রীষ্টধর্ম ও মুসলিম ধর্মের তরঙ্গাঘাতে বারবার ভেঙে পড়েছিল, কিভাবে এই দুই-এর প্রত্যেকেই মানবজাতির বিবেকবুদ্ধির ওপর এক-চেটিয়া অধিকার দাবি করেছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই কি ভাবে অবশেষে এটা সম্ভবপর হতেও পারে—এই সকল নানা বিষয়ের সুন্দর ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

অন্য একদিন মধ্য এশিয়ার বিজয়ী বীর চেঙ্গিজ্ খানের কথা বললেন। "তোমরা তাঁকে একজন বর্বর আক্রমণকারী হিসাবেই লোককে বলতে শুনেছ", তিনি আবেগ ভরে বলে উঠলেন, "কিন্তু তা সত্যি নয়। এই সকল মহৎ প্রাণ কখনো লোভী বা আক্রমণকারী হতে পারে না। তিনি ঐক্যবন্ধনের চিন্তা করেছিলেন, এবং তিনি পৃথিবীকে এক করতে চেয়েছিলেন। হ্যাঁ, নেপোলিয়নও একই ছাঁচে গড়া, আর একজন হলেন আলেকজাণ্ডার। এই তিনটি প্রাণ অথবা একই প্রাণ তিনটি দিগ্বিজয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।" আর তখন তিনি সেই এক আত্মার প্রসঙ্গে চলে গেলেন যিনি দৈব প্রেরণায় তাড়িত হয়ে ধর্মজগতে বারবার এসেছেন ঈশ্বরের মধ্যে মানবের ঐক্য আনবার জন্য।

এই সময় মাদ্রাজ থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র প্রকাশের স্থান পরিবর্তন ও মায়াবতীতে নব প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের কথা আমাদের চিন্তার অনেকখানি স্থান জুড়ে ছিল। এই পত্রিকাটির প্রতি স্বামীজীর বিশেষ মায়া ছিল, তাঁর দেওয়া সুন্দর নামটির মধ্যেই সেই সত্য প্রকাশিত। তাঁর নিজের কয়েকটি প্রচারযন্ত্রের স্থাপনার জন্য তিনি বড় উৎসুক ছিলেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় এই পত্রিকার মূল্য তাঁর কাছে ছিল অনেকখানি; তিনি এও বুঝেছিলেন। তাঁর গুরুদেবের বাণী ও চিন্তাধারার কাজের ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই মাধ্যমেই প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। তাই দিনের পর দিন তিনি তাঁর পত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং তার বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজ নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। দিনের পর দিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নতুন সম্পাদনায় আসন্ন প্রথম সংখ্যাটির কথাই বলতেন। একদিন বিকালে যখন আমরা এক সঙ্গে

বসেছিলাম, তিনি আমাদের কাছে নিয়ে এলেন একটি সংখ্যা যাতে তিনি "একটি চিঠি লিখতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেটা এইভাবে বেরোল তাঁর লেখা থেকে"—

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি

একবার জেগে ওঠ !
এতো নিদ্রা, মৃত্যুময় জীবন দানিতে
নবরূপে পদ্মআঁখি দর্শনের তরে,
ভুবন রয়েছে জেগে, চিরসত্য ওহে
মৃত্যু তব তরে নহে।
হও পুনঃ আগুয়ান,
শান্ত পদক্ষেপে, পদপ্রান্তে পড়ে থাকা,
ধূলিকণাটুকু কভু হয় না বিস্মিত,
শক্তিমান চিরস্থির, প্রীতিপ্রদ সখা
সাহসী ও মুক্ত রূপে, জাগাও সমরে,
অগ্রসরি বল তবে উদ্দীপিত বাণী।
তুমি গৃহহারা,
সে হৃদয় পালিয়াছে সস্নেহ আনন্দে
করেছে বর্ধিত জীব, প্রবল নিয়তি,
এই নীতি সবকিছু উৎসে ফিরিয়া
এসে তবু, নব ভাবে পুনঃ বলীয়ান।
পুনঃ কর সুরু,
তা জন্মভূমি হতে, যেথা মেঘরাশি
তুষার আশিসে শিরে না শক্তি দিয়া,
নব নব কার্য তরে। স্বরগ তটিনী
তব কণ্ঠে বেজে ওঠে, শাশ্বত রাগিনী;
দেবদারু বৃক্ষ ছায়া শান্তি দান করে।
সর্বোপরি দেখ,
হিমালয় কন্যা উমা, পবিত্র কোমল,
জগন্মাতা, শক্তিদাত্রী, জীবনদায়িনী,
সর্ব কার্যে বিরাজিতা তিনিই সৃজেন,
এক হতে এ জগৎ; তাঁর চির দয়া
সত্য পথ মুক্ত করি দেখায় সবারে
একই পরম সত্য; দেখ, দেন তিনি
ক্ষমতা প্রতাপ আর অনন্ত প্রণয়।

তারা আশিসে তোমারে,
সত্যদ্রষ্টা যাহাদের, দেশকাল সীমা
দাবি করে ; যারা পিতা মানবজাতির,
যারা করে অনুভব সত্যের হৃদয়,
তারা মানে সেই তথ্য—'অদ্বিতীয় এক।'
প্রেম, তুমি কথা বল,
তব কণ্ঠস্বর আগে, চাহিয়া দেখিবে
দর্শন মিলায়ে যায় স্বপনের স্তরে,
মিথ্যা হয়ে যায় তারা। সত্যই কেবলি
অনন্ত গৌরবে থাকে উজলি ভুবন—
জগতে ডাকিয়া কহ—
ওঠ, জাগ এইবার, দেখ না স্বপন!
স্বপনের দেশ এ যে, যেখানে করম,
গেঁথে যায় চিন্তারাশি মালার আকারে,
রমণীয় কিংবা ফুলদল দিয়া,
সে ফুলের মূল নাই—কোথায় উদ্ভব,
সত্যের নিশ্বাসবায়ু দেয় উড়াইয়া
আদি শূন্যতায়। হও তবে বীর্যবান,
দাঁড়াও একাত্ম হয়ে সত্যের সমুখে,
অলস স্বপন করি দূর ; দেখ সেই সত্য
স্বপ্ন, যাহা মুক্ত সেবা, চির ভালোবাসা।

২৬শে জুন

গুরুদেব আমাদের ছেড়ে অন্য কোন শান্ত স্থানে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু আমরা তা বুঝতে না পেরে তাঁকে বারবার রঙীন ঝরনা বা ক্ষীরভবানীতে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য বলছিলাম। সেই প্রথম কোন খ্রীষ্টান বা মুসলমান সেই স্থানে গেল। আমরা যেটুকু দর্শন পেলাম তাতে আমরা আদৌ প্রসন্ন ও কৃতজ্ঞ হলাম না, পরে অবশ্য এই স্থানটি আমাদের সকল নামের মধ্যে পবিত্রতম হয়ে উঠেছিল। সব থেকে মজার ব্যাপার এই যে আমাদের মুসলমান নৌ-চালকেরা আমাদের জুতা পরে সেখানে নামতে দিচ্ছিল না, কাশ্মীরের মুসমানগণ এত হিন্দুভাবাপন্ন—চল্লিশ জন ঋষি, তীর্থস্থান উপবাস আর মন্দির এইসব কিছু নিয়ে।

২৯শে জুন

আর একদিন, আমরা নিজেরাই দুই কি তিন হাজার ফিট উঁচু একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ও শক্ত গাঁথুনিতে নির্মিত একটি ছোট মন্দির তখৎ-ই-সুলেমান দেখতে গেলাম। জায়গাটি বড় সুন্দর আর শান্তিপূর্ণ, পাহাড়ের নীচে চারিদিকে কয়েক মাইলব্যাপী ভাসমান বাগানগুলি দেখা যাচ্ছিল। স্থাপত্য সংক্রান্ত

স্মৃতিস্তম্ভ ও মন্দির নির্মাণের স্থান পছন্দের বিষয়ে হিন্দুদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগের বিষয়ে স্বামীজী যখনই কথা বলতেন, তখৎ-ই-সুলেমান ছিল তাঁর বক্তব্যের বড় উদাহরণ। তিনি বলেছিলেন, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীরা পর্বতচূড়ায় থাকতে ভালোবাসেন, তাই তিনি এখন উদাহরণের পর উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখালেন যে, হিন্দুরা কেমন গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ও সৌন্দর্যের স্থানগুলি তাদের পূজাবেদী নির্মাণের জন্যই উৎসর্গ করতেন। সমগ্র উপত্যকার আকর্ষণীয় স্থান ছোট্ট মন্দিরটি সত্যই উদাহরণ দেবার মত।

ঐ দিনগুলির টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে পড়ছে :

"তুলসী, সতর্কভাবে সকলের সঙ্গে থাক, কে বলতে পারে, কখন, কি বেশে প্রভু স্বয়ং তোমার কাছে আসবেন ?"

"একই দেবতা সর্বভূতে গুপ্ত আছেন, তিনি সর্বজীবের রক্ষাকর্তা, জাগ্রত করার কর্তা ও দুঃখদাতা। তিনি সর্বগুণরহিত।"

"সেখানে সূর্য বিভাসিত হয় না, চন্দ্রও না, তারকাও নয়।"

রাবণকে সীতাকে প্রতারণা করবার জন্য রামের রূপ ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল—সেই গল্পটি বললেন। রাবণ বললেন—'আমি কি তা ভাবিনি ? কিন্তু একজনের রূপ ধারণ করতে হলে, তাঁকে ধ্যান করতে হয়। রাম স্বয়ং নারায়ণ ; তাই তাঁকে যখন আমি ধ্যান করব, ব্রহ্মের কথাও মনের কোণে স্থান পায় না, তখন আমি একজন রমণীর কথা কেমন করে চিন্তা করব ?'

গল্পটি বলে স্বামীজী মন্তব্য করলেন, 'তবেই দেখ, অতি সাধারণ অপরাধীদের জীবনেও এমন আভাস দেখা যায়।' বরাবরই তিনি এমনই বলতেন। তিনি সর্বদা মানবজীবনকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করতেন, কোন কাজ বা চরিত্রের ঘৃণিত দিক বা শয়তানির দিকটায় তিনি কখনো জোর দিতেন না।

"যা পৃথিবীর সকলের কাছে অন্ধকার রাত্রি,
আত্মসংযমী মানুষ সেখানে জেগে থাকেন,
যা পৃথিবীর সকলের কাছে জীবন,
তাঁর কাছে তাই নিদ্রা।"

একদিন টমাস-আ-কেম্পিসের কথা বলছিলেন, তিনি কেমন গীতা ও ঈশানুসরণ-কেই সর্ববিদ্যার সার বলে সন্ন্যাসীর মত ঘুরে বেড়াতেন, এই পাশ্চাত্য সন্ন্যাসীর কথা বলতে গিয়ে তাঁর নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত একটি কথা স্বামীজীর মনে পড়ে গেল।

"স্তব্ধ হও জগৎগুরুগণ, ভবিষ্যৎ বক্তাগণও স্তব্ধ হও,
প্রভু তুমি একলাই আমার আত্মার মাঝে কথা বল।"

তারপর বললেন,

"কোমল শিরীষ পুষ্পে গুঞ্জনরত ভ্রমরের ভার সহ করে
কিন্তু পাখির নয়,

তাই উমা তুমি তপস্যা করতে যেও না।
এস, উমা এস, আমার পরাণ পুতলি,
তোমায় নয়ন ভরে দেখি।
জনম থেকে আমি দেখছি, তোমার মুখ মা,
তুমি কি জান, কত যাতনা ও বেদনা
তাই বস মা আমার হৃদ্‌-কমলে
বাস কর মা চিরকাল।"

মাঝে মাঝেই গীতা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা শুনতাম, সেই আশ্চর্য কবিতায় দুর্বলতা বা অপৌরুষের কথা কিছুই নেই। তিনি একদিন বলে উঠলেন—"স্ত্রীলোক অথবা শূদ্রদের অধিকার নেই—এটা সম্পূর্ণ অর্থহীন অভিযোগ ; কারণ গীতার সারতত্ত্ব উপনিষদেই নিহিত আছে। গীতা না পড়লে উপনিষদগুলি বোঝা সম্ভব নয়। স্ত্রীলোক ও অন্যান্য সকল বর্ণের লোকই মহাভারত পড়তে পারেন।"

৪ঠা জুলাই

স্বামীজী এবং তাঁর এক অ-আমেরিকান্ শিষ্যা অতি আনন্দে ও গোপনীয়তার সঙ্গে ৪ঠা জুলাই পালনের উৎসব আয়োজন করলেন। তাদের জাতীয় উৎসবের দিনে, দলের অন্যান্যদের প্রাতরাশে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কোন আমেরিকান পতাকা আমাদের নেই—এই রকম একটা আক্ষেপ স্বামীজীর কর্ণগোচর হয়েছিল। তিন তারিখের বিকালের শেষে তিনি একজন স্থানীয় দর্জিকে মহাআনন্দে নিয়ে এসে বললেন, ঠিকমত বুঝিয়ে দিলে, এই লোকটি পতাকাটি তৈরি করতে পারবে। স্বাধীনতা দিবসে আমেরিকা দেশীয় সঙ্গীগণ যখন ভোজনাগার হিসাবে ব্যবহৃত নৌকাটিতে এলেন সকালে চা পান করবার জন্য, তখন নৌকাটির মাথায় চিরহরিৎবৃক্ষ শাখায় পেরেক দ্বারা প্রলম্বিত কাপড়ের টুকরোটি দেখে আমার মনে হচ্ছিল তারা ও ডোরাগুলি তার ওপর বড়ই বেমানান বসানো হয়েছে! কিন্তু স্বামীজী এই ছোট্ট উৎসবটিতে উপস্থিত থাকবার জন্য তাঁর অন্য একটি যাত্রা স্থগিত রেখেছিলেন, আর নিজে ভাষণের সঙ্গে একটি কবিতা দিলেন। সেটি পাঠ করে শোনানো হল :

'৪ঠা জুলাই এর প্রতি'

হের ওই কৃষ্ণমেঘ অপসৃত হয়,
ঘন ঘোর সমাচ্ছন্ন ছিল সারারাত
ভুবন আবৃত করি কৃষ্ণছায়া মত।
তব যাদুস্পর্শধন্য জেগে ওঠে ধরা।
বিহঙ্গ কাকলি গীতে পূর্ণ চারিধার।
শিশির বিধৌত পুষ্প জেগে উঠে তবে,
আন্দোলিত করি তারা তারকা-মুকুট,

স্বাগত জানায় দেখ, হাসি বার বার।
সরোবরে উন্মীলিত শত পদ্ম আঁখি,
প্রেমভরে, তোমাকে হে জানায় স্বাগত।
সূর্যদেব! আজ তুমি দান স্বাধীনতা!
দেখ ভাবি, ধরিত্রী যে ছিল অপেক্ষিয়া,
যুগে যুগে, কালে কালে করেছে সন্ধান,
সুখনীড়, বন্ধুপ্রেম সব উপেক্ষিয়া
তব তরে; তারা যত আত্মনির্বাসিত,
তরঙ্গিত মহার্ণবে, আদিম অরণ্যে,
তুচ্ছ করি প্রতিপদে জন্মমৃত্যুরণ;
অবশেষে আসে দিন ফলপ্রস্বরূপে,
আরাধনা, ভালোবাসা, আত্মবিসর্জন,—
পূর্ণ হল, সারা হল, হল যে স্বীকৃত।
তবে তুমি, স্নিগ্ধচিত্তে উদিলে গগনে,
মানবের তরে দিতে মুক্তির আলোক!
প্রভু তুমি ভ্রম তব বাধাহীন পথে
তোমার প্রখর রশ্মি উজলে ভুবন,
প্রতি দেশ ধন্য হল তোমার আলোকে।
যতক্ষণ উচ্চশির হয় নরনারী
মহোল্লাসে দেখে ছিন্ন হয়েছে শৃঙ্খল,
জানে, নব জীবনের সুরু এই ক্ষণে!

৫ই জুলাই

সেদিন বিকালে একজন নিজের অবশিষ্ট চেরী ফলের বীচিগুলি গুনে ফেলার ছলে বললেন কবে তাঁর বিবাহ হবে। এই ঘটনা (প্রচলিত বিদেশী লোকাচার) তাঁকে অত্যন্ত আঘাত দিয়েছিল। স্বামীজী ব্যাপারটি সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাই পরের দিন সকালে আদর্শ ত্যাগের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে এলেন।

৬ই জুলাই

"এইসব গৃহ আর বিবাহিত জীবনের ছায়া আমার মনেও মাঝে মাঝে দেখা দেয়—" নিজেকে অপরাধীর সমপর্যায়ভুক্ত করার কোমল বাসনা—যা তিনি সব সময় দেখাতেন, সেই মহাজড়তা থেকেই এই কথা বলে উঠলেন স্বামীজী; কিন্তু এই প্রসঙ্গে ধর্মীয় জীবনের জয়গান প্রচার করে যারা গার্হস্থ্য জীবনের জয়গান করে, তাদের প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা দেখালেন। তিনি বললেন, "জনক হওয়া এত সোজা! সম্পূর্ণ নিরাসক্তি নিয়ে রাজসিংহাসনে বসা? সন্তান, স্ত্রী, ধন, মান কিছুরই চিন্তা না করা? পাশ্চাত্য দেশে

একের পর এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে যে তারা সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু আমি শুধুমাত্র বলতে পেরেছি, এমন মহামানবেরা ভারতে জন্ম নেন নি ।"

তারপর তিনি অপর দিকটি সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। তিনি শ্রোতাদের একজনকে বললেন, "নিজের মনে মনে বলতে ও সন্তানদের একথা শেখাতে কখনো ভুলো না যে, মেরু ও ঘর্ষণ, সূর্য ও খদ্যোৎ, সমুদ্র ও জলাশয়ে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ। পৃথিবীতে সব কিছুই জয়যুক্ত—বৈরাগ্যই শুধু নির্ভয়।

"ভক্ত সাধুরাও ধন্য, যারা প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম, তারাও ধন্য, কারণ তারা আদর্শের সাক্ষাৎ দিয়েছে এইভাবে, অন্যান্যদের সাফল্যের জন্য খানিকটা দায়ী।" আমরা যেন কখনো, কখনোই না ভুলি আমাদের আদর্শকে !"

এইসব মুহূর্তে যে বিষয়টি বোঝাতে চাইছেন, তার সঙ্গে একেবারে তিনি একাত্ম হয়ে যেতেন : এমন একটা ভাবে বলতেন যাতে প্রাকৃতিক নিয়মও নিষ্ঠুর ও উদ্ধত বলে মনে হত—তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে সেই গুণ বর্তমান ছিল। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন আমরা সেই অদেখা ব্রহ্মের মুখোমুখি এসে পড়েছি। প্রকৃত ৪ঠা জুলাই উৎসব পালন করে অর্থাৎ ডাল হ্রদ দেখে, শ্রীনগর ফেরার পথে আমরা এইসব কথা শুনছিলাম, যেখানে আমরা নূরমহলের শালিমার উদ্যান আর নিশাত উদ্যান বা 'আনন্দের উদ্যান' দেখেছিলাম। সূর্যাস্তের সময়ই, বড় চীনার গাছের পাদদেশে, সবুজ আইরিসের মাঝে—বেশ শান্তিতে কাটিয়েছিলাম আমরা। এই একই দিনে, ধীরামাতা ও জয়া কার্যোপলক্ষে গুলমার্গ রওনা হলেন—স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে কিছুটা পথ গেলেন।

পরের রবিবার ১০ই জুলাই রাত্রি প্রায় নটার সময়, ধীরামাতা ও জয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে এলেন আর তখনি বিভিন্ন সূত্রে আমরা খবর পেলাম যে স্বামীজী সোনমার্গের পথে অমরনাথ যাত্রা করেছেন। অন্য পথে ফিরবেন। তাঁর সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু নেই, কিন্তু তাঁর বন্ধুদের কাছে, এক হিন্দু দেশীয় রাজ্যে এ ব্যাপারটা বিশেষ চিন্তার কারণ হয়নি।

একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটল, যখন দু-একদিন পরে, একজন যুবক শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য অধীর হয়ে সেখানে এলেন আর স্বামীজীর কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেবার জন্য জেদ করতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম স্বামীজীর নির্জনবাসের পক্ষে এটা একটা অনুচিত ও অনাহূত প্রবেশ হবে। কিন্তু সনির্বন্ধ অনুরোধে তাই করা হল; আমাদের জীবনধারা সামাজিকভাবেই দু-একদিন বয়ে চলল।

১৫ই জুলাই, শুক্রবার

আমরা কিসের জন্য বেরোচ্ছিলাম? বেলা পাঁচটা আন্দাজ, সবেমাত্র আমরা নদীতে বেড়াবার জন্য যাত্রা সুরু করছিলাম, এমন সময় ভৃত্যেরা দূরে তাদের কয়েকজন বন্ধুদের চিনতে পারল, আমাদের কাছে খবর এল যে স্বামীজীর নৌকা আমাদের দিকেই আসছে।

একঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের কাছে চলে এসে বললেন, ফিরে এসে কি

ভালোই না লাগছে। এই গ্রীষ্মকাল অন্যান্য বারের তুলনায় গরম হওয়ায় কয়েকটি হিমবাহ গলতে সুরু হয়ে গেছে, ফলে সোনমার্গের পথে অমরনাথ যাওয়া অসম্ভব। এই কারণেই তিনি ফিরে এসেছেন।

আমাদের কাশ্মীরবাসের কয়েকটি মাসের মধ্যে তাঁর মধ্যে যে মহা আনন্দ ও উপলব্ধির ক্রমবিকাশ দেখেছিলাম এই মুহূর্ত থেকেই তার সুরু। তার গুরুদেবের উক্তির সত্যতা যেন আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারছিলাম।

"বাস্তবিকই কিছুটা অজ্ঞতা রয়ে গেছে। আমার পরমা মাতা তার নিজের কাজের জন্যই সেটা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু এটা তো পাতলা কাগজের আবরণের মত। এতো যে কোন মুহূর্তেই ছিঁড়ে যেতে পারে।"

অষ্টম অধ্যায়

পাণ্ড্রেনৃথানের মন্দির

সঙ্গীগণ : স্বামী বিবেকানন্দ, জয়া এবং নিবেদিতা।
স্থান : কাশ্মীর
কাল : ১৬-১৭শে জুলাই

১৬ই জুলাই

পরদিন স্বামীজীর এক শিষ্যার সৌভাগ্য হল একখানি ছোট নৌকা করে স্বামীজীর সঙ্গে নদীতে যাবার। নৌকাটি চলছিল, তিনি একের পর এক রামপ্রসাদী গান গাইছিলেন—মধ্যে মধ্যে এক-একটি গানের অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন।

"মাগো, আমি তোমায় ডাকি
যদিও মা মার তুমি
শিশু কাঁদে—মা, মা বলে।

*　　*　　*

যদিও তোমাকে চক্ষে দেখি না,
আমি কিন্তু হারা শিশু নই—
আমি তবু কাঁদি মা, মা, বলে।"

তারপর অভিমানহত শিশুর ক্ষুব্ধ গর্ব দিয়ে শেষ করলেন—
"আমি নই তেমন ছেলে অন্য:মাকে মা ডাকব।"

১৭ই জুলাই

সম্ভবত পরের দিন তিনি ধীরামাতার নৌকায় এলেন, যেখানে তিনি ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। প্রথমে তিনি সেই অদ্ভুত হিন্দু ধারণা—একদেহে শিব এবং উমার কথা বললেন। তাঁর কথাগুলি উল্লেখ করা সোজা কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের অভাবে কথাগুলি যেন প্রাণহীন বলে মনে হয়। এছাড়া তখনকার সেই আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশ—ছবির মত শ্রীনগর, দীর্ঘ পপ্‌লার গাছের সারি, দূরে তুষারশুভ্র পর্বতমালা। সেখানে নদীর উপত্যকায়, সুউচ্চ পাহাড়ের পাদদেশের খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে, তিনি আমাদের আবৃত্তি করে শোনালেন—"দেবতা নিলেন এমন রূপ, এক বিভক্ত রূপ, অর্ধনারী-অর্ধনর; একদিকে অস্থিকণ্ঠভূষা সাপের কুণ্ডলী, অন্যদিকে সুন্দর মালা। একদিকে জটা, অন্যদিকে কুঞ্চিত কালো কেশরাশি। আবার এই কথা বলতে বলতে তখনই একই চিন্তার অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়ে আবৃত্তি করলেন—

"দেবতা হলেন কৃষ্ণ এবং রাধা
প্রেম প্রবাহিত হল সহস্র ধারায়,

যে চায় নিয়ে নেয়।
প্রেম প্রবাহিত হল সহস্র ধারায়
প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে নিল,
হৃদয় ভরে দিল সুখে, আনন্দে।"

তিনি এমন মগ্ন হয়েছিলেন যে, দীর্ঘ সময় আগে প্রস্তুত হওয়া প্রাতরাশ পড়ে রইল। অবশেষে যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ভোজন করতে গেলেন, বলে গেলেন, 'যখন একজনের মনে এত ভক্তি তখন খাওয়াতে কি আসে যায়?' নামমাত্র খেলেন—আবার ফিরে এসে এ বিষয়ের আলোচনা শুরু করে দিলেন।

এই সময় কি অন্য কোন সময়ে, তিনি বলেছিলেন যে, যখন কাজের কথা ভাবেন, তখন তিনি রাধাকৃষ্ণের কথা বলেন না। শিবই কঠোর এবং প্রকৃত কর্মী তৈরি করেন, তাঁর কাছেই কর্মীকে উৎসর্গ করা প্রয়োজন।

পরের দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অপরূপ উক্তির কথা বললেন। তিনি অপরের সমালোচকদের মধু বা ক্ষত পছন্দ করার ধরন দেখে মৌমাছি বা মাছির সঙ্গে তুলনা করতেন।

তারপর আমরা ইসলামাবাদ ঘুরে অবশেষে সত্যিই অমরনাথের পথে যাত্রা করলাম।

১৭শে জুলাই

প্রথম বিকালেই, বিতস্তা নদীর পাশে একটি বনের মধ্যে আমরা বহু আকাঙ্ক্ষিত পাণ্ড্রেনথানের মন্দিরটি (পাণ্ডে স্থান—পাণ্ডবস্থান?) আবিষ্কার করলাম।

মন্দিরটি একটি পুষ্করিণীর মধ্যে নিমজ্জিত, গাঁজলায় ঘন আবৃত ছিল। তার মধ্যেই বহুদিন পূর্বের ভারী ধূসর চুনাপাথরে গাঁথা ছোট মন্দির।

মন্দিরটি একটি ছোট ঘর আর প্রধান চারটি দিকে ছিল চারটি দরজা। বাইরের দিকটা কোণাকৃতি পিরামিডের মত; মাথাটা কিন্তু কেটে দেওয়া হয়েছে একটি লতা-গুল্মের স্থান করে দেবার জন্য। সেটি চারদিক বিদ্ধ করা একটি স্তম্ভমূল দ্বারা রক্ষিত। মন্দিরটি স্থাপত্যরীতিতে ত্রিপত্রবিশিষ্ট তূণ—ত্রিকোণাকার খিলান, সবই এক বিরল রীতিতে একের সঙ্গে অপরকে এবং সরলরেখ চৌকাঠের উপরিভাগে একত্রিত করা হয়েছিল। এটি আশ্চর্য সুদৃঢ়তার সঙ্গে নির্মিত হয়েছিল। প্রয়োজনীয় রেখাগুলি অবশ্য ভারী শিল্পকার্যে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বনের মাঝে জলাশয়টির ধারে উপস্থিত হয়ে আমরা বড় নিরাশ হয়ে গেলাম; কারণ বেশ কয়েকটি নির্দেশক গ্রন্থে এই মন্দিরটিকে 'একেবারে উৎকৃষ্ট' অর্থাৎ আকার ও সমাপ্তি কৌশলে গ্রীক বা রোমান সমতুল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, আমরা ঐ ছোট মন্দিরটির ভিতরে গিয়ে তার অভ্যন্তরস্থ কারুকার্য দেখতে সক্ষম হলাম না।

আমাদের দুঃখ আনন্দে রূপান্তরিত হল, যখন আমাদের নৌচালকগণ আমাদের নৌকো দিতে পারে এমন একটি স্থানীয় লোককে নিয়ে হাজির করল। জলের গাঁজলার তলা থেকে নৌকাটি সে বার করে আনল, আর নৌকাতে একটি শিকল বেঁধে

সে জলাশয়ে কোমরজলের মধ্যে দিয়ে আমাদের পালা করে মন্দিরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। সুতরাং আমাদের মন্দিরের ভিতরে যাবার ইচ্ছা পূর্ণ হল।

স্বামীজী ব্যতীত আমাদের সকলেরই ভারতীয় স্থাপত্যকলার এই প্রথম পাঠ। তিনি এসে আমাদের শেখালেন কি করে মন্দিরের ভিতরটা দেখব।

মন্দিরের ছাদের ভিতর দিকটায় একটা বড় সূর্যফলক ছিল, সেটা একটি চতুষ্কোণের মধ্যে ছিল, যার কোণাগুলো ছিল কম্পাসের মুখের মত, এইভাবে চারটি সমান ত্রিভুজ হয়ে গিয়েছিল। ছাদের কোণে সাপ জড়ানো স্ত্রী ও পুরুষের ভাস্কর্য খোদাই ছিল সুন্দরভাবে। দেওয়ালে কিছুটা খালি জায়গা ছিল, যেখানে মনে হয় মৎস্যের ঝাঁক ছিল।

মন্দিরের বহির্গাত্রের কারুকার্যও এই রকমই ছিল। পুবদিকের দরজায় মনে হচ্ছে ত্রিপত্রবিশিষ্ট খিলানে দণ্ডায়মান ও শিক্ষাদানের ভঙ্গিতে, হাতটি উত্তোলিত অবস্থায় বুদ্ধের একটি সুন্দর মূর্তি ছিল। দেওয়ালের পোস্তার চারধারে গাছের ধারে, উপবিষ্ট অবস্থায় ও মুখমণ্ডল বিশেষ ভগ্ন এমন একটি নারী-মূর্তি, নিঃসন্দেহে বুদ্ধজননী মায়া দেবীর মূর্তি, খোদিত ছিল। অন্য তিনটি দরজার কুলুঙ্গি শূন্য ছিল, কিন্তু পুষ্করিণীর ধারে পড়ে থাকা একটি প্রস্তরখণ্ডে, সম্ভবত এই দরজাগুলির একটি থেকেই পড়ে গেছে, একটি বিকৃত রাজমূর্তি খোদিত ছিল, স্থানীয় লোকের ধারণা সেটি সূর্যমূর্তি। ছোট্ট মন্দিরটির স্থাপত্য সত্যিই অপূর্ব ছিল, তাই এতদিন সম্ভবত সংরক্ষিত আছে। একটি একক প্রস্তরখণ্ড এমন সুন্দরভাবে কাটা যে, সেটা দেওয়ালের একটি মাত্র ইঁট শুধু নয়, স্থপতির কল্পনার একটা অংশের সঙ্গেই যেন মিলে যায়। কোন দূরে গিয়ে এই প্রস্তরখণ্ডটি দুটি দূর দেওয়াল এমন কি তিনটি দেওয়ালের অংশ তৈরি করে দেয় যেন। এই কারণেই একজনের মনে হয়েছিল মন্দিরটি অতি প্রাচীন, সম্ভবত মার্তণ্ড মন্দিরের থেকেও প্রাচীন। শিল্পীদের কলাকৌশল বাড়ি তৈরির থেকে ছুতার মিস্ত্রীদের কাজের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। মন্দিরের মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত করার জন্য যে পবিত্র জলের উৎসটি ছিল তার থেকেই জল উঠে মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্লাবিত করেই মনে হয় এই জলাশয়ের সৃষ্টি।

স্বামীজীর কাছে মন্দিরটি আনন্দদায়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রত্যক্ষ স্মারক মন্দির, তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসকে যে চারটি ধর্মযুগে ভাগ করেছিলেন তারই একটির প্রতিনিধিস্বরূপ :

(১) বৃক্ষ এবং সর্প উপাসনার কাল, সেই সময় থেকেই সকল ঝরনার নামের শেষে 'নাগ' শব্দ যোগ হয়েছে, যেমন ভেরীনাগ ইত্যাদি। (২) বৌদ্ধযুগ। (৩) সূর্য-উপাসক হিন্দুযুগ (৪) মুসলিম যুগ। তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে বৌদ্ধ-যুগের স্থাপত্যরীতির অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য সূর্যফলক অথবা পদ্ম অলঙ্করণ। সর্প দেহধারীদের চিত্র প্রাক্-বৌদ্ধযুগের। সূর্য উপাসনার যুগে স্থাপত্যশৈলীর অবনতি ঘটে—তাই সূর্যমূর্তিতে একটা স্থূল ভাব ফুটে উঠেছে।

তারপর বনের মধ্যে ছোট মন্দিরটি পিছনে ফেলে রেখে আমরা চলে এলাম।

যখন পৃথিবীটা বিশাল ছিল, বিশাল বস্তুর উদ্ভব হচ্ছিল, তখন প্রায় আঠার শতক* আগে লোকেরা যাতে পূজা করে—এই মন্দিরটিতে কি ছিল? আমরা বলতে পারলাম না, শুধু অনুমান করেই গেলাম। একটা ব্যাপারে অবশ্য আমরা নতজানু হতে পারি—সেই শিক্ষাদানের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান বুদ্ধের কাছে। আমরা একটা বিষয় অনুমান করতে পারলাম, ঐ মন্দির বেষ্টন করে যে কাষ্ঠনির্মিত শহরটি ছিল অনেক দিন আগে আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, আর প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আবার শহরের পত্তন হয়েছিল। স্বপ্নের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমরা আবার ফিরে চললাম গাছের ভিতর দিয়ে নদীর ধারে।

তখন সূর্যাস্তের সময়—আহা কি সূর্যাস্তের শোভা! পশ্চিমদিকে পর্বতশ্রেণী লাল আভা মিশ্রিত নীল রঙে রঙীন, আরও উত্তরে মেঘ আর তুষারে তারা নীল। নীল দুধ-সাদা মণির মত উজ্জ্বল পশ্চাদ্‌পটের গায়ে আকাশ যেন সবুজ, হলুদে আর লালের ছোপ্ লাগা উজ্জ্বল অগ্নিশিখা আর সূর্যমুখী ফুলের রঙ। আমরা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। গুরুদেব যখন তখৎ-ই-সুলেমান দেখতে পেয়ে (যা আমরা আগেই দেখে ভালোবেসে ফেলেছি) বলে উঠ্‌লেন, 'দেখ! মন্দির নির্মাণের স্থান নির্বাচনে হিন্দুর কি প্রতিভা! সে সব সময় পছন্দ করে অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা। দেখ, সমগ্র কাশ্মীরকে আজ্ঞা করছে ঐ তখৎ-ই-সুলেমান। মুকুট পরা অর্ধশয়ান সিংহের মত, নীল জল থেকে উঠছে লাল হরিপর্বত। আর উপত্যকাটি রয়েছে মার্তণ্ড মন্দিরের পাদদেশে।'

আমাদের নৌকাগুলি বনের ধারে নোঙর করা ছিল, আমরা বুঝতে পারছিলাম আমাদের সদ্য-দেখা বুদ্ধ মন্দির স্বামীজীকে বেশ অভিভূত করেছে। সেই সন্ধ্যায় আমরা সকলে ধীরামাতার বজরায় সমবেত হলাম, আমাদের কথোপকথনের অল্প অংশ দেওয়া হল।

গুরুদেব বললেন যে খ্রীষ্টীয় আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধদের থেকে নেওয়া—কিন্তু দলের একজন এ তত্ত্ব মানতে রাজী হল না।

'তাহলে বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো কোথা থেকে এল'—সেই শিষ্য প্রশ্ন করেছিল।

স্বামীজী সংক্ষেপ উত্তর দিলেন—'বৈদিক অনুষ্ঠান থেকে'।

"কিংবা দক্ষিণ-ইউরোপেও তো এমন রীতিই প্রচলিত ছিল। তাহলে এটাই ভাবা ভাল নয় কি যে খ্রীষ্ট ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব একটি সাধারণ উৎস থেকেই!"

'না! না!' তিনি উত্তর করলেন 'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ভিতরেই ছিল! এমনকি বর্ণাশ্রমকেও আক্রমণ করা হয়নি, সেটা অবশ্য এখনো পর্যন্ত দানা বাঁধেনি। বুদ্ধ কেবলমাত্র আদর্শকেই জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। মনু বলেছেন—'যিনি এই জীবনে ব্রহ্মকে লাভ করেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ।' বুদ্ধ যদি পারতেন—এই ক্ষমতা অর্জন করতে পারতেন।"

কিন্তু তাঁর প্রতিবাদী বারবার প্রশ্ন করতে লাগল,"খ্রীষ্টীয় ও বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের

* প্রথম দেখে পাণ্ড্রেনথানের মন্দিরটিকে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ কণিষ্কের সমকালের বলে মনে হয়েছিল। আমার নিজের মনে হয় না যে মন্দিরটি অত প্রাচীন।—নিবেদিতা

মধ্যে তাহলে যোগ কোথায় ? তারা কেমন করে এক রকম হতে পারে ? আমাদের পূজার প্রধান অনুষ্ঠানের মত আপনাদের তো কিছুই নেই !"

"কেন আছে বইকি !" স্বামীজী বললেন, "বৈদিক অনুষ্ঠানেও খ্রীষ্ট ধর্মীয়দের মত ঈশ্বরের উদ্দেশে ভোগ নিবেদনের প্রথা আছে, তোমাদের পবিত্র খ্রীষ্টীয় ভোজ উৎসব, আমাদের প্রসাদের সমতুল্য। শুধুমাত্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলেই বসে অথবা নতজানু হয়ে উৎসর্গ করা হয়। তিব্বতে নতজানু হয়েই উৎসর্গ করা হয়। এছাড়া বৈদিক অনুষ্ঠানেও সুগন্ধি ধূপ-প্রদীপ, গান সবই আছে।"

অপর পক্ষ একটু অশোভন তর্ক করেই বলল, "কিন্তু, এই দুই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোন সাধারণ উপাসনা মন্ত্র আছে কি ?" এইভাবে প্রতিবাদ করলে সর্বদাই একটি কঠিন আপাতবিরোধী কিন্তু সত্যবিরোধী নয়—এমন তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত, যার মধ্যে একটি নতুন এবং অচিন্ত্যপূর্ব সাধারণীকরণ দেখা যেত।

তিনি এই প্রশ্ন শুনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন। "না ! আর খ্রীষ্টধর্মেতেও নেই ! এটা প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম মাত্র আর প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম এটা গ্রহণ করেছিল মুসলমানদের কাছ থেকে—সম্ভবত মূরীয় প্রভাবের মাধ্যমেই ।

মুসলিমধর্মই একমাত্র ধর্ম যা পুরোহিততন্ত্রের আদর্শকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। উপাসনাকারীগণের নেতা অন্যান্যদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ান আর বেদী থেকে কেবলমাত্র কোরাণ পাঠই হয়। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম এই ভাবটিই প্রকাশ করে।

এমনকি মস্তকমুণ্ডনও ভারতে প্রচলিত ছিল। আমি জাস্টিনিয়নের একটি ছবি দেখেছিলাম—তিনি দুজন মুণ্ডিত মস্তক সাধুর কাছ থেকে বিধি ও আইন-কানুন গ্রহণ করেছেন। প্রাক্-হিন্দুধর্মে সাধু এবং সন্ন্যাসিনী দুই-ই বর্তমান ছিলেন। ইউরোপ তার বিন্যাসরীতি পেয়েছে 'থেবাইড' থেকে।"

"তাহলে আপনি ক্যাথলিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আর্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করেন?"

'হাঁ, প্রায় সমগ্র খ্রীষ্টধর্মই আর্যধর্ম বলে মনে করি। আমার মনে হয় খ্রীষ্টের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমার মনে এই সন্দেহ হয়েছিল একটি বিশেষ স্বপ্ন, ক্রীটের অদূরে সেই স্বপ্ন দেখার পর থেকেই।* আলেকজান্দ্রিয়াতে ভারতীয় ও মিশরীয় ভাবধারার মিলন হয়, পরে এই মিলিত ভাবধারা ইহুদী ও হেলেনিক (গ্রীক) ধারণায় রঞ্জিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম রূপে জগতে প্রচলিত হয়েছে।

---

* ভারতে ফেরার পথে, ১৮৯৭ সনের জানুয়ারি মাসে, নেপ্‌লস্ থেকে পোর্ট সৈয়দ ভ্রমণকালে স্বামীজী এক বৃদ্ধ শ্মশ্রুধারী ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেন ; বৃদ্ধ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন, "এই হল ক্রীট দ্বীপ," দ্বীপের একটি স্থান বৃদ্ধ স্বামীজীকে স্বপ্নে দেখান, পরে যাতে তিনি চিনতে পারেন। এই স্বপ্নের অর্থ এই যে, ক্রীট দ্বীপেই খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধ তাঁকে দুটি ইউরোপীয় শব্দ দিয়েছিলেন একটি হল 'থেরাপিউটি', বলা হয়েছিল যে 'থেরাপিউটি' শব্দটির অর্থ থেরার পুত্রগণ, (সংস্কৃত-পুত্র) অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়। এর থেকে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে খ্রীষ্টধর্ম একটি বৌদ্ধ প্রচারনীতি থেকেই উদ্ভূত। সেই বৃদ্ধ আরও বলেছিলেন 'প্রমাণ এখানে আছে,' মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন 'এখানে খুঁড়লে বুঝতে পারবে।'

তোমরা জান, কার্যাবলী এবং পত্রাবলী সুসমাচার থেকেও প্রাচীনতর এবং সাধুজন তো কল্পনাবিলাস। সাধু পলই হলেন একমাত্র চরিত্র—যাঁর সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চয়, তবে তিনিও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব মত ছিল 'যেমন করেই হোক আত্মাকে রক্ষা কর।' তাই না? "না! ধর্মগুরুগণ-দের মধ্যে বুদ্ধ এবং মুহম্মদই কেবলমাত্র ঐতিহাসিক স্পষ্টতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁদের সৌভাগ্য যে যখন তাঁরা জীবিত ছিলেন তখন তাদের শত্রু এবং মিত্র দুই-ছিল। কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। এক যোগী,এক গোপবালক আর এক মহারাজ, সব কিছুর সমন্বয়ে গীতাহস্ত এক পরমসুন্দর মূর্তির সৃষ্টি হয়েছে।

রেনাঁ-এর খ্রীষ্ট জীবনী কেবল খেলা। এই জীবনী প্রকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্ট্রাউসকে ছুঁতেও পারে না। খ্রীষ্টের জীবনে দুটি ঘটনা ব্যক্তিগত স্পর্শে জীবন্ত—ব্যভিচারের অপরাধে বন্দী রমণী, এই গল্প সাহিত্যের সব থেকে সুন্দর গল্প, আর কূপ-পার্শ্বে রমণীর গল্প। শেষ গল্পটির সঙ্গে ভারতীয় জীবনের কি আশ্চর্য সত্যতা দেখা যায়। এক রমণী জল তুলতে এসে কূপের পার্শে এক হলুদ বস্ত্রপরিহিত সন্ন্যাসীকে বসে থাকতে দেখে। সাধু স্ত্রীলোকটির কাছে জল চাইলেন, তারপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে শিক্ষাদান করেন ও অল্প মনের কথা বলে দেন। ভারতীয় গল্পে আছে, স্ত্রীলোকটি যখন গ্রামবাসীদের সাধুকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে ডাকতে যায় সাধু সুযোগ বুঝে বনের মধ্যে পালিয়ে যান।

মোট কথা এই যে, আমার মনে হয় বৃদ্ধ রাব্বি হিলেল যীশু খ্রীষ্টের উপদেশসমূহের জন্য দায়ী আর ন্যাজারীন নামে প্রাচীন ও অজ্ঞাত এক ইহুদীগোষ্ঠী যেন সহসা সাধু পল কর্তৃক সহসা তড়িৎশক্তির দ্বারা যেন উজ্জীবিত হয়ে, উপাসনার কেন্দ্র স্বরূপ পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব ভূষিত হয়।

ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে এটি সাধারণ স্বপ্ন নয়। স্বামীজী উঠে ডেকে বেরিয়ে এলেন। এখানে প্রহরা শেষে ফিরছেন এমন এক কর্মচারীকে দেখলেন। স্বামীজী প্রশ্ন করলেন, এখন ক'টা বাজে? উত্তর এল, 'মধ্যরাত্রি,' 'আমরা এখন কোথায়?' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন। তাঁকে আশ্চর্য করে দিয়ে কর্মচারীটি উত্তর দিয়েছিলেন 'ক্রীট থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে।"

আমাদের গুরুদেব নিজেকেই ঠাট্টা করতেন যে ঐ স্বপ্ন তাঁর মনে কি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু তিনি এই স্বপ্ন কখনো মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। দুটি শব্দের মধ্যে দ্বিতীয়টি যে হারিয়ে গেছে এজন্য তাঁর মনে গভীর দুঃখ ছিল। স্বামীজীকে বলতে হয়েছে যে স্বপ্নটি দেখার আগে খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব যে একান্তভাবে ঐতিহাসিক—এই চিন্তা কখনো তাঁর মাথায় আসেনি। অবশ্য আমরা মনে রাখব যে, হিন্দুদর্শন অনুসারে একটি চিন্তাধারার সম্পূর্ণতাই আসল কথা, তার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার প্রশ্ন তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বামীজী বালক বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁর গুরু উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি কি জান না, যারা এমন সব বিষয়ে আবিষ্কার করে কথা বলেন তাঁরা নিজেরাই যে তাই ছিলেন?"

"পুনরুত্থান অবশ্যই বসন্ত-দাহ ছাড়া কিছুই নয়। শুধু মাত্র ধনী গ্রীক ও রোমানগণই এই প্রথা অনুষ্ঠিত করতেন, আর নতুন সূর্য-কাহিনী অল্পলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

"কিন্তু বুদ্ধ! আহা বুদ্ধ! পৃথিবীর যত লোক জন্ম গ্রহণ করেছে তার মধ্যে তিনি মহত্তম ব্যক্তি। তিনি নিজের জন্য কিছুই চান নি। সব থেকে বড় কথা, তিনি কখনো লোকের পূজা কামনা করেন নি। তিনি বলতেন: "বুদ্ধ মানব মাত্র নন—তিনি একটি অবস্থা বিশেষ। আমি দ্বার খুঁজে পেয়েছি। তোমরা সকলেই প্রবেশ কর।"

"তিনি 'পাপিষ্ঠা' অম্বপালির ভোজে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি অন্ত্যজ চণ্ডালের গৃহে ভোজন করেছিলেন তিনি জানতেন, চণ্ডাল গৃহে যা ভোজন করেছেন তাতে তাঁর মৃত্যু হবে, তবু মৃত্যুশয্যা থেকেও গৃহস্বামীকে মহামুক্তিদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। পরম সত্যলাভের অনেক আগেও ছোট ছাগশিশুটির জন্য মায়া ও মমতায় পূর্ণ! তোমাদের মনে আছে, সন্ন্যাসী এবং রাজপুত্র হয়েও রাজা যে ছাগশিশুটিকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন তার জন্য তিনি নিজেকে বলি দিতে বলেন, আর তা দেখে রাজা অনুকম্পায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, আর ছাগশিশুটির জীবন বাঁচিয়ে দিলেন। যুক্তি ও আবেগের এমন সংমিশ্রণ দেখা যায় না! সত্যি, সত্যিই তিনি জগতে দ্বিতীয় রহিত!"

নবম অধ্যায়

বিতস্তা নদীতীরে ভ্রমণ ও কথোপকথন

সঙ্গীগণ : স্বামী বিবেকানন্দ, ধীরা মাতা, জয়া এবং নিবেদিতা।

স্থান : কাশ্মীর।

২০শে ২৭শে জুলাই, ১৮৯৮

২০শে জুলাই

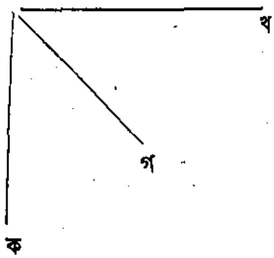
পরের দিন আমরা অবন্তীপুরের দুটি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে এলাম। মন্দির অভ্যন্তরে যখন আমরা গভীর পর্যবেক্ষণে মগ্ন ছিলাম প্রতি ঘণ্টাই যেন আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল। সামনে খোলা মাঠে আর গাছের মধ্যে যেসব মানুষ আমাদের অতি পরিচিত, তাদের মধ্যে থেকে মনে করা সম্ভব হচ্ছিল না যে আমরা মধ্য এশিয়ার একটি নদী অনুসন্ধান করছি। যারা কাশ্মীর যে কোন ঋতুতেই দেখেছেন তাদের মনে পড়ে যায় কালিদাস-বর্ণিত বসন্ত বনের ছবিটি—বুনো জাম, বাদাম আর আপেল গাছের সৌন্দর্যসম্ভার। সেই বন, শিব যেখানে একটি দেবদারু বৃক্ষতলে বসে আছেন, হিমালয় রাজকুমারী উমা তাঁর পদ্মবীজে গাঁথা মালাগাছি নিয়ে সেখানে এলেন, খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন অনুপম সুন্দর যুবক দেবতা, তাঁর তূণীর আর ফুলশর নিয়ে। ইংরাজী বসন্তের যা কিছু স্বর্গীয়, ইস্টার উৎসবে নর্ম্যাণ্ডীর অরণ্যে যা কিছু মনোরম সব কিছু একত্রিত ও বর্ধিত হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার সৌন্দর্যের মধ্যে।

সেদিন সকালে নদী ছিল প্রশস্ত, অগভীর এবং নির্মল। আমরা দুজনে স্বামীজীর সঙ্গে মাঠের উপর, নদীর ধারে প্রায় তিন মাইল ঘুরলাম। তিনি পাপবোধ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করে বললেন, মিশরীয়দের, রোম বংশোদ্ভূতদের ও আর্যদের মধ্যে পাপবোধ ধারণা কেমন ছিল। 'বেদে'র মধ্যে এই ধারণা ছিল—কিন্তু শীঘ্র তা লুপ্ত হয়। বেদেতে শয়তান ক্রোধের দেবতা হিসাবেই গণ্য। বৌদ্ধগণের কাছেই শয়তান 'মার' বা 'কামনার অধিপতি', আর বুদ্ধের একটি লোকপ্রিয় উপাধি—'মারজিৎ' (দ্রষ্টব্য সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ'—স্বামীজী চার বৎসর বয়সেই যা আবৃত্তি করতে শিখেছেন!) কিন্তু শয়তান যখন বাইবেলের হ্যামলেট, হিন্দুশাস্ত্রে ক্রোধের অধীশ্বর—সৃষ্টিকে কখনো সে ভাগ করে না। শয়তান সর্বদাই কলুষতায় প্রকাশমান, দ্বৈতভাবে নয়।

জরথুস্ত্র প্রাচীন ধর্মের এক সংস্কারক। তাঁর কাছে আরমাজদ্ এবং আহ্রিমান পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নয়; সর্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ মাত্র। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধর্ম নিশ্চয় বৈদান্তিক ছিল। তাই মিশরীয় আর 'শেম'বংশীয়গণ পাপবোধ তত্ত্বটি ধরে ছিল, অপর পক্ষে গ্রীক ও ভারতীয় আর্যগণ সেটা ছেড়ে দেয়। ভারতবর্ষে ন্যায়পরায়ণতা ও পাপ বিদ্যা ও অবিদ্যায় রূপান্তরিত হল, এবং উভয়ই সীমা

ছাড়িয়ে গেল। আর্যদের মধ্যে পারসীয় ও ইউরোপীয়গণ ধর্মচেতনায় শেমীয় হয়ে গেল এবং তাই এল পাপবোধ।*

তারপর আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে গেল, সাধারণত যেমন হয়, এই দেশের নানা সমস্যা ও ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ উঠল। দেশের লোককে বল দিতে হলে তাদের কি চেতনা সঞ্চার করা উচিত? তাদের নিজস্ব প্রগতির রেখা একদিকে চলেছে—যেমন 'ক', তাহলে নতুন শক্তি বৃদ্ধি 'খ' কি ক্ষতিপূরক? 'গ' এই দুই রেখার মধ্যে একটি উন্নতিসূচক মধ্যপথ সূচনা করবে, সেটি একটি জ্যামিতিক পরিবর্তন মাত্র। কিন্তু এটা তো তা নয়। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির প্রশ্ন। আমরা জীবনস্রোতকেই নতুন শক্তি সঞ্চার করে বাকি কাজটা তাকেই করতে দেব। বুদ্ধ বৈরাগ্যের কথা প্রচার করলেন, ভারত তা শুনল। তবু এক হাজার বছরের মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চ শিখরে উঠে এসেছে। ভারতের জাতীয় জীবনের উৎসই হল ত্যাগ। শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল—সেবা এবং মুক্তি। হিন্দু জননী সর্ব শেষে আহার করেন। বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়—জাতি এবং ধর্মের কল্যাণের জন্য। আধুনিক সংস্কারপন্থীগণের কয়েকজন যে সমস্যা সমাধান করতে পারল না, এমন একটা পরীক্ষায় উপনীত হলেন—তারা হলেন "বলি, তাদের উপর দিয়েই জাতিকে চলতে হবে।"



তারপর আমাদের আলাপ-আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। আমাদের আলোচনা ঠাট্টা ও আনন্দ ও গল্পে ভরে উঠল। আমরা হাসতে হাসতে শুনছিলাম। তখন নৌকা এসে গেল এবং সেদিনের মত কথাবার্তা শেষ হল।

স্বামীজী সারা বিকাল ও রাত্রি তাঁর নৌকায় অসুস্থ হয়ে শুয়ে রইলেন। কিন্তু পরের দিন যখন আমরা বিদবেহারার মন্দিরে নামলাম, দেখি, জায়গাটি ইতিমধ্যেই অমরনাথ যাত্রীদের দ্বারা পরিপূর্ণ, স্বামীজী আমাদের সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য যোগ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। "শীঘ্র অসুখে পড়া, শীঘ্রই নিরাময় হওয়া" ছিল স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য, একথা তিনি নিজের সম্বন্ধেও বলতেন। তারপর প্রায় সারাটা দিনই তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, বিকালে আমরা ইসলামাবাদে পৌঁছলাম।

একটি আপেল বাগিচার পাশে ডোঙাগুলি নোঙর করা হল। জলের কিনারা পর্যন্ত ঘাস জন্মেছে, মাঠের উপরে আপেল ও পেয়ারা গাছ, এমনকি প্লাম গাছও

---

* এই আলোচনার একজন শ্রোত্রী পরে স্বামীজীর জ্ঞানের প্রসারতা ও যথার্থতার প্রশংসা করবার সুযোগ পেয়েছিল। সে দেখেছিল দুজন পার্শী স্বামীজীর পদতলে বসে খুশি হয়ে তাদের ধর্মীয় বোধের ইতিহাসের কথা শুনছে।—নবেদিতা

ছিল, হিন্দুরা গ্রামের বাইরে যে গাছগুলি রোপন করা প্রয়োজন মনে করে, তেমনই। বসন্তের সময় আমাদের মনে হয়েছিল এই জায়গাটি যেন সেই আভিলনের দ্বীপ-উপত্যকা।

যেখানে শিলাবৃষ্টি হয় না, বৃষ্টি নেই, নেই তুষারপাত,
বাতাসও যেখানে জোরে প্রবাহিত হয় না, কিন্তু দেশটি আছে
প্রান্তরে ঢাকা—সুখী, বাগিচা-ঘেরা, সুন্দর,
আর গ্রীষ্মকালের সমুদ্র-ঘেরা ঝোপঝাড়গুলি।

যে বজরাটিতে আমরা দুজনে ছিলাম, জলের ধার পর্যন্ত সেটিকে নেওয়া সম্ভব হয়নি, সেটি নদীর একটি গভীর ও স্রোতময়ে অংশে উঁচু উঁচু ঝোপের মাঝে নোঙর করা ছিল। একধার থেকে অন্য ধারে যাওয়া—দুধারে কাঁচ সবুজ ধানের খেতের পাশ দিয়ে পপলার গাছের তলা দিয়ে যাওয়া—আহা! কি সুন্দর!

সন্ধ্যার অন্ধকারে আপেল গাছের তলায় ছোট আসরটিতে এসে একজন দেখল গুরুদেব বসে আছেন, আর সব থেকে বিরলতম ঘটনা অর্থাৎ ধীরামাতা ও জয়াকে ব্যক্তিগত কথা বলছেন। তিনি হাতে দু-টুকরো নুড়িপাথর নিয়ে বললেন—যখন তিনি সুস্থ থাকেন, তাঁর মন তখন এটা অথবা ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অথবা মনে হয় তার ইচ্ছাশক্তিরও জোর কমে গেছে। কিন্তু সামান্য যন্ত্রণার স্পর্শ অথবা অসুস্থতা দেখা দিলে, অল্পক্ষণের জন্যও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে "আমি এইরকম শক্ত হয়ে যাই" (পাথর দুটিকে ঠুকে দিয়ে বললেন), কারণ আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি।"

স্বামীজীর এই শান্তভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই একজনের একটা ভ্রমণের কথা মনে পড়ে গেল। একদিন ইংল্যাণ্ডে, মাঠের ওপর স্বামীজী একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ও এক ইংরাজ রমণীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন, তখন সহসা তাঁদের একটি খেপা ষাঁড় তাড়া করে। ইংরাজ ভদ্রলোক কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দৌড়ে পালিয়ে নিরাপদে পাহাড়ের অপরদিকে আশ্রয় নিলেন। রমণীটি যতটা সম্ভব দৌড়ালেন, অবশেষে আর সামর্থ্যে না কুলাতে মাটিতে পড়ে গেলেন। এই দেখে এবং তাঁকে সাহায্য করার উপায় নেই দেখে স্বামীজী ভেবে নিলেন 'তাহলে এই হল শেষ—.' হাত দুটি ভাঁজ করে রমণীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি পরে বলেছিলেন তাঁর মন গাণিতিক উপায়ে গণনা করে নিয়েছিল যে ষাঁড়টি কতদূর পর্যন্ত তাঁকে ছুঁড়ে দিতে পারে। কিন্তু জন্তুটি কয়েক পা দূরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, তারপর মাথা তুলে চুপ করে ফিরে গেল।

এই একই রকম সাহস, যদিও তিনি এসব চিন্তা থেকে তখন অনেক দূরেই ছিলেন, তিনি দেখিয়েছিলেন কিশোর বয়সে, কলিকাতার পথে শান্তভাবে একটা পলাতক ঘোড়াকে ছুটে ধরে ফেলেছিলেন, এবং ঘোড়ার গাড়িতে আটকে থাকা মহিলাটির জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে কথা হতে লাগল। আমরা গাছের তলায় ঘাসের উপর এক কি দু ঘণ্টা আধা-গম্ভীর আধা-আনন্দিত মনে বসে রইলাম। বৃন্দাবনের বাঁদরগুলো কেমন দুষ্টুমি করে তার নানা গল্প শুনলাম। তাঁর পরিব্রাজক জীবনে দুটি

বিভিন্ন ঘটনার গল্প শুনলাম। যখন তাঁর যে সাহায্যের প্রয়োজন তা আগে থেকেই তাদের দর্শনজাত উপলব্ধি তাঁর হয়ে গিয়েছিল। একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে। এই ঘটনাটি ঘটেছিল যখন তিনি একটি শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি কিছুই চাইবেন না; তখন প্রায় পাঁচদিন যাবৎ তিনি উপবাসী ছিলেন। যখন তিনি ক্লান্তিতে প্রায় মরমর হয়ে একটি রেল স্টেশনে শুয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে হল—তিনি নিশ্চয় উঠবেন এবং এমন একটা রাস্তা ধরে চলবেন, সেখানেই তিনি একটি মানুষের সাক্ষাৎ পাবেন যে মানুষটি তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি তাই করলেন এবং খাবার পাত্র হাতে একটি মানুষকে দেখলেন। "আপনিই কি তিনি যার জন্য আমাকে পাঠান হয়েছে?" সেই মানুষটি স্বামীজীর কাছে এসে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে করতে প্রশ্ন করল।

এই সময় এক শিশুকে আমাদের কাছে নিয়ে আসা হল—শিশুটির হাত ভীষণভাবে কেটে গেছে। স্বামীজী প্রাচীনাদের টোটকা দিলেন। তিনি জল দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডের ছাই ক্ষতস্থানে দিয়ে দিলেন। গ্রামবাসীদের সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন। রাত্রির মত আমাদের গল্পের আসর শেষ হল।

২৩শে জুলাই

পরের দিন সকালে কুলিদের একটি ক্ষুদ্র দল আপেল গাছের নীচে জড় হল; তারা আমাদের মার্তণ্ড মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করছিল। একটি অপরূপ প্রাচীন মন্দির,—মন্দিরের থেকে মঠের সাদৃশ্যই বেশি। অদ্ভুত সুন্দর স্থানে স্থাপিত আর বিভিন্ন যুগের মধ্যে এটি গড়ে উঠেছে—তাদের রীতির একত্র সন্নিবিষ্ট প্রভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান, আর তাই কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। যখন আমরা মধ্যাহ্নে মন্দিরে প্রবেশ করলাম, সূর্য তখন পশ্চিমে, আমাদের ঠিক পিছনে, আমাদের সামনেই বাধা-স্বরূপ অবস্থিত সারি সারি খিলানের নীচে গভীর কালো ছায়ার কথা আমি কখনো ভুলতে পারব না। তিনটি খিলান ছিল, একেবারে একটি অন্যটির পিছনে, আর দূরে অবস্থিতটির মধ্যে, তার দুই-তৃতীয়াংশের মত উচ্চতায় একটি ভারী সরলরেখ জানালার মাথা দেখা যাচ্ছিল। সব খিলানগুলিই ত্রিপত্রবিশিষ্ট, কিন্তু আমরা প্রবেশ করবার সময় প্রথম আর দ্বিতীয়টাই দেখতে পেয়েছিলাম। স্থানটি, বেশ বোঝা গেল, পবিত্র জলের উৎসটিকে ঘিরে ভারী পাথরের খণ্ড দিয়ে নির্মিত তিনটি আয়ত ক্ষেত্রাকার ছোট মন্দির। এই তিনটি মন্দিরের গঠনরীতি সমান, কঠিন। মধ্য এবং দূরের পূবের মন্দিরগুলি ঘিরে পরবর্তী কালের কোন নরপতি, প্রাচীর গেঁথে দিয়েছিলেন, মূল দ্বারটিতে হস্তক্ষেপ না করে, নীচু নীচু চৌকা দরজাগুলির বাইরে একটি করে ত্রিপত্রবিশিষ্ট খিলান নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া মন্দিরের সামনে, একটা বড় চক্রনাভি যোগ করে দিয়েছিলেন—আর প্রবেশদ্বার হিসাবে একটি উঁচু ত্রিপত্রবিশিষ্ট খিলান নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রধান সৌধের চারিধারে ধর্মশালা বা মঠটি অদ্ভুতভাবে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনাকারে নির্মিত। যারা এই মঠটি দেখেছে এবং উত্তর ভারতের মুসলিম রাজকীয় কবরগুলি দেখেছে, বুঝতে পারবে যে মঠটি প্রকৃত অর্থে একটা সম্পূর্ণ আশ্রম, আর যদিও আমাদের শীত-

প্রধান দেশে এইভাবে রেখে দেওয়া সম্ভব হয় না; তবুও তার উপস্থিতি চিরদিন মনে করিয়ে দেয় যে প্রাচ্যদেশেই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রকৃত উদ্ভব হয়েছিল। স্বামীজী খুব ব্যস্ত ছিলেন, পর্যবেক্ষণে এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়, চক্রনাভি ঘুরে প্রবেশপথ থেকে পবিত্র দেবালয় পর্যন্ত পশ্চিম দিকে—দুটি খিলানের উঁচু ত্রিপত্রবিশিষ্ট খিলানের উপর দিয়ে এবং একটি খোদাই করা মূর্তির উপর দিয়ে যে কার্নিশ গেছে তার দিকে নির্দেশ করে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন; অথবা দেবশিশু আঁকা ভিত্তিগাত্রের দিকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন; আমরা করবার আগেই কয়েকটি মুদ্রা তুলে নিলেন। সূর্যাস্তের আলোয় অশ্বারোহণে ফিরে আসা সত্যিই চমৎকার। এইসব সময়ের, অথবা আগের দিন কিংবা পরের দিনের কথোপকথনের অংশবিশেষ আমার মনে পড়ে যাচ্ছে।

কোন জাতি, গ্রীক অথবা অন্য-কোন জাতি, জাপানীদের মত দেশপ্রেমকে এত উচ্চে নিয়ে যায়নি। তারা কথা বলে না—কাজ করে, দেশের জন্য সব দিয়ে দিতে পারে। এখন সম্ভ্রান্তবংশীয় জাপানীরা, সাম্রাজ্যের ঐক্য বন্ধনের জন্য বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁদের সম্পত্তি ও খেতাব বিসর্জন দিয়ে জাপানে এখন চাষীর মত জীবনযাপন করছেন।* জাপানের যুদ্ধে কোন বিশ্বাসঘাতক খুঁজে পাবে না। একবার সে কথাও ভেবে দেখ!"

আবার ভাবপ্রকাশে অক্ষম কতগুলি লোকের কথা প্রসঙ্গে বললেন—"লাজুক এবং চুপচাপ লোকেরাই; আমি দেখেছি, যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন পশুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।"

আবার, সন্ন্যাসজীবনের কথা প্রসঙ্গে, এবং ব্রহ্মচর্যের বিধি-নিয়মের কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'যেসব সন্ন্যাসী সুবর্ণের চিন্তা করে, লালসা করে, তারা আত্মঘাতীর সমতুল্য।'—এইরকম আরো কত কথা।

২৪শে জুলাই

অরণ্য ও রাত্রির অন্ধকার—গাছের নীচে বড় অগ্নিকুণ্ড, দুই-তিনটি তাঁবু কালো পটভূমিকায় সাদা হয়ে দাঁড়িয়ে, দূরে আর একটি অগ্নিকুণ্ড ঘিরে ভৃত্যগণের কণ্ঠস্বর ও আকৃতি আর গুরুদেব ও তিনটি শিষ্যা—এই হল পরবর্তী চিত্র। ভেরীনাগের পথে, আপেল বাগিচার নীচে, পথের ধারে, অঝোর বৃষ্টিধারার মধ্যে—সূর্যের আলোয় মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, পাইন-আবৃত পাহাড়ের পাদদেশে অষ্টকোণাকৃতি জলাশয়যুক্ত জাহাঙ্গীরের প্রাচীন বিশাল প্রাসাদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু দিনের সেরা দিন এল সান্ধ্যভোজনের পর যখন উপহার নিয়ে আসা অগণিত অভ্যাগত ও ভক্তের ভীড় কমে যাবার পর আমরা অবশেষে একা হলাম। সহসা গুরুদেব দলের একজনের দিকে ফিরে বললেন—"তুমি তো তোমার বিদ্যালয়ের কথা আর বলনা, তুমি কি মাঝে মাঝে সে কথা ভুলে যাও?" তিনি বলে বসলেন, "দেখ, আমায় কত কথা ভাবতে হয়। একদিন আমি মাদ্রাজের কথা ভাবি, আর সেখানের কাজের কথা ভাবি। আর একদিন আমি আমার পূর্ণ মনোযোগ রাখি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সিংহল বা কলকাতার জন্য। এখন আমি তোমার কাজের কথা ভাবছি।"

* এই কথা আমার মনে হয় ভুল। কারণ জাপানী সামুরাইগণ তাঁদের রাজনৈতিক সুযোগগুলিই ত্যাগ করেছিলেন—তাঁদের ভূসম্পত্তি নয়।—নিবেদিতা

ঠিক এই মুহূর্তে গুরুদেবকে নৈশভোজের জন্য আহ্বান করা হল, যতক্ষণ না তিনি ফিরে এলেন যে বিশ্বাস তিনি আমন্ত্রণ করে এসেছিলেন, ততক্ষণ তা দেওয়া হল না। পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুবিবেচিত ইচ্ছা, শুরু করবার পক্ষে সামান্যতা, প্রসারতা ও অন্তর্নিবেশী ধারণা থেকে সরে যাবার চূড়ান্ত প্রবণতা, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা ও সমগ্র শিক্ষাদান প্রচেষ্টার ভিত্তি হবে ধর্মীয় জীবন—এইসব কথা তিনি মন দিয়ে শুনলেন। "কিন্তু সেই উৎসাহ পাবার জন্য তুমি সাম্প্রদায়িক হতে চাও, তাই না? তুমি সর্বসম্প্রদায় থেকে উপরে ওঠার জন্য নিজেই একটি সম্প্রদায় রচনা করবে। হুঁ, আমি বুঝেছি।"—স্বামীজী তখন এই কথা বললেন।

কতকগুলি অসুবিধা স্পষ্টতই থাকবে। অনেক কারণেই এই পর্যায় পর্যন্ত বস্তুটিকে প্রায় অসম্ভবই মনে হবে, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তিকে ঠিক পথে চালিত করা; আর পরিকল্পনাটি যদি সত্য হয় পথ এবং উপায়ও হাতের কাছেই পাওয়া যাবে, একথাও ঠিক।"

তিনি সব যখন শুনলেন তখন একটু অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'তুমি আমাকে সমালোচনা করতে বলছ—কিন্তু তা তো আমি পারব না। কারণ আমি নিজে যতখানি অনুপ্রাণিত—তোমাকেও ততখানিই অনুপ্রাণিত বলে মনে করি। তুমি জান, আমাদের ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের এখানেই তফাৎ। অন্য লোকেরা ভাবে তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা অনুপ্রাণিত ছিলেন, আমরাও তাই ভাবি। কিন্তু আমি তাঁরই মত অনুপ্রাণিত, তুমিও তাই, আবার তোমার পরে তোমার ছাত্রীরা এবং তাদের শিষ্যারাও ক্রমশই হবে। সুতরাং তুমি যা ভাল বোঝ তেমনভাবেই আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

তারপর তিনি ধীরামাতা ও জয়ার দিকে ফিরে এই শিষ্যার হাতে এক মহা বিশ্বাস অপর্ণের কথা বললেন, যখন স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে যাবেন—এই শিষ্যা স্ত্রীলোকদের কল্যাণ সাধনে প্রতিনিধিত্ব করবেন, এই কাজ পুরুষদের দায়িত্ব-ভারকেও অতিক্রম করে যাবে। তিনি দলের কর্মীর দিকে তাকিয়ে আরো বললেন "হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তোমার যা দরকার, সেই প্রদীপ্ত উৎসাহ নেই। তোমার শক্তির ক্ষয় হওয়া প্রয়োজন।"

২৫শে জুলাই

পরের দিন, ভোরবেলাই একটি তাঁবুর ভিতর প্রাতরাশ খেয়ে আমরা আচ্ছাবল রওনা হলাম, আমাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখেছে কিছু রত্ন তার হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সে ফিরে পেয়েছে—রত্নগুলি এখন খুব উজ্জ্বল ও নতুন। স্বামীজী মৃদু হেসে গলাটি থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এমন সুন্দর স্বপ্নের কথা বলতে নেই।"

আচ্ছাবলে জাহাঙ্গীরের আরো উদ্যান দেখতে পেলাম। এই স্থান না ভেরীনাগ কোনটি তাঁর প্রিয় বিশ্রামস্থল ছিল?

আমরা উদ্যানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, পাঠান খাঁর জেনানা মহলের বিপরীতে

একটি স্থির জলাশয়ে স্নান করলাম, তারপর প্রথম উদ্যানটিতে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ করে বিকালে অশ্বপৃষ্ঠে ইসলামাবাদ ফিরে এলাম।

যখন আমরা মধ্যাহ্ন ভোজে বসেছিলাম, তখন স্বামীজী তাঁর কন্যাকে শিবের কাছে নিবেদন করবেন বলে, তাঁর সঙ্গে অমরনাথ গুহায় যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। ধীরামাতা মৃদু হেসে অনুমতি দিলেন। পরবর্তী আধঘণ্টা অভিনন্দনে ও আনন্দে কাটল। ইতোমধ্যেব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে আমরা সকলেই পহল্‌গামে চলে যাব, এবং তীর্থযাত্রা শেষে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সুতরাং সেই সন্ধ্যায় নৌকায় উপস্থিত হয়ে, আমরা বাঁধাছাঁদা শুরু করে দিলাম, চিঠিপত্র লিখলাম। পরের দিন বিকালে বাওয়ান অভিমুখে রওনা হলাম।

দশম অধ্যায়

অমরনাথের মন্দির

স্থান: কাশ্মীর
কাল: ২৯শে জুলাই—৮ই অগস্ট, ১৮৯৮।

২৯শে জুলাই

এই সময় থেকে আমরা স্বামীজীর দেখা বিশেষ পেতাম না। তিনি তীর্থযাত্রার জন্য উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিলেন, আর সাধারণত দিনে একবারই আহার করতেন। এই সময় তিনি সাধু ছাড়া অন্যদের সঙ্গ চাইতেন না। কখনো কখনো তিনি তাঁবু খাটানোর জায়গায় মালা জপতে জপতে আসতেন। আজ রাত্রে দলের দুজন বাওয়ানে ঘুরতে গিয়েছিল, বাওয়ান পবিত্র জলের উৎসগুলিই কেন্দ্র করে, ধর্মীয় প্রবণতায় মণ্ডিত একটা গ্রাম্যমেলার মতই লাগল। পরে ধীরামাতার সঙ্গে তাঁবুর দরজার কাছে যাওয়া এবং স্বামীজীকে নানা প্রশ্নকারী হিন্দীভাষী সাধুদের কথা শোনা সম্ভব হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার আমরা পহল্‌গামে পৌঁছে উপত্যকার নীচু অংশে তাঁবু ফেললাম। আমরা দেখলাম আমাদের প্রবেশ অধিকার আদৌ আছে কিনা—এ প্রশ্ন নিয়েই স্বামীজীকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হল। নাগা সন্ন্যাসীরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বললেন, "এটা সত্য স্বামীজী, যে আপনার শক্তি আছে কিন্তু তা প্রকাশ করা উচিত নয়। স্বামীজী এই কথা মেনে নিলেন। সেই দিন বিকালে যাই হোক, তিনি তাঁর কন্যাকে, তাঁবুর চতুর্দিকে আশীর্বাদধন্যা হবার জন্য নিয়ে ঘুরলেন। অবশ্য আসল উদ্দেশ্য ছিল ভিক্ষা দেওয়ানো। আর তিনি ধনী বলে গণ্য হবার জন্যই হোক অথবা ক্ষমতাশালী হবার জন্যই হোক, পরেরদিন আমাদের তাঁবু একটি মনোরম ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁবুগুলির মাথার উপর রইল আমাদের তাঁবু।

সেখানে সামনেই আমরা দেখলাম বেগবতী লিডার নদী বিপরীত দিকে, পাইন গাছ ঢাকা পর্বতশ্রেণী, আর উঁচু কাটলের পারে একটি হিমবাহ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল। আমরা একাদশী পালনার্থে এই গ্রামে মেষপালকদের সঙ্গে রয়ে গেলাম। পরের দিন ভোরে যাত্রীরা রওনা হল।

৩০শে জুলাই

ভোর ছ'টায় আমরা প্রাতরাশ খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তীর্থযাত্রীরা কখন যাত্রা সুরু করেছে বলা সম্ভব হল না। কারণ এত ভোরে জলযোগের সময়ও দেখলাম খুব অল্প যাত্রী বা তাঁবু রয়ে গেছে। যেখানে গত রাত্রে হাজার লোকের তাঁবু পড়েছিল সেখানে শুধু নিভানো আগুনের ছাইটুকুই পড়ে আছে।

পরে যেখানে থামা হল সেই মধ্যবর্তী যাত্রাটা কি সুন্দরই না লেগেছিল। সেখানে

একটা গিরিসঙ্কটের ধারে আমাদের তাঁবু খাটানো হল। সেদিন বিকালে কেবলই বৃষ্টি পড়ছিল। স্বামীজী মাত্র পাঁচ মিনিট আমার সঙ্গে গল্প করতে এলেন। কিন্তু ভৃত্যবর্গ ও অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে আমি কত যে স্নেহমমতার স্পর্শ পেলাম। বৃষ্টিপাতের সময়ের মধ্যে আমি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা কাজে লাগাবার জন্য বেরিয়ে পড়ে সাত আট রকমের পাহাড়ী ফুলের প্রজাতি সংগ্রহ করলাম, তার মধ্যে দুটি আমার কাছে নতুন লাগল। তারপর আমি বৃষ্টি-ঝরা ফার গাছের ছায়ায় ফিরে এলাম।

যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব অন্যান্যগুলির তুলনায় বেশ কষ্টসাধ্য। মনে হচ্ছিল পথের যেন শেষ নেই। চন্দনবাড়ির কাছে এসে স্বামীজী জোর করে আমায় বললেন প্রথম হিমবাহের উপর পদব্রজে যাবার জন্য, আর প্রতিটি খুঁটিনাটি দেখানোর জন্য বিশেষ যত্ন নিলেন স্বামীজী। তারপর পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরে ঘুরে সরু পথের উপর দিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে একটি চড়াই-এ ওঠা হল। প্রথম পাহাড়টির চূড়ায় যেন ছোট ছোট সাদা ফুলে গালিচা বিছানো হয়ে আছে। তারপর পথ গেছে শেষনাগের পাঁচশত ফুট ওপর দিয়ে, অবশেষে বরফের চূড়ার মাঝখানে ১৮০০০ ফিট উঁচুতে একটা ঠাণ্ডা স্যাৎসেঁতে জায়গায় আমাদের তাঁবু পড়ল। অনেক নীচে ফার গাছ দেখা যাচ্ছে, আর সারা বিকাল এবং সন্ধ্যা কুলিরা চারদিক থেকে জুনিপার গাছ সংগ্রহ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। তহশীলদার, স্বামীজী ও আমার তাঁবুগুলি কাছাকাছিই ছিল, সন্ধ্যায় একটা বড় আগুন জ্বালা হল ঠিক সামনেটিতে। কিন্তু আগুনটা ভাল জ্বলল না, অনেক নীচে হিমবাহ দেখা যাচ্ছিল, স্বামীজীকে তাঁবু খাটানোর পর থেকে আর দেখতে পাইনি।

পঞ্চতরণী—পাঁচটি নদীর স্থান খুব দূরের পথ নয়। তাছাড়া শেষনাগ থেকে নীচুতে অবস্থিত, আর সেখানে ঠাণ্ডাটা শুক্‌নো ঠাণ্ডা এবং আরামপ্রদ। তাঁবুর ঠিক সামনেই একটা নদীর শুক্‌নো খাত দেখা যাচ্ছিল, কেবলই তাতে নুড়ি আর পাথর আর এরই মধ্যে পাঁচটি নদী প্রবাহিত। তীর্থযাত্রীদের কর্তব্য ছিল এই নদীগুলিতে স্নান করা, একটি থেকে অন্যটিতে ভিজা পোশাকেই যাওয়া। সকলের নজর বেশ এড়িয়ে স্বামীজী পুরোপুরি রীতিনীতি মেনে স্নান করলেন।

আহা ফুলগুলো যে কি সুন্দর ছিল! আগের রাত্রি না এই রাত্রি? বড় বড় নীল আর সাদা ফুল ছিল আমার তাঁবুতে, আমার বিছানার নীচে! আর এখানে, বিকালে কাছ থেকে একটা হিমবাহ দেখবার জন্য ঘুরতে বেরিয়ে আমি কত রকমের ফুল আর নতুন ধরনের চেশ ফুল দেখলাম (ফরগেট মি নট)। তার ছোট কোমল রুপোর মত পাতা, মখমলের মত পুষ্প। এখানে জুনিপার জাতীয় গাছও খুব কম। এই উচ্চতায় আমরা তুষারশৃঙ্গের মহাবেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের দেখতাম। এই মৌনী বিশাল পর্বতগুলিই হিন্দুমনে ভস্মলেপিত শিবের ধারণা জাগিয়ে তুলেছে।

২রা অগস্ট

মঙ্গলবার, ২রা অগস্ট, অমরনাথের পুণ্যদিনে, তীর্থযাত্রীদের প্রথম দলটি বোধ হয় রাত ছটায় বেরিয়ে পড়েছে। আমরা পূর্ণচাঁদের আলোয় বেরোলাম। যখন আমরা সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় নামছি তখন সূর্য উঠছে। যাত্রার এই অংশটি বিশেষ নিরাপদ নয়। যখন আমরা ডাণ্ডী থেকে নেমে চড়াইতে উঠতে লাগলাম আসল বিপদের সুরু হল। প্রায় খাড়া পাহাড়ের গায়ে একটি ছাগল যাবার মত পথ, অন্যদিকে উৎরাই-এর পথ হয়েছে, ঘাসের একটা ছোট্ট সিঁড়ির মত। ডেইজী ফুলের এক প্রজাতি বুনো গোলাপ দেখলেই তুলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তুলতে গেলে নয় হাত-পা কিংবা জীবন যাবে। তারপর কোন রকমে পরবর্তী উৎরাই-এর নীচে পৌছে, হিমবাহের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল কষ্ট করে হেঁটে চললাম গুহার উদ্দেশে। গুহা থেকে প্রায় একমাইল দূরে বরফ আর রইল না, আর সেই প্রবহমান ধারায় তীর্থযাত্রীদের স্নান করতে হয়। যখন আমরা ভাবছি পৌছে গেছি, তখনো পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা খাড়া চড়াই ভাঙা বাকি।

স্বামীজী ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমি, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মনে না করে, নীচে পাথর-বিছানো নদীতীরে তাঁর আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি অবশেষে এলেন, তিনি স্নান করতে যাচ্ছেন, এই কথা বলে আমাকে এগিয়ে যেতে বললেন। আধঘণ্টা পরে তিনি গুহায় প্রবেশ করলেন। মৃদু হেসে তিনি নতজানু হয়ে বসলেন, প্রথমে অর্ধচন্দ্রাকৃতির একদিকে, তারপর অন্যদিকে। জায়গাটি বিশাল, একটা বড় গীর্জা ধরে যায় সেখানে, আর গভীরতম ছায়ার কোণে, বিশাল তুষারশিব, মনে হল যেন নিজের ভিত্তির সিংহাসনে আসীন। কয়েক মিনিট কাটল, তারপর তিনি গুহা ছেড়ে বার হবার জন্য ফিরলেন।

তাঁর কাছে যেন স্বর্গের দ্বার খুলে গেল। তিনি শিবের পাদস্পর্শ করেছেন। পরে তিনি বলেছেন, 'পাছে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন' এইজন্য নিজেকে শক্ত করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর দৈহিক ক্লান্তি এত বেশি হয়েছিল যে একজন চিকিৎসক পরে বলেছিলেন, তাঁর হৃদ্‌স্পন্দ বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে চিরদিনের মত বর্ধিতায়ন হয়ে গেছে তার পরিবর্তে। তাঁর গুরুদেবের কথাগুলি কি আশ্চর্যভাবে প্রায় পূর্ণ হতে চলেছে যে, "যখন সে জানবে সে কে এবং কি, তখনই তার দেহ ত্যাগ করবে।"

আধঘণ্টা পরে, নদীর ধারে একটি পাথরের ওপর বসে, সেই দয়ালু নাগা সন্ন্যাসী ও আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারতে সারতে স্বামীজী বলে উঠলেন—"আমার যে কি ভালোই লেগেছে! আমার মনে হচ্ছিল তুষারলিঙ্গ যেন স্বয়ং মহাদেব। আর এখানে কোন অসাধু ব্রাহ্মণ, কোন ব্যবসা, অথবা কোন অন্যায় কিছু নেই। কেবলই পূজা আর পূজা! কোন ধর্মস্থান আমার এত ভাল লাগেনি!"

পরে তিনি আমাদের প্রায়ই সেই অভিভূতকর দর্শনের কথা বলতেন, সেই দর্শন যেন একেবারে তাঁকে শীর্ষবিন্দুতে টেনে নিয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিল।

তিনি শ্বেত তুষারস্তম্ভটির (অমরনাথ) কবিত্ব বর্ণনা করতেন। তিনি বলেছিলেন, এই স্থানটির প্রথম আবিষ্কারক একদল মেষপালক। তারা গ্রীষ্মকালে একদিন ভেড়াগুলির খোঁজ করতে করতে এত দূরে চলে এসেছিল; গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে তারা অদ্রব তুষাররূপী স্বয়ং ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন যে অমরনাথ তাঁকে বর দিয়েছেন যে তিনি স্বয়ং ইচ্ছা না করলে তাঁর মৃত্যু হবে না (অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়েছেন)। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তুমি এখন বুঝবে না কিন্তু তুমি তীর্থযাত্রা শেষ করেছ, এবং এখন এর ফল দেখা দেবে। কারণ থাকলেই কার্য হয়। তুমি পরে ভালো করে বুঝতে পারবে। ফল ফলবেই।"

যে পথটি ধরে আমরা পরের দিন সকালে পহলগাম যাত্রা করলাম সেই পথটি বড় সুন্দর ছিল। সেই রাত্রে, তাঁবুতে ফিরেই আমরা তাঁবু তুলিয়ে পরে বেশ দূরে একটা তুষারময় গিরিপথে তাঁবু খাটালাম। আমরা একজন কুলিকে কয়েক আনা পয়সা দিয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠালাম। কিন্তু পরের দিন বিকালে যখন আমরা সত্যিই ফিরে এলাম, দেখলাম এর কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সারা সকাল ধরে তীর্থযাত্রীদের দীর্ঘ সারি পহলগামে আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে চলেছে আর বন্ধুর মত আমাদের খবর দিয়ে এবং আমাদের আসন্ন প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিয়ে চলে গেছে। সকালে, সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই আমরা উঠে পড়েছিলাম। যখন আমাদের সামনে সূর্য উঠল, পিছনে চন্দ্র অস্ত গেল, আমরা 'মৃত্যু-হ্রদ'-এর উপর দিয়ে এলাম, এই হ্রদে একবছর চল্লিশজন তীর্থযাত্রী তাদেরই স্তোত্রপাঠের কারণে স্থানচ্যুত একটি তুষারপ্রবাহে নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে গিয়েছিল। যখন আমরা খাড়া পাহাড়ের নীচে সরু পথের কাছে এসে দাঁড়ালাম, সেই পথ দিয়েই আমাদের ফেরবার যাত্রা সংক্ষিপ্ততর করা যাবে। সেখানে সকলেই ঠেলাঠেলি করে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করছে। নীচে গ্রামবাসীরা প্রাতরাশের মত কিছু প্রস্তুত করে রেখেছিল। আগুন জ্বলছিল, চাপাটি সেঁকা হচ্ছিল, চা দেবার জন্য তৈরি। এইখান থেকে তীর্থযাত্রীরা বড় দল থেকে—যেখানে যেখানে পথ আলাদা হয়ে গেছে, সেইখানে মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের যাত্রাপথে যে একত্রীকরণের ভাবটা জেগেছিল ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল।

সেইদিন সন্ধ্যায়, পহলগামে সেই ক্ষুদ্র পাহাড়টির ওপরে পাইন কাঠের গুঁড়ির একটা বড় আগুন জ্বালানো হল, আসন বিছিয়ে আমরা বসে গল্প করতে লাগলাম। আমাদের বন্ধু নাগা সন্ন্যাসী আমাদের গল্পে যোগ দিলেন, আমাদের নানান রকম মজার মজার মাথামুণ্ডুহীন গল্প হল। কিন্তু যখন আমাদের ছোট দলটি ছাড়া সকলে চলে গেল, আমরা বসে রইলাম। তখন মাথার উপর চাঁদ, সুউচ্চ তুষাররাজি, বেগবতী নদী, আর রইল পাহাড়ী পাইন বৃক্ষ। স্বামীজী শিব, অমরনাথ গুহা এবং দর্শনের বিশাল পরিধি সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন।

৮ই অগস্ট

পরের দিন আমরা ইসলামাবাদ রওনা হলাম। সোমবার সকালে, যখন প্রাতরাশ খাচ্ছিলাম, আমরা নিরাপদে শ্রীনগরে এসে নোঙর করলাম।

একাদশ অধ্যায়

প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীনগরে

সঙ্গীগণ : স্বামী বিবেকানন্দ, ধীরামাতা, জয়া এবং নিবেদিতা।

স্থান : কাশ্মীর—শ্রীনগর

কাল : ৯ই-১৩ই অগস্ট, ১৮৯৮

৯ই অগস্ট

এই সময় গুরুদেব সর্বদাই আমাদের ছেড়ে অন্যত্র যাবার কথা বলতেন, যখন আমি লেখাটি দেখি যে 'প্রবহমান নদীই নির্মল, এবং ভ্রাম্যমাণ সাধুই পবিত্র,' আমি বুঝতে পারলাম এর প্রকৃত অর্থ কি। 'আমি সর্বদা ভাল থাকি যখন আমায় কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, আর আমাকে রুটি ভিক্ষা করতে হয়'—এই আকুল কাতরোক্তির অর্থ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ মানুষের স্পর্শ, আর পদব্রজে দেশটা দীর্ঘ চক্রাকারে ঘুরে এসে আবার বারমূলায় এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাড়ি ফেরা।

তাঁর নৌচালকগণের পরিবারটি, যাদের সঙ্গে তিনি দুটি বছর এসে প্রগাঢ়ভাবে বন্ধুত্ব স্বীকার করেছিলেন, আজ বিদায় নিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। পরে তিনি তাঁর সঙ্গে এই নৌচালকদের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলতেন, দয়া ও ধৈর্য কতদূর যেতে পারে, এটি তারই প্রমাণ।

১০ই অগস্ট

সন্ধ্যায় আমরা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে স্বামীজী তাঁর শিষ্যা নিবেদিতাকে ডেকে নিলেন তাঁর সঙ্গে মাঠে বেড়াবার জন্য। তাঁর কথা-বার্তা সবই হল নিবেদিতার কাজ এবং তাঁর অভিপ্রায় কি সেই সম্বন্ধে। তিনি দেশ এবং ধর্মীয় চেতনার একত্রীকরণের কথা বললেন।

নিজের বিশেষত একমাত্র ইচ্ছা যে হিন্দুধর্ম সক্রিয়, অগ্রগামী ও প্রচারভিত্তিক বিশ্বাসে পরিণত হোক ; 'অস্পৃশ্যতা' সম্বন্ধেও বললেন, এই হল একমাত্র বস্তু যা তিনি বর্জন করেছিলেন। তারপর তিনি যারা অতি রক্ষণশীল ছিলেন তাদের বিশাল আধ্যাত্মিকতার কথা গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন। ভারত চেয়েছিল কার্য উপযোগিতা। কিন্তু তাই বলে ভারত যেন তার প্রাচীন ধ্যানগম্ভীর জীবনের রূপ বিসর্জন না দেয়। 'সাগরের মত গভীর ও আকাশের মত উদার হও'—রামকৃষ্ণদেব যা বলতেন—তাই ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু রক্ষণশীলতার আবরণে রক্ষিত আত্মার গভীর অন্তর্জীবন, আকস্মিকতার ফল, প্রকৃত সত্যের আভাস তাতে নেই। "আর আমরা যদি নিজেদের ঠিক রাখি তাহলে জগৎও ঠিক থাকবে, কারণ আমরা কি সবাই এক নই?" রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর জীবনের গভীরতার সম্বন্ধে সজাগ ও সজীব ছিলেন, কিন্তু তবুও বাহ্যজগতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় ও সক্ষম।"

তারপর তার গুরুদেবের পূজা সম্বন্ধে সেই জটিল প্রশ্নটি এল। আমার জীবন প্রবল উৎসাহ, সেই মহাব্যক্তিত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, কিন্তু অন্যরা নিজেরাই বুঝবে, তাদের সম্বন্ধে এ কথা কতটা সত্য। অনুপ্রেরণা একজন মানুষের ভিতর দিয়েই পরিস্রুত হয়ে বেরোয় না।

১১ই অগস্ট

দলের একজন আজ হাত দেখছিলেন বলে স্বামীজীর কাছে তিরস্কৃত হলেন। এটা এমন জিনিস সবাই পছন্দ করে—কিন্তু সারা ভারত অবজ্ঞা করে ও ঘৃণা করে। একটু বিশেষ অনুরোধের উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি চরিত্রগঠন পর্যন্ত পছন্দ করেন না। সত্যি কথা বলতে গিয়ে যদি তোমাদের অবতার ও তাঁর শিষ্যগণ অলৌকিক কার্যকলাপ না দেখাতেন তাহলে আমি তাদের বেশি সৎ ভাবতাম। বুদ্ধ এমন করার জন্য সন্ন্যাসীকে বিতাড়িত করেন। পরে, এই বিষয়ে, (এখন তিনি এরই ওপর বেশি মনোযোগ দিয়েছেন) কথাপ্রসঙ্গে তিনি সভয়ে বললেন, এই সামান্যতম অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন ও কত ঘোর বিপদ ডেকে আনে।

১২ই ও ১৩ই অগস্ট

স্বামীজী এখন একজন ব্রাহ্মণ পাচক রেখেছেন। স্বামীজীর একজন মুসলমান পাচক দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করানোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অমরনাথের সাধুদের যুক্তি খুবই মর্মস্পর্শী হয়েছিল। "স্বামীজী, শিখেদের অন্তত এটা করবেন না", তারা বলেছিলেন, স্বামীজী অবশেষে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর নৌকায় ছোট মুসলমান বালিকাটিকে উমারূপে পূজা করছেন। ভালোবাসার কথা বলতে সে সেবাই বুঝতো, তাই যেদিন স্বামীজী কাশ্মীর ছেড়ে চলে গেলেন, ছোট্ট মেয়েটি সানন্দে একটি থালা-ভর্তি আপেল নিজেই তাঁর টাঙা অবধি বহন করে নিয়ে এল। স্বামীজী তাকে কখনো ভোলেন নি, যদিও সে সময় তাঁকে বেশ উদাসীন দেখাচ্ছিল। কাশ্মীরে থাকাকালীন স্বামীজী সেদিনের কথা বলে আনন্দ পেতেন, যেদিন তিনি দেখেছিলেন মেয়েটি নৌকোর গুণ টানবার পথে একটি নীল ফুল দেখে, তার সামনে বসে পড়ে, ফুলটিকে এদিক-ওদিকে হেলিয়ে দিয়ে একা-একাই প্রায় কুড়ি মিনিট সময় কাটিয়েছিল।

নদীর ধারে একটি জমির উপর তিনটি চিনার গাছ জন্মেছিল, তাদের প্রতি আমাদের চিন্তাধারা একটি অদ্ভুত ভালোবাসার রূপ নিয়েছিল। কারণ মহারাজা এই জমিটি স্বামীজীকে দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, আর আমরা ভবিষ্যতে আমাদের কর্মকেন্দ্র হবে মনে মনে এই ছবি আঁকতাম ; কাজ যা হবে—"লোকের দ্বারা, লোকের জন্য, কর্মী এবং সেবিত হবে যে উভয়ের কাছেই তা হবে আনন্দদায়ক।"

এই ভারতীয় ধারণা যে, বাস্তুভূমি স্ত্রীলোকদের দ্বারাই কল্যাণকর ও আশীর্বাদধন্য হয়, তারই বশবর্তী হয়ে স্থির হল যে আমরা যাব এবং এই স্থানটি কিছুদিনের জন্য তাঁবু ফেলে সংলগ্ন করে নেব। আমাদের দলের একজনের তখন বিশেষ শান্তির প্রয়োজন ছিল। মহারাজা জমিটি নিয়ে স্বামীজীকে অর্পণ করবার আগেই স্থির হল যে আমরা একটি 'স্ত্রীমঠ' স্থাপন করব এখানে। এটা সম্ভব হল এই কারণে যে স্থানটি এর আগেই ইউরোপীয়দের তাঁবু ফেলার জন্য ছোট স্থানগুলির অন্যতম ছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

চিনার বৃক্ষতলের তাঁবু জীবন

সঙ্গীগণ : স্বামী বিবেকানন্দ, ধীরামাতা, জয়া এবং নিবেদিতা।
স্থান : কাশ্মীর—শ্রীনগর
কাল : ১৪-২০শে অগস্ট।

১৪ই অগস্ট

সেদিন হল রবিবারের সকাল, বেদান্ত বিষয়ে আগ্রহী এক ইউরোপীয় অতিথির সঙ্গে দেখা করবার জন্য, স্বামীজীর আমাদের সঙ্গে চা পান করবার কথা ছিল। এই বিষয়ে তিনি বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। আমার মনে হয় তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এই রকম প্রচেষ্টার চরম নিষ্ফলতার কথা অতি-আগ্রহী শিষ্যদের ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া। তিনি প্রশ্নকারীকে বোঝাবার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করলেন আর তার সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হল। তার অন্যান্য কথার মধ্যে একটি কথা আমার মনে আছে, তিনি বলেছিলেন। "আমি চাই বিধিনিয়ম ভাঙা হোক, যদি সত্যিই ভাঙতে পারি তো আমরা মুক্তি পাই। তোমরা যাকে নিয়ম ভাঙা বল সে তো নিয়ম পালনেরই অন্যদিক মাত্র!" তারপর তিনি তৃতীয় অবস্থার কথা সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু যে কোন কথা শোনে না সেই কানেই কথাগুলো পড়ল।

১৬ই অগস্ট

মঙ্গলবার মধ্যাহ্নভোজে তিনি আর একবার আমাদের ছোট্ট তাঁবুটিতে এলেন। শেষের দিকে এত প্রবল বর্ষণ সুরু হল যে তিনি ফিরে যেতে পারলেন না। টডের 'রাজস্থানের ইতিহাস' বইটি কাছেই পড়েছিল, তিনি সেটি তুলে নিলেন আর মীরাবাই সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন। "বর্তমান বাংলার জাতীয়তাবোধের ধারণাসমূহের দুই-তৃতীয়াংশই এই বই থেকে গৃহীত" একথা তিনি জানলেন। কিন্তু মীরাবাই-এর গল্প, তিনি রানী হয়েও রানী হয়ে থাকতে চাননি, কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোলেন—সর্বদাই স্বামীজীর প্রিয় গল্প ছিল। এমনকি টডের গল্পগুলির মধ্যে মীরাবাই কেমন করে আনুগত্য, প্রার্থনা, নিষ্ঠা আর সেবার কথা প্রচার করেছিলেন—এবং এই শিক্ষা যে চৈতন্যের সর্বজীবে দয়া আর ভগবৎ নামে প্রেম বিতরণের বিপরীত—একথাও তিনি বললেন। তিনি মীরাবাই-এর গল্প বিভিন্ন সূত্রে গেঁথেছেন, অন্য সূত্রেও যে গল্পটি প্রচলিত, যেমন দুই মহাদুর্বৃত্তের কথোপকথন, এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বিদীর্ণ হয়ে মীরাবাইকে সেই মূর্তিতে লীন করে নিলেন—এইসব গল্প। আমি একদা স্বামীজীকে একজন স্ত্রীলোকের কাছে মীরাবাই-এর গান আবৃত্তি ও অনুবাদ করতে শুনেছিলাম।

আমার যদি সম্পূর্ণ গানটি মনে থাকত! স্বামীজীর অনুবাদে গানটির শুরু এই রকম: 'ধরে থাক, ধরে থাক, ধরে থাক ভাই' আর শেষ হল 'যদি অন্ধ

বঙ্কা দুই ডাকাত ভাই, হীন কসাই সুজন, আর পতিতা রমণী খেলাচ্ছলে তোতা পাখিকে কৃষ্ণ নাম বলতে শিখিয়ে উদ্ধার পায় তাহলে সকলেরই আশা আছে।' আবার মনে পড়ে তাঁকে আমরা মীরাবাই-এর অপূর্ব গল্প বলতে শুনেছিলাম। বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে তিনি যেতে অস্বীকার করলেন এই বলে যে বৃন্দাবনে স্ত্রীলোকের পুরুষের মুখ দেখা উচিত নয়। তারপর তিনবার এই ঘটনা ঘটার পর মীরাবাই স্বয়ং তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, বৃন্দাবনে কি অন্য পুরুষ আছে, তার ধারণা ছিল কেবল শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। আর যখন তিনি বিস্মিত সাধুকে দেখলেন, তিনি সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠন খুলে বললেন, "মূর্খ, তুমি নিজেকে এখানে পুরুষ ভাব ?" তখন সাধু শ্রদ্ধায় বিচলিত হয়ে মীরাবাই-এর পদতলে লুটিয়ে পড়লেন, মীরা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, যেমন মাতা আশীর্বাদ জানায় তার সন্তানকে।

আজ স্বামীজী আকবরের কথায় চলে গেলেন, সম্রাটের সভাকবি তানসেনের একটি গানও তিনি গাইলেন—

"সিংহাসনে বসে আছ, নরেশ্বর
তুমি দিল্লীর সম্রাট
যে মুহূর্তে তুমি সিংহাসনে আরোহণ করেছ,
ধন্য সেই দণ্ড, মুহূর্ত আর পল,
হে লোকেশ্বর,
তুমি দিল্লীর প্রভু—
তোমার রাজমুকুট, রাজদণ্ড, রাজসিংহাসন বজায় থাকুক,
হে লোকেশ্বর,
তুমি দিল্লীর সম্রাট ;
হে হুমায়ুনপুত্র,
সূর্যের আনন্দ, লোকেশ্বর,
তুমি দিল্লীর সম্রাট।"

তারপর আমাদের আলোচনা জাতীয়বীর প্রতাপসিংহ, যাকে কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করানো যায়নি, তার উপর চলে গেল। একদিন যখন তিনি চিতোর থেকে পলায়ন করে ঘুরছিলেন, আর রানী সন্ধ্যায় খাবার জন্য, স্বহস্তে সামান্য খাদ্য প্রস্তুত করছিলেন একটা ক্ষুধার্ত বিড়াল শিশুদের ভাগের রুটির টুকরোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেবারপতি শুনলেন খাদ্যের জন্য তাঁর শিশুসন্তানদের কান্না। তখনই, প্রকৃত লক্ষে, তার বীর হৃদয় বিচলিত হল। স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তির সম্ভাবনা তাকে প্রলুব্ধ করল। একমুহূর্তের জন্য তিনি অসম সংঘর্ষ থেকে বিরত হবার এবং আকবরের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠাবার কথা চিন্তা করলেন, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। ভগবানের ইচ্ছাই ভগবৎশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এই ছবিটি তার মন থেকে মুছে যাবার আগেই সেখানে একজন দূত বিখ্যাত রাজপুতের পত্র নিয়ে এল। পত্রে লেখা ছিল—"আমাদের মধ্যে মাত্র একজনই আছেন যাঁর রক্ত বিদেশীর বিমিশ্রণ থেকে মুক্ত। তার মস্তক যেন ধূলায় লুণ্ঠিত না হয়, এই

কামনা করি।" প্রতাপের অন্তরাত্মা শৌর্যের দীর্ঘশ্বাস বায়ু গ্রহণ করে, নববিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠে দাঁড়ান, তিনি দেশ থেকে শত্রু বিতাড়িত করে উদয়পুরে ফিরে যাবার পথ করে নিলেন।

এছাড়া স্বামীজী কুমারী রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর সুন্দর গল্পটি বললেন: একই সঙ্গে বহু রাজা তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। যখন তিনটি সৈন্যদল দ্বারে উপস্থিত তার পিতা তাঁকে বিষপ্রয়োগ করা ছাড়া আর গত্যন্তর দেখলেন না। তার খুল্লতাতকে এই ভার দেওয়া হল। কুমারী যখন তার কক্ষে নিদ্রিত ছিলেন তিনি বিষপ্রয়োগ করতে গেলেন। কিন্তু কন্যার অনুপম রূপলাবণ্য দেখে আর তার শৈশবস্মৃতি মনে করে বীর হৃদয় কাতর হয়ে পড়ল, তিনি কার্যটি সম্পন্ন করতে পারলেন না। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী শব্দ শুনে জেগে উঠলেন এবং পরিকল্পনার কথা যখন শুনলেন, তখন হস্ত প্রসারণ করে, মৃদু হেসে বিষপাত্র তুলে নিলেন। এইসব কত গল্প, কারণ রাজপুতবীরদের এইরকম গল্পের সীমা নেই।

২০ অগস্ট

শনিবার, স্বামীজী আর যার নাম স্ব‍ও কয়েকদিনের জন্য আমেরিকান কন্সাল ও তাঁর স্ত্রীর অতিথি হবার জন্য ডাল হ্রদে গেলেন, তারা সোমবার ফিরে এলেন, আর মঙ্গলবার স্বামীজী নতুন মঠে (চিনার গাছের তলার তাঁবুগুলিকে তাই আমরা বলি) ফিরে এলেন। তিনি তাঁর নৌকাটি আমাদের নৌকার কাছে আনিয়ে নিলেন, যাতে গাণ্ডেরবল যাবার আগে কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।

পরিশিষ্ট

[স্বামীজীর সঙ্গে কয়েকটি ভ্রমণকাহিনীর স্মৃতিচিত্রণ পাণ্ডুলিপির অপ্রকাশিত অংশ]

সেই দিনগুলি ছিল বড়ই মহান্, "প্রবুদ্ধ ভারতের" প্রথম সংখ্যা তখন সবেমাত্র পৌঁছেছে আর সম্পাদককে সাহায্য করার জন্যে নিবেদিতাকে আলমোড়া পাঠানোর কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। স্বামীজী ভাবলেন তা করা হলে অন্তত আলমোড়া যাবার পথে নিবেদিতা ভারতের কতকগুলি বড় শহর দেখতে পাবেন। তারপর তিনি কথা বলতে লাগলেন—কি অপূর্বভাবে বললেন। বুধবার দিন তিনি আমাদের জন্য অনুবাদ করলেন—"বৈরাগ্য সম্বন্ধে একশত পদ"। বৃহস্পতিবার তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বললেন। এর আগে তাঁর মুখ থেকে এত কথা আমরা কখনও শুনিনি।

কাশ্মীর থাকার কথা স্মৃতিচারণ করলে আমার মনে হয় একটিমাত্র মূল্যবান ঘটনা ছাড়া এই দুটি দিনই সব থেকে পবিত্রতম সময়। সময়ের আশ্চর্য দৃশ্যানুযায়ী ছবি আঁকার প্রভাবের কথা এসে যায়—কারণ আমার মনে হয় যদি জয়া ও নিবেদিতা সেই বৃহস্পতিবার রাত্রে তাঁদের তাঁবুতে বসে নিজেদের লেখা মিলিয়ে নিতেন—তাহলে স্বপ্ন দেখতেন যে গ্রীষ্মকালে তাদের তিনটি দিন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একবিষয়ে একজন ঐ রকম ঘটনায় এমন জগতে চলে গেছে যেখানে সময় বলতে কিছু নেই এবং সবকিছুই সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তারপর হায়, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস থেকে বছর এই স্মৃতি উত্তোলিত হয় যাতে চির আলোকের রেখায় সেগুলি ঝলমলিয়ে উঠে। আমরা দুঃখের সঙ্গে এই পৃথিবী ও সাধারণ জীবনের মলিন রঙের সঙ্গে তাদের অপরিহার্য প্রভেদটা বুঝতে পারতাম।

স্বামীজী আমাদের বিল্বমঙ্গলের গল্প বলছিলেন, বিল্বমঙ্গল তরুণ বয়সে চিন্তামণি নামে এক অসতী রমণীর প্রেমে পড়েছিল। এই রমণীর প্রতি বিল্বমঙ্গলের আকর্ষণ এত তীব্র ছিল যে, তার বাবা মারা গেলে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার প্রয়োজন, তখনও বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে ছেড়ে যেতে বিলম্ব করছিল।

অনেক রাত্রে যখন বিল্বমঙ্গল ফিরল, দেখল নদীতে তখন বান ডেকেছে, নদীর জল বেড়ে গেছে, নদী পার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একটা কাঠের গুঁড়ি দেখতে পেয়ে, সেটা আঁকড়ে ধরে কোন রকমে নদীর অন্য পারে পৌঁছাতে পারল। সেখানে দেখল কাঠের গুঁড়িটা আসলে একটা মৃতদেহ! বিল্বমঙ্গল ছুটে চলল। চিন্তার বাড়ির দরজা বন্ধ, চারদিক অন্ধকার, সে ঢুকতে পারল না। তবু বারান্দা থেকে একটা দড়ি ঝুলতে দেখে—কোন রকমে বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে, সেই দড়িটা সে দেখল একটা সাপ ছাড়া কিছুই নয়।

তার প্রেমিকার সামনে রুদ্ধশ্বাসে সে এসে দাঁড়াল, আর চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের একনিষ্ঠ ভালবাসা দেখে ব্যথিত চিত্তে বিস্মিত হয়ে বলল—"যদি তুমি ভগবানকে এত ভালোবাসার একশো ভাগের একভাগও দিতে, মুক্তি পেতে।"

চিন্তার মুখের এই কথা বিল্বমঙ্গলের প্রাণে গিয়ে বাজল—'ভগবানকে ভালোবাস! এই ভালবাসা দাও ভগবানকে।' সে বার বছরের জন্য বনে পালিয়ে গেল, আর সেখানে কৃষ্ণধ্যান করতে লাগল। এই রমণী ইতিমধ্যে এক ধনী বণিককে বিবাহ করল।

কিন্তু বার বছর পরে, এই ঋষি তখন একটি স্নানের ঘাটের পাশ দিয়ে যাবার সময়, দৈবক্রমে চোখ তুলে তাকাল, কারণ সে জানত সেখানে এক সুন্দরী রমণী আছে, সে বণিকের বনিতা। তখন সেই ঋষি তিনদিন উপবাস করে রইল। উপবাসান্তে বণিকের কাছে প্রার্থনা জানাল বণিকপত্নীকে তাকে দেখতে দেবার জন্য। সেই রমণী হল চিন্তামণি। বিল্বমঙ্গল চিন্তার দুটি চুলের কাঁটা চেয়ে নিয়ে নিজের দুটি চোখ উৎপাটিত করে বনে চলে গেল। সেখানে সে মধুর মধুর রূপে কৃষ্ণকে দেখতে পেল। এই হল অন্ধ ঋষি বিল্বমঙ্গলের গল্প।

এই প্রসঙ্গ থেকে আমাদের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই আশ্রমজীবন এবং ভারতীয় জীবনের ভিত্তি দারিদ্র্য এবং সরলতার আদর্শের প্রসঙ্গে চলে গেল। তিনি আবেগভরে বললেন "দরিদ্র্যকে দৈবীকরণের জন্য সন্ন্যাসীর বিশেষ প্রয়োজন।" এই বলে তিনি আবৃত্তি করলেন—"কেউ বলে, ইনি বড় সাধু, কেউ বলে তুমি জান না? এ স্বয়ং শয়তান। কেউ বলে চণ্ডাল, কেউ বলেন ইনি ব্রাহ্মণ —হে শিব তোমার মত কবে আমি হতে পারব?" তারপর শিবের স্তোত্রের ভিতর দিয়ে খ্রীষ্টজন্মের ৫৭ বৎসর পূর্বে, যিনি ভ্রাতার জন্য রাজসিংহাসন ছেড়েছিলেন, সেই প্রাক্তন রাজা ভর্তৃহরি কর্তৃক লিখিত "ত্যাগ সম্বন্ধে একশত পদের" মধ্য দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়া অতি সোজা—

"আমি অনেক দেশ ঘুরেছি—বহুকষ্ট করি,
কিন্তু পাইনি তো কোন ফল,
উচ্চকুল ও পদপ্রতিষ্ঠার গর্ব ছেড়ে
আমি এখন সর্বজীবে সেবা করি।"

তারপর ব্রহ্ম সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা এবং অধিকতর বোধগম্য করবার দীর্ঘ প্রচেষ্টা।

"তাহলে স্বামীজী, আপনি বলেন" একজন বলেছিল, "ঈশ্বর যাই হোন না কেন—তিনি ব্যক্তিত্বের ধারক?" স্বামীজী ইতস্তত করতে লাগলেন, জয়া বলে উঠলেন—"ঈশ্বর যাই হোন না কেন তিনি ব্যক্তিত্বসমূহের ধারক"। একথা তক্ষুনি প্রামাণিক সূত্র হিসাবে গৃহীত হল।

গুরুদেব বললেন—"দেখ তিনটি স্তর আছে: ব্যক্তিগত দেবগণ, একজন ব্যক্তিগত দেবতা এবং স্বয়ম্ভূ, এদের তিনজনের মধ্যে ব্যক্তিগত দেবতা হলেন দুর্বলতম। ঈশ্বর হলেন ব্যক্তিগতের মধ্যে—ঈশ্বর হলেন পরমপিতা। উদাহরণ স্বরূপ ব্রহ্ম আছেন পরমপিতার পিছনে। আমরা সেখানে উপস্থিত হই। আর বেদ হয়ে দাঁড়ায় নির্বেদ, পুরুষ হয়ে যায় অ-পুরুষ, নারী অনারী, ঈশ্বর নিরীশ্বর। দেখ, জগতে আর কোন ধর্মগ্রন্থ আছে কিনা, যা নিজের কথা বলবে—সব শাখাগুলি নিয়েই বেদ হল গৌণ; সেটাই হল শ্রেষ্ঠ যার মধ্য দিয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়।

কৃষ্ণকেও বলতে শোনা গেছে মানুষ যখন ব্রহ্মত্বে উপনীত হয় সে আবার মাথায় দাঁড়ায়। আর দেখ এই কথার কি যৌক্তিকতা। যতক্ষণ তোমার মতে দুই দুই ভাব আছে, তুমি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যায় পৌঁছাতে পারবে না। তোমরা দেখ, অজ্ঞানতা সবসময়ই কারণের বাইরে কর্মফল, আর বিজ্ঞান দেখে কর্মফলের মধ্যে কারণকে। সুতরাং দ্বৈতবাদ হল অজ্ঞানতা আর অদ্বৈতবাদ হল বিজ্ঞান।" তারপর ত্যাগের মহা বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বহু মন্তব্য করলেন।

"যারা মূর্খ তাদের গর্বিত বাক্যগুলি নতুন সম্পদের মদিরা পানে এলোমেলো হয়ে যায়"...সিসৃমৃথ্ থনের প্রবীন অরণ্য রক্ষক, যিনি যেসব মানুষ তাঁকে পদাঘাত করেছে তাদের সম্বন্ধে বিভীষিকা প্রকাশ করতে এসে এই কথাগুলি আবৃত্তি করেছিলেন। সময় সম্বন্ধে ধারণা ভারতীয় লোকেরা কতটুকু মূল্য দেয়, যখন দেখি চাষাভুষো মানুষও একে অপরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"এরা কে, গতকাল তারা ছিল না, আগামীকাল এইখানে কেউ থাকবে না, তাই ধৈর্য ধর ভাই।" সবথেকে লোকপ্রিয় হল বহুকথিত ছত্রগুলি—"সবকিছুই ভয়পীড়িত, শুধু বৈরাগ্যই ভয়রহিত।"

পরের দিন সকালে বোধহয় দশটার সময় কথাপ্রসঙ্গে গুরুদেবের মনে একটা নূতন চিন্তার উদয় হল, তাই তিনি মৃদু হেসে গাছের তলায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন—"রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন"—আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা বসে থেকে যেন দক্ষিণেশ্বরের জগতে ফিরে গেলাম।

স্বামীজী বলতে লাগলেন কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণ মানবচরিত্র বুঝতে কখনো ভুল করতেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, "সময়ে সময়ে মানুষকে আমার মনে হয় কাচ দিয়ে তৈরি আর আমি তার ভিতরটা খুব ভাল করে দেখতে পাই।" তিনি একজনের কথা বলতেন, ঐ ব্যক্তি গভীর রাত্রে তাঁর কাছে মাতাল হয়ে এসেছিল, এক বোতল ব্রাণ্ডি কোটের পকেটে নিয়ে, অন্য বোতলটি বাইরে গাড়িতে রেখে এসেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা ছেড়ে উঠে বসে শান্তভাবে বললেন—"অন্য বোতলটাও নিয়ে আয়।" দুটি বোতলই যখন আনা হল, তিনি যে লোকটি তাঁকে গালি দিতে এসেছিল তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধরে নেচে গেয়ে অস্থির হলেন। তারপর ভাবলেন সেই তরুণটির কথা—যাকে তিনি স্পর্শ করেছিলেন এবং সেই মুহূর্ত থেকে আমৃত্যু দশ বছর পরে সুখে-দুঃখে সুস্থতায় সব সময় বলতেন "আমার প্রিয়, আমার প্রিয়," আর সেই মানুষ যাকে প্রভুর কিছুই করার ছিল না। তবু তার সব কথাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হত, এ যে তার হয়ে তিনি কথাও বলতেন। কিন্তু শেষে দেখা গেল তাঁর জীবনটাই বৃথা—এক পাপাচার ও অসম্মানের জীবন।

স্বামীজী দারিদ্র্যপীড়িত বালকটির কথাও বললেন, যে বার বার এসে তাঁর গুরুর পদতলে বসে থাকত। অবশেষে তিনি তাঁকে স্নেহভাবে বললেন—"যা, যা, আগে পয়সাকড়ি কর—তারপর আমার কাছে আসবি।" আর আজ সেই বালক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, এবং তাঁদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

"তবেই দেখ," স্বামীজী বলে চললেন—"আমার হল কুকুরের মত প্রভুভক্তি, আমি সানন্দে গুরুর কথা শুনে তাই অন্ধভাবে মেনে চলি।"

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেমন খাদ্যে: খাদ্যবিচার মেনে চলতেন, আর প্রীতি লোকের হাত থেকেই খাদ্য গ্রহণ করতেন, সে কথা বললেন। তবু, যে জিনিস তিনি নিজে খেতেন না, অন্য কাউকে খেতেও দিতেন না, শুধুমাত্র তাঁর প্রিয় শিষ্যকেই খেতে দিতেন, তিনি বলতেন,—"আমি সর্বভুক অগ্নি"।

অনেকদিন পরে স্বামীজী এক অসুখী মহিলার কথা বলেছিলেন; মহিলাটি বাগানের মধ্যে একটি বিশাল অট্টালিকায় থাকতেন; মহিলাটির ভৃত্য স্বামীজীর জন্যে মিষ্টান্নাদি এনেছিল। যখন স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এইসব মিষ্টান্ন এল, একজন শিষ্য মহিলাটির নাম বলল। "আশ্চর্য, আমি এইগুলোর কাছে পা রাখছি, দেখ তবু এগুলো পুড়ে ছাই হল না।" প্রকৃতপক্ষে যেখানে মিষ্টান্ন রক্ষিত ছিল, যেন অপবিত্র বোধ হচ্ছিল, সেখানটা পা দিয়ে ছুঁতেও তাঁর ইচ্ছা করছিল না, মিষ্টান্নগুলো দেখে তিনি ক্ষণে ক্ষণে জ্বলছিলেন। তিনি গোল্লাগুলো খেলেন। দেখলেন যে একজন ভক্ত শিষ্য কলকাতা থেকে ব্যস্ত হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে এসেছেন, এবং প্রথম যে ভৃত্যকে দেখলেন তাকে দিয়ে মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিলেন এবং ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রথম কোন মানুষ যখন তাঁর কাছে আসত তার সবদিক থেকেই তাকে বিচার করার অভ্যাস ছিল স্বামীজীর, শুধু শরীর দিয়েই নয়, তার গত-জন্ম বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জন্মও যেন বই-এর পাতা উল্টোনোর মত দেখে নিতেন। স্বামীজী বলতেন, "যখন আমি পাশ্চাত্যে গেলাম, সবাই কেবল 'চেতনা—চৈতন্য' নিয়েই বকে যাচ্ছে। কিন্তু অবচেতনা ছাড়া চেতনার কোন মূল্যই আমার কাছে নেই, কারণ আমার মনে আছে গুরুদেব কেমন নবাগতকে সম্মোহিত করে দশ মিনিটেই তার সবকিছু জানতে পারতেন।

মূর্তিপূজার প্রয়োজনের সপক্ষেও তাঁর জোরাল যুক্তি ছিল। যখন 'ব' তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ছিল, আমি তার গুরুলক্ষ ধারণাকে নিয়ে ঠাট্টা করলাম, আমি মূর্তিপূজা নিয়ে তাকে লজ্জায় ফেলতাম আর বলতাম, অদ্বৈতবাদই সত্য। তোমরা জান, আমি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েছিলাম আর সর্বপ্রকার মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলাম।"

তারপর গোপালের মার কথা, তিনি যেমন তাঁর মূর্তি ও দর্শনের গল্প বলতেন—সেই কথাই স্বামীজী আমাদের বলতেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁকে যেমন "সেই তরুণ যুবকের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যিনি ইংরাজী শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং একটি ডিগ্রীও পেয়েছিলেন। তরুণটি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তুমি তার বিবেচনার উপর নির্ভর করতে পার।" গোপালের মা অশ্রুপূর্ণ নয়নে এসে প্রশ্ন করলেন—"মশাই, বলতো আমি যা দেখেছি ও পেয়েছি তারা সত্যি না মিথ্যা!" তরুণটি এর কি উত্তর দেবেন? এই মুহূর্ত থেকে তাঁর বিরোধিতা ভেঙে গেল। তিনি জানতে পারলেন (একথা তিনি পরে বলেছিলেন) যে, কালী আর শিব শুধু কল্পনা মাত্রই নয়, এই রূপেই ভক্তরা তাঁদের দর্শন পান।"

ধর্মের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ক্রমবিকাশের যতক্ষণ না সবকিছু একীকরণে সমাপ্ত হয়—প্রভু বলেছেন, "যতক্ষণ তুমি জগতের দিকে তাকিয়ে থাক, তখন তুমি ঝোপের

আড়াল দিতে পার কিন্তু আকাশে সে আড়াল কে দিয়েছে করে? তারপর তিনি মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনার কথায় চলে গেলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে প্রসিদ্ধ লোক-কবির গান ভালোবাসতেন, সেটি স্বামীজী গেয়ে উঠলেন—

বলব কারে মনের ব্যথা,
শিশু কাঁদে মায়ের তরে,
নইতো আমি তেমন ছেলে
অন্য মাকে মা ডাকব।
যখন মা মার তুমি
তখনো ছেলে কাঁদে মা, মা,
শক্ত মুঠোয় আঁচল ধরে।

আবার :

"আর কাজ কি আমার কালী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।
কাশীতেই মেলে মুক্তি? এ বটে শিবের উক্তি
ওরে সকলের মূল ভক্তি—মুক্তি তাহার দাসী।
নিধানে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়,
চিনি খেতে ভালোবাসি।"

"তোমরা জান, তিনি নিজের কথা কিছু বলেন নি, কেবল জননী ভগবতীর কথাই বলতেন। তিনি কখনো 'আমি' অথবা 'আমাকে' বলেন নি, যখন তিনি নিজে বুঝেছিলেন যে নিজেই তিনি তাই।"

"স্বামীজী" একজন বলল, "আমি অবতার বাদ সম্বন্ধে আর একটু জানতে চাই, আপনি কি বলবেন?"

"ভাল কথা, তুমি দেখতে পাচ্ছ—কোথায় একটু রমণীর কোমলতা ছিল—যা আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল? কিন্তু কোন ভাবে পুরুষ হিসাবেই তার প্রকাশ বাঞ্ছনীয় হওয়াতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সৃষ্টি—তাই তিনি সব সময় বলতেন—"আমার জননী ঈশ্বরী।" আমরা ঈশ্বরের এমন প্রকাশকেই অবতার বলি, এঁর সঙ্গে আসেন কয়েকজন ব্যক্তি তাঁদের বলা হয়—এক 'ঈশ্বর কোটি'। তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে তাঁরা নিজেদের জন্য কিছুই করতে পারেন না, তারা পরের সেবাতেই ব্যাপৃত থাকেন; তাঁরা অবতারের মতবাদ প্রচারের কার্য সহায়ক।

"আমার ভূমিকা? রামকৃষ্ণদেব আমাকে সব সময় বলতেন—আমি ঐ 'অবতার-মানব'।"

"আচ্ছা, এ কথা কি সত্য যে আপনি কখনো সারদা দেবীর মুখ দেখেন নি? তিনি নাকি আপনার মুখ দেখেন নি? যখন আপনি ছেলেমানুষ ছিলেন, তখনও?

গুরুদেব মাথা নাড়লেন। তখন লক্ষ্মীদেবীর মাথায় দুষ্টামি বুদ্ধি এল, তিনি স্বামীজীকে ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন—তাঁকে, তাঁর গুরুদেব নিজের সম্বন্ধে কি

বলতেন তাই বলবার জন্য। তাঁর গুরু (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন—"যিনি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্যরূপে এসেছিলেন এখানে তিনি বাস করেন।" তিনি প্রিয় শিষ্য সম্বন্ধে কি বলতেন? এই বিষয়ে স্বামীজী বেশ অনমনীয়; তিনি কখনো সেসব কথা বলতেন না, তাই তিনি প্রশ্নটাকে ভ্রূকুটি করে এড়িয়ে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী জানতেন যে তিনি কি প্রশ্ন কাকে করছেন। পরে তিনি একজনকে (নিবেদিতা) বুঝতে পারেনি বলেই, বলেছিলেন যে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে গীতার বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই প্রভু রামকৃষ্ণ এবং আমাদের গুরুদেব রূপে দক্ষিণেশ্বরে বিরাজমান ছিলেন। এই কথাই অবশ্য সেই আশ্চর্য কথনের সবটাই নয়। তারপর এল দক্ষিণেশ্বরের ছোট ঘরটিতে বন্ধুদের সঙ্গে আগমনের কথা, আর গান গাইতে বলা হলে রামমোহন রায়ের গানটি* গেয়েছিলেন।

"মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ
প্রেম আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন,
গোপনে অতি যতনে॥"

এই গানটি যেন সংকেতের কাজ করল। এই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সোজা তাকালেন তাঁর দিকে আর উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলেন, "ওরে আমার ছেলে, এত বছর ধরে তোকেই যে আমি খুঁজছিলাম বাবা"। স্বামীজীকে আলিঙ্গন করে তিনি নির্জনে নিয়ে গেলেন তখন।

অন্যেরা বলতেন যে যুবককে (স্বামীজী) তিনি (রামকৃষ্ণ দেব) বললেন যে তিনি একজন অবতার সেই যুবক এ কথা শুনে কেবল ঠাট্টা করে হাসতেন আর ভাবতেন বক্তা সত্যিই উন্মাদ। কিন্তু যুবকটি বক্তার মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব মহাপবিত্রতা এবং আন্তরিকতা চিনতে পেরেছিলেন। এক কি দুই সপ্তাহ পরে বন্ধুকে হেসে বলেছিলেন যে, তিনি প্রবীণ সাধুর কাছে আবার যাবেন, কারণ তার দেওয়া মিষ্টি খেতে খুব ভাল। মিষ্টান্ন নিয়ে মন্তব্যটিকে গুরুত্ব না দিলেও, ভাবতেও ভাল লাগে যে, আমাদের গুরুদেব যে প্রচণ্ড ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা দেখাবেন পরে, তার প্রাথমিক পর্বের যা আগে কখনো দেখেনি, এইভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিস্বার্থভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তারপর আবার রামপ্রসাদের গান···

একজন বাঙালী কবি থেকে অন্য কবির কথায় আসা সোজা। তিনি জি. সি. ঘোষের লেখা থেকেও কিছু কিছু অনুবাদ করে বলতেন। শ্রোত্রীর এখন সামান্যই মনে আছে।

*গানটি প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যা নাথ পাকড়াশী রচিত।

"ফুলেরা দুলে দুলে বলে,
রাখ মোদের প্রেমিকের গলে।"
"মধুকর দুঃখে কাঁদে,
সে, ভালোবাসার ধন, পদ্মকে খুঁজে পায় না।
সে গুনগুনিয়ে বলে,
তার মনের দুঃখের কথা।
কারণ সে দেখে হ্রদের জল শূন্য
সেখানে কোন পদ্ম নেই।

অথবা এই পদটি সাহিত্যরসে সিঞ্চিত করে বলা যায়—

"দুঃখী ভ্রমর কাঁদে
তার অশান্ত হৃদয় তাকে নিয়ে যায় সরোবরে,
সেখানে সে দুঃখের ভার উজাড় করে দেয়,
গুনগুনিয়ে—
কারণ হ্রদ এখন শূন্য।"

"আমার বন্ধু গিরিশ সত্যই প্রতিভাবান''—গুরুদেব বললেন। এই কথা থেকে আর রামকৃষ্ণদেবের ভক্তি প্রসঙ্গ থেকে তিনি বাংলার চৈতন্যদেবের এবং তার সহচর নিত্যানন্দের প্রসঙ্গে চলে গেলেন। আর শ্রীযুক্ত ঘোষের নাটক থেকে পুরো সংলাপ বলতে লাগলেন।

গ্রামবাসীগণ ॥ "কে এই ভিখারী?
উত্তর ॥ আমি প্রেম ভিখারী।
গ্রামবাসীগণ ॥ নদীয়া নগরে কে প্রেম বিলায়?
উত্তর ॥ আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুনেছি
তাই এসেছি আমি।
আমি দেশে দেশে ঘুরেছি,
কিন্তু এখানে প্রেমে বন্দী হয়েছি।
মার ভাই, কিন্তু বল হরি, হরি।
গ্রামবাসীগণ ॥ (পরস্পরে)
ও মাধাই, কে এই হরি সংগ্রাম করে,
গঙ্গার তীরে?
সেকি, প্রেম বিতরণকারী নিতাই,
মাধাই বল 'হরি',
এই দুই ভাই ছাড়া, আমাদের নাই অন্যগতি।

হিন্দু উপাখ্যান

শৈশবের মহাভারত-প্রীতি যাঁদের
জীবনকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে,
সেই সকল আত্মার উদ্দেশে

ভূমিকা

উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, নিম্নোক্ত গল্পগুলির মধ্যে আছে আমাদের অকৃত্রিম ঘুম-পাড়ানী ভারতীয় কাহিনীর সংগ্রহ। দুটি বর্ণনার মধ্যে কখনো কখনো বই-এর গল্পগুলির মধ্য থেকে যেগুলি মুখের কথায় শুনেছি, সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ার অধিকার আমি প্রয়োগ করেছি। প্রতিটি কাহিনী ও প্রত্যেকটি ঘটনা এখানে যেমন বলা হয়েছে, তাদের কোন না কোন ভাবে মূল রচনার অনুরূপতা আছে।

যদি একটির পর একটি ধরা যায়, সর্প-চক্রের কাহিনীগুলি পাওয়া যাবে মহাভারতের প্রথম খণ্ডে। শিবের গল্প সতী এবং উমার গল্পের প্রয়োজনীয় ভূমিকা হিসাবে সন্নিবেশিত। ভাগবত পুরাণ থেকে সংগৃহীত সতীর কাহিনী এবং রাজকুমারী উমার কাহিনী রামায়ণ ও কালিদাসের কুমার-সম্ভব (যুদ্ধের দেবতার জন্ম) কাব্য থেকে। মহাভারতের সেই রত্নখনি থেকে সাবিত্রীর কাহিনী ও নল-দময়ন্তীর অতুলনীয় গল্পটি সংগৃহীত। কৃষ্ণচক্রের গল্পগুলির মধ্যে প্রথম সাতটি পুরাণ থেকে, যেগুলি আমাদের অপ্রামাণিক নীতি উপদেশগুলির অনুরূপ এবং শেষের তিনটি মহাভারত থেকে সংগৃহীত। ভক্তিমূলক কাহিনীগুলির উৎস অবশ্য বিভিন্ন, যেমন, বিষ্ণুপুরাণের জনপ্রিয় কাহিনীগুলির বর্ণনা থেকে ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের গল্প, আবার, আমার কল্পনায় গোপাল এবং তাঁর ভাইর গল্প বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনের মত একটি গ্রাম্য কাহিনী মাত্র। শিবি রাজা, ভরত ও এই সংগ্রহের শেষ দুটি গল্প মহাভারতের। রামায়ণ চক্রের শ্রেণীভুক্ত চারটি গল্প সম্পর্কে এ কথা বলার কোন প্রয়োজন নাই যে, এগুলি রামায়ণ মহাকাব্যের একটি সংক্ষিপ্তসারের রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত, যা হিন্দু নারীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে শত শত বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। মহাভারতকে ভারতীয় জাতীয় রূপক কাহিনীগুলির সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু সীতাকে ভারতীয় চেতনায় কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে গণ্য করে রামায়ণকে ভারতীয় নারীজাতির মহাকাব্য বলা যেতে পারে।

একত্রে এই দুটি মহৎ রচনা ভারতীয় জীবনে অনন্যসাধারণ শিক্ষার মাধ্যম। সমগ্র দেশব্যাপী, প্রতিটি প্রদেশে, বিশেষ করে শীতের মরশুমে হিন্দু ও মুসলমান শ্রোতারা সন্ধ্যার পরে ব্রাহ্মণ কথককে ঘিরে তাঁর মুখ থেকে প্রাচীন কাহিনীগুলির বর্ণনা শোনে। বাংলার মুসলমানদের মহাভারত সংক্রান্ত নিজস্ব বর্ণনা আছে। এবং, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রত্যেকটি শিশুর জীবনে এমন এক সময় আসে, যখন প্রতিটি সন্ধ্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুরমা তার কানে এইসব পুরানো স্মৃতির কাহিনী ঢেলে দেয়। গ্রামে নাটক অনুষ্ঠানের অনাড়ম্বর ব্যবস্থা আছে, কতকগুলি রাজ্যে এইসব নাটকের সাহায্যে প্রতিটি মানুষ মহাভারতের পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞান নিয়ে বড় হয়ে ওঠে।

এখানে কতকগুলি গল্পের সম্পর্কসূত্রে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক সমস্যা আছে, যেগুলি সমাধানের কোন চেষ্টা আজও করা হয়নি। এগুলির মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় আর কোনটি নয়। এখানে কৃষ্ণ-চক্রের দশটি গল্পের মধ্যে বহু পাঠক সপ্তম ও অষ্টমের মধ্যে ধারাবাহিকতার বিচ্ছেদ অনুভব করবেন। তিনশত খ্রীষ্ট

পূর্বাব্দে সিরিয়া এবং বেবিলনের সেলুকাস্ নিকাতোরকে ভারত সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে গ্রীক লেখক মেগাস্থিনিস্ লিখেছেন, "মথুরা এবং ক্লিসোবোথ্রাতে (কৃষ্ণপুর ?) হেরাক্লিসের পূজা করা হয়।" এই বক্তব্য থেকে এটা অনুমান করা খুবই শিশুসুলভ কাজ হবে যে, গ্রীক হেরাক্লিসের পূজা সোজাসুজি অথবা যান্ত্রিক উপায়ে ভারতে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁকে দুটি পৃথক শহরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রাচীন দেশগুলির সীমা নির্ধারণ কম ছিল, বরং তারা আধুনিক যুগ অপেক্ষা ছিল বেশি সংযুক্ত। উল্লিখিত সময়ে মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়া ছিল একটাই সাংস্কৃতিক এলাকা, গ্রীস ছিল সীমান্তবর্তী রাজ্য অপেক্ষা কিছুটা বড় ও দূরতম প্রান্তে অবস্থিত। এখন শুধু প্রশ্ন এই যে, গ্রীস এবং ফিনিশিয়ায় হেরাক্লিসের পূজা এবং ভারতে হেরাক্লিস্ (সাময়িকভাবে কৃষ্ণ হিসাবে পরিচিত) দূরবর্তী মধ্য এশিয়ার কোন পূর্বপুরুষকে নির্দেশ করে না, যিনি সাধারণভাবে উভয়ের গ্রহণযোগ্য একজন পৌরাণিক অর্ধ-মানব, অর্ধ-দেবতা, শক্তিশালী, ন্যায়পরায়ণ, বীরসুলভ দয়ায় পূর্ণ, যিনি হিন্দু সাধারণের মধ্যে শিবের আদি কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, তিনিই দীর্ঘ স্মৃতির অনুসরণের মধ্যে আর্যদের একটি ও অপর আর একটিতে বিকীর্ণ আকারে প্রেরিত হয়েছেন। তাহলে কি মথুরার কৃষ্ণ, কালিয় নাগের কৃষ্ণ, পর্বত ও দৈত্যদের সম্পর্কে আলোচিত কৃষ্ণ মধ্য এশিয়ার হেরাক্লিসেরই ভারতীয় বর্ণনা ?

এইভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এখানে সন্নিবেশিত পৌরাণিক কাহিনীর কৃষ্ণ ও মহাভারতের পার্থসারথি কৃষ্ণ উভয়েই এক অথবা পৃথক। এই উত্তরের উপর ইতিহাসের অনেক কিছুই নির্ভর করে। যদি দুইটি পৃথক অস্তিত্ব হয়, তবে কি পার্থ-সারথি কৃষ্ণ মহাভারতের সর্বশেষ সংশোধনের সময়কার নূতন কিছু সংযোজন, অথবা আর্যজাতির একজন প্রাচীন বীরপুরুষ, যাঁরা বৈদিক কল্পনায় জনপ্রিয় বাহন হিসাবে পরিণতি কৃষ্ণ-হেরাক্লিসের একীকরণের মধ্যে ? আমার বিশ্বাস, ভাষা ও আধ্যাত্মিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দিক থেকে কোন বিদেশীর পক্ষে সম্ভব নয় বলে, উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় মনীষীরাই এ বিষয়ে বিশ্বাস-যোগ্য সমাধান অর্জনের পক্ষে উপযুক্ত। আমার সন্দেহ, এইসব তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিদেশীদের মতামত চমৎকার অনুমানের চেয়ে খুব বেশি কিছু কখনো হতে পারে না। যাই হোক্, আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, কৃষ্ণের জীবনকাহিনী এখানে যেমন বলা হয়েছে, আজও লোকেরা নিজেদের মধ্যে তেমনই আলাপ-আলোচনা করে।

এই পুস্তক রচনায় সাহায্য প্রদানের জন্য হিন্দু মহিলা, আমার দয়ালু প্রতিবেশিনী যোগীনী-মা'কে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। এই পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর গভীর ও ঐকান্তিক জ্ঞান তরুণতর ছাত্র অথবা ছাত্রীকে সাহায্য করার জন্য তাঁর অনলস আগ্রহেরই সমতুল। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী সারদানন্দকেও এই সঙ্গে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। "সন্ধ্যার পরে ভারতীয় কথকের" প্রথম ছবিটি ও প্রচ্ছদপটে দুর্গার বজ্রাস্ত্রের ছবি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা।

কলকাতা, জুন, ১৯০৭

রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের
নিবেদিতা

সর্পকাহিনীর আবর্তন-চক্র

সর্পজাতির উপর অভিশাপের বিস্ময়কর ও পাতালে সর্পরাজ্যের প্রথম কাহিনী।

সকলেরই জানা আছে পৃথিবীর নীচে পাতালে এক চিরন্তন জগৎ আছে, যেখানে নাগরাজ তক্ষকের রাজত্ব, আর তার চারপাশে আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী বয়োবৃদ্ধ শক্তিশালী সব সাপেরা বাস করে। সাপেদের এই জগৎ আশ্চর্য এবং সুন্দর। এই আশ্চর্য জগৎ দেখার সুযোগ মানুষের পক্ষে একবার মাত্র ঘটেছিল, যখন তরুণ উতংক তার গুরুর প্রতি কর্তব্যপালনের উদ্দেশ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমরত্বের সুধা পান করে বিদেশে গিয়েছিল, আর ফেরার পথে তক্ষক উতংকের গুরুভক্তির নিদর্শন চুরি করায় তাকে পাতালে অনুসরণ করে গুরুর জন্য নির্দিষ্ট ঐ জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে হয়েছিল।

প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন মুনিদের শিষ্য তরুণ উতংক ছিল নির্ভীক ও বলবান এবং কষ্টসাধ্য এই অজুহাতে সে কখনো কোন কাজ বা দায়িত্ব থেকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে বা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারত না। অনেক কষ্ট আর অসুবিধা সহ্য করে সে তার গুরুপত্নীর জন্য একজন রানীর কাছ থেকে দুটি মূল্যবান রত্ন নিয়ে আসছিল। এই উদ্দেশ্যে গুরুগৃহ থেকে বেরুনোর সময় তার গুরু ও রত্ন দুটি নিয়ে আসার সময় ঐ রানী তাকে বলেছিল, "মনে রেখো, এই রত্নালঙ্কারগুলির ওপর সর্পরাজ তক্ষকের লোভ ভয়ানক। দেখো, সে যেন পথে ওগুলি না চুরি করে নেয়।"

গুরুর হাতে রত্নালংকারগুলি তুলে দেওয়ার জন্য স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়ে উতংক রানীর কাছ থেকে ফিরে আসছিল। কিন্তু পথে যেতে যেতে সে একজন ভিক্ষুককে দেখলো, যে ঘনঘন দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। একসময় খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে উতংক অলংকারের বাক্সটি পথের উপর রেখে একটি ঝরনার কাছে এসে জল খেতে মাথা নোয়াল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঐ আশ্চর্য ভিক্ষুক ভয়ঙ্কর তক্ষকের রূপ ধারণ করে বাক্সটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। উতংক তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে কোনরূপ আতংকিত না হয়ে তার অনুসরণ করতে শুরু করল। ওদিকে তক্ষকও মাটির মধ্যে একটি গর্তে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজের সিদ্ধান্তে অটল উতংক তাকে অনুসরণ করার জন্য একটি লাঠির সাহায্যে ঐ গর্ত খুঁড়তে লেগে গেল। এই দৃশ্য দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ভাবলেন, এই তরুণের হৃদয় খুব দৃঢ় হলেও তার যন্ত্রটি উপযুক্ত নয়। তিনি উতংকের লাঠির মধ্যে নিজের বজ্রের শক্তি সঞ্চারিত করলেন ও যতক্ষণ না সাপের রাজত্বে যাওয়ার মত একটি কুণ্ডলাকার সুড়ঙ্গপথ তৈরি হয়, ততক্ষণ সামনের দিকে চাপ সৃষ্টি করে রাখলেন। সেই পথের শেষে পৌঁছে উতংক দেখল একটি সুন্দর এলাকা, বিপুল প্রসারিত সীমানা, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও বাগান। সেখানে সব বড় বড় দুর্গ, গম্বুজ ও অসংখ্য তোরণ আর বাগানগুলিতে খোলা মাঠ, মল্লযুদ্ধের স্থান ও সকল রকম খেলাধূলার বন্দোবস্ত।

আরও এগিয়ে গিয়ে উতংক দেখল দুটি মেয়ে তাঁতে কাপড় বুনছে, তাদের মাকুও বেশ সূক্ষ্ম এবং সুতার রং সাদা আর কালো। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সে বিরাট একটা চাকার কাছে এসে দেখলো, ঐ চাকাটিতে বারটি স্পোক লাগানো আছে,

আর, ছ'টি ছেলে ঐ চাকাটিকে ঘোরাচ্ছে। আরও পরে সে দেখলো, বিশাল আকৃতির এক ঘোড়ার উপর চড়ে আছে একটি কালো পোশাকে ঢাকা লোক।

উতংক যখন এইসব দৃশ্য দেখছিল, তখন সে জানত যে, সে একটা জাদুর দেশে এসে পৌঁচেছে। তাই সে শক্তিশালী মন্ত্রের শব্দগুলি উচ্চারণ করতে থাকল। এইসব শুনে ঘোড়ায় চড়ে থাকা লোকটি তাকে বলো, "আমার কাছে তুমি কি বর চাও।" তখন উতংক উত্তর দিল, "আমাকে এই বর দিন, যেন সর্পকুল আমার বশ্যতার অধীন হতে পারে।" তখন তিনি উতংককে বললেন, "এই ঘোড়াটির মধ্যে ফুঁ দাও।" উতংক তাই করলো। আর, তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে এমন ভয়ঙ্কর ধোঁয়া আর আগুন বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়লো যে, গোটা সাপের জগৎটাই ছারখার হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তক্ষক নিজে তার স্বজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হঠাৎ এসে তরুণ উতংকের পায়ে পড়ে সেই চুরি করা রত্নালংকারগুলি রেখে দিল। উতংক সেগুলি হাতে তুলে নেওয়ার পর সেই ব্যক্তিটি বললেন, "এই ঘোড়ায় চড়ে বসো, এ তোমাকে পলকের মধ্যে তোমার গুরুর দরজায় পৌঁছে দেবে।" উতংকের হৃদয় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এই ভেবে যে, সে তার গুরুর নির্দেশ পালন করতে সক্ষম হবে। তার কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু কাম্য ছিল না। সুতরাং সে ঘোড়ায় চড়ে বসলো, আর, মুহূর্তের মধ্যে গুরুগৃহের দরজায় পৌঁছে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলেন তার গুরুভক্তির নিদর্শন সেই রত্নালংকার দুটি।

এখন উতংক বুঝতে পেরেছে, মানুষের এই মাটির পৃথিবীর নীচে সেই চিরন্তন জগতে সে যা কিছু দেখেছে, সেগুলির অর্থ কী। তাঁত-বোনা আর কিছু নয়—সময়ের সংকেত, সাদা-কালো সুতোর রঙ দিন আর রাত্রির সংকেত, বারটি স্পোক সহ বড় চাকাটির অর্থ একটি বছর ও বারটি মাস; যে ছটি ছেলে চাকাটিকে ঘোরাচ্ছিল, তারা ছ'টি ঋতুর সংকেত। কালো পোশাকে আবৃত সেই ব্যক্তিটি বর্ষা ও যে ঘোড়ার উপর তিনি চড়ে ছিলেন, সেই ঘোড়াটি আগুনের সংকেত। কারণ, উত্তাপ যখন জলের নিয়ন্ত্রণাধীন, তখনই সাপের জগৎ পরিতৃপ্ত থাকতে পারে। গুরু উতংককে বললেন, "তুমি খুব ভাল কাজ করেছ। তুমি স্বর্গীয় অমৃত পান করেছ, আর এই অমরত্বের সুধা পান করার ফলে তুমি তক্ষকের রাজত্ব থেকে জীবিত ফিরে আসতে পেরেছ, যা না হলে মরণশীল কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব হোত না।" উতংকের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, তাঁর মধ্যে সর্পজাতির বিনাশ সাধনের কিছু উপায় অর্জনের আকাঙ্ক্ষাও জেগে উঠলো। তার চোখে সাপেরা মানুষের পক্ষে অদ্ভুতরকমের বিপজ্জনক। সে স্থির সিদ্ধান্ত নিল যে, রাজার কাছে গিয়ে সাপেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যেভাবে হোক রাজী করাবে। এখন, সর্পজাতির উপর একটি আশ্চর্য ও প্রচণ্ড অভিশাপ আছে, যে জন্য তাদের মধ্যে ভীষণ ভয়ও আছে। বহু বহু কাল আগে, সময়ের সেই আদিপর্বে সাপের সংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে তারা ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল ও বিষে পরিপূর্ণ হয়ে পরস্পর নিজেদের মধ্যে ও মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু দিয়ে দিয়েছিল। উচ্চ স্বর্গে থেকে দেবতারা ভয়ে কাঁপছিল, পাছে এই ভয়ংকর বিষাক্ত সর্পকুল তরুণ মানবগোষ্ঠীকে চিরকালের মত বিনাশ করে ফেলে। সেই সময় একটি ঘটনা ঘটে গেল। সর্পজননী কদ্রু কোন বিষয়ে তাঁর আদেশ পালনের জন্য একদিন

তাঁর সন্তানদের আহ্বান জানালেন, যে আদেশ তাঁর স্বেচ্ছাচারী দুষ্টপ্রকৃতির সন্তানেরা করলো প্রত্যাখ্যান। এর ফলে কদ্রু হৃদয়ে কঠোর এবং ক্রোধে পূর্ণ হয়ে উঠলেন, এবং প্রকৃত পক্ষে স্বর্গে দেবতাদের হৃদয়ে যে ভয় ছিল, ভয়ের দ্বারা অন্ধভাবে চালিত হয়েও তিনি নিজের ইচ্ছায় বলছেন, এই ভেবে তিনি তার মুখ খুললেন, আর, নিজের সন্তানদের উপর টেনে আনলেন অভিশাপ। তিনি বললেন, "তোমরা সবাই মহান রাজা জনমেজয়ের আগুনের আহুতিতে ধ্বংস হবে!" হায় সন্তানগণ! হায় কদ্রু! নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভয়ানক কিছু অভিশাপ হতে পারে না, যাতে নিজের মায়ের দ্বারাই একটি জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল।

সবগুলি জগতের সকলেই শুনল এই ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী এবং মুহূর্তের জন্য স্বর্গের দেবতারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এই ভেবে যে, সর্পজাতি আর কোনদিনই বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু যখন তাঁরা তাদের দুঃখ দেখলেন আর সেই সঙ্গে দেখলেন তাদের সৌন্দর্য, তখন তাদের হৃদয় দয়ায় ভরে উঠলো। তাঁরা সবাই মিলে স্রষ্টা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে নিজের প্রিয় সন্তানদের উপর কদ্রুর ক্রোধের ভয়াবহতার কথা নিবেদন করলেন ও তার ভয়ানক পরিণামকে কোন উপায়ে নমনীয় করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। ব্রহ্মা তাঁদের প্রার্থনা এইভাবে মঞ্জুর করলেন যে, কেবল নিষ্ঠুর ও বিষাক্ত সাপগুলিই ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু যারা শান্ত, ক্রীড়াশীল ও স্নেহপ্রবণ, তারা ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। তারপর খুব আস্তে প্রায় স্বগতোক্তির মত তিনি তাদের অভিশাপমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি বললেন, "যুগসমূহের অতিবাহিত হওয়ার পথে নাগ-জাতির মধ্যে একটি কন্যার জন্ম হবে, যে মরণশীল মানুষের মধ্যে পবিত্রতম ব্যক্তিকে বিয়ে করবে। এই বিয়ের ফলে জন্মলাভ করবে তাদের পুত্র আস্তীক, যার ভালবাসা থাকবে তার মায়েরই জাতির প্রতি, আর তাদের উপর চেপে থাকা দুর্ভাগ্যের নিয়তিকে সে পরাস্ত করবে। কেবল একটি ছোট্ট সাপ গুটি মেরে ব্রহ্মার পায়ের কাছে শুয়ে থেকে এই শাপমুক্তির প্রতিশ্রুতির কথা শুনল।

এখন, এই প্রতিশ্রুতির কথা তক্ষকের রাজত্বের মধ্যে প্রচার হয়ে যাওয়াতে সমগ্র জগৎ স্বস্তি অনুভব করলেও, সর্পকুল ধৈর্য ও দুঃখের সঙ্গে যুগের পর যুগ অপেক্ষা করতে থাকল। কারণ, তারা জানতো তাদের উপর এই অভিশাপ ভয়ংকর তবু স্রষ্টার দরবারে এই শর্ত প্রস্তুত ছিল যে, যখন তাদের আতঙ্ক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছবে, মুক্তি-দাতা আস্তীকও তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াবেন।

পরীক্ষিতের দুর্ভাগ্যের কাহিনী

নীরব নিস্তব্ধ অরণ্যে বসে আছেন ঋষি শমীক। বিরাট গাছের নীচে ছায়ায় এইভাবে বসে আছেন তিনি দীর্ঘকাল গতিহীন স্তব্ধতায়, কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে অথবা কারও কথার কোন উত্তর না দিয়ে তিনি পালন করে চলেছেন তাঁর মৌনব্রত। নির্ভয়ে বণ্যপ্রাণীরা তাঁর পায়ের কাছে খেলা করছে, অদূরে আশ্রমের গবাদি পশুরা চরে বেড়াচ্ছে।

একদিন একটি ঘটনার সৃষ্টি হোল। শিকাররত রাজা পরীক্ষিৎ বনপথে মৌনব্রতধারী ঋষি শমীকের কাছে এসে পড়লেন। রাজা পরীক্ষিৎ ছিলেন মস্তবড় শিকারী, তিনি বন্যপ্রাণীর পিছনে ধাওয়া করতে ভালবাসতেন। জঙ্গলের মধ্যে কোন হরিণ প্রাণ নিয়ে তাঁর হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু আজ রাজার নিয়তি তাঁকে প্রলুব্ধ করে ফাঁদে ফেলেছে। দ্রুত পলায়মান একট হরিণকে তিনি শুধু আহত করতে পারলেন, কিন্তু তাকে ধরতে পারলেন না। আহত হরিণকে অনুসরণ করতে করতে তিনি তাঁর সঙ্গের অনুচরবৃন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি এসে পড়লেন অরণ্যের বহুদূরে নির্জনে ধ্যানরত শমীক ঋষির কাছে।

রাজা চীৎকার করে জানতে চাইলেন, "আপনি কোন আহত হরিণ দেখেছেন? শীঘ্র বলুন, কোন পথে সে পালিয়ে গেছে?" উত্তেজনায় রাজার মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, তাঁর পোশাক ও রত্নখচিত অলংকারের মধ্যে আভিজাত্যের চিহ্ন। কিন্তু ঋষি রাজার প্রশ্নগুলি স্পষ্ট শুনতে পেলেও একটিরও কোন উত্তর দিলেন না।

পরীক্ষিৎ নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, এমন কেউ থাকতে পারে, যে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হবে। একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি বার বার করেও কোন উত্তর না পেয়ে রাজা শিকারীর সব উৎসাহ তিক্ত ক্রোধ ও অবজ্ঞায় পরিণত হল এবং কাছে একটা মরা সাপ পড়ে থাকতে দেখে তাঁর তীরের ডগায় তুলে নিয়ে সাধুর গলায় কুণ্ডলাকারে জড়িয়ে দিয়ে ধীরে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে চললেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, অনেকখানি হেঁটে যাওয়ার আগেই রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, একজন অপরিচিত পবিত্র মানুষকে অপমান করে তিনি কী অন্যায় করেছেন! কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। তাঁর নিজেরই ক্রোধের জন্য যে নির্মম নিয়তি মাথার উপর এসে পড়েছে, তাকে পরিহারের আর কোন উপায় ছিল না, বরং এই নিয়তি তার ধ্বংসের জন্য পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

সাধু শমীকের কাছে অপমান ও প্রশংসা দুইই এক বস্তু। তিনি জানতেন রাজা পরীক্ষিৎ একজন কর্তব্যপরায়ণ মহান রাজা, তাই তাঁর প্রতি এরূপ আচরণ সত্ত্বেও তিনি কোনরূপ ক্রোধ অনুভব না করে নীরবে বসে আগের মতই ধ্যানে মগ্ন থাকলেন, রাজা যেভাবে তীরের ডগা দিয়ে মৃত সাপটাকে তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা ঠিক সেইভাবেই জড়ানো থাকলো। ঋষি শমীক যখন একইভাবে বসে আছেন, সে সময় তাঁর ছেলে শৃঙ্গী দূর অরণ্য থেকে ঘুরে ঘুরে এসে পৌঁছলেন ও তাঁর কিছু বন্ধু ও

শমী রাজ, তার বাবাকে বিনা বাধায় যে অপমান করেছে, সে কথা পরিহাসের সঙ্গে জানালো।

শৃঙ্গী ছিলেন বিরাট মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন, পিতার যোগ্যসন্তান। তাঁর জীবনের একটি মুহূর্ত কিংবা এতটুকু শক্তি কখনো আমোদ প্রমোদে অপব্যায়িত হয়নি। তাঁর শরীর ও মন, তাঁর কথা, কাজ ও ইচ্ছা সবই তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেবল একটি মাত্র বিষয়ে তিনি তাঁর পিতার উপযুক্ত ছিলেন না। ক্রোধের অনুভূতির ক্ষেত্রে শমীকের যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, শৃঙ্গীর তা ছিল না। কঠোর আত্মসংযম ও মনঃসংযোগের ফল তিনি মুহূর্তের ক্রোধের আবেগে নষ্ট করে ফেলতেন। তবুও তিনি এত বড় ছিলেন যে, যে কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো তা আর ফিরিয়ে আনা যেত না, এবং প্রচণ্ড ক্রোধের বশে তিনি যা উচ্চারণ করতেন তার শুভ পরিণামের জন্য পৃথিবীকে নিজেই সহযোগিতা করতে হোত।

তিনি যখন শুনলেন যে শিকারী রাজা তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে অপমান করেছে, ক্ষোভে ও দুঃখে তরুণ সন্ন্যাসী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঋষি শমীকের জন্য তাঁর ভালবাসা ও কোমলতা, বৃদ্ধ বয়সে প্রতিটি আঘাত থেকে তাঁকে নিরাপদে রক্ষা করার ইচ্ছা ও তাঁর এই মৌনব্রতের জন্য শ্রদ্ধা তাঁর ক্রোধের অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত যেন নিজেকেই পুড়িয়ে ফেলতে চাইল। ধীরে ধীরে তিনি মুখ খুললেন, আর, তারপর মুখ থেকে বেরিয়ে এল এই কথাগুলি. "এই সাত দিন ও রাত্রির মধ্যে, যে ব্যক্তি আমার পিতাকে অপমান করেছে, সর্পরাজ তক্ষক স্বয়ং তার জীবন হরণ করবে।" এই অভিশাপবাণী উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল, বহুদূরে সিংহাসনে বসে তক্ষক অনুভব করলো তরুণ সন্ন্যাসীর ক্রোধ, আর ধীরে ধীরে নিজের বিরাট কুণ্ডলী থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের জগতের দিকে এগুতে থাকলো।

শমীকের মৌনব্রতও শেষ হয়ে এসেছিল ছেলের ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে। যখন তাঁকে অভিশাপের কথা বলা হোল, তাঁর হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, "হায়, আমার পুত্র! আমাদের রাজা সাধারণের মঙ্গলকামী একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, আর, তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায় অরণ্যের আশ্রমে শান্তিতে বাস করে আমরা জ্ঞান ও পবিত্র জীবনের অনুশীলন করছি। ন্যায়পরায়ণ শাসকদের মাথায় অভিশাপ ডেকে আনা সাধুর উপযোগী কাজ নয়। অধিকন্তু, দয়া মহান, ক্ষমা সুন্দর। এসো আমরা ক্ষমা করি!

বৃদ্ধ সাধুর গভীর মাধুর্য ও নির্মল আন্তরিকতা তাঁর ছেলের পীড়িত আত্মার উপর শান্ত ঝরনার মত বয়ে গেল। শৃঙ্গী আনত হয়ে তার বাপের গলা থেকে ঐ নোংরা আবর্জনাকে সরিয়ে দিল। কিন্তু তার মুখ থেকে যে কথা আগেই বেরিয়ে গিয়েছে, তার আর প্রত্যাহারের কোন আশাই ছিল না। একথা বুঝতে পেরে শমীক ঋষি রাজার মাথার উপর যে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা ঝুলছে, এই খবর গোপন দূতের মারফৎ রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল।

গোপন দূতের মারফৎ রাজা জানতে পারলেন, যে মৌনী ঋষিকে তিনি অপমান

করেছিলেন, তিনিই বন্ধুর মতো ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে সাবধানবাণী পাঠিয়েছেন, তখন নিজের কৃতকর্মের জন্য তাঁর অনুতাপের সীমা রইলো না।

গোপন দূতের মারফৎ রাজা জানতে পারলেন, যে মৌনী ঋষিকে তিনি অপমান করেছিলেন, তিনিই বন্ধুর মতো ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে সাবধান বাণী পাঠিয়েছেন, তখন নিজের কৃতকর্মের জন্য তাঁর অনুতাপের সীমা রইলো না। তবুও নিজের জীবনের উপর সতর্ক প্রহরা ছাড়া কোন দুঃখ, তা সে যতই হোক্ না কেন, আর তাঁকে রক্ষা করতে পারে না। তাই, তিনি পরামর্শের জন্য নিজের মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক দ্রুত ডেকে বসলেন। তাঁর জন্যে একটিমাত্র স্তম্ভের উপর একটি বাসস্থান নির্মিত হোল, যার মধ্যে চাক্ষুষ দর্শন ছাড়া কোন জীবিত প্রাণী ঢুকতে পারবে না। স্থির-সংকল্প করে পরীক্ষিৎ নিজেকে সেই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করলেন, সাতদিন সাতরাত্রি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সেই ঘরের মধ্যে থেকেই তিনি রাজকার্য চালাবেন, পূজা-অর্চনা করবেন ও কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের জন্য বাইরে বেরুবেন না।

কিন্তু এর মধ্যে রাজার নিকটবর্তী বিপদ সম্পর্কে গুজব জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তক্ষক যতই রাজকীয় বাসস্থানের দিকে এগোতে থাকলো, সে একজন ব্রাহ্মণকে অরণ্যের মধ্যে তারই মতো একই লক্ষ্যের দিকে যেতে দেখলো। ঐ ব্রাহ্মণ যে সর্পদংশনের বিখ্যাত চিকিৎসক কাশ্যপ, এটা বুঝতে পেরে এবং তার গতিবিধি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তক্ষক তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিল। সে খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিল যে, সে যা সন্দেহ করেছিল, ঠিক তাই। কাশ্যপ রাজ দরবারেই চলেছেন, রাজার নিয়তি অনুসারে তাঁকে সাপে কামড়ালে, তাঁর জীবনের পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

তক্ষক হাসলো, তারপর কাশ্যপের সঙ্গে বাজী ধরে বললো যে, তার বিষের ভয়ংকরতা সম্পর্কে কাশ্যপের জানা নেই। সে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ পছন্দ করে নিয়ে, তার মাথা তুলে বিষাক্ত ছোবল মারলো ঐ গাছের শরীরে। তৎক্ষণাৎ ঐ বিরাট গাছটার শিকড় আর ডালপালা ইত্যাদি সব বিষের জ্বালায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিন্তু ধ্বংসের চেয়ে নিরাময়ের শক্তি কত বড়! সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এতটুকু আতংকিত না হয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁর দুটি হাত উপরে তুলে শান্তি ও আশীর্বাদের আশ্চর্য মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বত্থ গাছটি আবার বেঁচে উঠলো। প্রথমে দুটি পাতাসহ নরম অংকুরের সৃষ্টি হোল, তারপর আরও অসংখ্য শাখা-প্রশাখাসহ অসংখ্য পাতার মুকুল, যতক্ষণ না গাছটি আগের মতো মাথা তুলে দাঁড়ালো, ঠিক সেই আগেকার অরণ্য-সম্রাট।

তক্ষক উপশমকারী শুক্ল ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনসম্পদ ও রত্নভাণ্ডার দিতে চাইলে এই শর্তে যে, তিনি যেন তাঁর লক্ষ্য থেকে বিরত হন ও রাজার মৃত্যুতে বাধার সৃষ্টি না করেন। ব্রাহ্মণ তখন ধ্যানে বসে কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর অন্তরে জানতে পারলেন, নিয়তির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরীক্ষিতের উপর অভিশাপ পূর্ণ হবেই। সুতরাং, তিনি তক্ষকের দেওয়া রত্নসম্পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন এবং কথা দিলেন

যে, তিনি এ ব্যাপারে আর অগ্রবর্তী হবেন না। ঐ বিরাট সর্পরাজ তক্ষক তখন জঙ্গলের মধ্যে একা চলে গেল, আর, মানুষের কৃতকর্মের জন্য অদৃষ্টের যে গোপন জাল বোনা হয়ে চলেছে, তার জন্য মনে মনে হাসলো।

এদিকে রাজা নিরাপদ আশ্রয়ে ছ'দিন, ছ'রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছেন, আজ এসেছে সপ্তম দিন, এখনও পর্যন্ত কোন সাপ দেখা যায়নি। এইরূপই চিরকাল হয়ে থাকে। ঈশ্বর তখনই তাঁর দূত পাঠান, যখন মানুষ আর ভয় করে না।

এদিকে দিন শেষ হয়ে এল, রাজার মনের বোঝাও নেমে গেল। সূর্য অস্তমিত হওয়ার মুখে রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য একদল অদ্ভুত আগন্তুক ফল ও ফুল ইত্যাদি নিয়ে দরজার কাছে হাজির হল। মনে হোল তারা সব অরণ্যবাসী। রাজা পরীক্ষিৎ এখন খুবই সদয় হৃদয়ে অভ্যর্থনা করলেন ও তাদের নাম না জিজ্ঞাসা করেই তাদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করলেন।

যাই হোক, তারা চলে যাওয়ার পর রাজা ও তাঁর বন্ধু এবং মন্ত্রীরা, যারা তাঁর চারপাশে ঘিরে বসেছিল সদ্য-আনীত ঐ ফলগুলির জন্য অস্বাভাবিক ক্ষুধা অনুভব করলো এবং প্রচুর হাসিখুশি ও আনন্দের সঙ্গে খাওয়া শুরু করে দিতে সচেষ্ট হল। রাজা নিজে যে ফলটি নিয়েছিলেন, সেটি ভেঙে দেখলেন, তার মধ্যে তামাটে রংয়ের একটি ছোট্ট কীট, যেটার চোখ দুটো উজ্জ্বল কালো। পোকাটি এত ক্ষুদ্র যে, প্রায় খালি চোখে দেখাই যায় না। এই মুহূর্তে সূর্য অস্তাচলগামী এবং অভিশপ্ত সাতরাত্রি ও সাতদিন প্রায় ঠিকই শেষ হতে যাচ্ছে। পরীক্ষিতের আর কোন ভয় ছিল না, বরং সাধুর পাঠানো সংবাদের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য মনে মনে আফশোষ হচ্ছিল। এখন, রাজার মোহাচ্ছন্ন অদৃষ্ট তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে, তাই, তিনি ঐ ক্ষুদ্র পোকাটিকে ফল থেকে আঙুলে বেছে নিয়ে খেলার ছলে তাকে বললেন, "হে ক্ষুদ্র খেয়ালী কীট, তক্ষক এখানে নাই, তুমি যদি ভয়ংকর তক্ষক হতে! এখন আমাদের দেখাও, তুমি কি করতে পার।" রাজার এই অকস্মাৎ বাক্চাতুর্যে সকলেই হেসে উঠলো, এমনকি রাজাও এক সপ্তাহ আগে ক্রোধে ঋষির গলায় মরা-সাপ জড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার কথা স্মরণ করে এখন পরিহাসের ভঙ্গীতে ঐ তুচ্ছ পোকাটিতে নিজের গলার কাছে তুলে ধরলেন।

পরীক্ষিতের জীবনে এইটেই ছিল শেষ কাজ। তৎক্ষণাৎ, সম্রাটের নিজের মুখে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান পেয়ে ঐ ছদ্মবেশী কীটের আকৃতি আতঙ্কিত মন্ত্রীদের চোখের সামনে বদলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে বিরাট থেকে বিরাটতর আকার ধারণ করে প্রচণ্ড শক্তিশালী সাপ স্বয়ং তক্ষকে পরিণত হল। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাজার গলার চারপাশে শক্ত কুণ্ডলী পাকিয়ে তার সেই বিরাট মাথা তুলে প্রচণ্ড ফোঁস ফোঁস গর্জনে শিকারের উপর ছোবল মারলো। অবিলম্বে মৃত্যু ঘটলো রাজা পরীক্ষিতের।

এখন শিশু জনমেজয় পিতা পরীক্ষিতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হল, আর বিশ্বস্ত মন্ত্রীরা সিংহাসনের চারপাশে বসে তার নামে রাজ্য শাসন করতে লাগলো। এইভাবে শান্তির সঙ্গে তরুণ বালক জনমেজয়ের সাবালক হওয়া পর্যন্ত বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। একই সময়ে বহুদূরে অরণ্যের মধ্যে আশ্চর্য নীরবতায় আস্তীক নামে আর একটি বালকও বড় হয়ে উঠছিল, যার বাবা ছিলেন নশ্বর মনুষ্য-কুলের মধ্যে পবিত্রতম মানুষ, আর মা ছিলেন সর্পজাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভদ্র-গোষ্ঠীর একজন রাজার বোন। আস্তীকের স্বভাব ছিল তার বাবার মতো সাধুতা, প্রীতি ও জ্ঞানের ঐশ্বর্যে পূর্ণ। কিন্তু তার পুরো তার জীবনটাই সে অরণ্যে সাপের রাজ্যে বাস করে এসেছে। কারণ, তার বাবা তার মাকে ত্যাগ করে তার জন্মের আগেই চলে গিয়েছেন। তাই তার সমস্ত হৃদয় শৈশবের আবাস ও তার মায়ের জাতি, লোকেদের সঙ্গেই পড়ে থাকতো। এখানে দেখা যাচ্ছে, একই বয়সের দু'জন অদৃষ্টজাত বালক, দু'জনেই জগতে পরিবর্তন আনার জন্য জন্মেছে, একজন রাজা জনমেজয়, আর একজন সর্প-মানব, ব্রাহ্মণ ও সাধু আস্তীক। আর, সে যুগটাই ছিল সর্পজাতির শক্তিমান প্রভু তক্ষকের ক্ষমতার যুগ।

যখন রাজা জনমেজয় পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই সময় একদিন একটি ঘটনা ঘটলো। উতঙ্ক নামে একজন ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে চীৎকার করে বলতে লাগলো, "প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! আপনার পিতৃহন্তা তক্ষকের উপর প্রতিশোধ নিন।"

তখন রাজা ব্যগ্র কৌতূহলে জানতে চাইলেন, কেন তিনি পিতৃহীন, তাঁর পিতা একজন মহত্তম রাজা হয়েও কিভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। তখন সকলে তাঁকে শমীক ঋষি ও তাঁর ছেলে শৃঙ্গী মুনির অভিশাপের কথা, কেমন করে একটিমাত্র স্তম্ভের উপর রাজার প্রাসাদ তৈরি হল, কেমন করে তামাটে রঙের পোকা ফলের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল, সব বললো। সব শুনে অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়গুলি মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তরুণ রাজা রাজপরিবারের শত্রু বিরাট তক্ষকের কথাটাই শুধু ভাবতে থাকলেন। তিনি শুধু এই চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে গেলেন যে, কি করে তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কি করে সমগ্র সর্পকুলের শত্রুতা থেকে জগতের মনুষ্যকুলকে রক্ষা করা যায়। যখন তাঁর উদ্দেশ্য গভীর রূপ নিল তিনি মাথা তুলে দরবারের পুরোহিত ও মন্ত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন, "এবার সময় হয়েছে, আমি আমার পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাই; তক্ষক ও তার সমস্ত লোককে একত্রে জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ করে এর শোধ নিতে হবে। ঠিক যেমন করে তক্ষক নিজে তার বিষের আগুনে আমার পিতাকে দগ্ধ করেছিল। হে জ্ঞানী পুরুষেরা! হে মন্ত্রীগণ! এখন আপনারা আমাকে বলুন এই ব্রত পালনের জন্য আমি কিভাবে অগ্রসর হব?"

রাজা যখন দরবারে এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তখন সাপেদের জগতে সর্বত্র একটা শিহরণ বয়ে গেল। কারণ, পুরাতন সেই অভিশাপ, যা তাদের উপর চেপে আছে, এখন সেই অভিশাপ ফলে যাওয়ার সময় হয়েছে। জনমেজয় সেই রাজা, যাঁর

জন্য এতগুলি যুগ অপেক্ষা করেছিল। এখন তাদের ধ্বংসের অভিশপ্ত মুহূর্তটি হাতের কাছে শুধু নয়, মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছে। এদিকে সর্পরাজ কদ্রুও ঠিক মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছেন, যখন তিনি তাঁর ছেলে আস্তীককে তাঁর জাতিকে রক্ষা করার জন্য বলবেন। যেহেতু এই অঙ্গীকার পালনের জন্যই রাজা জনমেজয়ের জন্ম হয়েছে, তাই তাঁর উপদেষ্টাদের সব ক্ষমতা ও জ্ঞান আয়ত্তের মধ্যে। তাঁরা সব মনীষীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রাচীন পুঁথিপত্র দেখে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, স্বয়ং তক্ষকসহ সমগ্র সর্পকুলকে রাজকীয় যজ্ঞের আগুনে কোন্ পদ্ধতিতে দগ্ধ করা যায়। সেই অনুসারে সব প্রস্তুতির উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়ে গেল। এক টুকরো জায়গা ঠিক করে তার উপর নির্মিত হোল বিশাল বেদী ও সমূহ পাত্র এবং তৈজস পত্র ইত্যাদি সেখানে নিয়ে আসা হোল। যাজ্ঞিক পুরোহিতদের বিরাট বাহিনী জমায়েত হোল, আগুন প্রস্তুত এবং চাল, ঘি যা কিছু যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেওয়া হবে, তাও জমা করা হোল। কিন্তু, যখন সবই প্রস্তুত তখন শোনা গেল যে, বেদী নির্মাতারা অশুভ কিছুর পূর্বাভাস পেয়েছেন, যার অর্থ এই আহুতির সময় একজন আগন্তুক এসে যজ্ঞের অনুষ্ঠানকে ব্যর্থ করে দেবে। এই কথা শুনে সিংহাসনে বসার আগেই রাজা আদেশ দিলেন, সব তোরণদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হোক, আর, কোন কারণেই যেন কোন আগন্তুককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া না হয়।

শেষে হোমাগ্নি জ্বলে উঠলো, এবং যাজ্ঞিক পুরোহিতরা সমবেত কণ্ঠে মন্ত্র ও স্তব উচ্চারণ করতে লাগলেন আর জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় শোধিত ঘি ঢালতে আরম্ভ করলেন। এর পরবর্তী দৃশ্য কী আশ্চর্য আর ভীষণ! যজ্ঞে নিবদ্ধ মনের শক্তি এত প্রচণ্ড যে, নিকট এবং দূর সব জায়গা থেকে সাপগুলো শূন্যে বাতাসে উড়ে, বুকের উপর হেঁটে এবং আকাশ থেকে যজ্ঞের আগুনে নিজেরাই ঝাঁপ দিয়ে পড়তে থাকলো। শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাপ ভয়ে আতঙ্কে ফোঁস ফোঁস করতে করতে যন্ত্রণায় শরীর মুচড়ে ছটফট করতে করতে ক্রমাগত এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। মন্ত্রের প্রচণ্ড শক্তি, যা তাদের দুর্বার বেগে আগুনের দিকে আকর্ষণ করছিল, তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত তারা আগুনে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হোল। আগুনের উত্তাপ যতই বাড়তে থাকলো উজ্জ্বলতর হোল শিখা, পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ ততই প্রবলতর শব্দে ঊর্ধ্বগামী হোল। কারণ, তাঁদের শক্তিকে বিশ্বের শেষতম প্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে ও স্বয়ং তক্ষককে আকর্ষণ করে টেনে আনতে হবে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে। সকলের মধ্যে রাজার মন গভীরতা ও একাগ্রতায় স্থিরতম। তাঁর মুখমণ্ডল অন্ধকারের মত কালো হয়ে উঠেছে, সিংহাসনে বসে আছেন তিনি, তাঁরা চোখের পাতা একটুও কাঁপছে না। তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে তিনি পুরোহিতদের শক্তিশালী মন্ত্রের অনুসরণ করে চলেছেন, যে মন্ত্রশক্তিতে তক্ষককে টেনে এনে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। রাজার মধ্যে পিতৃহন্তার প্রতি প্রতিশোধের তৃষ্ণা ও রাজরক্তে রক্তের শোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। সুতরাং, পুরোহিতরা মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকলেন আর রাজা বসে বসে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন সবকিছু। ওদিকে যজ্ঞবেদী থেকে অনেক দূরে প্রধান ফটকের

দায়িত্বে ছিলেন একজন বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, যার একটিমাত্র দোষ ছিল, কোন ব্রাহ্মণ কোন কিছু প্রার্থনা করলে তিনি কখনো তা প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যজ্ঞে আহুতি চলতে থাকলো। এদিকে একটা আশ্চর্য গুজব শোনা গেল। শোনা গেল যে, তক্ষক তার নিজের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আকাশের দেবতা ও দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের সিংহাসনে নীচে আশ্রয় নিয়েছে।

জ্বলন্ত চোখে নিজের পায়ের উপর লাফিয়ে উঠে জনমেজয় চীৎকার করে উঠলেন, "আমি গ্রাহ্য করি না!—তক্ষকের জন্য কোন আশ্রয় থাকবে না। ইন্দ্রের সিংহাসনটাই আগুনে নিক্ষিপ্ত হোক, আর ভস্মীভূত হয়ে যাক।" এই কথায় পৃথিবীর বুকের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। রাজার এই ভয়ংকর কথাগুলির পরে দেখা গেল বহুদূরে ঊর্ধ্ব আকাশে একটি অনুজ্জ্বল কালো চিহ্ন এবং সমগ্র প্রকৃতি জেনে গেল যে, স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রের সিংহাসন যজ্ঞস্থলের দিকে নীচে চলেছে। দৃঢ়ভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে সিংহাসনকে জড়িয়ে ইন্দ্রের পোশাকের নীচে আত্মগোপন করে আছে তক্ষক। আর, যতক্ষণ ইন্দ্র তাকে আশ্রয় দিয়ে রাখবেন, স্বয়ং দেবরাজও জনমেজয়ের ঘোষিত সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার শক্তি প্রতিরোধ করতে পারবেন না। নামছে—নামছে, দ্রুততর গতিতে মহাশূন্য ভেদ করে স্বর্গের সিংহাসন নেমে আসছে। সকলের সব দৃষ্টি ঊর্ধ্ব আকাশে, মনে হচ্ছে যেন সব হৃদয় শুদ্ধ হয়ে গেছে, তারা দেখছে সিংহাসনটা ছুটে আসছে রাজকীয় যজ্ঞের লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে। তারপর একটা প্রবল আলোড়নের বিক্ষোভ দেখা গেল এবং দেখা গেল স্বর্গপিতার সিংহাসন আবার স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে, আর অকস্মাৎ তক্ষকের দৃশ্যমান বিরাট শরীরটা ধীরে ধীরে কিন্তু তার নিশ্চিত নিয়তির মধ্যে নেমে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন অদ্ভুত অথচ আকর্ষণীয় চেহারার ব্রাহ্মণ জনমেজয়ের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "রাজা, আমার একটি প্রার্থনা মঞ্জুর করুন!" মুহূর্তের জন্য তাঁকে স্তব্ধ করতে রাজা হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। রাজার চোখ দুটো শূন্যে ঘূর্ণায়মান নীচে নেমে আসতে থাকা তক্ষকের বেগে শরীরের দিকে অপলক নিবদ্ধ। যতক্ষণ না জয় সুনিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ তিনি স্বয়ং দেবতাদের প্রার্থনাও মঞ্জুর করতে প্রস্তুত নন। কিন্তু, যখন তক্ষক এত নিকটে এসে গিয়েছে যে, তার মৃত্যু অনিবার্য, তিনি রাজকীয় প্রথা অনুসারে আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "বলুন, আপনি যা কিছু চাইবেন, আমি তা মঞ্জুর করব!"

ব্রাহ্মণ বললেন, "তাহলে, যজ্ঞের এই আহুতি বন্ধ হোক!" রাজা আতঙ্কে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। সাপগুলোর আগুনে এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়া বন্ধ হয়ে গেল। দূরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল তক্ষকের বিরাট শরীর। আর, যাজ্ঞিক পুরোহিতরা হঠাৎ দেখলেন যে, তাঁদের মন্ত্রোচ্চারণ আর কোন কাজেই লাগছে না, তারা মন্ত্রপাঠ বন্ধ করে দিলেন, বন্ধ করে দিলেন ঘৃতাহুতি। নির্মাতারা যেমন ভবিষ্যবাণী করেছিলেন, পবিত্র এই আগন্তুক সর্পব্রাহ্মণ আস্তীক ছাড়া আর কেউ নন, যিনি অনুমান কালে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেছেন ও স্বয়ং রাজার প্রতিশ্রুতি

অনুযায়ী যজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিলেন। এবং এই ব্রাহ্মণের প্রবেশ এমন একটি বিষয়, যে ক্ষেত্রে কটকে প্রহরারত সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীর রাজার আদেশ পালনের কোন ক্ষমতাই ছিল না। কারণ, সকলেই জানতো যে, ঐ কর্মচারীর সারা জীবনের অভ্যাস ছিল কোন ব্রাহ্মণের যে কোন প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করা।

রাজা জনমেজয় সব কথা শুনলেন। আস্তীক তাঁকে বললেন, সর্পজাতির উপর মা কদ্রুর অভিশাপের কথা, এবং একজন পরিত্রাতার প্রতিশ্রুতির কথা, যিনি তাঁর মায়ের জাতির মধ্যে হিংস্রতম ও ভীষণতমদের বাদ দিয়ে আর সবাইকে রক্ষা করবেন। এই উদ্দেশ্যই যে তাঁর জন্ম, যজ্ঞের শুরুতে সর্পকুলের মধ্যে বিরাট ভয় ও বিষাদের অবস্থা দেখে জ্ঞাতিবর্গকে রক্ষা করার জন্য আস্তীকের উদ্দেশ্যে তাঁর মায়ের আহ্বান ইত্যাদি সব কথা আস্তীক রাজাকে বললেন। সব শুনে রাজার অন্তর থেকে ক্রোধ ও হতাশা দূরে চলে গেল। তিনি দেখলেন, মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল মাত্র। তিনি বুঝতে পারলেন, এমনকি তক্ষকের বিষে তাঁর পিতার মৃত্যুও দেবগণের ইচ্ছা পূরণের জন্যই ঘটেছে। এবার তিনি আস্তীককে মূল্যবান উপঢৌকন ও রাজকীয় অনুগ্রহ দেওয়ার জন্য মুখ ফেরালেন। কিন্তু নশ্বর মানুষের মধ্যে আস্তীকের উদ্দেশ্য আগেই সফল হয়ে গিয়েছে। সবার অলক্ষ্যে তিনি চলে গিয়েছেন রাজ-দরবার থেকে। তাঁর বাকী জীবনটা তিনি অরণ্যে তাঁর শৈশবের গৃহে মায়েরই জ্ঞাতিকুলের মধ্যে কাটিয়ে দেবেন।

অরণ্যের নির্জন অঞ্চলগুলিতে যে কোন সময় কেউ হয় তো মহাদেবের সাক্ষাৎ দৈবাৎ পেয়ে যেতে পারেন, কারণ, এইসব স্থান তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিচরণভূমি। একবার দেখা পাওয়া গেলে ভুল হওয়ার উপায় নাই। যদিও তাঁকে ঐশ্বর্যশালী বা শক্তিশালী দেখায় না। তাঁর শরীরের চামড়া কাঠের সাদা ছাইতে ঢাকা, পোশাক ধর্মীয় সাধু-সন্ন্যাসী যাঁরা ঘুরে বেড়ান, তাঁদের মত হলুদ রংয়ের কাপড়। তাঁর জট-পাকানো চুল স্তূপীকৃত ও মাথার উপর চূড়া করে বাঁধা। এক হাতে তাঁর ভিক্ষাপাত্র আর এক হাতে দীর্ঘ ত্রিশূল আর কখনো কখনো তাঁকে দেখা যায় দুপুর বেলা দরজায় দরজায় ঘুরে ভিক্ষা করছেন।

হিমালয়ের বরফ-ঢাকা বিরাট উঁচু চূড়াগুলির একটিতে স্থির হিমের উচ্চতায় শিবের সিংহাসন। শুধু নীরবতা নয়, নীরব আনন্দে গদগদ হয়ে তিনি সেখানে বসে থাকেন, সম্পূর্ণ আত্মহারা অবস্থায় চিরন্তনতার ধ্যানে মগ্ন। মহাদেবের মাথার উপর খাড়া পাহাড়ের কিনারা থেকে যখন নতুন চাঁদের আলো জেগে ওঠে, আর আলো ছড়ায় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, তখন পূজারীদের দৃষ্টিতে মনে হয় ঐ চাঁদের আলো আর কিছু নয়, সব যেন স্বয়ং মহাদেবের শরীর থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কারণ, তিনি উজ্জ্বল কিরণে পূর্ণ এবং কোন অন্ধকারের ছায়া দিতে পারেন না।

প্রগাঢ় নিস্তব্ধতায় আবৃত মহাদেবের গিরিগৃহ মানস সরোবরের উপরে এবং সেখানে স্তরের পর স্তর চিন্তার নীচে গোপন গভীরে মনের শান্তি নিয়ে তিনি বিরাজ করেন। এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর প্রতিটি শ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে জগৎসমূহের সৃষ্টি ও বিনাশ হয়ে থাকে। তবু, তিনিই মহাদেব, কারণ, তাঁর নিজের বলতে কিছু নাই; তাঁর সৃষ্ট সব কিছুর মধ্যে তিনি রাজত্বের বা পিতৃত্বের দাবি করেন না। সম্পদ নয়, ক্ষমতা নয়, যা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য এই অধিকারে প্রলুব্ধ করতে পারে। তাঁর একটি মাত্র ইচ্ছা অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা ও আলোয় আলোকিত করা। এরূপ কথিত আছে, একবার তাঁর ধ্যান এত গভীর হয়েছিল যে, যখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ হোল, তখন তিনি একা এসে দাঁড়ালেন সব সৃষ্টির হৃদয়ের মাঝখানে এবং সমূহ বিশ্বচরাচর তখন অন্তর্হিত হয়ে গেল। তারপর তিনি দেখলেন, বিশ্বচরাচর থেকে অন্ধকার দূরীভূত, কোথাও আর অজ্ঞতা বা পাপ অবশিষ্ট নাই, তিনি দু হাত ঊর্ধ্বে তুলে সেই মহাশূন্যতার মধ্যে আনন্দে গান গেয়ে উঠলেন, "ব্যোম্! ব্যোম্!" মহাদেবের এই নৃত্যই ভারতীয় নৃত্যকলার প্রলয়নৃত্য, এবং তাঁর পূজা করতে হলে "ব্যোম্! ব্যোম্! হর! হর! হর" শব্দের উচ্চারণে আহ্বান জানাতে হয়।

যাই হোক, এই মহান দেবতার মুখমণ্ডল থেকে সন্দেহাতীত রূপে তাঁকে আমরা চিরকালের মত চিনে নিতে পারি। একটি বারের মত দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট, জ্ঞানের সেই উজ্জ্বল দ্যুতি ও দুটি চোখের দয়া আর কোমলতা থেকে একটি বারের ক্ষণিক প্রভা আর কোনদিনই আমাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না, যাঁকে আমরা দেখলাম, তিনি স্বয়ং শিব। এই মহান দেবতা কখনো ক্রুদ্ধ হতে পারেন, এ কথা

চিন্তা করা অসম্ভব। যাঁর আকৃতি রজতশুভ্র হিমালয়ের মত, তিনি কেবল দুটি জিনিস দেখেন মানুষের মধ্যে। আমাদের মধ্যে পাপ অথবা ভ্রম যাই হোক্ না কেন, তিনি আমাদের মধ্যে তার কারণ প্রকাশের জন্য সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করেন, যাতে আমরা আর অন্ধকারের মধ্যে বৃথাই ঘুরে না বেড়াই। তিনি আমাদের মধ্যেকার অন্তর্দৃষ্টির ও অদৃষ্টির অভাব এই দুটি দেখেন। তাঁর অসীম অনুকম্পা ছায়াহীন, কলঙ্কহীন।

জাগতিক ক্ষেত্রে তিনি খুবই সাধারণ, তাঁর পূজার জন্য প্রায় কিছুই চান না। তাঁকে শুধু বেলপাতা, জল আর একমুঠো চালের চেয়েও অনেক কম নিবেদন করতে হয়। যে কোন ভাবেই হোক, তিনি এগুলি গ্রহণ করেন। যেমন, বেদনার্তের চোখের জল তাঁর কাছে প্রায়ই পবিত্র জলের নিবেদন বলে গণ্য হয়। একবার রাত্রে তিনি রাজকীয় শিবির পাহারা দিচ্ছিলেন, যখন শত্রুপক্ষ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলো। ঐ শয়তানদের হাতে ছিল বেল-কাঠের ছড়ি, তাই দিয়ে তারা তাঁকে বারবার আঘাত করতে লাগলো। মৃদু হেসে তিনি সব আঘাতকে পূজা হিসাবে গ্রহণ করলেন, আর তাদের মাথায় আশীর্বাদ করলেন।

তিনি নিজের জন্য তাদেরই রাখেন, যারা দাবিদারহীন, প্রভুহীন, ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। অনুরাগী নন্দী তাঁর একজন ভৃত্য। তিনি ঘোড়া কিংবা হাতির উপর চড়েন না, চড়েন একটি বৃদ্ধ জীর্ণ ষাঁড়ের উপর, যেহেতু আর সকলে সাপকে বাতিল করে দিয়েছিল, তাকে আদর করে নিজের গলায় জড়িয়ে নিলেন। মানুষের সমাজের মধ্যে যারা বাঁকা, কুঁজো, খোঁড়া, টেরা-চোখ ইত্যাদি সব তাঁর একান্ত নিকটের। কারণ, নিঃসঙ্গতা, পঙ্গুতা, দারিদ্র্য এই মহান দেবতার হৃদয়ে যথেষ্ট করুণা সৃষ্টি করে থাকে। তিনি কারও কাছে কিছুই প্রত্যাশা করেন না বরং বিনিময়ে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা না করে তিনি সবাইকে দান করেন তাঁর করুণা। তিনি পশুপতি, যে তাঁর কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে আসে, তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের দাবিতে তাঁর সব মাধুর্য ও দীপ্তিসহ নিজেকেই বিলিয়ে দেন।

তবুও, শুধুমাত্র এই রূপের মধ্যেই শিব মানুষের কাছে আসেন না। কখনো কখনো আমাদের মধ্যে জ্ঞান অবর্ণনীয় রূপে মহার্ঘ হয়ে ওঠে, এবং এই কারণেই অজ্ঞানতা ধ্বংসের এই চিরন্তন মহান দেবতা, যখন সময় আসে তখন জেগে ওঠেন। তাঁর হাতে থাকে তরবারি এবং আমাদের চোখের সামনেই চলে আমাদের প্রিয়তমদের নিধনযজ্ঞ। তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির তৃতীয় নয়ন জ্বলে ওঠে, আর, তা দিয়ে তিনি সব ভণ্ডামি আর কৃত্রিমতাকে বিদ্ধ করেন। তাঁর এই তৃতীয় নয়নে যে আলো ঝলসে ওঠে, এক মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে তিনি তার সাহায্যে সব অসত্যকে ভস্মে পরিণত করেন। পার্থিব ব্যাপারে তিনি যতই বোকা হোন্ না কেন, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তাঁকে কিছুতেই প্রতারিত করা যাবে না। এই বিষয়ে তিনি ভয়ংকর রুদ্র হিসাবেই পরিচিত, এবং তাঁর কাছে দিনের পর দিন মানুষ এই বলে প্রার্থনা করে, "হে মধুরের মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম।"

এইভাবেই কাহিনী চলতে থাকে। তবুও প্রকৃত পক্ষে মহাদেব সম্পর্কে এই চিন্তা মানুষের স্বতস্ফূর্ত স্বর্গীয় অনুভূতির অর্ধেক মাত্র। দেবতা হিসাবে আমরা দুটি বিষয়ের বিবেচনা করে থাকি। একটি জ্ঞান—ভারতে যাকে বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি, এবং এই অন্তর্দৃষ্টি সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হলে শিব বা মহাদেব। কিন্তু অনেকে দেবতাকে দেখেন ক্ষমতা, শক্তি, সৌন্দর্য ও আমাদের চার পাশের বিশ্বজগতের মধ্যে। বাস্তবিক, এই দুটি একসঙ্গে না হলে যে কোন একটি সম্বন্ধে চিন্তা করা যায় না। তাই শিব, সেই মহাশক্তি—আদি শক্তির স্বামীরূপ চিরন্তন সহগামী। যত ছবি আঁকা হয়েছে, যত কাহিনী বলা হয়েছে এই শক্তির, সবই সতী এবং উমা ও মহাকালীর। তিনি গৌরী, স্বর্ণময়ী, সুন্দরী, বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় নতুন সূর্যের রক্তিম আলোর প্রকাশ। তিনি সব সময় কৈলাসেই বাস করেন মহাদেবের পত্নী অথবা অনুরাগিনী পূজারিণী অথবা তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি রূপে। তিনি মানুষের মধ্যে মহাদেব শিবের নামেই পরিচিত।

সতী, সর্বগুণময়ী পত্নী

অনেক, অনেক আগে সেই কালের সূচনায় দক্ষ নামে একজন রাজা ছিলেন, যিনি নিজেকে দেবতাদের ও সকল মানুষের প্রধান বলে গণ্য করতেন। একবার একটি বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হোল, আর সেই ভোজের আসরে উপস্থিত সব দেবতারাই দক্ষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ও একমাত্র শিব ছাড়া সকলেই তাকে অবিশ্বাসী বলে স্বীকার করলেন। স্বয়ং মহাদেবও এই আসরে উপস্থিত, তাঁর শরীর ভস্মমাখা, পরনে পাটলবর্ণ লেংটি, সত্যিই তিনি যে কোন ভিখারীর মত পোশাকে আবৃত। তাঁর সঙ্গে একটি দীর্ঘ লাঠি ও পাত্র। তবুও, তিনি মাথা নত করে দক্ষের পাদস্পর্শ করলেন না। শুধু দয়াই তাঁর অভিপ্রায়। আমরা সকলে জানি যে, নিকৃষ্টতর কারও সামনে মহত্তর কারও অবনমন হলে, তার পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় কিছু হতে পারে না। ভারতে এও বলা হয়ে থাকে যে, এরূপ ঘটনা যদি তোমার ক্ষেত্রেও ঘটে, তোমার মাথাও ঘুরে যাবে। সুতরাং, সম্রাট দক্ষের প্রতি কেবল দয়াবশত শিব তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন না এবং সম্ভবত পরের দিকে এসব কথা ভুলেই গেলেন। কিন্তু বেচারা দক্ষ শিবের শ্রদ্ধা না জানানোর কারণ বুঝলেন না এবং তারপর থেকে তাঁকে শত্রু হিসাবে গণ্য করে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করতে শুরু করলেন। এদিকে, দক্ষের অনেকগুলি মেয়ে ছিল, একমাত্র সবচেয়ে ছোট মেয়েটি ছাড়া আর সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ছোট মেয়েটি এত ভাল ছিল যে, এজন্য তার নাম রাখা হয়েছিল সতী (সতী শব্দের অর্থ অস্তিত্ব, এবং প্রকৃতপক্ষে সৎগুণ ছাড়া আর কোনকিছুই টিকে থাকে না)

গোপনে সতীর সমগ্র আত্মা মহাদেবের আরাধনায় নিবেদিত ছিল। তিনি দিনের পর দিন শিবের মূর্তি পূজা করতেন ও মূর্তির সামনে আতপ চাল ও জল নিবেদন করতেন, আর, প্রার্থনা করতেন এই বলে যে, তাঁর সমস্ত জীবন যেন তাঁরই প্রেমে অতিবাহিত হয়।

এইসবের মাঝখানে দক্ষ একদিন ঘোষণা করলেন যে, সতীর বিয়ের সময় হয়েছে। তিনি স্বয়ংবর সভা অর্থাৎ বর পছন্দ করার জন্য সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করে দিলেন। বেচারা সতী! মহাদেবকে তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে বসে আছেন, তাঁর পক্ষে আর কাউকে বিয়ে করা কি করে সম্ভব? এদিকে সেই মারাত্মক দিনটিও হাজির হোল। বিরাট সভাগৃহের মধ্যে অপূর্ব সব সিংহাসনে বসে আছেন আমন্ত্রিত দেবতা ও রাজারা চক্রাকারে। বরমাল্য হাতে নিয়ে সতী ভিতরে ঢুকলেন। তিনি চারদিকে চেয়ে দেখলেন। তিনি বলে দিতে পারেন, কারা দেবতা, কারণ তাঁদের ভেতর থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল। তাঁদের চোখ মিটমিট করেনি, ছায়াপাতও ছিল না, যা রাজাদের বেলায় হচ্ছিল। দেবতা এবং রাজা উভয়ের মধ্যে যাকে খুশি তিনি পছন্দ করতে পারতেন। যাঁর গলায় তিনি বরমাল্য দিতেন, তিনি সুখী হতেন, তাঁর বাবা দক্ষও খুশি হতেন। তাঁরা সকলে মূল্যবান রত্নালংকারে ঝলমল করছেন, আর তাঁদের জমজমাট রংয়ের পোশাকও উজ্জ্বল। সতী বারবার তাঁর

চোখ নিয়ে সভাগৃহের সব স্থান নিরীক্ষণ করে দেখলেন, কিন্তু যাঁকে খুঁজলেন, তাঁকে পেলেন না। তিনি সেখানে নাই। তাঁর পক্ষে কী সাংঘাতিক মুহূর্ত!

অগত্যা সতী হতাশ হয়ে সভাগৃহের মধ্যস্থলে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এবং এই বলতে বলতে তাঁর হাতের মালা শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন, "আমি যদি সত্যিই সতী হই, তবে, হে শিব! তুমি আমার এই মালা গ্রহণ করো!" দেখা গেল, শিব সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তাঁর গলায় দুলছে সতীর মালা।

দক্ষ ক্রোধে স্তম্ভিত, কিন্তু তিনি কি করতে পারতেন? রাজকন্যার পছন্দই শেষ কথা। সুতরাং, বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করতে হোল। যাই হোক, অনুষ্ঠান শেষে দক্ষ সতীকে কাছে ডেকে বললেন চীৎকার করে, "অবাধ্য সন্তান! তুমি নিজেই স্বামীরূপে একজন ভিখারীকে পছন্দ করেছ। এখন যাও, তার স্ত্রী হয়ে সংসার কর, কিন্তু আর কোনদিন এখানে ফিরে এসো না, আমার মুখও দেখো না!"

শিব সতীকে নিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন ও সতী তার বালিকা বয়সের যত স্বপ্ন ও প্রার্থনার মধ্যে সুখের কল্পনা করেছিলেন, তার চেয়েও সুখী হলেন। যাই হোক, একদিন নারদ মুনি তাঁর পাটলবর্ণের পোশাক পরে গুরুতর কোন সংবাদ নিয়ে এসেছেন এমন গম্ভীর মুখে এসে হাজির হলেন। তিনি শিবের কাছে গিয়ে বসলেন কথা বলার জন্য। শিব তখন বাঘের চামড়ার আসনের উপর বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন। নারদ যখন বুঝলেন যে তিনি শিবের নজরে আসতে পেরেছেন, তখন কথা বলা শুরু করে দিলেন, "হুম্, তোমার শ্বশুর দক্ষ একটি সুন্দর উৎসবের আয়োজন করছেন। রাজকীয় সমারোহের সঙ্গে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে, আর তার সমুদ আত্মীয়স্বজনকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন।"

"খুব ভালো কথা",—শিব নিরাসক্ত হয়ে উত্তর দিলেন।

"কিন্তু তোমাকে তো নিমন্ত্রণ করেনি!"—নারদ শিবের দিকে চোখ রেখে ঔৎসুক্যের সঙ্গে বললেন।

"না," শিব বললেন, "সেটা কি ভালো হয়নি?

"কী বলছো!" নারদকে বিভ্রান্ত দেখাল; "তুমি এতে অপমান মনে করো না, মহাদেব উপস্থিত থাকবে না অথচ রাজকীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে, এ কী সাংঘাতিক ধর্মীয় অসম্মান নয়!"

শিব ক্লান্তস্বরে বললেন, "ওঃ, সকলে যদি আমাকে সবকিছুর বাইরে রাখে, তাহলে বোধ হয় জগৎসমূহ সৃষ্টির ও ধ্বংসের দায়িত্ব থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি, আর অনন্ত ধ্যানের মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজেকে বিস্মৃত হতে পারি!"

নারদ বুঝলেন, এই ধরনের আলোচনা থেকে তাঁর কোন লাভ হওয়া অসম্ভব, এটা স্পষ্ট। বরং শান্তিতে থাকতে দেওয়ার জন্য মহাদেব তাঁর শ্বশুরের প্রতি বেশ কৃতজ্ঞই ছিলেন, মনে হোল।

সুতরাং নারদ সংবাদটি সতীকে দেওয়ার জন্য ফিরে চললেন। সংবাদ শুনে সতীর মধ্যে নারীসুলভ কৌতূহল জেগে উঠলো তৎক্ষণাৎ। তাঁকে নারদ হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি জানতে চাইলেন প্রস্তুতিপর্ব ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের

কথাও ঠিক ঠিক কীভাবে যজ্ঞ ও ভোজনপর্বের ব্যবস্থা ইত্যাদি হচ্ছে, এইসব কথা। শেষে বললেন, "আমি কিন্তু যাবই।" এই বলে তিনি স্বামীর খোঁজে চললেন, আর নারদ নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, ঘটনা ঘটতে চলেছে, তিনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লেন।

কৈলাসে কেবল সতী শিবের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি যেতে চাই ও উৎসব দেখতে চাই!"

শিব বললেন, "কিন্তু, তোমাকে তো নিমন্ত্রণ করা হয়নি!"

"না, কোন মেয়েই তার বাপের বাড়িতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণের প্রয়োজন বোধ করে না।" সতী যুক্তি দেখালেন।

শিব বললেন, "হাঁ, তবু, প্রিয়তমা, তুমি কিছুতেই যাবে না! আমার আশংকা যারা আমাকে ঘৃণা করে, তারা তোমাকে সাংঘাতিক অপমান করবে।"

তখন মহাদেবের চোখের সামনে সতীর মুখ ও আকৃতির পরিবর্তন হতে শুরু করলো। মহাদেব বলেছেন, "কিছুতেই যাবে না!" সতী এখন তাঁকে দেখিয়ে দেবেন, তিনি কে এবং কী, কে মহাদেবকে ভালবেসেছে আর পূজা করেছে। তখন তিনি কয়েকটি বিরাটও ভয়ংকরী রূপ ধারণ করলেন। শিবের সামনে আবির্ভূতা হলেন সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গারূপে, বিশ্বের রানী ও কেন্দ্রশক্তি। তিনি দেখালেন নিজেকে জগৎসমূহের করুণাময়ী জগদ্ধাত্রীরূপে। তিনি মৃত্যুর দেবী ভয়ংকরী কালী মূর্তি ধারণ করলেন। ভীত কম্পিত মহাদেব তাঁর সামনে নিজেরই সমান মনে করে তাঁকে পূজা করলেন। তখন তিনি আবার সেই আগের রূপ নমনীয়া অনুরাগিণী সতীতে রূপান্তরিত হলেন। সাধারণ স্ত্রী যেমন স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করে, তেমনই বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "তুমি যদি বল, আমাদের সাংঘাতিক ঘটনার মধ্যে পড়তে হবে, তাহলেও মানুষকে একজন সর্বগুণময়ী স্ত্রী কিরূপ হওয়া উচিত, তা দেখানোর জন্য এসব ঘটনা ঘটতেই হবে। অধিকন্তু, কঠোর বাক্য আমাকে কি আঘাত দিতে পারে? আমিই সেই, যে সব বিষয় ও সত্তা ধারণ করে আছে তার হৃদয়ে!"

নতি স্বীকার করলেন শিব। সতী তখন পুরাতন অনুগামী নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সেই বুড়ো ষাঁড়টার উপর চড়ে ভিখারীর স্ত্রীর ছিন্নবস্ত্র পরে পিতা দক্ষের রাজপ্রাসাদের দিকে যাত্রা করলেন।

অবশেষে, সেখানে পৌঁছে সতী যজ্ঞভূমির বিরাট কক্ষে গিয়ে ঢুকলেন। মাত্র কয়েক বছর আগেকার তরুণী ও সুন্দরী সতী এখন আরও তরুণী এবং সুন্দরী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর অদ্ভুত সাজসজ্জা দেখে সমবেত অতিথিরা উচ্চহাস্যে অভ্যর্থনা জানালো তাঁকে। তারা সকলে তাঁরই বোনেরা, মূল্যবান পোশাক ও রত্নালংকার পরে প্রত্যেকেই সিংহাসনের উপর নিজের নিজের স্বামীর বাম পাশে বসে আছে।

যজ্ঞসভার একপ্রান্তে পুরোহিত ও সম্ভ্রান্তদের মধ্যে দক্ষ হোমের কাজ শুরু করতে তখন উদ্যত হয়েছেন। সতী সেখানে গিয়ে তাঁর বাবার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই দক্ষ ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন। বললেন, "এই ভিক্ষুকের স্ত্রী! তুমি কেন এসেছ এখানে? আমি কি তোমাকে অভিশাপ দিইনি, তাড়িয়ে দিইনি আমার সামনে থেকে?

সতী ভক্তিমতী হয়ে বাবার পাদস্পর্শ করার জন্য মাটিতে মাথা নত করতে গিয়ে বললেন, "বাপের দেওয়া অভিশাপ সৎসন্তানের পক্ষে আশীর্বাদ।"

দক্ষ উত্তর দিলেন, "সৎ কন্যারা কখনো ভিখিরীদের পছন্দ করে বিয়ে করে না! তোমার সেই স্বামীটি কোথায়? সে একটা চোর, বদ্‌মায়েস, অসৎ, অসাধু, মেয়ে-চোর!"

দক্ষ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি শেষ করার আগেই সতী লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন, উঠে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে, তাঁর সৌন্দর্য ও দুঃখ মিশে তাঁকে অপূর্ব সুন্দর দেখাল। তাঁর একটি হাত উপরে উঠলো, যেন বলতে চাইলেন, "ক্ষান্ত হও!"

তিনি বললেন, "বাবা, এই ধরনের কথা কোন সাধ্বী স্ত্রীর কান দিয়ে শোনাও উচিত নয়। যে কান তোমার কথাগুলি শুনেছে; সে তোমার দেওয়া। তুমি আমার জীবন দিয়েছ, দিয়েছ এই শরীর। তাহলে, এই জীবন ফিরিয়ে নাও! আর একবার তোমার দেওয়া জীবন তোমারই হোক! এই অসম্মানের বিনিময়ে আর এক মুহূর্তও এ জীবন আমি ধরে রাখতে চাই না।"

তারপর দক্ষের পায়ের তলায় পড়ে গেল সতীর মৃতদেহ। উপস্থিত সকলে আতঙ্কে উঠে দাঁড়ালেন, এমনকি দক্ষ নিজেও পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন, নিজেরই বাক্যের পরিণাম দেখে তিনি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত। কিন্তু আর কোন আশাই ছিল না। সতীর সুন্দর ও বিশ্বস্ত আত্মা সত্যিই পলাতকা!

তখন তাঁদের পুরাতন অনুগামী নন্দী শিবকে কৈলাসে গিয়ে সব ঘটনা জানাবার জন্য দ্রুত রওনা হয়ে পড়লো। বেরোবার পথে দরজার মুখে শরীরের সবগুলি প্রত্যঙ্গ কাঁপিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো নন্দী, "হে দক্ষ, তুমি যদি এইসব কার্যকলাপ থেকে রক্ষা পাও, তবু তোমার শরীরের উপর ছাগলের মাথা নিয়ে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে!" এই বিরাট মুহূর্তগুলিতে মানুষ সত্যকে দেখতে পায়, এমনকি ভবিষ্যতের মধ্যেও।

কৈলাসে শিবকে ধ্যান থেকে জাগানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। শেষপর্যন্ত তিনি নন্দীর বক্তব্য শুনলেন ও বুঝতে পারলেন কি ঘটেছে। তাঁর ক্রোধ এবং দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকলো না। মাথার উপর হাত তুলে তিনি একটি চুল ছিঁড়ে আনলেন ও নিজের সামনে মাটির উপর নিক্ষেপ করলেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এক দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠলো। তাঁকে শিব তাঁর বাহিনীর প্রধান সেনাপতি করলেন। তারপর তিনি তাঁর জটা নাড়া দিলেন, আর সেই জটা থেকে বেরিয়ে এল বামন, দৈত্য ও সৈন্যদের একটি পুরোবাহিনী। তারা সকলে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়ালো তাদের নেতার পিছনে, আর তাদের নেতা মহাদেবের পিছনে। তারপর তারা দল বেঁধে দক্ষের বাসভূমির দিকে শৃঙ্খলার সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেল।

তারা সেখানে পৌঁছেই দক্ষের মাথা কেটে ফেললো আর রাজপ্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। কিন্তু শিব সোজা চলে গেলেন সতীর দেহের কাছে ও ভক্তিভরে তাঁর দেহ কাঁধের উপর তুলে নিয়ে স্থান ত্যাগ করে আসতে উদ্যত হলেন।

এই মুহূর্তে একজন নারী এসে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ে পূজা নিবেদন করলেন। অবশেষে তার কান্নার শব্দ শোকে মাতাল শিবের কানে গেল। তিনি বললেন, "বলো! কে তুমি আমাকে পূজা করছো?"

"আমি সতীর মা।"

"মা, তোমার কি বলার আছে?" শিব শান্তস্বরে বললেন। "শুধু তোমার দয়া। তুমি আমার স্বামী দক্ষের জীবন ফিরিয়ে দাও!" মহাদেব তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে বললেন, "বেশ, তিনি বেঁচে উঠুন!" তাঁর অনুগত সেবকরা দক্ষের জীবন আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন।

কিন্তু দক্ষের মাথা ছিল না, আর, তাঁর নিজের মাথাটা খুঁজেও পাওয়া গেল না। সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ বলি দেওয়ার জন্য কাটা ছাগলের একটি মাথার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "ওটা হলেই সুন্দর হবে।" কেউ একজন কাটা ছাগলের মাথাটা এনে দক্ষের মুণ্ডহীন দেহের উপর বসিয়ে দিল। নন্দী যেমন বলেছিল; দক্ষের জীবনে সত্যি সত্যি তাই ঘটে গেল। রক্ষা পেলেও, দেহের উপর ছাগলের মুণ্ড নিয়ে তাঁকে বেঁচে উঠতে হোল।

এদিকে শিব সতীর দেহ নিয়ে দেবতার শোকস্তব্ধ বেদনায় দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। তিনি পৃথিবীর উপর ইতস্তত ঘুরতে লাগলেন। তাঁর চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগ্নেয়গিরির দাহ, পদক্ষেপে কেঁপে উঠছে জগৎ। তখন ধ্বংসের হাত থেকে মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করার জন্য বিষ্ণু এসে দাঁড়ালেন শিবের পিছনে এবং সতীর মৃতদেহের দিকে তাঁর চক্র ঘোরাতে থাকলেন। মৃতদেহটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত বাহান্নটি টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। শিব যখন তাঁর কাঁধের উপর আর কোন ওজন অনুভব করলেন না, ফিরে গেলেন কৈলাসে, আবার ডুবে গেলেন তাঁর সেই নির্জন ধ্যানের একাকীত্বের মধ্যে।

কিন্তু, আবার কেমন করে সতী গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে উমা হয়ে জন্মালেন, কেমন করে আবার তিনি মহাদেবের প্রেমের জন্য প্রতিযোগিতা করলেন, এবং সতীর প্রতি তাঁর হৃদয়ের একান্ত অনুরাগের জন্য কেমন করে শিব উমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এক পলকের দৃষ্টিপাতে মদনকে ভস্মে পরিণত করলেন, এসব কথা কি মহাকবি কালিদাসের মহান কাব্য "কুমারসম্ভবম্"-এ (যুদ্ধ দেবতার জন্ম) নাই?

উমা হৈমবতীর কাহিনী

সতী আবার জন্ম নিলেন রাজকন্যা উমা রূপে। দেবলোকে, আমাদের দীর্ঘসময়, তাঁদের মাত্র একটি দিনের মত অতিবাহিত হয়। জন্ম থেকে শিশুকাল পর্যন্ত ও শিশুকাল থেকে নারীত্ব লাভ পর্যন্ত আমাদের হিসাবে যে ক'বছর সময় লাগে, উমার কাছে তা অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার। তিনি ভালভাবেই জানতেন, তিনি কে, এবং স্মরণ রেখেছিলেন যে, শিবকে জয় করে চিরকাল তাঁর সঙ্গিনী হবার জন্যই তিনি জন্মেছেন।

এ জন্মে তিনি পিতারূপে এমন একজনকে পছন্দ করেছেন, যিনি মহাদেবকে ভালবাসেন এবং তাঁকে জামাই হিসাবে পেলে নিজেকে গভীরভাবে সম্মানিত বোধ করবেন, তিনি স্বয়ং গিরিরাজ হিমালয়। উমা তার সততার জন্য খুব ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ ছিলেন। তিনি যে শুধু বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কর্তব্য শেষ করতেন, তাই নয়, যেসব পবিত্র আচার শিব ভালবাসতেন, সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। কিন্তু পূজা-অর্চনা ও কঠোর উপবাসের মধ্যে তাঁর এত দীর্ঘ সময় কেটে যেত যে, তাঁর মা উমার শরীর নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উমার জীবনটুকুও চলে যেতে পারে এই ভয়ে প্রায়ই তাঁকে এইসব বন্ধ করার জন্য অনুনয় বিনয় করতেন। কিন্তু, রাজকন্যা দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর কর্তব্যে অটল রইলেন, কারণ, তিনি জানতেন, তিনি সুন্দরী হলেও তাঁর এই জীবনের কঠিন সমস্যা কি করে সতীর স্মৃতি শিব ভুলে যেতে পারেন, তাঁর দিকে তাকানো তো দূরের কথা। উমা ঠিক করলেন, তাঁর আত্মা ও ইচ্ছার অনুশীলনের জন্য, তিনি সব শক্তি নিয়োগ করবেন। এসব সত্ত্বেও, তাঁর লাবণ্য দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। এবং এটা আদৌ বিস্ময়কর মনে হবে না, যদি তোমরা তাঁর বাসস্থান সেই মনোরম পর্বতরাজি দেখতে পেতে। যেখানে সারা রাত্রি আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা চিরহরিৎ বৃক্ষশ্রেণী, আর বুনো গোলাপ ও লাল ডালিম ফুল ফুটে থাকে সারা গ্রীষ্মঋতু, তাদের বিকশিত সৌন্দর্যে ভরে থাকে পরিবেশ। কত সুন্দর গাছ, উপাদেয় ফল, আর কত প্রচুর ফুটে-থাকা বুনো ফুলের বাহার! সেখানে পশু পাখীরা তাদের অস্তিত্বের জন্য অবিরাম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। সেখানে অনমনীয় বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়া যেমন অপূর্ব, তেমনই অপূর্ব নীচের বনজঙ্গলের সৌন্দর্য।

যদি দিবারাত্রি এই সৌন্দর্যে চোখ কান ভরে থাকে, তাহলে একজন কুমারী কন্যার এই লাবণ্যসুধা পান করে দিনে দিনে জীবনীশক্তির নিকটতর না হয়ে উপায় কী?

কিন্তু তাঁর মনোমুগ্ধকর ফিকে সোনালী আভাযুক্ত গায়ের ত্বক ছিল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বস্তু, তাই হিন্দু নারীদের কাছে এত বেশি প্রশংসিত। প্রকৃতপক্ষে, এজন্য তাঁর খ্যাতি এতদূর ছিল যে, আজকাল কেবল ভারতে রানীরাই সোনার তৈরি নূপুর বা অলংকার পায়ের সজ্জা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, আর কেউ নয়। সাধারণ নারীরা ব্যবহার করে রুপো, কারণ, হলুদ উমার গায়ের রং, এর সঙ্গে পায়ের স্পর্শ পবিত্রতার শুচিতাকে নষ্ট করে।

উমার বয়স যখন প্রায় আঠারো হয়ে এল, তখন তাঁরই মতো তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দেবতারাও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এ বিষয়ে তাঁদের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গেল এইভাবে: কিছুদিন আগে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দৈত্যদের একজনকে অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী করে তাকে বিরাট অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ব্রহ্মার এই বরের শক্তিতে ঐ দৈত্য খুবই অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং ক্ষুদ্রতর দেবতাদের সিংহাসন অন্যায়রূপে দখল করে নিতে উদ্যত হয়েছিল। দেবতারা সবাই ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আপত্তি জানিয়ে সব কথা তাঁকে বললেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁদের দুঃখের কাহিনী শুনে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বললেন, "যে আমার বন্ধুত্ব পেয়েছে, তোমাদের ভুলের জন্য আমি তার উপর প্রতিশোধ নিতে পারি না। তোমরা কি এই প্রবাদটি জানো না যে, যে একটি বিষবৃক্ষ নিজে রোপন করে, সে নিজে সেটিকে ছেদন করতে পারে না? কিন্তু আমি ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে যা দেখতে পাচ্ছি, শিব যদি আর কাউকে না বিয়ে করে একমাত্র রাজকন্যা উমাকেই বিয়ে করে, তবে তিনি এমন এক পুত্র-সন্তানের পিতা হবেন, যে সন্তান স্বর্গের সেনাবাহিনীর সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ জয় করবে। তোমরা যত শীঘ্র সম্ভব যদি এই বিয়ের ব্যবস্থা করতে পার, তত শীঘ্র যুদ্ধের দেবতার জন্ম নিকটতর হবে।"

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বজ্রের মত কণ্ঠস্বর মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল আর দেবতারা ইতি-কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ করতে বসলেন। শেষে ক্ষুদ্রতর দেবতাদের প্রধান ইন্দ্র প্রেমের দেবতা (ভারতীয়) মদনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

মদন ও তাঁর স্ত্রী রতি বাড়িতেই ছিলেন, আর, তাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সৈনিক বসন্ত, তিনজনেই ইন্দ্রের অনুরোধ কান দিয়ে শুনলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছা, প্রেমের দেবতা মদন শিবের হৃদয় লক্ষ্য করে তাঁর অদৃশ্য বাণ নিক্ষেপ করুন।

মদন যখন বুঝতে পারলেন তাঁর করণীয় কাজ কী, তখন এই দীর্ঘকায় সুন্দর তরুণ দেবতা বিবর্ণ হয়ে গেলেন। দেবলোকে এই বিশ্বাস বলবৎ ছিল যে, মহান দেবতা শিব তুচ্ছ নশ্বর দুর্বলতার উর্ধ্বে, এবং তাঁর হৃদয়ে মানবিক প্রেমের সঞ্চার করার প্রচেষ্টাজনিত ঔদ্ধত্যের পরিণাম মারাত্মক, এমনকি এইসব আমুদে প্রকৃতির আত্মার পক্ষেও। তাঁরা ভয় করলেন, তাঁরা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারেন এবং মহাদেবের ক্রোধের আগুনও জ্বলে উঠতে পারে।

তবু, আকাশের দেবতা ইন্দ্রের প্রতি তাঁদের প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁর কাছে তাঁদের অনেক ঋণ। তাঁর সেবার জন্য তাঁরা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। শেষে মদন বললেন, "যদি বসন্ত আগে থেকে উপস্থিত হয়ে আমাকে সাহায্য করে, যা সে এতকাল করে এসেছে, তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

যাই হোক, জোর করে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে ইন্দ্র উঠে চলে গেলেন এবং যাওয়ার আগে বলে গেলেন, কোন তরুবীথির মধ্যে মহাদেবকে পাওয়া যাবে।

এখন, মদন মহাদেবের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন, বসন্ত তার আগেই চলে গিয়েছে। বসন্ত যতই এগোতে থাকলো ও তাঁর হাতের দণ্ড দোলায়িত হতে থাকলো, বনের যত শুকনো গাছ, যেগুলিতে কখনো একটি সবুজ পাতাও ছিল না,

সেগুলিতে রাশি রাশি ফুল ফুটে উঠলো! তারপর ঢুকলেন মদন ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী রতি এবং প্রাণিসমূহের সৌহার্দ্যে অরণ্যজগৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। পাখিরা নিজেদের মধ্যে গলা কাঁপিয়ে গান গেয়ে উঠলো. বুনো হরিণেরা পাশাপাশি দল বেঁধে বনের জলাশয় থেকে বেরিয়ে এল জল খেয়ে, বাতাসে ভেসে উঠলো মৌমাছিদের গুঞ্জন; এই সুন্দরের প্রভাবে ফুলগুলিও আনত হোল, নতমুখ কুঁড়িগুলি এগিয়ে এল আরও কাছে।

স্বয়ং ধনুর্ধারী প্রেম তাঁর বন্ধু বসন্তের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এসে গেলেন বনের কেন্দ্রস্থলের নিকটে এবং তিনি যা খুঁজছিলেন, তা পেয়ে গেলেন। দেখলেন, এক বিরাট প্রাচীন চিরসবুজ গাছের তলায় একটা কালো চিতাবাঘের বিছানো চামড়ার উপর বসে তিনি ধ্যানমগ্ন। পরমুহূর্তে একজন বৃদ্ধ মানুষ এগিয়ে এসে হাত তুলে বললো, "ক্ষান্ত হও!" ইনি নন্দী। তৎক্ষণাৎ বনের সব কিছুর উপর নেমে এল স্তব্ধতা। বনভূমি যেন শূন্যে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হয়ে গেল। গান গাইবার জন্য গাছের ডালে বসে পাখিরা গলা খুলেছিল, তাদের গলা থেকে আর শব্দ বেরুলো না। ডানায় ভর করে ভেসে-থাকা কীটপতঙ্গরা গতিহীন হয়ে গেল। মদনের ফুলধনু থেকে মধুপানের আশায় উড়ে-আসা মৌমাছিরা ঘন কালো রেখার মতো ধনুকের উপর বসে থাকলো, অথবা ঢেকে থাকলো তূণীর, ফুলের তৈরি অবগুণ্ঠনের মতো, যেন মৃত্যুর মতো স্থির।

তারপর মদন ঐ চিরসবুজ গাছের নীচে একটি উজ্জ্বল সাদা রূপকে আকৃতির মধ্যে দেখলেন। স্বয়ং শিব, যাঁকে তিনি চেয়েছিলেন। গাছের তলায় গতিহীন স্তব্ধতার মধ্যে মহাদেব ধ্যানে সমাধিস্থ। তাঁর কপালের মাঝখানে একটি অস্পষ্ট কুঞ্চিত কালো রেখাও কিছুটা কম্পিত। মদনের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হোল, কারণ, তিনি বুঝতে পারলেন, এই সেই বিখ্যাত তৃতীয় নয়ন, যা থেকে যে কোন মুহূর্তে আগুনের হল্কা বেরিয়ে আসতে পারে। মদন জানতেন না, কখন যে এই নয়ন উন্মুক্ত হতে পারে! এই সুযোগই খুঁজছিলেন তিনি, তবু তিনি শর নিক্ষেপ করতে সাহস করলেন না, যেহেতু যার জন্য তিনি মহাদেবের হৃদয়ে প্রেম জাগিয়ে তুলবেন, এমন প্রেমের পাত্রী আশে পাশে কেউ ছিলেন না। আরোপ করা আচ্ছন্ন অবস্থা ভেঙে ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল বনের সজীবতা, এবং এই পরিবেশের মধ্যে মদন যাঁর সাহায্য প্রত্যাশা করছিলেন, তাঁকে দৃশ্যের মধ্যে পেলেন। এক পরমাসুন্দরী কন্যা প্রবেশ করলেন বনে, এমন রূপ আগে কখনও দেখেননি মদন। তাঁর রীতি ও আচরণ রাজকীয় ও পরনে প্রার্থনার জন্য রেশমী পোশাক। ইনিই উমা, পর্বতসমূহের কন্যা, এসেছেন শিবকে তাঁর সকালের পূজা নিবেদন করতে।

তিনি যখন মহাদেবের পায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, ক্ষীণতনু তরুণ ধনুর্ধারী তখন নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন গাছের আড়ালে। মহাদেবের অস্তিত্বে আত্মহারা উমা তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মহাদেব তাঁর চোখ খুলে পূজারিণীর প্রতি মৃদু হাসলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে দুঃসাহসী মদন তাঁর ধনুতে টান দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে প্রস্তুত

হলেন। দুর্লভ একটি মুহূর্তমাত্র, তবু চকিতে মহাদেবের মনের মধ্যে এই চিন্তা ঢুকে গেল, কুমারীর ঠোঁট দুটি কী গভীর লাল! তারপর, এই কল্পনাটুকু সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করার আগেই একটা তীব্র ঘৃণার শিহরণ নিজের উপর দ্রুত বয়ে গেল। সেই বিরাট তৃতীয় নয়ন এখন উন্মুক্ত, আর ধরতে পেরেছে এই নিষ্ফল আবেগের উৎস, যেখানে দুঃসাহসিক অভিযানের দেবতা তাঁর শর নিক্ষেপ করতে উদ্যত। ভস্মে পরিণত হলেন মদন, এক মুঠো ছাই পড়ে থাকলো মানুষের আকারে।

এক মুহূর্ত পরেই শিব সেই গাছের তলা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য নতজানু উমা পড়ে থাকলেন একাকিনী।

কিন্তু বনাঞ্চল ভরে গেল প্রেমের সুন্দরী পত্নী রতির এই করুণ বিলাপে, যার কোন সান্ত্বনা ছিল না যে, ক্রোধের একটিমাত্র আকস্মিক অগ্নিশিখায় মদনের সঙ্গে তাঁকেও ধ্বংস করা হ'ল না। তিনি তাঁর স্বামীর বন্ধু বসন্তকে ডেকে চিতাসজ্জা প্রস্তুত করতে বললেন, যে চিতাসজ্জায় তিনি নিজেও স্বামীর সহগামিনী হবেন। এমনই মুহূর্তে, যাই হোক, অরণ্যের মধ্য থেকে ভেসে এল ইন্দ্রের কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন, "প্রিয় নারী! হঠকারিতা করে কিছু করে বসো না। এ কথা সত্য যে, কিছুক্ষণের জন্য তুমি তোমার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ। কিন্তু তিনি যে কাজের সূচনা করে গেলেন, কয়েক মাসের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে। মহাদেব যখন উমাকে বিয়ে করবেন, তিনি তাঁর অযাচিত কৃপা থেকে মদনের জীবনও আবার ফিরিয়ে দেবেন। শুধু ধৈর্য ধরো!" এই কথার পর বসন্তও রতিকে ইন্দ্রের কথা বিশ্বাস করে ধৈর্য ধারণ করার জন্য বোঝালেন।

[*খুব সত্য কথা যে, কয়েক মাস পরেই রতিকে তাঁর স্বামীর আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মদনের দেহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেই হেতু মানুষও দেবতাদের মধ্যে প্রেমের গতিবিধি অদৃশ্য।*]

এবং, বনের মধ্যে একাকিনী পরিত্যক্তা উমা উপলব্ধি করলেন যে, সতীকে মুহূর্তের জন্যও ভুলিয়ে দিতে তাঁর স্বামীর উপর তাঁর সব সৌন্দর্যের প্রভাব ব্যর্থ হয়েছে। তাই, তিনি আরও শক্তিশালী এবং আশ্চর্য ভিন্ন ধরনের প্রার্থনার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত হলেন।

তখন তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে লোকালয় থেকে অনেক দূরে আশ্রমে বাস করার জন্য চলে গেলেন। তাঁর পোশাক হল কর্কশ ঘাসের তৈরি মেখলা ও বার্চ গাছের ছালের আবরণ। আর কিছু নয়, এইসব। তিনি অনাবৃত ভূমির উপর শুয়ে ঘুমোতেন শুধুমাত্র সেটুকু সময়, যে সময়টুকুমাত্র তিনি শিবের নাম জপ করতেন না। তাঁর ডান হাত চিহ্নযুক্ত হল এবং অবিরাম জপমালা ব্যবহারের ফলে অবসন্ন হয়ে এল। তাঁর চুলে জট পাকিয়ে গেল, এবং মনে হল খাদ্যের জন্য তিনি কোন চিন্তাই করছেন না।

জীবনের এই ধারা কতদিন বয়ে চলবে, তা তিনি নিজেই জানতেন না। এমন দিনে একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক ঐ পথে যাওয়ার সময় খাদ্য ভিক্ষার জন্য তাঁর আশ্রমের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

উমার যদিও নিজের কোন সন্তান ছিল না, তবুও, সর্বদাই অন্যের প্রয়োজনে দয়ালু ছিলেন মায়ের মতই, তাই তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা এনে দিলেন। দেখা গেল, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক তাঁর প্রাপ্য পেয়েও চলে না গিয়ে কথা বলে কিছু সময় কাটাতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি বললেন, "ভদ্রে, কার জন্য জীবনে এই কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত উদ্‌যাপন করে চলেছেন? আপনি তরুণী এবং সুন্দরী। আমার মনে হয়, আপনি কোন বৃদ্ধের মত বা হতাশগ্রস্তের মত জীবন যাপন করে চলেছেন। কার প্রেম আপনাকে এরূপ জীবন যাপনে আকৃষ্ট করেছে?"

উমা বললেন, "আমার হৃদয়ের সবটুকুই শিবের জন্য।"

"শিব!" ভিক্ষুক বলে উঠলেন, "কিন্তু, তিনি নিশ্চয়ই একজন অদ্ভুত ব্যক্তি! কারণ, তিনি দরিদ্রের চেয়েও দরিদ্রতর এবং কল্পনারও কল্পনাবিলাসী। ভদ্রে, আমি প্রকৃতই বিশ্বাস করি, আপনার হৃদয় নিশ্চয় সেই পাগলকে দিয়ে বসেননি!"

উমা শান্তভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আঃ, আপনি জানেন না, তাই এরকম কথা বলছেন। মহতের কার্যকলাপ প্রায়ই সাধারণ মনের নাগালের বাইরে। মহাদেবের পথ আপনার জ্ঞানেরও উর্ধ্বে।"

ভিখারী জিদ্ ধরলেন, "কিন্তু, বিশ্বাস করুন, আমি জ্ঞানের কথাই বলছি। যে আপনার প্রেমের যোগ্য নয়, তার জন্য বৃথা চেষ্টা করে আপনার জীবন আর নষ্ট করবেন না। শিবের চিন্তা ত্যাগ করুন। আপনি যেরূপ মনে করেন, তিনি যদি তা-ই হন, তিনি তার যোগ্য..."

উমা বলে উঠলেন, "থামুন! আপনাকে অনেক কথা বলতে দিয়েছি, আমি আর আপনার একটি কথাও শুনতে চাই না,"—এই বলে তিনি চলতে উদ্যত হলেন।

তিনি তাঁর পা তুলতে চলেছেন, দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরিয়ে নেননি তখনও, রাজকন্যা উমা দেখলেন ব্রাহ্মণের অবয়ব অতর্কিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। উমার শরীর যেন মাটির সঙ্গে শেকড়-গাঁথা হয়ে থাকলো। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্চয় কোন ভুল হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু শেষে বিশ্বাস করতে হল। সৌন্দর্য যা সম্পন্ন করতে পারেনি, উপবাস ও জাগরণের ফলে তাই সম্ভব হ'ল। যে ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ, তিনি স্বয়ং মহাদেব ছাড়া আর কেউ নন।

ভারতীয় অ্যাল্‌সেস্‌টিস্‌ সাবিত্রী

অ্যাল্‌সেস্‌টিস্‌-এর মতো কিছু গ্রীস দেশীয় গল্প আছে, যা আমরা খুবই ভালবাসি। প্রত্যেকেরই স্মরণে আছে, তাঁর স্বামী অ্যাড্‌মেটাস্‌ কিরূপে অভিশপ্ত হয়েছিলেন ও যতক্ষণ না কেউ তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল তাঁকে জীবন বিসর্জন দিয়ে প্লুটোর অন্ধকার রাজত্বের আশ্রয়ে চলে যেতে হোত। এবং, কেউই ভুলতে পারে না, অ্যাড্‌মেটাসের জীবন রক্ষা পেতে পারে, এজন্য মৃত্যুবরণ করাও তুচ্ছ কাজ ছিল, অন্তত এমন একজন ছিলেন। এই একজন আর কেউ নন, তাঁর স্ত্রী এ্যাল্‌সেস্‌টিস্‌। তাই এই সাহসী-হৃদয়া মহিলা সূর্যের আলো পিছনে ফেলে একা চলে গেলেন মৃত্যুর রাজত্ব সেই পাতালপুরীতে।

তখন অ্যাড্‌মেটাসের সুবৃহৎ কক্ষে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুঃখ এবং শোকের ঝড় বয়ে গেল, যতক্ষণ না সেখানে একজন আগন্তুক এসে পৌছলেন, যাঁর শক্তি নশ্বর মানুষের উর্ধ্বে ও যাঁর হৃদয় ছিল সকলের দুঃখের নিকট উন্মুক্ত। তিনিই শক্তিমান হেরাক্লেস্‌। অ্যাড্‌মেটাসের দুঃখে দয়ালু হয়ে তিনি পাতালপুরীতে চলে গেলেন ও ফিরিয়ে আনলেন তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রীর আত্মা। এইভাবে, অভিশাপ থেকে মুক্তি ঘটলো ও মানুষের শক্তিতে পরাস্ত হোল মৃত্যু স্বয়ং। অ্যাল্‌সেস্‌টিস্‌ আবার তাঁর স্বামী অ্যাড্‌মেটাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে বসবাস করলেন ও বহু বছর পরে পাকা শস্য যেমন শস্যাগারে চলে যায়, তেমন দুজনেই জীবন কাটিয়ে চলে গেলেন মৃত্যুর ওপারে, এবং একত্রে মিলিত হলেন তাঁদের পিতৃপুরুষের সঙ্গে।

এই গল্পের মধ্যে নারীদের সম্পর্কে গ্রীকদের চিন্তার বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। আমরা শিখি যে, যদিও সাধারণভাবে নারী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশি দুর্বল, এবং পুরুষের আশ্রয় তাদের প্রয়োজন, তবু অন্যের প্রতি তাদের ভালবাসার শক্তিতে সিংহের মত সাহস ধরতে পারে ও যে বিপদের সামনে পুরুষ ভয়ে কুঁকড়ে যায়, সেই বিপদের মুখোমুখি আনন্দের সঙ্গে দাঁড়াতে পারে, এটা গ্রীকরা জানতো।

ভারতেও তার নম্র সাদা অবগুণ্ঠনবর্তী নারীদের মধ্যে তাদের সব শান্ত লাবণ্য সত্ত্বেও ঐ একই সাহস, একই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এটাও জানা আছে, ভীরু স্বভাবের কোন বালিকা, সতী কিংবা উমার মতো রক্তমাংসের শরীরে কোন প্রচ্ছন্ন স্বর্গীয় চরিত্র নয়, সাধারণ মানুষেরই কন্যা ও কঠোর জগতের সঙ্গে পরিচয়ে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, সেও হঠাৎ সাহসিকা হয়ে উঠতে পারে ও অন্যকে রক্ষা করতে পারে। ভারতীয় লোকেরা জানে যে, একজন সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জন্য এমন কোন অন্ধকার নাই যার মধ্যে ঢুকতে পারে না, এমন কোন কষ্ট নাই, যা সে মাথা পেতে নেয় না, এমন কোন যুদ্ধ নাই, যা তার স্বামীর জন্য সে করতে পারে না। তবুও ভারতের আদর্শ নারীর কাহিনী অ্যাল্‌সেস্‌টিস্‌-এর কাহিনী থেকে অদ্ভুত রকমের পৃথক। পৃথকও বটে আবার একই সঙ্গে অনুরূপও বটে। শুধু শোন, তারপর তোমরা নিজেরাই বিচার করো।

রাজকুমারী সাবিত্রী ছিলেন সুন্দরী ও বিশেষ গুণবিশিষ্টা। তবুও জগৎ তাঁর নামোল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁর পবিত্রতার কথাই চিন্তা করে। তিনি তাঁর বাবা মায়ের প্রার্থনার শক্তি হিসাবেই এসেছিলেন জগতে। কারণ, তাঁর বাবা অশ্বপতি ও রানীর বিয়ের অনেক বছর পরেও তাদের কোন সন্তান হয়নি, আর, এজন্য তাদের দুঃখেরও অন্ত ছিল না। তাদের বয়সও বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, তবুও রাজা প্রতিদিন নিজের হাতে জ্বালাতেন উৎসর্গের আগুন, জাতীয় প্রার্থনা 'সাবিত্রী' আবৃত্তি করতেন, আর দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতেন একটি সন্তানের জন্য। একদিন তার পূজার মধ্যে তিনি যখন সাবিত্রী-গান করছিলেন ও গভীরভাবে দৈব ইচ্ছার কথা চিন্তা করছিলেন, তখন হঠাৎ আগুনের মাঝখানে তিনি দেখলেন একটি নারীর আকৃতি। তিনি সেই দেবী যিনি ভারতীয় প্রার্থনার মূল শক্তি এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন যে, রাজা ও রানীর একটি কন্যা হবে, যার অদৃষ্ট উন্নত ও প্রার্থনার নামেই যার নাম হবে। এইভাবে, রাজা ও রানীর ভক্তি থেকে রাজকন্যা সাবিত্রীর জন্ম।

সাবিত্রী কত ভাল ও কত তার শক্তি! দয়া ও নম্রতায় পূর্ণ, তবু তাঁর মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততা বা নির্বুদ্ধিতার কিছুই ছিল না। প্রতিটি সঙ্কল্পে স্থির ও সকলের প্রয়োজনে বিশ্বস্ত ও কঠিন প্রশ্নের নির্ভয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন তিনি। সাবিত্রী তাঁর বাবা, মা ও আর সকলেরই আদরের।

অবশেষে, সময় এল যখন সাবিত্রীর বাবাকে তাঁর বিয়ের কথা ভাবতে হোল। সাবিত্রীর বয়স এখন সতের কিংবা আঠারো এবং এখনো কোন বিয়ের প্রস্তাব আসেনি। তাঁর বাবা-মাও ভাবলেন সাবিত্রীর পক্ষ থেকে কোন্ রাজকুমারের কাছে নারিকেল পাঠিয়ে ইঙ্গিত দেবেন যে, রাজকুমারী তাঁর কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। যাই হোক, ঠিক এই সময়ে সাবিত্রী নিজেই একটি প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি এই যে, তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানের কোন চেষ্টা করার আগে, তাঁকে দীর্ঘ তীর্থযাত্রায় যেতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে একটি পর একটি পবিত্র মন্দিরে, বহু পবিত্র মানুষের আশীর্বাদ নিতে হবে ও তাঁদের উপদেশ শুনতে হবে, নিজের ইষ্টদেবীর সঙ্গে স্থাপন করতে হবে গভীর সংযোগ, এবং তারপর ফিরে এলে যদি দেখা যায় কোন গতিপথ নির্ধারিত হয়নি জীবনের, তখনও বিয়ের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার অনেক সময় থাকবে। কারণ, এসব ব্যাপার দৈবের অধীন, এবং বিয়ের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দ্রুত হস্তক্ষেপ করা ভাল নয়। প্রত্যেকেই এই ধারণাকে প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করলেন। সাবিত্রীর বাবার কোন কোন মন্ত্রীর মনে হোল যে, এই পথে সাবিত্রী একজন যোগ্য রানী হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারেন। তিনি দেশ ঘুরে দেখবেন ও দেশের পবিত্র ও জ্ঞানী মানুষদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। অন্যেরা হয়তো তাঁর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের উন্নতির কথা ভেবে থাকতে পারেন। সাবিত্রীর বাবা মা ভাবলেন, সাবিত্রী যেভাবে তাঁদের কাছে এসেছে, ঠিক সেইভাবে প্রার্থনার মধ্যেই তার স্বামীর গৃহে যাওয়া ঘটতে পারে।

সুতরাং, বিরাট প্রস্তুতিপর্ব শেষ হোল। পাকা-মাথা বৃদ্ধ মন্ত্রীদের বলে দেওয়া হলো, তাঁরা রাজকুমারীর উপর লক্ষ্য রাখবেন। সেবার জন্য পাঠানো হোল বহু-

সংখ্যক ভৃত্য। তাঁকে স্বর্ণমণ্ডিত একটি গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হোল, উজ্জ্বল লাল রং-এর পর্দায় চারিদিক ঢাকা, যার মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছু দেখতে পাবেন, অথচ তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। অনুচরবর্গ ও হাতির এক বিরাট বাহিনী অনুসরণ করতে থাকলো তাঁবু, আসবাবপত্র ও খাদ্য ইত্যাদি সহ। তাদের সঙ্গে একটি পাল্কীও থাকলো, বনের মধ্যে যখন গাড়ি ঢুকবে না, তখন সেই পাল্কীতে সাবিত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা যাত্রা শুরু করেছিল রাত্রির প্রথম লগ্নে, যখন নতুন চাঁদের উদয় হয়েছিল, যাতে তারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই উত্তপ্ত শুষ্ক সমতলভূমি অতিক্রম করে গিয়ে বনের কাছে পৌঁছতে পারে দিনের আগে। এর আগে রাজকুমারী কখনো এতদূর অবধি যাননি। তাঁর সারা জীবন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন রাজোদ্যানের মধ্যে, আর শহর ও নগর উদ্যানের মধ্যে ঘুরেছেন বন্ধ গাড়ির ভিতরে বসে। কিন্তু, তাঁর এ যাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন একা স্বাধীন একটি অভিযানে বেরিয়েছেন, আর কোথাও যেন তিনি এগিয়ে চলেছেন। প্রতিটি মুহূর্তের এগিয়ে যাওয়া যেন আনন্দময় কর্তব্যের পূর্ণতা। বাবা-মায়ের কাছ থেকে এই প্রথম সাবিত্রীর দীর্ঘ বিচ্ছেদ। তবুও তিনি সুখী ছিলেন। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো, শেয়ালের ডাক ও মধ্যরাত্রির আকাশ তাঁর আনন্দকে পূর্ণ করে তুলেছিল, এমনকি সামনের সারির মশালধারীরা যখন জঙ্গলে বাঘের গর্জনে ভয়ে চমকে উঠছিল, তখনও তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন। এরূপ একটি ভ্রমণের সময় নক্ষত্রের আলোতে উজ্জ্বল রাত্রি মায়ের বুকের মতই মনে হয়, এবং যিনি এর মধ্যে ডুবে যান, তিনি যে কোন কণ্ঠস্বরের চেয়েও গভীরতর একটি নীরবতার ডাক শুনতে পান।

ভোরের আলো শুরু হওয়ার অনেক পরেও অভিযান চলতে থাকলো, যখন তারা একটা ঝরনার ধারে জঙ্গলের কাছে এসে পৌঁছে গেল। এখানে সাবিত্রী স্নান সেরে পূজা করবে ও তার খাওয়ার জন্য সাধারণ রান্নার কাজ সেরে নেবে। বাকী দিনটা তারা সকলে সেখানেই কাটালো, আবার পরের দিন খুব সকাল থেকেই আরম্ভ হোল তাদের তীর্থযাত্রা।

এই জীবন-যাত্রা অব্যাহত রইল অনেক মাস ধরে। তারা কখনো কখনো কোন আশ্রমের কাছে ডেরা বেঁধে কাটালো পুরো এক সপ্তাহ। প্রতিদিন সকালে সাবিত্রী পাল্কীর মধ্যে ঢুকে বসতেন ও তপোবনের সন্ন্যাসীর কাছে নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উপহার দিতেন ও তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। তারপর মাটিতে তাঁর সামনে বসতেন ঘন অবগুণ্ঠন ঢেকে, তিনি যদি কথা বলতেন, তবে তাঁর কথা শুনতেন। আর, সাধু যদি কোন কথা না বলতেন, তবে তাঁকে দেখেই তৃপ্ত হতেন, কারণ, যে চোখ দিয়ে সাধু-দর্শন হয়, সেই চোখ দুটোই ধন্য।

এবং প্রতি মুহূর্তে তিনি তাঁর জীবনের সেই বিশেষ শুভ দিনটির নিকটতর হচ্ছিলেন। যে জীবন যুগ যুগ ধরে নারীজগতে তাঁর নামটিকে চিরপ্রিয় করেছে।

একদিন বনের মধ্যে যেতে যেতে তাঁর শিবিকার পর্দার আড়াল থেকে দেখলেন দীর্ঘকায়, শক্তিমান এক তরুণকে। এই তরুণের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা দেখে তিনি

নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেলেন। তরুণের একটি কাঁধের উপর কুঠার, আর, অন্য এক হাতে ধরা আছে জ্বালানি কাঠের আঁটি। তবুও তাঁকে দেখে সাহসী এবং ভদ্র মনে হয়, এবং, যে সৌজন্যের সঙ্গে তিনি তাঁর অভিযাত্রী দলের একজনকে সাহায্য করে তাদের যাওয়ার সুবিধার জন্য রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালেন, তা তাঁর উচ্চবংশ ও নম্র হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয়। এই তরুণের নাম ও তাঁর পিতৃপরিচয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হোল। তারপর রাজকুমারী ও তাঁর দলবল বাড়ির দিকে ফিরে চললেন। কারণ, সাবিত্রী আজ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অদৃষ্ট এসে হাজির হয়েছে এবার। এই সেই আত্মা, যাঁর সঙ্গে অসংখ্য জন্ম-জন্মান্তরের সূত্রে তিনি বাঁধা হয়ে আছেন। তিনি অরণ্যবাসী অথবা রাজা যেই হোন, যে ভাবে হোক, তীর্থদর্শন ও নিরন্তর প্রার্থনার ফলে তাঁর স্বচ্ছ মনের দৃষ্টি দিয়ে তিনি চিনে নিতে পারলেন, তাঁর পূর্বের সব জন্মে তিনি এঁরই পত্নী ছিলেন। সাবিত্রী বুঝতে পারলেন, অতীত জীবনে যা হয়েছে, এ জীবনেও আবার তাই হবে, এবং এই সেই পুরুষ যাঁকে তাঁর বিয়ে করা উচিত।

যখন সাবিত্রী এসে উপস্থিত হলেন, তখন রাজা অশ্বপতি তাঁর সভাগৃহে ছিলেন। সাবিত্রী হয়তো তাঁর বাবার সঙ্গে একাই দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর পাশে পবিত্র মুনি নারদ বসেছিলেন। নারদের পরনে গোলাপী রঙের পোশাক। রাজা সাবিত্রীকে নির্ভয়ে কথা বলার আদেশ দিয়ে বললেন, "তুমি নিজেকে কার হাতে দান করবে, এ সম্পর্কে কি কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছ?" প্রথম উষ্ণ অভ্যর্থনার পরে রাজা একথা খুব ধীর শান্ত স্বরেই বললেন।

সাবিত্রী উত্তর দিতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন।

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর মুখে তরুণের কথা শুনে, আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "ঐ তরুণ সম্পর্কে আমাকে সব কথা বল।"

রাজকুমারী ভয়ে ভয়ে বললেন, "কোন একটি বনের মধ্যে আমরা একজন তরুণকে দেখলাম, যিনি অরণ্যবাসীর জীবন যাপন করছেন। তাঁর বাবা একজন অন্ধ রাজা, যিনি তাঁর সিংহাসন থেকে বৃদ্ধ বয়সে বিতাড়িত হয়েছেন। এই যুবককেই আমি বিয়ে করব মনস্থ করেছি। তিনি ভদ্র, শক্তিমান ও শিষ্টাচারী, তাঁর নাম সত্যবান।"

যেই মুহূর্তে সাবিত্রী তাঁর পছন্দের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করলেন, নারদকে বিচলিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখা গেল। হঠাৎ একটা হাত উপরে তুলে তিনি বলে উঠলেন, "না না, এ হতে পারে না!" অশ্বপতি তাঁর দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে বললেন, "কেন নয়? তুজনের মতো সম্পদ আমার মেয়ের নিশ্চয়ই আছে।"

নারদ বললেন, "আমি সে কথা বলছি না। সাবিত্রী যদি এই যুবককে বিয়ে করে তাহলে তাকে বিধবা হতে হবে। কারণ, সত্যবানের উপর অভিশাপ আছে এবং আজ থেকে বার মাসের মধ্যে তার মৃত্যু অবধারিত!"

নারদের কথা শুনে রাজকন্যা বিবর্ণ হয়ে গেলেন। প্রত্যেক হিন্দু রমণী স্বামীর আগে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করে। অশ্বপতি তখন সাবিত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "সাবিত্রী, এ খুবই দুঃসংবাদ, তোমাকে অবশ্যই নতুন করে পছন্দ করতে হবে।"

সাবিত্রী বললেন, "না বাবা, তা হয় না। একজন শুধু একবারই তার বিশ্বাস অর্পণ করতে পারে। আমার স্বামী হিসাবে দ্বিতীয় আর কাউকে আমি বরণ করতে পারি না। বিধবা হওয়া দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু সত্যবানকে স্বামী হিসাবে বরণ করে, যে বিপদই আসুক না কেন, আমি তার মুখোমুখি হতে রাজী আছি।"

রাজা এবং নারদ দুজনেই বুঝতে পারলেন, সাবিত্রীর এই উক্তি সত্য। পরের দিনই অশ্বপতি একটি নারিকেল সঙ্গে দিয়ে বনের অধিবাসী তরুণ রাজপুত্রের কাছে বাহক পাঠালেন। এর অর্থ এই যে, রাজার ইচ্ছা, ঐ যুবক তাঁর মেয়েকে বিয়ে করুক। সত্যবান ও তাঁর বাবা-মা আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু একটি শর্ত তাঁরা আরোপ করলেন যে, সাবিত্রীকে এসে তাঁদের ঘরেই বাস করতে হবে। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের ফেলে স্বামী সত্যবানকে নিয়ে তিনি আর কোথাও যেতে পারবেন না।

বিয়ের ঘোষণা হয়ে গেল। তাঁদের মিলনে সাক্ষী ডাকা হোল অগ্নিকে। সাবিত্রীর বাম কব্জিতে পরানো হোল লোহার বালা। সত্যবান ও সাবিত্রীর উত্তরীয় ও আচ্ছাদনবস্ত্র একসঙ্গে গাঁট বাঁধা হোল, এবং হাতে হাত রেখে তাঁরা পবিত্র অগ্নির চারপাশে সাত পাক ঘুরলেন, যখন পুরোহিত প্রতিবার ঘোরার সময় প্রাচীন মন্ত্র পাঠ করলেন এই বলে যে, তাঁদের এই বন্ধন যেন অক্ষয় থাকে। তারপর তাঁরা চলে গেলেন বনে বাস করতে। যাওয়ার আগে রাজকুমারীর সব পোশাক ও রত্নালংকার খুলে রেখে গেলেন সাবিত্রী। সেখানে তাঁর নূতন বাবা ও মায়ের বিশ্বস্ত ও আদরের কন্যা হতে হবে তাঁকে। কিন্তু সাবিত্রী মন থেকে কিছুতেই তার স্বামীর জীবনের ভয়ংকর পরিণামের কথা ভুলতে পারলেন না ও ভুলতে পারলেন না সেই বিশেষ দিনটির কথা, যে দিনটি তাঁর স্বামীর মৃত্যুদিন বলে নারদ তাঁকে বলে গেছেন। কারণ, জগৎসমূহের মধ্যে যমই একমাত্র সত্তা, যিনি তাঁর কথা কখনো ভাঙেন না। তাই, ভারতে একটি কথা প্রচলিত আছে, "মৃত্যুর মতো সত্য।" যম এই কারণে সত্য এবং বিশ্বাসেরও দেবতা।

এই একমাত্র চিন্তায় বেচারা সাবিত্রীর বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। তিনি জানতেন, এই অভিশাপ মুছে যাওয়ার কোন আশা নাই। তিনি এও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। এখন শুধু দেখতে বাকী আছে, কি করে তিনি তাঁর স্বামীর জীবন রক্ষা করার উপায় খুঁজে বার করেন।

সেই ভয়ানক মুহূর্তটি একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগলো। শেষে, যখন আর মাত্র তিনদিন বাকী আছে, তখন তরুণী পত্নী এক মারাত্মক ব্রত গ্রহণ করলেন, যাকে 'তে-রাত্তির' বলা হয়ে থাকে। তিন রাত্রি পর পর তিনি জাগরণে কাটাবেন, প্রার্থনা করবেন ও ঐ তিনটি দিন তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করবেন না। এই পথে তিনি আশা করলেন, আত্মার এমন এক স্তরে পৌঁছতে পারবেন, যার সাহায্যে তিনি সবই দেখতে ও শুনতে পাবেন, যা মরজগতের মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে।

অন্ধ রাজা ও বৃদ্ধা রানী তাঁদের নূতন মেয়েকে এই কষ্টকর প্রচেষ্টা থেকে বিরত হওয়ার জন্য বোঝালেন, কিন্তু সাবিত্রী যখন সহজ উত্তর দিয়ে বললেন, "আমি একটি ব্রত উদ্‌যাপন করছি"। তাঁরা আর কিছু বল্‌লেন না। এক্ষেত্রে সাবিত্রীর সিদ্ধান্ত পবিত্র এবং তাঁরা তাঁকে কেবল ব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্যই করতে পারেন। অবশেষে চতুর্থ দিনের সকাল এল, সাবিত্রী কোন খাদ্য তখনও গ্রহণ করলেন না। বললেন, "রাত্রে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে। এখন আমি আপনাদের কাছে একটিমাত্র জিনিস ভিক্ষা করি, যা আমি কখনো করিনি, যে, আজ আমাকে আপনাদের ছেলের সঙ্গে জঙ্গলে যেতে ও তাঁর সঙ্গে দিনটি কাটাতে অনুমতি দেবেন।" সাবিত্রী সতর্কতার সঙ্গে সত্যবানের নাম উচ্চারণ করলেন না তাঁর বাবা মায়ের সামনে, তাহলে সেটা প্রগল্‌ভতা ও খারাপ কারণ হোত। বৃদ্ধ দম্পতি মৃদু হাসলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, "মেয়েটি বেশ ভালো। আজ পর্যন্ত কোনদিন কিছু চায়নি। আমরা নিশ্চয়ই ওকে সত্যবানের সঙ্গে যেতে দেব। সত্যবান, আমাদের মেয়ের যেন কোন অযত্ন না হয়।" এই কথাগুলির পরে সাবিত্রী তাঁদের পায়ের ধুলো নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

সাবিত্রী হিসেব করে দেখেছিলেন, বিপদ আসতে পারে দুপুরে, এবং সময় যতই দুপুরের দিকে এগিয়ে গেল, তিনি প্রস্তাব করলেন আর ঘোরাঘুরি না করে কোন স্থানে ছায়ার নীচে বসা হোক। সত্যবান কিছু ঘাস যোগাড় করে এনে তার ওপর সাবিত্রীকে বসতে দিলেন। তারপর সাবিত্রীর কোলে কিছু বুনো ফল দিয়ে ভরে দিলেন, এবং চলে গেলেন কাঠ কাটতে।

বেচারা সাবিত্রী বসে অপেক্ষা করতে করতে একাগ্র হয়ে শুনতে থাকলেন সত্যবানের গাছ কাটার শব্দ। এক সময় শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। শেষকালে সত্যবান টলমল করতে করতে এসে সাবিত্রীকে বললেন, "আমার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।" তারপরেই সত্যবান তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন ও গভীর মূর্ছার মধ্যে ঢলে পড়লেন।

এই সময় সাবিত্রী দেখলেন, বিকট ও ভয়ংকর চেহারার একটি মূর্তি জঙ্গল থেকে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে, তার বাহ্যিক আকার জমকালো, রাত্রির মত অন্ধকার, তার এক হাতে এক টুকরো দড়ি ও দড়ির প্রান্তভাগে ফাঁস। সাবিত্রী তখনই বুঝতে পারলেন যে ইনিই যম, সত্যের দেবতা ও মৃত্যুর রাজা।

তিনি দয়া করে সাবিত্রীর দিকে হাসলেন। বললেন, "বৎসে, আমার আদেশ তোমার জন্য নয়।" এই কথা বলতে বলতে তিনি নত হলেন, তাঁর দড়ির ফাঁসে সত্যবানের আত্মাকে জড়িয়ে বেঁধে নিলেন তাঁর পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

যতক্ষণ তিনি এইসব করছিলেন, সাবিত্রী সব সময় কাঁপছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর স্বামীর আত্মা যমকে অনুসরণ করার জন্য উঠে দাঁড়ালো সাবিত্রী আর কাঁপলেন না। তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। চোখগুলি তাঁর জলছিল, হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ, এমনকি তিনি মৃত্যুর রাজ্যে যেতে প্রস্তুত।

যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ ফেলে সাবিত্রীকে বললেন, "খুব বেশি দুঃখ করো না! মৃত্যুই একমাত্র অনিবার্য অতিথি। বিদায় বৎসে!"

এই বলে বনপথ ধরে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু যেতে যেতে তিনি তাঁর পেছনে পায়ে চলার চটাচট্ শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলেন। এতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর কর্তব্য সত্যবানের আত্মাকে নিয়ে যাওয়া, সাবিত্রীর আত্মা নয়। সাবিত্রী কি করতে চলেছে? সে কি তাঁকে অনুসরণ করছে? তাছাড়া, সে কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছে? কোন্ শক্তিতে তার শোনার আর দেখার ক্ষমতা এতখানি তীক্ষ্ন হয়েছে? মরণশীল মানুষের চোখে মৃত্যু অদৃশ্য বস্তু। আবার সেই চটাচট শব্দ! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে মানুষের পায়ে চলার শব্দ। নির্বোধ বালিকা! সে কি তার স্বামীকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে? আগে হোক, পিছে হোক, তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবেই। তবুও তাকে বর দিয়ে তার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে তিনি চেষ্টা করবেন। হঠাৎ তার দিকে পেছন ফিরে যম বললেন, "সাবিত্রী, তোমার স্বামীর জীবন ছাড়া, তোমার আর কি চাই বলো, এবং তা তুমি পাবে। তারপর বাড়ি ফিরে যাও।"

সাবিত্রী নত হয়ে বললেন, "আর একবার আমার শ্বশুরের দৃষ্টি দান করুন।"

মৃত্যুর সম্রাট বললেন, "সহজেই মঞ্জুর করলাম। এখন বিদায়, এ স্থান তোমার জন্য নয়।"

তবুও পিছনে পিছনে পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করতে থাকলো। বন হয়ে এল আরও ঘন, আর অন্ধকার, তবুও যম যেখানে যাচ্ছেন, সাবিত্রী তাঁকে সেখানেই অনুসরণ করে চলেছেন।

"বাছা, তোমার আরও একটি ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি, কিন্তু, তারপর তোমাকে চলে যেতে হবে।"—বললেন যম।

সাবিত্রী নির্ভয়ে দাঁড়ালেন। তিনি এখন মৃত্যুর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক অনুভব করছেন, এবং বিশ্বাস করেছেন, তিনি এখনও তাঁকে যেতে দিতে প্রস্তুত। সাবিত্রী বললেন, "আমার শ্বশুরের ধনসম্পদ ও রাজ্য ফিরিয়ে দিন।"

যম পিছন ফিরে বললেন, "তাই হবে। কিন্তু এবার তুমি যাও!" তবুও সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর অনুসরণ করে চললেন ও যম স্বয়ং তাঁকে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। একের পর এক প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন ও প্রতিবারই তাঁর সংসারের সুবিধার জন্য কিছু না কিছু যোগ করেছেন, যে সংসারে তিনি পুরো এক বছরও কাটাননি। যম অবশেষে নিজেই এটি উপলব্ধি করলেন।

তিনি আদেশের সুরে বললেন, "এবার সাবিত্রী, তোমার নিজের জন্য কিছু চাও। তোমার স্বামীর জীবন ছাড়া আর যা চাইবে, তা পাবে। কিন্তু এটাই আমার শেষ দান! এটা হয়ে গেলেই আমার সামনে থেকে তুমি নির্বাসিত হবে।"

সাবিত্রী বললেন, "তাহলে আমাকে এই বর দিন, যেন আমার অনেক সন্তান হয়, আর তাদের ছেলেমেয়েদের সুখী দেখে যেন আমি মরতে পারি।"

যমের খুব আনন্দ হোল। তিনি ভাবলেন, এবার সাবিত্রী নিশ্চয়ই চলে যেতে ইচ্ছুক। বললেন, "অবশ্য! অবশ্য! এতো খুব ভাল ইচ্ছা!"

তবুও সাবিত্রী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন, যেন অপেক্ষা করছেন।

যম বললেন, "বেশ, আমি তো তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে দিয়েছি। সব তো হয়ে গেল, আর কেন?"

এই কথাতে সাবিত্রী তাঁর মাথা তুলে হেসে বললেন, "হে প্রভু, একজন বিধবাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে নেই।"

ভয়ঙ্কর রাজা মুহূর্তের জন্য তাঁর দিকে তাকালেন। মৃত্যুর রাজা হিসাবে কেমন করে তিনি মৃতকে ত্যাগ করে যাবেন? আবার, সত্যের দেবতা হয়ে কি করেই বা তিনি সাবিত্রীকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হতে বলবেন? এক মুহূর্তের জন্য তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, তার পর সত্যবানের বন্ধনমুক্তির জন্য ফাঁস খুলে দিতে আনত হলেন, যখন সমগ্র বনাঞ্চল ভরে উঠলো তাঁর হাসিতে।

তিনি বললেন, "নারীজগতে এই নারী তুলনাহীনা! হৃদয়ের সাহস কী অসীম, যা স্বামীকে নরক পর্যন্ত অনুসরণ করে ও স্বয়ং যমের হাত থেকে তার জীবন পুনরুদ্ধার করতে পারে! এইভাবেই দেবতারা নশ্বর মানুষের হাতে পরাজয় বরণ করতে ভালবাসেন।"

এক ঘণ্টা পরে, যে গাছের নীচে সত্যবান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন, সেখানেই জেগে উঠলেন আবার। তাঁর মাথা সাবিত্রীর হাঁটুর ওপর। ক্লান্ত অনুচ্চস্বরে বললেন, "আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি মারা গিয়েছি।"

সাবিত্রী উত্তর দিলেন, "প্রিয়তম, এ তোমার স্বপ্ন নয়। কিন্তু রাত্রি হয়ে আসছে, এসো শীঘ্রই আমরা বাড়ি চলে যাই।"

তাঁরা যখন যেতে প্রস্তুত হলেন, বনের মধ্যে তাঁদের সন্ধানে আসা রাজার রক্ষীবাহিনীর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল। কারণ, ঐ একই দিনে সত্যবানের বাবা তাঁর রাজত্ব ফিরে পেয়েছেন ও তাঁদের দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের জীবন চিরকালের মত দূরে সরে গিয়েছে।

একদা নল নামে এক রাজা ছিলেন, যিনি ছিলেন নিষাদ জাতির শাসনকর্তা। নল ছিলেন এই নিষাদ জাতি ও লোকেদের প্রথম রাজা। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন শক্তিশালী, সুন্দর, রাজকীয় সম্মানের বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ, এবং আচরণে ছিলেন দয়ালু। ধনুর্বিদ্যা, শিকার ও সম্রাটদের প্রিয় সব রকম খেলাধূলায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর বিশেষ গুণ ছিল এই যে, অশ্ব পরিচালন ব্যবস্থায় তাঁর অসাধারণ পরিমাণ জ্ঞান। সৌন্দর্যে, চরিত্রে, ভাগ্যে, শক্তিতে সারা জগতে নলের মত আর একজনও রাজা ছিলেন কিনা সন্দেহ।

যদি একজনও কেউ থেকে থাকেন, তাহলে তিনি বিদর্ভের রাজা ভীম, বীরত্বপূর্ণ স্বভাব ও বিরাট সাহসী সম্রাট, যাঁকে তাঁর সমূহ প্রজা গভীরভাবে ভালবাসতেন। ভীমের তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। মেয়ের নাম দময়ন্তী। সারা পৃথিবীতে দময়ন্তীর রূপ, মাধুর্য, রাজকীয় লাবণ্য ও মর্যাদার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। এত লাবণ্য তার আগে কেউ কখনো দেখেনি। কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত তিনি তাঁর রূপসী দাসীদের মাঝখানে জ্বলতেন, এমনও শোনা যেত। দেবতাদেরও হৃদয় আনন্দে ভরে উঠতো, যখন তাঁরা এই অসাধারণ সুন্দরী কুমারীকে দেখতেন।

এমন ঘটনার সৃষ্টি হোল যে, চারণকবি ও দূতেরা দময়ন্তীর সামনে অবিরাম নলের স্তুতিগান করতে থাকলো, আবার নলের সামনেও করতে লাগলো দময়ন্তীর স্তুতি, যতক্ষণ না দুজনে দুজনের সম্পর্কে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলো। কেউ কাউকে না দেখেও দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হোল আসক্তির। এদিকে নল নিজের মধ্যে প্রেমের জাগরণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে বেশির ভাগ সময় একাকী তাঁর রাজোদ্যানের মধ্যে কাটাতে লাগলেন। একদিন তিনি সোনালী ডানা মেলে একদল বুনো রাজহাঁস উড়ে যেতে দেখলেন, এবং তাদের মধ্য থেকে একটিকে তিনি হাত দিয়ে ধরে ফেললেন। পাখিটা ভীষণ ভয় পেয়ে বলে উঠলো, "রাজা, আমাকে হত্যা করবেন না! আমাকে মুক্তি দিন, আমি দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার কথা বলব, যাতে একমাত্র আপনাকেই বিয়ে করতে ইচ্ছা করেন, জগতের আর কাউকে নয়।" গভীর চিন্তার সঙ্গে ও ডানায় টোকা দিতে দিতে নল তার কথাগুলি শুনে বললেন, "আঃ, তুমি যদি সত্যই তা পার, তবে তাই করো।' এই বলে হাত খুলে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন।

তারপর ঐ রাজহাঁসগুলো উড়ে গিয়ে বিদর্ভ শহরে রাজোদ্যানের মধ্যে দময়ন্তী ও তাঁর সহচরীদের সামনে নামলো। সব সুন্দরী মেয়েরা উড়ন্ত পাখি ধরতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়লো, প্রত্যেকেই একটি করে পাখি ধরতে চায়। কিন্তু দময়ন্তী যে পাখিটার পিছনে ছুটলেন, সে উড়ে গিয়ে নির্জনস্থানের দিকে দময়ন্তীকে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে, মানুষের মতো কণ্ঠস্বরে বললো, "দময়ন্তী, নিষাদরাজ নল মানুষের মধ্যে তুলনাহীন। আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন! তাঁকেই বিয়ে করুন! যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন সব সময় সুখের ও আনন্দের!"

রাজকুমারী যখনই বুঝেছিলেন, রাজহাঁস কি বলতে পারে, তখনই জোড় হাতে মাথা নীচু করে তার কথা শুনলেন ও তার বলা শেষ হয়ে গেলে মুখ তুলে মৃদু হেসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "প্রিয় পাখি, তুমি ঠিক এমনি করে আমার কথাও তাঁকে বলো!"

এরপর থেকে দময়ন্তীর সহচরীরা লক্ষ্য করলেন, তিনি যেন দিনে দিনে নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। বেশির ভাগ সময় তিনি একাই ঘুরে বেড়াতেন। প্রায়ই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন ও বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলেন। এমনকি আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও তাঁর চিন্তা ছিল অনেক দূরে। তখন, মার্জিত ও অপ্রত্যক্ষভাবে তারা এই ব্যাপার ভীমের কানে তুললো। তিনি, তাঁর মেয়ে বড় হয়েছে এই প্রকাশ পেয়ে ভাবলেন, তার বিয়ের ব্যবস্থা করতেই হবে। এই ভেবে, কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে স্বয়ংবর হবে ঘোষণা করে সারা দেশে দূত পাঠিয়ে দিলেন।

এই সংবাদে দেশের প্রতিটি অংশ থেকে চরম জাঁকজমকের সঙ্গে ঘোড়া, হাতি ও রথ ইত্যাদি নিয়ে দেহরক্ষীসহ রাজারা এলেন। ভীম তাঁদের যথাযথ অভ্যর্থনার সঙ্গে গ্রহণ করলেন ও দময়ন্তীর স্বয়ংবরের দিন পর্যন্ত রাজকীয় আবাসে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। দেবতাদের মধ্যেও এই সংবাদ চলে গেল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মৃত্যুর রাজা স্বয়ং যমও স্বর্গ থেকে বিদর্ভ নগরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের প্রত্যেকের ইচ্ছা রাজকুমারীকে তাঁরা জয় করবেন।

গর্বিত দেবতারা যখন যাচ্ছিলেন, তাঁরা একজন মানুষকে পায়ে হেঁটে যেতে দেখলেন। মানুষটির সৌন্দর্য, দেহ ও মনের বিশালতা এমন যে, দেবতারা তখনই মনস্থ করলেন, আকাশে তাঁদের রথ ছেড়ে দিয়ে এই মানুষটির সঙ্গী হয়েই তাঁরা পৃথিবীলোকে যাবেন। দেবতারা সবই জানেন, তাই হঠাৎ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, "নল! তুমি একজন মানুষ, যাকে বিশ্বাস করা চলে। তুমি আমাদের হয়ে একটি সংবাদ নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতি দেবে?"

উজ্জ্বল দ্যুতিসম্পন্ন চারিটি অস্তিত্বের আবির্ভাব দেখে ও তাঁরা তাঁদের সংবাদ-বাহক দূত হওয়ার জন্য তাঁকে বলছেন শুনে নল অবিলম্বে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমি করতে রাজী আছি।" তারপর, তাঁদের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কিন্তু আমাকে আগে বলুন, আপনারা কারা আমাকে সম্বোধন করছেন? তাছাড়া, আপনাদের সংবাদটিই বা কী, যা আমি বয়ে নিয়ে যাব?"

ইন্দ্র বললেন, "আমরা অমর, দময়ন্তীর জন্য পৃথিবীতে এসেছি। আমি ইন্দ্র, এই যে আমার পাশে অগ্নি। ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন জল-দেবতা বরুণ। আর তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন যম, যিনি মানুষের দেহের বিনাশ সাধন করেন। তুমি আমাদের হয়ে দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বলো, "জগতের অভিভাবকরা তোমার স্বয়ংবর সভায় আসছেন, তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি তাঁদের মধ্য থেকে একজন তোমার স্বামী নির্বাচন করো!"

নল বললেন, "কিন্তু ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি নিজেই তো এখানে এসেছি। কি করে একজন পুরুষ, যে নারীকে সে ভালবাসে, তার কাছে গিয়ে অপরের জন্য

অনুরোধ করতে পারে? হে দেবগণ, আপনারা বরং আমাকে বাদ দিন! এই আদেশ দিয়ে আমাকে পাঠাবেন না!" দেবতার গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "তাহলে, রাজা, তুমি কেন প্রথমে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে? কেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েও এখন তুমি তোমার কথা রাখছ না?"

একথা শুনে নল বললেন, "কিন্তু, আমি যদি সেখানে যাই, দময়ন্তীর মহলে ঢুকব কেমন করে? তোমরা কি জান না, ভীমের রাজপ্রাসাদ সুরক্ষিত?"

কিন্তু ইন্দ্র উত্তর দিলেন, "সে ভার আমাদের উপর ছেড়ে দাও! তুমি যদি যেতে চাও, ভেতরে ঢোকার ক্ষমতাও তুমি পাবে।"

নল তখন বললেন, "হে দেবগণ! আমি আপনাদের ইচ্ছা পালন করব।" এই কথা বলার পরেই মুহূর্তের মধ্যে নল দেখলেন তিনি ভীমের রাজপ্রাসাদের মধ্যে দময়ন্তীর গোপন মহলে তাঁরই সামনে উপস্থিত।

দময়ন্তী বসেছিলেন তাঁর সহচরীদের মধ্যে। পরের দিনই তাঁর স্বয়ংবর, এবং নল নিশ্চয়ই এই স্বয়ংবরসভায় যোগদান করবেন, এই কথা ভেবে তাঁর ঠোঁটে হাসির আভাস ও গাল দুটি রক্তিম হয়ে উঠেছিল। তাঁর চোখ দুটিতে আলোর দ্যুতি এবং কথাবার্তাও ছিল রহস্যময় ও কোমল। নল প্রিয়তমাকে এই প্রথম নিজের চোখে দেখে অনুভব করলেন, দময়ন্তীর জন্য তাঁর প্রেম কত গভীর ও কত প্রচুর। সত্যিই, তিনি এত বিপুল সৌন্দর্যের অধিকারিণী যে, আকাশের চাঁদকেও তা দেখে লজ্জা পেতে হবে। কারও রূপ যে এত পরিপূর্ণরূপে নিখুঁত হতে পারে, এমন চিন্তা কখনো নলের মনে আসেনি, শোনেন নি কখনো, এমনকি কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি কথা দিয়েছেন, বিশেষ করে দেবতাদের, অগত্যা তাঁর নিজের অনুভূতিকে দমন করতে হল।

তাঁর মনের সংকল্প স্থির হতে যত না সময়ের প্রয়োজন হল, তার আগেই তিনি সমবেত মহিলাদের সামনে সশরীরে দৃশ্যমান হয়ে পড়লেন। আর, সঙ্গে সঙ্গে তারা বিস্মিত হয়ে লাফ দিয়ে পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালেন। তাদের মনে কোন ভয় ছিল না, কিন্তু এই অদ্ভুত উপায়ে যে পুরুষটির আবির্ভাব তাদের চোখের সামনে ঘটে গেল, তাঁর রূপ দেখে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল ও তাদের মনের মধ্যে দেখা দিল প্রশ্ন। ইনি কে হতে পারেন? কিন্তু, তারা এত লজ্জা পেয়েছিল যে কোন কথা বলতেই সাহস করলো না। কেবল দময়ন্তী ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন ও স্মিত হাসির সঙ্গে জানতে চাইলেন, "আপনি কে? আর, কি কৌশলে সকলের অলক্ষ্যে আপনি এর মধ্যে ঢুকলেন? আমার মহল কি সুরক্ষিত নয়? রাজার আদেশ কি কঠোর নয়?"

এই কথাগুলি শোনার পর রাজা উত্তর দিলেন, "হে রাজকুমারী, আমার নাম নল। দেবতাদের দেওয়া শক্তিতে আমি এখানে অদৃশ্য অবস্থায় ঢুকেছি। আমি এসেছি তাঁদের সংবাদবাহক হিসাবে। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ এবং যম সকলেই আপনাকে কামনা করেন। আগামী কাল স্বয়ংবরা হলে আপনি তাঁদের মধ্যে যে কোন

একজনকে পছন্দ করুন আপনার স্বামীরূপে, তাঁদের দূত হয়ে এই কথাই জানাতে এসেছি আপনাকে।

দেবতাদের নাম শুনে দময়ন্তী মাথা নত করলেন। তারপর মৃদু হেসে নলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে বীর, তা হয় না, কাল আমি দেবতাদের কাউকে নয়, আপনাকেই পছন্দ করব ঠিক করেছি। আপনার সংবাদ আমি রাজহাঁসের মুখে পেয়েছি। আপনাকে আমি আমার হৃদয়ে বরণ করেছি। আপনার জন্যই স্বয়ংবরের আয়োজন। যদি আপনাকে না পাই, তাহলে আর কারও দ্বারা বিজিত হতে চাই না।" নল উত্তর দিলেন, "না, দেবতাদের উপস্থিতিতে আপনি কেমন করে একজন মানুষকে পছন্দ করবেন? আপনার নিজের মঙ্গলের জন্য হৃদয় পরিবর্তন করুন, আমি অনুরোধ করছি, সেইসব উন্নত আত্মার অধিকারী ও জগৎসমূহের স্রষ্টাদের দিকে, যাঁদের পায়ের ধুলার সমান আমি নই। সে মানুষ ভ্রান্ত, যে তাঁদের কিছু নয় বলে মনে করে। আপনি সতর্ক হোন, আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করছি, আপনি এই স্বর্গীয় পুরুষদের কোন একজনকে বরণ করুন। মানুষের যাঁরা রক্ষাকর্তা, তাঁদের দ্বারা প্রার্থিত হলে, কোন্ নারী না গৌরব বোধ করে!"

এতক্ষণে দময়ন্তীর দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে নলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি দেবতাদের প্রণাম করছি, কিন্তু রাজা, আপনাকেই আমার স্বামী হিসাবে বরণ করেছি!"

নল বললেন, "আপনি পবিত্র! যা ভাল মনে হয়, তাই করুন। কিন্তু, আমি অন্যকে কথা দিয়েছি, এখন কোন্ সাহসে ঘটনার মোড় নিজের লাভের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি? তাও যদি সেটা সম্মানের সঙ্গে হয়, তাহলে ইচ্ছা করে দেখতে পারি। একথা জেনে আপনি মন ঠিক করুন!" নল এইসব কথা বলার পর দময়ন্তীর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল। চোখের জলের নীচে দেখা দিল হাসি। কারণ, নলের মনের গোপন কথা বেরিয়ে পড়েছে। একমুহূর্ত তিনি ভাবলেন, তারপর মাথা তুলে বললেন, "সম্রাট, আমি একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি। এর ফলে আপনার উপর কোন কলঙ্কের দাগ লাগবে না। আপনি দেবগণের সঙ্গেই স্বয়ংবর সভায় আসুন! তারপর, তাঁদের সামনেই আপনাকে আমি বরণ করে নেব। আর, এই পছন্দ হবে একলা আমারই। আপনার কোন পাপ হবে না।

আগামী কাল দময়ন্তী তাঁর হতে নিজেকে সমর্পণ করবে, দময়ন্তীর এই প্রতিশ্রুতি ছাড়া নলের মনে আর কোন অনুভূতি থাকলো না। তাঁর শরীরের শিরায় শিরায় আবেগের স্পন্দন, তবু শান্তভাবে মাথা নত করে তিনি বিদায় নিলেন, এবং, তৎক্ষণাৎ আর একবার অদৃশ্য আকার ধারণ করে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে দেবতাদের সামনে এসে উপস্থিত ও সব ঘটনা তাঁদের জানালেন। "কুমারী আমাকে বললেন, দেবগণও আমার স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে আসুন। আমি তাঁদের সামনেই আপনাকে বরমাল্য দেব। তাহলে, আপনাকে আর কোন পাপ স্পর্শ করবে না।"

দেবতারা তাঁদের সংবাদবাহকের প্রতিবেদন মেনে নিলেন। কারণ, তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বয়ংবর অনুষ্ঠানের দিন সকালটি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। সিংহেরা যেমন পর্বত-অরণ্যে ঢুকে থাকে, রাজারাও তেমনি বিরাট উঁচু দরজা দিয়ে বৃত্তাকার সভাগৃহে ঢুকলেন। দৃশ্যটি বেশ জমকালো। বিরাট স্তম্ভগুলির মধ্যে এক-একটি উজ্জ্বল সিংহাসনে এক একজন রাজ-অতিথি বসে আছেন। প্রত্যেকের হাতে নিজ নিজ রাজদণ্ড ও মাথায় মুকুট। প্রত্যেক রাজাকে বেষ্টন করে আছে চারণ-কবি ও ঘোষকেরা। রাজাদের রেশম ও প্রতীক চিহ্নের ঝলমলে শোভার সঙ্গে রত্নালঙ্কার ও ফুল এবং পল্লব-গুচ্ছের সজ্জা সভাকক্ষের শোভা বৃদ্ধি করছে।

যথানির্দিষ্ট সময়ে তুরীবাদকদের পিছনে পিছনে রক্ষীবেষ্টিতা হয়ে রাজকন্যা দময়ন্তী ঢুকলেন। এমনই তাঁর লাবণ্য যে, সমবেত সম্রাটদের মনে হল, যেন একটা উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি তাঁকে ঘিরে আছে। এই তুলনাহীন সৌন্দর্য দেখে সকলেই দমবন্ধ করে প্রায় নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকলেন। একের পর এক প্রত্যেক সম্রাটের নাম ও কৃতিত্ব ঘোষণা করা হতে থাকলো। রাজকুমারীর ঘোষকেরা যদি আপত্তি করে, প্রত্যেক রাজার ঘোষকেরাও প্রত্যুত্তরে জবাব দিতে প্রস্তুত, এবং দময়ন্তী দাঁড়িয়ে থেকে তা শুনে তাঁর পছন্দ হলেই সঙ্কেত দেবেন।

যখন নলের নাম ঘোষণা করা হোল, তিনি উপরে মাথা তুললেন এবং সেদিকে তাকালেন। নলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই ভয়ে ভয়ে দেখলেন, পাশাপাশি পৃথক পৃথক সিংহাসনে পাঁচজন নল বসে আছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সমান অপূর্ব, সমান সুন্দর। তাঁদের মধ্যে কাকে পছন্দ করবেন, নলের পৃথক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় নাই।

রাজকন্যা দেখলেন ও পছন্দ করতে চেষ্টা করলেন। তারপর তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পিছিয়ে এলেন। আবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। তিনি বুঝলেন, এ দেবতাদেরই কৌশল। এই পাঁচজনের মধ্যে চারজন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম। একজন নল। কিন্তু নল কোনটি? দময়ন্তী মনে করতে চেষ্টা করলেন, ছোটবেলায় বৃদ্ধদের মুখ থেকে শোনা স্বর্গের অধিবাসীদের বিশেষ চিহ্নের কথা। কিন্তু তাঁর সামনে কারও শরীরেই তিনি সেরূপ কোন চিহ্ন দেখলেন না। দেবতারা সম্পূর্ণ নিখুঁত নলের শরীরের আকার ধারণ করে বসে আছেন। এখন তিনি কি করবেন? জীবনের এই চরম মুহূর্তে তাঁর ভুল করতে সাহস হল না।

নিজের মনে মনে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ দময়ন্তীর মনে এল, তাঁকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং দেবতাদের কাছেই প্রার্থনা জানাবেন। অবিলম্বে মাথা নত করে, ভক্তিভরে হাত দুটি জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে তাঁদের সম্বোধন করে বললেন,—

"হে দেবগণ! যে মুহূর্তে আমি বুনো রাজহাঁসের কথা আমার কানে শুনেছি, সেই মুহূর্ত থেকে নিষাদরাজ নলকে আমার স্বামীরূপে বরণ করেছি আমার মনে। আমি যাতে এই সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি, দেবগণ এখন নিজেদের আমার কাছে প্রকাশ করুন! কি চিন্তায়, কি কথায় আমার সংকল্পে আমি বিচলিত হইনি,

আমি যেন এর পরেও আমার সংকল্পে অবিচল থাকতে পারি, দেবগণ আমার কাছে নিজেদের প্রকাশ করুন। এবং যেহেতু দেবতারাই আমার ভাগ্যে নিষাদরাজ নলকে স্বামীরূপে নির্দিষ্ট করেছেন, এখন তাঁরা নিজেদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য, আমার কাছে নিজেদের প্রকাশ করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, একমাত্র নলের হাতেই নিজেকে সমর্পণ করব। আমি যাতে এই প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকতে পারি, তাঁরা এখন নিজেদের প্রকাশ করুন! আমি জগৎসমূহের মহান রক্ষাকর্তাদের দয়ার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁরা এখন তাঁদের উপযুক্ত আকার ধারণ করুন, আমি যেন আমার প্রকৃত প্রভুকে চিনে নিতে পারি!"

দময়ন্তীর করুণ কথাগুলিতে মুগ্ধ, তাঁর সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা ও নারীসুলভ প্রেমের পবিত্রতা দেখে দেবতারা অবিলম্বে প্রকাশ্যে সকলের সামনে নিজেদের আকৃতির পরিবর্তন না করেও স্বর্গীয় পরিচয়গুলি ধারণ করে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। দময়ন্তী সোজা তাঁদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাঁরা ধুলা অথবা ঘামে সিক্ত নন, তাঁদের গলার মালাগুলি টাটকা এবং দৃষ্টি অপলক। তাঁদের শরীর থেকে কোন ছায়াপাত নেই। তাঁদের পাগুলিও মাটিতে স্পর্শ করেনি। আর নল দাঁড়িয়ে আছেন, ছায়া পড়েছে তাঁর শরীরের। তাঁর গলার মালাগুলিও বিবর্ণ হয়ে এসেছে, শরীরে ধুলা এবং ঘামের কলঙ্ক। তাঁর পা দুটো মাটি স্পর্শ করে আছে, চোখগুলিও মানুষের মত। যেই মুহূর্তে দময়ন্তী নল ও দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারলেন, সেই মুহূর্তে তিনি আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন তাঁর সত্য পূর্ণ করার জন্য। লজ্জানত ভঙ্গিতে তিনি তাঁর বাম হাতে নলের পোশাকের প্রান্তভাগ ধরলেন ও তারপর গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে গাঁথা মালাটি নলের গলায় দুলিয়ে দিলেন। উপস্থিত সকলে এইভাবে তাঁর মানুষ নলকে নির্বাচন করতে দেখে হর্ষে ও আনন্দে ফেটে পড়লেন। দেবতারাও বলে উঠলেন "চমৎকার! চমৎকার!"

নল তাঁর উচ্চাসন থেকে নীচে নেমে এসে বললেন, "হে পবিত্র নারী, যেহেতু তুমি অবিনশ্বর দেবতাদের মাঝখান থেকেও আমার মতো একজন নশ্বর মানুষকে পছন্দ করে বরণ করে নিয়েছ, জেনে রেখো, স্বামী হিসাবে আমার কাছে তোমার প্রতিটি ইচ্ছা পবিত্র বলে গণ্য হবে। আমি সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কাছে, যতদিন এ জীবন থাকবে, আমি তোমার, কেবল তোমারই থাকব!"

সুতরাং, পারস্পরিক প্রতিজ্ঞা ও আনুগত্যের সঙ্গে তাঁরা দুজনেই দেবতাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে লাভ করলেন। তারপর সব অতিথি, রাজা ও দেবতারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। নল ও দময়ন্তীর আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হল, আর পরম সুখে তাঁরা চলে গেলেন নিষাদদের নগরে।

এখন, দেবতারা যখন নিজেদের রাজ্যে ফিরছিলেন, পথে তাঁদের সঙ্গে কলি আর দ্বাপরের দেখা হয়ে গেল। তাঁরা আসছিলেন পৃথিবীতে। কোথায় চলেছেন, জানতে চাওয়া হলে কলি উত্তর দিলেন, "দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছি। সেই সুন্দরী কুমারীকে বিয়ে করার জন্য আমার হৃদয় একাগ্র হয়ে আছে।"

একথা শুনে ইন্দ্র হেসে বললেন,"কিন্তু তাঁর স্বয়ংবর তো ইতিপূর্বেই শেষ। আমাদের সামনেই নলকে সে তার স্বামী নির্বাচিত করেছে।"

একথায় স্বর্গলোকের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির কলি প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠে বললেন, "যদি অবিনশ্বর স্বর্গবাসীদের ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে তাঁদেরই উপস্থিতিতে দময়ন্তী নশ্বর একজন মানুষকে বিয়ে করে থাকে, তাহলে তাঁকে কঠোর দুর্ভাগ্যের পরিণাম ভোগ করতে হবে !"

কিন্তু, দেবতারা উত্তর দিলেন, "আমাদের অনুমোদন পেয়েই দময়ন্তী নলকে নির্বাচিত করেছে। আর কে এমন সুন্দরী কুমারী আছে, যে তা না করে পারতো? মহান, পুরুষোচিত, বিদ্বান, মানুষের মধ্যে বাঘের মত তেজস্বী, সেই নশ্বর মানুষটি স্বর্গীয় রক্ষাকর্তাদের মধ্যে যে কোন একজনেরই অনুরূপ। তাঁর সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান, এবং শুদ্ধতা, আত্মসংযম ও আত্মার পরিপূর্ণ প্রশান্তি সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে ! হে কলি, যে কেউ নলকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করবে, সে নিজেই তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ অভিশাপ ও ধ্বংসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে !"

ধর্মভাবে এই কথাগুলি বলে দেবতারা কলি এবং দ্বাপরকে পিছনে ফেলে স্বর্গে চলে গেলেন। কিন্তু, তাঁরা চলে যাওয়ার পরেই কলি দ্বাপরকে বললেন চুপিচুপি, "আমি প্রতিশোধ নেবই ! নেবই এর প্রতিশোধ! নলের মধ্যে আমি অধিকার বিস্তার করব, তাকে তার স্ত্রী আর রাজ্য থেকে বঞ্চিত করব। আর তুমি, পাশার মধ্যে ঢুকে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে !"

তবু, নলের উপর নজর রাখতে কলির বারো বছর সময় লেগে গেল। এই সময়ের মধ্যে তাঁর আচরণের এমন কোন ত্রুটি খুঁজে পাওয়া গেল না, যার সূত্র ধরে কলি তাঁর মধ্যে ঢুকে গ্রাস করতে পারেন। যাই হোক, অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় যখন নল তাঁর পূজা শেষ করতে গিয়ে সবগুলি আচমন সম্পন্ন করলেন না, তখন এই ভুলের ছিদ্র ধরে কলি তাঁর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এমনকি তিনি তাঁর ভাই পুষ্করকে গিয়ে নলকে পাশা খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাবার জন্য উত্তেজিত করলেন। এই সঙ্গে দ্বাপরও পুষ্করের হাতে মূল পাশা অর্থাৎ ছক্কায় পরিণত হলেন। সেই মারাত্মক জুয়া খেলার এই হল সূচনা, যা মাসের পর মাস ধরে চললো, এবং শেষ হল নলকে সর্বস্ব বঞ্চিত করে।

খেলা চলতে থাকা কালে দময়ন্তী, নাগরিক ও প্রজারা কত সময় এসে নলকে ক্ষান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে, কিন্তু ভিতরের কলির প্রভাবে রাজা রানীর কথা অগ্রাহ্য করেছেন ও আরও বরং বেশি করে ঝুঁকে পড়েছেন পাশার উপর। রানী যখন দেখলেন যে সব অশুভ তাদের উপর এসে পড়ার উপক্রম করছে, তখন রাজসারথিকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, "সারথি, আমি তোমার সাহায্য চাই। আমার মন সংশয়-ব্যাকুল হয়েছে। রাজা দুঃখে পড়তে চলেছেন। তুমি আমার ছেলে ইন্দ্রসেন ও মেয়েকে নিয়ে আমার বাবার বাড়িতে রেখে এসো ! তাদের আমার আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার পর, তুমি যা ইচ্ছা করো !"

এ বিষয়ে রাজার মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করা হলে, তাঁরা দেখলেন, রানীর আদেশ খুবই উত্তম।. ছেলে-মেয়েদের রাজা ভীমের তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সারথি চলে যাওয়ার পর, পুষ্কর নলের কাছ থেকে রাজত্ব ও তার আর যা কিছু ছিল সবই জিতে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "রাজা, আপনার বাজী ধরতে আপনার আর কি বাকি আছে? বাকি আছে শুধু দময়ন্তী একা। আসুন, তাকে বাজী ধরে খেলা যাক!"

নিদারুণ মনস্তাপের সঙ্গে রাজা পুষ্করের দিকে তাকালেন স্থির দৃষ্টিতে, কিন্তু একটি কথাও বললেন না।

তারপর নিজের সব অলংকার খুলে দিয়ে, একমাত্র পোশাক পরে, তার সব ধনসম্পদ পিছনে ফেলে রেখে রাজা শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। দময়ন্তীও একটি লম্বা ওড়না ঢাকা দিয়ে তার পিছনে অনুসরণ করে চললেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, তিনদিন তিনরাত্রি তারা একসঙ্গে ঘুরলেন। কারণ, পুষ্কর ঘোষণা করে দিয়েছেন, যে নলকে সাহায্য করবে, তার মৃত্যুদণ্ড হবে। তাই, কিছুটা দণ্ডের ভয়ে, কিছুটা পাছে সাহায্য করলে রাজার আরও ক্ষতির কারণ হয়, এই ভয়ে প্রজাদের মধ্যে একজনও সাহস করে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না।

অবশেষে, চতুর্থ দিন যখন তারা বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গাছের মূল ও ফলের অনুসন্ধান করছেন, নল দেখতে পেলেন, সোনালী রংয়ের কতকগুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে। "এই তো খাদ্য!"—এই ভেবে তার পরনের একমাত্র কাপড় খুলে নিয়ে তাদের উপর ছুঁড়ে মারলেন ধরবার জন্য। কিন্তু হায়, পাখিগুলো কাপড়টা সঙ্গে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

আর, তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে একদা নিষাদদের শক্তিশালী সম্রাটকে বিষন্ন মনে উলঙ্গ অবস্থায় মাটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাখিগুলো বিদ্রূপ করে বলে উঠলো, "ক্ষুদ্রবুদ্ধি রাজা, তুমি যে পাশা নিয়ে খেলেছিলে, আমরা সেই পাশা ছাড়া আর কেউ নই। তোমার পরিধানে একটি মাত্র কাপড়ও নাই, এটা দেখেই আমরা সন্তুষ্ট। তোমার কাপড়টুকু নিয়ে নেওয়ার জন্যই আমরা তোমার পিছনে অনুসরণ করেছি এতক্ষণ।

এই কথাগুলি শোনার পর এবং মারাত্মক দশা উপলব্ধি করে তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, তার শত্রুরা নিগূঢ় রহস্যময় সত্তা। নল দময়ন্তীর দিকে ফিরে বারবার বলতে থাকলেন, "ভদ্রে, ঐ যে রাস্তা দেখা যায়, তোমার বাবার রাজ্যে চলে গেছে। দময়ন্তী আমি সবই হারিয়েছি। আমার দুর্ভাগ্য নিয়তি-নির্দিষ্ট, আমার চেতনাও হারিয়েছে। কিন্তু, আমি তোমার স্বামী। আমার কথা শোন। ঐ রাস্তা ধরে তোমার বাবার রাজত্বে চলে যাও।"

কিন্তু দময়ন্তী কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলেন, "রাজা, তোমাকে একা এই বনের মধ্যে ফেলে রেখে কি করে আমি চলে যেতে পারি? তোমার সবই গিয়েছে, ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে তুমি ক্লান্ত। না, না, মন্দভাগ্যের এই দিনগুলোতে যখন তোমার পূর্বের সুখের কথা মনে পড়বে, তুমি আমাকে তোমার কাছে পাবে তোমার ক্লান্তি উপশমের

জন্য! মনে রেখো, বৈদ্যরা কি বলেন, "দুঃখের দিনে স্ত্রীর সমান ঔষধ আর কিছু নাই। নল, আমি তোমাকে যা বলছি, একথা কি সত্য নয়?"

নল বললেন "দময়ন্তী, ভদ্রে! তুমি যা বলেছ, তা ঠিকই। সত্যি, স্ত্রীর মতো বন্ধু, স্ত্রীর মতো ঔষধ আর কিছু নাই। কিন্তু, আমি তো তোমাকে ত্যাগ করছি না। তবে তুমি এমন করে কাঁপছ কেন? আমি নিজেকে পরিত্যাগ করতে পারি, প্রিয়ে, কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারি না। তবে, তুমি এত ভয় করছো কেন?

কিন্তু, দময়ন্তীর আছে স্ত্রীর পূর্বদৃষ্টি। তাই, তিনি উত্তরে বললেন, "আমি জানি, রাজা, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবে না। তবু, পাগল ও হতবুদ্ধি অবস্থায় অনেক কিছুই সম্ভব। কেন বারবার তুমি আমাকে আমার বাবার বাড়ির পথ দেখিয়ে দিচ্ছ? অথবা, তুমি যদি সত্যিই চাও যে, আমি আমার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে থাকি, তাহলে চলো, আমরা দুজনেই বিদর্ভ দেশে চলে যাই। সেখানে তোমাকে সম্মানের সঙ্গে রাজা অভ্যর্থনা জানাবেন, সকলেই শ্রদ্ধা করবে, আমার বাবার বাড়িতে আনন্দে কাটাতে পারবে।"

নল বললেন, "নিশ্চয়ই তোমার বাবার রাজ্য আমার নিজেরই রাজ্যের মতো। তবু, এই দুর্দিনে আমি কিছুতেই সেখানে যেতে পারি না। একদিন সেখানে আমি সৌভাগ্যের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলাম, গৌরবান্বিত করেছিলাম তোমাকে, আজ সেখানে তোমার লজ্জার কারণ হয়ে এই দারিদ্র্যের মধ্যে কি করে যেতে পারি?"

দময়ন্তী তাঁর নিজের কাপড়ের একাংশ দিয়ে স্বামীকে ঢাকলেন, আর ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে দুজনে গিয়ে পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থানে উপস্থিত হলেন। এখানে খোলা মাটির উপর বসে বিশ্রাম করতে করতে তাঁরা ক্ষুধায়, চিন্তায় ও দুঃখে অবসন্ন হয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন।

কিন্তু কলির জন্য নলের মন সব সময় উদ্বিগ্ন ও বিক্ষিপ্ত, তিনি ঘুমোতে পারলেন না। দময়ন্তী ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেগে উঠলেন এবং তাঁর স্ত্রীর উপর যত বিপদ ডেকে এনেছেন, মনে মনে সেইসব কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর অনুরাগের কথা চিন্তা করে তিনি ভাবলেন, তিনি যদি দময়ন্তীর সঙ্গে না থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই বাবার বাড়ির রাস্তা খুঁজে চলে যেতে পারবেন। এবং যে সম্মানের সঙ্গে তিনি তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পক্ষে একটা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল যে, পরে দময়ন্তীর কোন বিপদ হতে পারে। এইসব চিন্তার মধ্যে তাঁর মনে একটি প্রশ্ন জাগলো, দুজনের পরে থাকা একটিই পোশাক, দময়ন্তীকে না জাগিয়ে কি করে তিনি ছিন্ন করবেন? মনের মধ্যে এই চিন্তা জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কলির প্রভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও দু-এক পা দূরে একটা খোলা তলোয়ার পড়ে থাকতে দেখলেন। তলোয়ারটি কুড়িয়ে নিয়ে তিনি ওড়নাটা আধখানা করে কেটে ফেললেন ও তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দময়ন্তীকে তাঁর ঘুমের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেলেন সেখান থেকে।

তবু বারবার তাঁর মনটা ফিরে ফিরে এল সেই বিশ্রামের কুঁড়েঘরটিতে। একবার, আরও একবার দেখলেন তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রীকে। কলি তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছেন, কিন্তু

প্রেম তাঁকে ফিরিয়ে আনছে। মনে হল, হতভাগ্য রাজার মনটা যেন দ্বিধাবিভক্ত এবং এক অর্ধাংশ অপর অর্ধাংশের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। "হে ভগবান! হে ভগবান!" বলে তিনি বিলাপ করতে থাকলেন, "ওখানে আমার প্রেয়সী খোলা মাটির উপর ঘুমিয়ে আছে; পরিত্যক্ত, অসহায়! জেগে উঠে ও কি করবে? এই বিপদসঙ্কুল বনের মধ্যে ও একা কি করে পথ চলবে? স্বয়ং সূর্য তোমাকে আশীর্বাদ করুন! আকাশের দেবতা, নক্ষত্র ও বায়ু তোমার রক্ষাকর্তা হোন! তোমার সতীত্ব তোমার প্রহরী হোন!"

এইভাবে প্রিয়তমা পত্নীকে সম্বোধন করে নল চলে গেলেন। সেই অতুলনীয় রূপরাশি পড়ে থাকলো। কলি তাঁর সমস্ত যুক্তি অপহরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও চেতনা-বঞ্চিত হয়ে নল ভুলে গেলেন তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রীকে। সেই নির্জন অরণ্যে দময়ন্তীকে একা ফেলে রেখে উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে দুঃখের সঙ্গে চলে গেলেন নল।

তিন বছর চলে গেছে। দময়ন্তী এখন তাঁর বাবার বাড়িতে ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাস করছেন। কারণ, ভীম সেই সময় চতুর্দিকে তাঁর চর পাঠিয়েছিলেন দময়ন্তীকে খোঁজার জন্য, তারা তাঁকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে এনে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি সব অলংকার বর্জন করে আধখানা ওড়না ব্যবহার করতেন ও দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁর স্বামী নলের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতেন। এই তিন বছরের মধ্যে নলের কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি।

শেষবারের মত দময়ন্তীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নলের ভাগ্যে কী ঘটলো? নল দেখলেন জঙ্গলের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে, আর সেই আগুনের মধ্য থেকে কোন এক প্রাণীর আর্ত চীৎকার ভেসে আসছে, "হে শক্তিমান নল, আমাকে সাহায্য করুন!"

"ভয় করো না!" এই কথা বলে নল সেই আগুনের বৃত্তের মধ্যে ছুটে গেলেন এবং দেখলেন একটা বিরাট সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে তার মধ্যে পড়ে আছে।

সাপটা বললো, "রাজা, অভিশপ্ত হয়ে আমি এখানে পড়ে আছি, নড়তে পারছি না', নল নামে যতক্ষণ না কেউ আমাকে এখান থেকে আগুনের বাইরে নিয়ে যান। এবং আমাকে যে স্থানে তিনি নিয়ে যাবেন, আমি কেবল সেইখানেই অভিশাপমুক্ত হতে পারি। নল, আপনি যদি আমাকে হাতে তুলে নেন, আমি আপনার বন্ধু হব ও আপনার মঙ্গল করব। অধিকন্তু আর কোন সাপই আমার মত নয়। আমি নিজেকে আপনার হাতে ছোট আর হাল্কা করে নিতে পারি। আমি মিনতি করছি, আপনি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চলুন!"

তখন ঐ বিরাট সাপটা মানুষের বুড়ো আঙুলের মত ছোট হয়ে গেল, আর নল তাকে হাতে তুলে আগুনের বাইরে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। কিন্তু যেই মাত্র তিনি সাপটাকে মাটির উপর রেখে দিতে উদ্যত হলেন, সাপটা তাঁকে কামড়ে দিল, আর নল যখনই বুঝলেন যে তাঁকে সাপটা কামড়েছে, তখন তাঁর আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে গেল।

তখন সাপ বললো, "নল, আশ্বস্ত হোন্ ! আমি আপনাকে আপনার শারীরিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করলাম, এখন আর কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না। যে আপনার ক্ষতি করেছে ও প্রতারিত করেছে, এবার থেকে তাকে আপনার মধ্যে চূড়ান্ত যন্ত্রণার মধ্যে বাস করতে হবে। এবার থেকে আপনি শান্তি পাবেন ও সেই শয়তানটা আমার বিষের জ্বালায় তীব্র যন্ত্রণায় ভুগতে থাকবে। এখন আপনি অযোধ্যা চলে গিয়ে সেখানে রাজার সামনে উপস্থিত হোন। অযোধ্যার রাজা জুয়াখেলায় দক্ষ। আপনি তাঁর রথের সারথির দায়িত্ব নেবেন। আপনার অশ্ব-পরিচালনার দক্ষতা আছে, সেই দক্ষতা দিয়েও আপনি রাজার সেবা করবেন। বিনিময়ে আপনি রাজার কাছ থেকে পাশা খেলার জ্ঞানটুকু অর্জন করবেন। যখন আপনি পাশা খেলা শিখতে পারবেন, তখন আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে আবার আপনি ফিরে পাবেন। সব শেষে, হে রাজা, যখন আপনি নিজের আকৃতি ফিরে পেতে ইচ্ছা করবেন, তখন আমার কথা চিন্তা করে এই পোশাকগুলি পরবেন।" এই কথাগুলি বলে নাগরাজ নলকে দু-টুকরো মন্ত্রপূত কাপড় দিয়ে অবিলম্বে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এখান থেকে নল অযোধ্যা চলে গেলেন ও সেখানে রাজা ঋতুপর্ণের অধীনে চাকরী নিলেন। ঘোড়ার সুদক্ষ পরিচালক হিসাবে তাঁকে প্রচুর সম্মান দেওয়া হোল এবং তাঁর অধীনে ছেড়ে দেওয়া হোল সবগুলি আস্তাবল ও সহকারীর দল। কারণ ঋতুপর্ণ তাঁর ঘোড়া বেগবান থাকুক, এর চেয়ে অন্য কিছু খুব বেশি আকাঙ্ক্ষা করতেন না।

কিন্তু, রাতের পর রাত অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে বহুক নামে পরিচিত রথের সারথিকে একাকী আর্তনাদ করে কাঁদতে শুনতে পেত অন্যান্য সহকারী কর্মচারীরা। তারা স্পষ্ট শুনতো বহুক কেঁদে কেঁদে বলছে, "হে ভগবান! সে এখন কোথায় মাথা রেখে শুয়ে আছে? ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর, অসহায় ও পরিশ্রমে ক্লান্ত। ভাবছে, তারই কথা চিন্তা করে, কে অযোগ্য? সে এখন কোথায় বাস করছে? সে এখন কার অধীনেই বা কাল কাটাচ্ছে?"

সহকারীরা যখন অনুরোধ করে জানতে চাইল, কে সে, কার জন্যই বা বহুক এমন করে বিলাপ করে, বহুক তখন নিজের কথা প্রচ্ছন্ন রেখে সব কাহিনী তাদের খুলে বললো। সে বললো, "একজন লোক, তার খুব সুন্দরী স্ত্রী ছিল, কিন্তু লোকটির বুদ্ধি ছিল কম। সে তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি। দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল, আর তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। স্ত্রীছাড়া লোকটি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল শোকে পীড়িত হয়ে। আর, এখন সে দুঃখের আগুনে জ্বলছে, কি দিন, কি রাত্রি, তার মনে শান্তি নেই। যাই হোক, শেষে লোকটি আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু তার প্রতিটি ঘণ্টা তার মনে স্ত্রীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যখন তার বিপর্যয় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তার স্ত্রী জঙ্গলের মধ্যেও তাকে অনুসরণ করতে ছাড়েনি। কিন্তু, সে তাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে উপযুক্ত মূল্যই দিয়েছে! স্বামী-পরিত্যক্তা, একা জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত, প্রতি মুহূর্তে বিপদ-সঙ্কুল জঙ্গলের ভয়ের মধ্যে সে তার স্ত্রীর জীবনকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। হ্যাঁ, বন্ধুগণ,—সেই লোকটি, শুধু সেই

লোকটিই তার স্ত্রীকে এইভাবে ফেলে পালিয়েছে। কী বিশাল ও সাংঘাতিক জঙ্গল, চারদিকে শিকারী জন্তুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে একা তার স্ত্রীকে সেই নির্বোধ হতভাগ্য লোকটি ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। সেই লোকটি—শুধু সেই লোকটি !"

ঋতুপর্ণের রাজপ্রাসাদে সর্বক্ষণ দময়ন্তীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে কাল কাটাতে লাগলো রথ-সারথি বহুক। আর দময়ন্তী তাঁর বাবার প্রাসাদে একটি চিন্তা, কেবল একটিমাত্র চিন্তা করতে থাকলেন, কি উপায়ে নলকে খুঁজে পাওয়া যায়। এখন, বিদর্ভ রাজ্যের একটি প্রথা ছিল এই যে, সাময়িকভাবে রাজার আদেশ নিয়ে ব্রাহ্মণরা বেরিয়ে পড়তেন, ঘুরে বেড়াতেন শহর থেকে শহরে, দেশে দেশান্তরে, পবিত্র ধর্মপুস্তক থেকে কাহিনী শোনাতেন সাধারণ মানুষকে, আর, যেখানে প্রয়োজন হোত, সেখানে ধর্মশিক্ষা দিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই ভ্রাম্যমাণ ধর্মশিক্ষকদের সাহায্যে দময়ন্তীকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, যখন তিনি এক বিদেশী রাজকন্যার সহচরী হয়ে কাজ করছিলেন। এখন তাই, দময়ন্তী ঠিক করলেন, তিনি সকল ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দেবেন, তাঁরা যেন তাঁর দীর্ঘকাল হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে সন্ধান পেতে তাঁদের পন্থায় চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণরা নির্দেশের জন্য তাঁর কাছে এলে দময়ন্তী তাঁদের একটি গান দিলেন, যে গানটি তাঁরা যখন যেখানে, যে রাজ্যে যাবেন, সমবেত জনতার মাঝে গাইবেন।

"কোথায়, প্রিয় জুয়াড়ী, তুমি কোথায় গেলে,
আধখানা ওড়না ছিন্ন করে দিলে,
রইলো পড়ে তোমার প্রেয়সী পত্নী
বনের মধ্যে ঘুমিয়ে ?
তোমার জন্য বসে আছি,
যেমন তুমিও চাও আমাকে,
পরেছি আধখানা ওড়না শুধু
চোখের জলে ডুবিয়ে।
দয়া করো, হে বীর ! হে রাজা !
ফিরে এসো দয়া করে,
তোমার বিরহে শুধু অবিরাম
দুই চোখে জল ঝরে !"

"এর পরে, এই অংশের সঙ্গে আপনারা আপনাদের কথা যোগ করবেন", দময়ন্তী বললেন ব্রাহ্মণদের। যেমন, "বাতাসের উত্তেজনায় অরণ্য যেমন আগুনে দগ্ধ হয়, তাঁর দয়াও তেমন করে জেগে উঠুক ." - আবার—

"স্ত্রীকে রক্ষা করা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য
তাকে প্রতিপালন করাও কর্তব্য স্বামীর।
বিস্ময়ের বিষয় এই, তোমার ন্যায় মহৎ
অবহেলা করে চলেছে দুটি কর্তব্যই !

তুমি ছিলে জ্ঞানী আর বিখ্যাত,
উচ্চবংশজাত এবং দয়ার আধার।
তবে কেন আমাকে এমন আঘাত দিলে ?
হে ঈশ্বর, সব দোষই আমার !
আমার সৌভাগ্যই আমাকে করেছে বিচ্ছিন্ন।
তবুও তুমি বিরাটতম, তুমি মহত্তম
মানুষের মাঝে ; তাহলে, দয়া করো,
দয়া করো আমাকে !"

দময়ন্তী ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে আবার বললেন, "এইভাবে গান গাওয়ার পর, যদি দৈবাৎ কেউ আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবে তার কথা আমাকে এসে বলবেন। আমাকে জানতেই হবে, সে কে, কোথায় বা সে বাস করে। কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখবেন, কেউ যেন না আন্দাজ করতে পারে, আপনারা যে কথা বলবেন, তা আমার আদেশেই বলছেন। অথবা আপনারা যে আমার কাছে আবার ফিরে আসবেন, একথাও যেন কেউ না বুঝতে পারে। আমি আপনাদের সকলকে মিনতি করছি, আপনাদের গানের উত্তরে যে ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইবে, তার সম্পর্কে সব রকম অনুসন্ধান করতে ভুলবেন না।"

এইসব নির্দেশ পেয়ে ব্রাহ্মণরা দময়ন্তীর আদেশ পালনে বিভিন্ন দিকে যাত্রা করে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের অভিযান চলতে থাকলো নিকটে এবং দূরে, গ্রামে ও শহরে, নূতন নূতন রাজ্যে, জঙ্গলে, তপোবনে, সন্ন্যাসীদের মঠে, ভ্রাম্যমাণ রাখাল বালকদের এক শিবির থেকে আর এক শিবিরে। তাঁরা যেখানেই গেলেন, গান গাইলেন ও সেই অংশের অভিনয় করলেন, যা দময়ন্তী তাঁদের শিখিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা সব জায়গায় অনুসন্ধান করলেন, যদি তাঁরা কোন উপায়ে নলের সন্ধান এনে রাজকন্যাকে দিতে পারেন।

এভাবে যখন দীর্ঘদিন চলে গেল, ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন দময়ন্তীর কাছে ফিরে এসে বললেন, "দময়ন্তী, নিষাদগণের রাজা নলের সন্ধানে আমি অযোধ্যা নগরে গিয়ে ঋতুপর্ণের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। যদিও সেখানে আমি গানগুলি বারবার গাইলাম, রাজা কিংবা তাঁর পারিষদদের মধ্য থেকে কেউ কোন কিছু বললেন না। তারপর, রাজা যখন আমাকে বিদায় করে দিলেন, তখন তাঁর ভৃত্যদের মধ্যে একজন সারথি বহুক এসে আমাকে সম্ভাষণ করলেন। বহুকের চেহারা দেখতে বিশ্রী, তার হাতদুটিও খুব ছোট। কিন্তু, তিনি অশ্ব তত্ত্বাবধানে খুবই দক্ষ, রন্ধনশিল্পের সঙ্গেও তার ভাল পরিচয় আছে।

"এবং এই বহুক অনেক দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জল ফেলে আমার কাছে এসে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলো। আর, তারপরেই সে বললো, 'যখন সে দুজনের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করছিল, আর পাখিরা যার পোশাক নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তার উপর রাগ করা উচিত নয় ! নারীর সম্মানই তার শ্রেষ্ঠ প্রহরী। যে দুঃখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, তার উপর ক্রুদ্ধ সে যেন না হয়। সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা সব সময় স্বামীর প্রতি

বিশ্বস্ত ও সৎ থাকেন। ভাল কিংবা মন্দ যে ব্যবহারই সে পেয়ে থাকুক না কেন, যে লোক তার সব ভালবাসার জিনিস হারিয়ে বসেছে, তাকে সে নিশ্চয় ক্ষমা করবে।' রাজকন্যা, এই কথা শুনেই আমি ছুটে এসেছি। এখন আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।"

এই সংবাদ শোনার পর দময়ন্তীর আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, নল এখন কোথায় আছেন, এবং তাঁকে কি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন নলকে নিজের বাবার বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করা তাঁর নিজের নারীবুদ্ধির উপর নির্ভর করছে। দীর্ঘ সময় ধরে সযত্নে তিনি ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করলেন, তারপর গেলেন তাঁর মায়ের কাছে। এবং তাঁর মায়ের সামনে রাজপরিবারের এক ধরনের পুরোহিত, সেই একান্ত বিশ্বস্ত সেবককে ডেকে পাঠালেন। তিনি নিজে যখন নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন এই সেবকটিই তাঁকে উদ্ধার করে বিদর্ভ রাজ্যের নগরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। বাবা ভীমের কাছে সব গোপন রেখে, কিন্তু মায়ের পূর্ণ অনুমতি নিয়ে তিনি এই ব্রাহ্মণের দিকে ফিরে বললেন, "সুদেব, সোজা পাখির মতো দ্রুতগতিতে এই মুহূর্তে অযোধ্যা নগরে চলে যাও। সেখানে গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে বলবে, ভীমের কন্যা দময়ন্তী আর একবার স্বয়ংবরা হতে চান। দেশের সব অঞ্চল থেকে রাজাও যুবরাজরা এতে যোগ দেবেন। অনেকদিন হোল, বীর রাজা নল বেঁচে আছেন কিনা কোন খবর না পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, দ্বিতীয়বার স্বামী পছন্দ করবেন। তুমি তাঁকে বলবে, আগামীকাল প্রভাতে সূর্য ওঠার লগ্নে স্বয়ংবর সভার অনুষ্ঠান হবে।"

সুদেব রানী মা ও তাঁর কন্যাকে আনত প্রণাম জানিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে অযোধ্যা নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

ঋতুপর্ণ এই সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর সারথি বহুককে ডেকে পাঠালেন। তিনি যদি মাত্র একদিনের মধ্যে বিদর্ভ পৌঁছতে ইচ্ছা করেন, তাহলে জগতে একজন মাত্র সারথি আছে, যে এটা সম্ভব করে তুলতে পারে। তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, "বহুক আরও উদ্যমে চেষ্টা কর। কালই ভীমের কন্যা দময়ন্তী দ্বিতীয়বার স্বয়ংবরা হতে চলেছেন, আমি আজই সেখানে পৌঁছতে চাই।"

ঋতুপর্ণের এই কথাগুলো শোনার পর নলের মনে হোল তার বুক যেন ভেঙে যাবে। সে নিজেকে নিজে ভাবলো, "কী! এ কী পাগলামি, না দুঃখ? অথবা, বোধ হয় এ আমাকেই শাস্তি দেওয়া? হায়, সে এ কী নিষ্ঠুর কাজ করতে চলেছে! এমনও হতে পারে, আমারই নির্বুদ্ধিতার পরিণামে নিষ্কলঙ্ক রাজকুমারী আর আমাকে গ্রাহ্য করছে না। তবুও, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, সে আমার স্ত্রী হয়ে, আমার ছেলেমেয়ের মা হয়ে আর কাউকে বিয়ে করার কথা কল্পনাও করতে পারে। যেভাবে হোক, সেখানে গিয়ে আমি ঋতুপর্ণের ইচ্ছা পূর্ণ করে, নিজেই নিজের চোখে সব দেখে সন্তুষ্ট হব।" মনে মনে এই চিন্তার প্রতিফলন হওয়ার পর

বহুক রাজাকে উত্তর দিলেন, "হে সম্রাট, আমি আপনার আদেশ স্বীকার করছি। আপনি একদিনের মধ্যেই বিদর্ভ নগরে পৌঁছে যাবেন।"

সেদিন সারথি বহুকের রথ-চালনা ছিল অপূর্ব ঘটনাবহুল। ঋতুপর্ণ অথবা তাঁর সঙ্গী ভৃত্য কখনো এরূপ নৈপুণ্য দেখেননি। রথ-চালনা দেখে ঐ ভৃত্যের প্রকৃতই মনে এল রাজা নলের খ্যাতির কথা। সে সারথির উপর চোখ রেখে দেখে নিল, তার শারীরিক সৌন্দর্যের অভাব, আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল যে, এর পক্ষে নল হওয়া কদাচিৎ সম্ভব। যদিও, দুর্ভাগ্যের পরিণামস্বরূপ নলের পক্ষে ভৃত্যের ছদ্মবেশে কাটানো একেবারে অসম্ভব নয়। যখন তখন সারথি রথ নিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল এবং বাতাসের বেগের সঙ্গে সমান গতিতে রথ-চালনা করছিল। আবার, পাখির মতো অতিক্রম করে চলেছিল নদী, পর্বত, জঙ্গল ও হ্রদ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বহু মাইল অতিক্রম করে যাচ্ছিল সে। তাঁর সারথির নৈপুণ্য দেখে ঋতুপর্ণ ভেবে পাচ্ছিলেন না, কি করে তাঁর মনের আনন্দ প্রকাশ করবেন। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বিদর্ভ পৌঁছানোর আবেগ প্রকাশের ভাষাও তাঁর ছিল না। যতই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল, তিনি আরও স্থিরনিশ্চয় হলেন যে, একমাত্র বহুকের সাহায্যেই এ কাজ সম্ভব। কিন্তু, দুপুরের দিকে দু'জনের মধ্যে একটি বিষয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হোল। বিতর্কের আরম্ভ কোন একটি নির্দিষ্ট গাছের পাতা ও ফলের সংখ্যা নিয়ে। ঋতুপর্ণ ছিলেন বিরাট গণিতবিদ্। তিনি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার কথা বললেন, এবং তাঁর সঙ্গী রাজকর্মচারী রথ থামিয়ে, গাছ কেটে গণনা করে দেখার জন্য জিদ করলেন, রাজার কথা সত্যি কিনা যাচাই করে দেখার জন্য। কারণ, সংখ্যা যাচাই করে দেখার ব্যাপারে বহুকের আগ্রহ ছিল গভীর। রাজা হতাশ হয়ে পড়লেন, যেহেতু বহুককে বাদ দিয়ে তাঁর যাওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল ও পাতা গণনা করার পর যখন দেখা গেল, রাজা ঠিকই বলেছিলেন, তখন সারথি রীতিমত বিস্মিত হোল ও রাজার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়লো। সারথিকে আরও কিছুটা তুষ্ট করার জন্য রাজা ঋতুপর্ণ বললেন, "এসো বহুক, তোমার অশ্ব পরিচালনার জ্ঞানের বিনিময়ে, তোমাকে আমার পাশা খেলার জ্ঞান দেব। আমি জুয়াখেলার প্রতিটি গোপন রহস্য জানি।" শুধু এই মুহূর্তটুকুর জন্য নল অপেক্ষা করে আছেন, আর চাকরী করছেন এতদিন! যাই হোক, তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে পাশা খেলার জ্ঞান দিয়ে দিলেন। যেই মুহূর্তে তিনি তা করলেন, অন্ধকারের শক্তি কলি সকলের অলক্ষ্যে নলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, আর তিনি নিজেই অনুভব করলেন, যেন হঠাৎ তিনি সব দুর্বলতা ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন, এবং ফিরে পেয়েছেন তাঁর হারানো সব উদ্যম ও শক্তি। নূতন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে সারথি আবার রথে চড়ে বসলেন ও নিজের হাতে লাগাম ধরে দ্রুত বিদর্ভ শহরের দিকে চললেন।

সন্ধ্যার দিকে ঋতুপর্ণের রথ যখন শহরের মধ্যে ঢুকলো, প্রাসাদের মধ্যে থেকে দময়ন্তী শুনতে পেলেন সেই রথচালনার শব্দ। তিনি রোমাঞ্চিত হলেন, কারণ, এরকম শব্দ লাগামে নলের হাতের স্পর্শ থেকেই হতে পারে, তাঁর স্মরণে এল। কিন্তু

প্রাসাদের একটি ছাদের উপর উঠে বাইরের দিকে লক্ষ্য করে তিনি দেখলেন, একজন নলের মত রথ চালাচ্ছেন, কিন্তু নলের মত মুখ বা শরীরের আকৃতি কারও নয়। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, "হায়, আজ যদি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা না হয়, কাল আমাকে আগুনে পুড়ে মরতে হবে। আমি এ দুঃখের জীবন বইতে পারি না।"

মাঝখানে অযোধ্যা-রাজ ভীমের সঙ্গে দ্রুত সাক্ষাৎ করার আগে ভাবতে আরম্ভ করলেন, কোথাও একটা ভুল নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে। তিনি আর কোন রাজা, যুবরাজা বা তাঁদের রথ ইত্যাদি কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি স্বয়ংবর সম্বন্ধে কোন কথা কারও কাছে শুনলেন না। অগত্যা তিনি রাজা ভীমকে বললেন যে, তিনি কেবল তাঁকে সম্মান নিবেদন করার জন্যই এসেছেন। একথা শুনে ভীম একটু বিস্মিত হলেন। সাধারণত কোন ব্যক্তি এত দ্রুত ব্যস্ততার মধ্যে এত দূর থেকে মাত্র একদিনের মধ্যে শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের জন্য আসতে পারে না। যাই হোক, এর কারণ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে, এই কথা ভেবে ভীম ঋতুপর্ণের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুসারে তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনার দিকে মনোযোগ দিলেন।

এসব ব্যাপারে নলের কোন লক্ষ্য ছিল না। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে তিনি ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন ও যখন দেখলেন যে আদেশমত কাজ হয়েছে, তখন দুহাতে মুখ ঢেকে নতমস্তকে বসে রইলেন। একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শুনে তিনি তাকালেন মুখ তুলে। প্রাসাদের ভেতর থেকে বাইরে এসে একজন দাসী তাঁকে দময়ন্তীর নাম উল্লেখ করে বলছে, কেন এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি এবং ঋতুপর্ণ এসেছেন। সারথি বললো তিক্ততার সঙ্গে, "আমরা এসেছি, কারণ রাজা শুনেছেন যে, বিদর্ভের রাজকুমারী দ্বিতীয়বারের জন্য স্বয়ংবরা হতে চলেছেন!" "কিন্তু তুমি কে?"—পরিচারিকা জানতে চাইলো আবার, "কে তুমি? তোমাদের মধ্যে কি কেউ ঘটনাক্রমে নলের নাম শুনেছ? অমনও হতে পারে যে, তুমি হয়তো জান, ক্লান্ত অবসন্ন রাজা আর নেই।"

বহুক উত্তর দিল, "না না! রাজা তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমনকি তাঁর দেহের রূপও অপহৃত। নলের সত্তাই কেবল নলকে জানে, এবং তাঁর পত্নীকে জানে দ্বিতীয় সত্তারূপে। নল তাঁর গোপন কথা কখনো কারও কাছে প্রকাশ করেননি!"

পরিচারিকা উত্তর দিল, "তবুও, অযোধ্যাতে আমরা একজন ব্রাহ্মণকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি যখন গান গাইলেন—

'কোথায়, প্রিয় জুয়াড়ী, তুমি কোথায় গেলে,
আধখানা ওড়না ছিন্ন করে দিলে,
রইলো পড়ে প্রেয়সী পত্নী
বনের মধ্যে ঘুমিয়ে?
কথা বলো, মহান রাজা, শুনতে বড় ব্যাকুল,
আমার কোন কলঙ্ক নাই, আমি যে আকুল!'

ব্রাহ্মণ যখন এই গানটি গেয়েছিলেন, তখন তুমি কিছু জবাব দিয়েছিলে। তোমার সেই কথাগুলি আবার বলো। আমি মিনতি করছি। আমার মনিবানী সেই কথাগুলি আবার শোনার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।"

এই কথার উত্তরে নলের গলা আধখানা বুজে এল। তিনি সেই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন, "যখন সে দুজনের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করছিল, আর পাখিরা যার পোশাক নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তার উপর রাগ করা উচিত নয়। নারীর সম্মানই তার শ্রেষ্ঠ প্রহরী। যে দুঃখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, তার উপর যেন সে ক্রুদ্ধ না হয়। সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা সব সময় স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ও সৎ থাকেন। ভাল কিংবা মন্দ যে ব্যবহারই সে পেয়ে থাকুক না কেন, যে লোক তার সব আনন্দ হারিয়ে বসে আছে, তাকে সে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে।"

এই কথাগুলি শেষ করে রাজা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। দু'হাতের মধ্যে মাথা রেখে দুঃখে ভেঙে পড়লেন। এই দৃশ্য দেখে পরিচারিকা রাজকুমারীকে সব কথা বলার জন্য নীরবে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

ঋতুপর্ণের সারথির বিরাট শক্তির খবর দময়ন্তীরও কানে এসে হাজির হয়েছিল। তিনি শুনেছিলেন, কেমন করে একটি নীচু দরজার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি নিজেকে ছোট করলেন না, বরং, তাঁর সামনে প্রবেশপথটাই বড় হয়ে গেল, যাতে তিনি সহজেই পেরিয়ে আসতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাতেই যানবাহন নিজেই জলে পূর্ণ হয়ে জলের প্রয়োজন মেটায়। আগুনের দরকার হলে তাঁকে আগুন জ্বালাবার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয় না, এক মুঠো ঘাস সূর্যের আলোতে ধরলেই, ঘাসগুলো আপনা আপনি তাঁর হাতের মুঠোতে জ্বলে ওঠে। এইসব কাহিনী ও আরও অনেক কিছু শোনার পর দময়ন্তীর নিশ্চিত ধারণা হোল, সারথি বহুক তাঁর স্বামী নল ছাড়া আর কেউ নন। তবু, তিনি আরও একবার পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁর ছেলেমেয়ে দুটিকে দাসীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন নলের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবার জন্য। তাদের দেখে নল তাঁর বাহুর মধ্যে নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর যখন বুঝলেন যে এটা অন্যের চোখে অদ্ভুত দেখাচ্ছে, তখন আত্মসমর্থনের ভঙ্গীতে পরিচারিকাকে বললেন, "এরা অনেকটা আমার নিজের ছেলেমেয়ের মত দেখতে। কিন্তু, কুমারী, তুমি এদিকে আর এসো না। আমরা বিদেশী; এখান থেকে অনেক দূরের দেশ থেকে এসেছি। আমরা অপরিচিত, তাছাড়া আমি একা থাকতে চাই!"

এখন, এইসব কথা শোনার পর দময়ন্তী আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, তাঁর বাবা ও মায়ের অনুমতি নিয়ে নলকে তাঁর নিজের মহলে ডেকে আনলেন। তাঁর সামনে এসে, এবং, তাঁকে যে পোশাকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন, সেই আধ-খানা ওড়না-ঢাকা অবস্থায় দেখে তিনি দুঃখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনিই যে নল এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে এবং তাঁকে ভৃত্যের বেশে দেখে দময়ন্তী আর চোখের জল চাপতে পারছিলেন না। তবু, নিজেকে সংযত রেখে তিনি শান্ত মৃদুস্বরে বললেন, "আচ্ছা বহুক, তুমি কি কখনো একথা শুনেছ, একজন ভালমানুষ তার অনুরাগিনী

স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় একা বনের মধ্যে ফেলে চলে গিয়েছিল? হায়, তার মধ্যে নল কি দোষ পেয়েছিল যে আমাকে এই অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া উচিত হয়েছিল তার? আমি কি স্বয়ং দেবতাদের তুলনায় তাঁকেই পছন্দ করে বরণ করিনি? এবং, তিনিও কি তাঁদের সাক্ষাতে অগ্নিসাক্ষী রেখে আমার হাতে হাত রেখে বলেন নি, 'আমি চিরকাল তোমারই থাকব!' তুমি কি মনে কর বহুক, সে প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে গেল, যখন তিনি আমাকে এমন করে ছেড়ে চলে গেলেন!"

নল উত্তরে বললেন, "বাস্তবিকই এ দোষ আমার নয়, সবই কলির কাজ, কলি এখন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, আর, তাইতো আজ এখানে আসতে পেরেছি। কিন্তু, দময়ন্তী, তোমার মত সৎ মহিলা আর কি কখনও ছিল, যে দ্বিতীয়বার স্বামী পছন্দ করতে পারতো? এই মুহূর্তে তোমার বাবার সংবাদবাহকরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, আর চীৎকার করে ঘোষণা করে চলেছে, 'ভীমের কন্যা তাঁর উপযুক্ত স্বামী আবার পছন্দ করে গ্রহণ করবেন'। শুধু এই কারণেই ঋতুপর্ণ আজ এখানে ছুটে এসেছেন।"

তখন দময়ন্তী কাঁপতে কাঁপতে ভীত হয়ে তাঁর হাত দুটি জড়ো করে নলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "প্রিয়, পবিত্র স্বামী আমার, আমাকে অসতী সন্দেহ করো না! তোমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যই এ আমার পরিকল্পনা মাত্র। তুমি ছাড়া এ জগতে আর কারও ক্ষমতা ছিল না এত দ্রুত রথ চালনা করে এখানে পৌঁছতে পারতো। সেই দেবতারা, যাঁদের সামনে তোমাকে আমি বরণ করেছিলাম, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু সকলেই তোমাকে বলুক আবার প্রতিটি চিন্তা শুধু তোমার জন্যই ছিল কিনা!"

দময়ন্তী এই কথাগুলি বলার পর আকাশ থেকে ফুল ঝরে পড়লো, এবং একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "প্রকৃতই দময়ন্তীর সততাও মর্যাদা প্রশ্নাতীত! দময়ন্তী কলঙ্কহীনা!"

এবার নলের হৃদয় শান্ত হোল। তাঁর নিজের শরীরের আকৃতির পরিবর্তনের কথা তাঁর মনে হোল। তিনি সেই মন্ত্রপূত পোশাকগুলি বের করে পরলেন, আর, পোশাকগুলি পরার সময় তাঁর মনকে নিবদ্ধ রাখলেন সেই মহান সর্পটির স্মৃতির উদ্দেশে। নল তাঁর হারানো শরীর, সৌন্দর্য সবই ফিরে পেলেন। দময়ন্তী নলকে আবার আগের মতো দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন ও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হোল তাঁদের কাছে। রানীমা আশীর্বাদ করলেন তাঁদের। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল তাঁদের বিচ্ছেদব্যথার স্মৃতিগুলি আলোচনা করে।

পরেরদিন ভীম রাজদরবারে উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে নল ও দময়ন্তীকে অভ্যর্থনা করলেন। যথাসময়ে কলিও নলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাই, নল তাঁর নিজের নিষাদ-রাজ্যের দিকে এগোলেন, সেখানে গিয়ে পুনরুদ্ধার করলেন তাঁর সিংহাসন।

তারপর তিনি তাঁর রানী দময়ন্তী ও ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে এসে তাঁদের সবাইকে নিয়ে চলে গেলেন নিজের প্রাসাদে। এরপর তাঁরা সকলে একসঙ্গে সুখে বাস করতে থাকলো।

প্রাচ্য পরিবারের চিত্র

কলকাতার হিন্দুপল্লীতে জীবনযাত্রা

যখন আবিষ্কার করলাম যে আমার কাজের দরুন আমায় কলকাতার হিন্দুপল্লীতে বসবাস করতে হবে চতুর্দিক থেকে চিরাচরিত প্রতিবাদ উঠল। মনে হল যেন কলেরা বা টাইফয়েডে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা যদি প্রকাশ হয় তবে নিরাপত্তার সম্ভাবনা এক। আমি অবশ্য এই ভীতির যৌক্তিকতা দেখতে পাইনি। কয়েক মাস হল এখানে আছি, একটা দিনও অসুখের কারণ দেখতে পাইনি।

আমার চোখে আমার বাড়িটি চমৎকার। দুটি আঙিনা, অল্প একটু দোতলা ও পাঁচ থাকে তৈরি মজার ছাদওয়ালা বাড়িটা প্রাচীন হিন্দু কায়দায় বাড়ি তৈরির এক খাপছাড়া নমুনা। গোটা জায়গাটায় এক ইঞ্চি কাচ নেই, নীচের জানালাগুলোতে লোহার গরাদ, উপরের গুলোতে কাঠের। আমার পড়ার ঘরে ঘন সবুজ রং করা কাঠির তৈরি চিকে সূর্যের দীপ্তিকে কিছুটা কোমল করে, কিন্তু আমার শোবার ঘরে তারাদের অবাধ উঁকিঝুঁকি। অতীতে এখানে কোনও বড় পরিবার বাস করত, হয়তো এখানে এক পুরুষের মৃত্যু হয়েছিল, তারপর শেষ বুড়ো মারা যাওয়ার পর বাকিরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, সেইসব গোষ্ঠি হয় তো আবার নতুন নতুন পরিবারের পত্তন করেছিল। পুরানো বাড়িটি যেন এমন সব জীবনের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত যাদেরই অবিরাম স্রোত চলেছে আমার জানালার তলায়, নীচের গলিতে, আশেপাশের গ্রামে—নিঃসন্দেহে অজ্ঞ ও সরল, কিন্তু মানবিক মায়া-মমতা ও অনাড়ম্বর ভক্তিতে ভরা।

গলিটা দিব্যি পরিষ্কার, বেশ মজার আঁকা-বাঁকা। গোড়ায় একদিকে মোড় নিয়েছে, পরে আর একদিকে, আর বড় বড় বাড়ির মাঝখানে যেখানেই জায়গা পেয়েছে ছোট ছোট বস্তী গজিয়ে উঠেছে। ঘন বাদামি রঙের দেওয়াল আর লাল টালির ছাদওয়ালা এক প্রস্থ মাটির কুঁড়ে এখানে নারকেল গাছের সারির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। নারকেল গাছেরা উপরে নভোনীলে পুচ্ছ দোলায়, নীচে তাদের দীর্ঘায়িত ছায়ার আশ্রয়ে রয়েছে একটি ছোট্ট পুকুর ও গোয়ালঘর, আশ্রয় পাচ্ছে দেওয়ালের তলাকার দু-চারটি সবুজ গাছ-গাছালি। আর একটা বস্তীতে প্রবেশপথে পাম্পের মত জলের কল, তাকে ঘিরে প্রায় সবসময়েই ঘোমটা-পরা মেয়েদের ভিড়; কাঁখে তাদের পিতল বা মাটির সুঠাম কলসী। সর্বত্র রোদের আমেজে খুশি বাচ্চাদের হাসি, সর্বত্র সদ্য-মেলা কাপড়-চোপড় পতপত করছে, এখানে-সেখানে ছুটো-একটা গরু।

এখানে লেখার টেবিলে বই ও ছবিতে আর আধুনিক জীবনের দু-একটা সাদা-মাটা সৌখিনতায় পরিবৃত আমি বাইরে চোখ মেলে বহু শতাব্দী আগেকার এক জগৎকে দেখি। না বাইরে নয়, আমার এই ঘরের ভিতরেই দেখি। সে দিনটা আমি ভুলব না যেদিন আমার বুড়ি ঝি উনুন কেনা নিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এল, উনুনের দাম পড়বে ছ ফার্দিং। এত বিপুল পয়সাকড়ির মালিক হয়ে যে তিন-

খানা ছোট লোহার শিক, একটা বড় পাতলা টালি ও একতাল গঙ্গামাটি কিনে ফেলল। তাই দিয়ে নিজের জন্য ছোট্ট সামান্য একটি উনুন তৈরি করে ফেলল। এই উনুনে সে একটি কাঁদাওয়ালা গোল মাটির হাঁড়ি চাপাত। দিন কয়েক পরে খুব কাঁচুমাচু হয়ে সে আরও ছটি ফার্দিং চাইল, গরম হাঁড়ি নামানর জন্য একটা সাঁড়াশি কিনবে। সাঁড়াশি একটি তুচ্ছ চেহারার বাসন, কেউ বলতে পারবে না কত কাল ধরে ঝিয়ের পূর্বপুরুষেরা ঠিক এরই দোসরদের গৃহস্থালির নির্দোষ বিলাসের টুকিটাকির মধ্যে ধরে এসেছে। সমস্ত জিনিসটাই দারিদ্র্যের মুখর সাক্ষ্য, পুরুষের পর পুরুষ সাহসের সঙ্গে যে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছে এবং সুন্দরভাবে বহন করেছে। মাটির হাঁড়ি যখন আগুনের উপর স্বাভাবিকভাবেই ফেটে গেল তখন তার কান্না অবশ্য আরও ইঙ্গিতবহ। হাঁড়ির দাম মোটে একটি ফার্দিং। এই বৃদ্ধার বয়স সত্তরের উপর, তার অর্ধেক বয়সী আমি তাকে "ঝি" অর্থাৎ "মেয়ে" বলে ডাকি। উঁচু অবস্থার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও অবশ্য তাকে এই বলেই ডাকে। হিন্দু গৃহস্থালির এ একটি সুন্দর আচার, সেখানে ঝিদের কাছে মনিব ও মনিব-গিন্নী "বাবা" ও "মা", আর মেয়েরা "দিদিমণি"। পুরানো ঝিদের ঠাকুমা হিসাবে পরিবারের অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া, মনিবদের বকাঝকা করার অধিকার লাভ করা ও জীবনের শেষ পর্যন্ত মনিবদের ছেলেমেয়েদের আহ্লাদ দিয়ে মাথা খাওয়া—এ একেবারে আকছার ঘটে। এসব ক্ষেত্রে পারিবারিক গোষ্ঠীর এই সদস্যটির সামাজিক নীচুস্তর অপরিচিত লোক সহজে বুঝতে পারবে না। মনিব-গিন্নী ঝির খাবার নিজেই রাঁধে ও স্বহস্তে পরিবেশন করে (আমাদের ধ্যান-ধারণার একটা মজার বৈপরীত্য) আর ঝি যখন বৃদ্ধ বয়সে মারা যায় তখন তার মনিব বাড়ির পাতান আত্মীয়রা রক্তের সম্পর্কের কেউ মারা যাওয়ার মতই শোকার্ত হয়।

ঝির পক্ষে যেসব কাজ করা নিষিদ্ধ তা নিয়ে আমার গোড়ার দিককার দিনগুলোয় বেশ মজা হত। দ্বিতীয় দিন বিকেলে যখন আমি চায়ের জন্য গরম জল চাইলাম হঠাৎ তাকে অদৃশ্য হতে দেখে তো একটু কৌতুকই বোধ করলাম। মুহূর্তের মধ্যে সে ফিরে এল, সারা গা দিয়ে জল ঝরছে। আমার খাবার ছোঁওয়ার আগে চান করার দরকার বোধ করার জন্যই এই অবস্থা। এই ধরনের আতিশয্য ক্রমশ আপনা-আপনিই মিলিয়ে গেল, আর এখন অবাক কাণ্ড, আমার কাপডিশ ধুতে সে রাজী, কিন্তু যখন আর কোনও মেমসাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন বান্ধবীর কাপডিশ ধোওয়ার কাজটা আমাকেই করতে হয়। খাদ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ভারতীয় কুসংস্কার নিশ্চয়ই বিস্তারিত অনুশীলনের যোগ্য। কুসংস্কারের বিস্তারিত অনুশীলনে নিশ্চয়ই মজুরি পোষাবে। কিন্তু বিশুদ্ধির ধারণা এশিয়ার দেশগুলিতে কেন এত অসুবিধা ও বাধা-নিষেধে ভারাক্রান্ত অথচ প্রাচীন গ্রীসে কি করে দৃশ্যত এমন লঘুতা ও শোভনতার সঙ্গে ব্যাপারটাকে পার হয়ে যাওয়া গেল ?

আমার বাড়িতে একটা আঙিনা আছে। আমরা ইংরেজরা কেন আমাদের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পক্ষে উপযুক্ত গৃহস্থাপত্যকে সূর্যের ও ঝকঝকে রোদের দেশ এই

প্রাচ্যভূমিতে টেনে আনি? যে দেশের যা শৈলী তাই নেওয়াই কি বিজ্ঞজনোচিত নয়? হিন্দুরা নিশ্চয়ই নিজেদের ঠাণ্ডা রাখতে আমাদের চেয়ে বেশি মাথা ঘামায়, ধনীদের বাড়িতে আমরা যেসব বিরাট বিরাট শ্বেতপাথরের আঙিনা দেখি যার সিঁড়িতে ও থামের গায়ে বসান চারাগাছের মেলা, সেগুলো নিশ্চয়ই এথেন্স বা পম্পিয়াইয়ের যে কোনও জিনিসের মতই সুন্দর। আমার আঙিনাটি অবশ্য বিশুদ্ধ শ্বেতপাথরের নয় তবু সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সামনের দরজাটা খুলতে কেন যে আমার এত ভাল লাগত তা আবিষ্কার করতে আমার বেশ কিছুদিন লেগেছিল। পরে বুঝলাম এ হল ভিতরে থেকেই আবার আকাশ ও তারাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ। আঙিনা যেন দিনে শীতলতা ও ছায়ার প্রশস্ত কূপ, রাতে অনন্তকালের মন্দির, হালকা হাওয়ার খেলার মাঠ, অবারিত সূর্যঘড়ি, আঙিনাওয়ালা বাড়ি কে না ভালবাসবে?

আমার বাড়ির স্থাপত্যের আর একটি সৌন্দর্য হল তার ছাদ। এখানে এলে মনে হয় যেন সিরিয়ায় আছি। চতুর্দিকে বহুদূরবিস্তৃত একই রকমের ছাদ, মাঝে মাঝে গাছ ও বাগানের শ্যামলিমা, নীচে উপরে সারি সারি থামের ও পাথরের খাড়া খাড়া সিঁড়ির বৈচিত্র্য। বাংলার এই বিপুল সমভূমিতে লাহোরের মত ভিড় করে আসা সৌন্দর্য নেই। এখানে আভাসটা বরং বিস্তৃতি ও শান্তির; ছাদের পর ছাদ, মাঝে মাঝে তালগাছের মাথা, আর উপরে বিশাল নীলের গম্বুজ। এখানে উষায় কি গোধূলিতে কি জ্যোৎস্নায় মনে করা যায় যে বিশ্বজগতের সঙ্গে যেন একাই আছি। নীচে দেখা যায় প্রত্যেক আঙিনায় সন্ধ্যার রান্নার জন্য জ্বালা ছোট ছোট উনুন থেকে ধোঁওয়া উঠছে। ইংল্যাণ্ডের আরামদায়ক গ্রামীণ দৃশ্যপট থেকে কত যে তফাৎ! আবার উপরটাও কত তফাৎ। দুই ক্ষেত্রেই যদিও ঘরে ফেরা আগুনের আভাতেই উদ্ভাসিত, তবু এই তফাৎ! উপরকার বাতাসের এই উজ্জ্বল নির্মলতা আর চাঁদের ও তারাদের বিপুল দীপ্তির কথা মনে রাখলেই কারণ বোঝা যাবে।

কিন্তু বেশির ভাগ সময় পর্দার অন্তরালে আবদ্ধ হিন্দু মেয়েদের পক্ষে এমন একটা ছাদ থাকা যে কতখানি ব্যাপার! এখানে তার সমগ্র জীবনদর্শন ঘটে, যে জীবন বিমূর্ত, যে জীবনের পরিসর নৈর্ব্যক্তিক। এখানে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সান্নিধ্য কারণ এক অন্তরালবাসিনীর ছাদ অন্য অন্তরালবাসিনীর কাছে অধিগম্য, এখানে গ্রীষ্মের দীর্ঘ রাতের উত্তাপ জুড়োয়, বহুক্ষণ ধরে রসালাপ চলে যখন পরিবারের মেয়েরা স্বস্তিতে দম ফেলার জায়গা এই ছাদটুকুতে লুকিয়ে চুরিয়ে চলে আসে ঘুমোনর জন্য, আর এখান থেকেই সেই গঙ্গার আভাস মেলে, যে গঙ্গা সন্তাপহারিণী, শ্রমলাঘবিনী পূজার মতই শান্তিদায়িনী। সুন্দরী গঙ্গা। সন্তানরা তাঁকে কত যে ভালবাসে! পাদস্পর্শে মলিন হবেন এই আশঙ্কায় গঙ্গায় নামার আগে তাঁদের নীচু হয়ে মাথায় একটু জল ঠেকিয়ে বন্দনাটুকু কি কমনীয়।

"কিন্তু সামাল, সামাল! কুকুর ডাক! ভিখারীর দল শহরে ঢুকল।" ভারতীয় গৃহিণীদের কাছে ভিখারীর ব্যাপারটা অত্যন্ত বাস্তব। তারা একেবারে পালে পালে হাজির হয়, সৌভাগ্যক্রমে অবশ্য রোজ নয়: সুবেশ, সুস্মিত চেহারার

স্ত্রী-পুরুষ, বেশির ভাগ সাদা কাপড় পরা ; বড় বড় জপের মালা আর একহাতে লাঠি ও আর একহাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। তাদের এমন পরিপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে যে গোটা শহরটা বিভিন্ন পল্লীতে ভাগ করে নির্দিষ্ট করা আছে কোন পল্লীতে সপ্তাহের কোন দিনে তাদের পরিক্রমা হবে। আমার অবশ্য সব চেয়ে আগ্রহ নিঃসঙ্গ ভিক্ষাজীবী সম্পর্কে। তত্ত্বগতভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে মানুষগুলি যেন নগ্নপদ মঠবাসী, বুদ্ধের গৈরিক বসনের মত গৈরিক বেশ পরা, আর পরমাত্মার নামের জোরে ভিক্ষার্থী। আওয়াজ কানে আসার আগেই হয়তো সে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে, চাইলে দেখা যায় দাঁড়িয়ে সুরেলা 'হরিবোল' কি 'সীতারাম' আওড়াচ্ছে। এই তার ভগবানকে ডাকা। ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধে ভারতীয়দের অনুভূতি বিশেষ নজরে পড়ার মত। বারবার নামকীর্তনই হল মোট আরাধনা, তাদের যুক্তি হল আমরা অনুভব করি না করি আগুনে হাত দিলেই যদি হাত পোড়ে, তা হলে আমরা জানি বা না জানি ভগবানের নামকীর্তনে কি শুভ হতে বাধ্য নয়? আমাদের বন্ধুটি হয়তো তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইছে, আর এ জিনিসটা উল্লেখযোগ্য, কারণ অতি মধুর ও শক্তিমান সমগ্র একটি সাহিত্যিক রূপ এই ভিক্ষুকদের সেবায় নিয়োজিত, বাংলার রবার্ট বার্নস রামপ্রসাদের অপূর্ব সুন্দর গীতের যেটুকু অবশিষ্ট আছে কিছুকাল আগে পর্যন্তও তা সংগ্রহের উৎস ছিল কেবল এই রকমই। গানের শেষ চরণে গীতিকারের নিজের নামটি সর্বদা উল্লেখ থাকার কথা, এই মজার প্রথাটি কোনও বিশেষ গীতিকারের রচনা সংগ্রহের জন্য যে কতখানি সহায়ক তা শুনলেই বোঝা যায়। বন্ধু আমাদের সামান্য একমুঠো চাল কি দুটো ফল কিংবা একটি পয়সাতেই সন্তুষ্ট, উপরন্তু দাবিদার যখন এত তখন তা ছাড়া কিছু দেওয়াও কঠিন। 'মা, খেতে দাও' বলে যে মানুষটি এসে দাঁড়ায় দাতার মনে তার সম্বন্ধে কিন্তু কোনও খারাপ ধারণা থাকে না। "অনাহারী মানুষের প্রতিবেশীর রুটিতে স্বাভাবিক অধিকার" এই অনুশাসন ভারতবর্ষে কোনও রোমাঞ্চ জাগায় না, এখানে অনুরূপ ধারণাকে মৌলিক সামাজিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরেই নেওয়া হয়।

"নতুন মানুষ, অজানা মুখ, অপর মন" পরিবৃত এখানকার জীবন বহু অপ্রত্যাশিত আকর্ষণে ভরা। এই যে টেবিলে বসে আমি লিখছি তার কয়েক ইঞ্চি দূরে অবিশ্রাম পাখির ডাক আর ডানার ঝাপট শোনা যায়। আর একটু দূরে দেখা যায় নিম, অশ্বত্থ ও তালগাছের কাঁপন—আর নীচে চতুর্দিকে এমন এক জীবন যা নতুনত্বে স্পন্দমান অথচ অতীতের রহস্যে আভাসিত। আমি আমার হুইটমান ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের, 'বিয়াটা বিয়াট্রিক্স'-এর অপূর্ব সৌন্দর্যের দিকে তাকাই আর প্রতীক্ষা করি একটা মানসিক পরিবেশ থেকে স্বচ্ছন্দে আর একটায় উত্তরণে সক্ষম হওয়ার জন্য, কারণ এই উত্তরণ ছাড়া কেবল ঘটনাচক্রে শারীরিক উপস্থিতির মূল্য অতি সামান্য। এই যে ইচ্ছা আমি প্রকাশ করছি ইতিমধ্যেই তা একটুখানি অন্তত পূরণ হয়েছে। আগের তুলনায় এক বৃহত্তর অস্তিত্ব আমি উপলব্ধি করছি,

উপলব্ধি করছি সমগ্র মানবজাতির এক বিপুল জাহাজ যাতে দূরত্ব ও কাল সমানভাবে মিশে গিয়েছে, যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আর্য তাদের মহত্তম রূপে একীভূত হয়েছে।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের দৃষ্টিতে যার প্রকাশ হয়েছিল :

"হে গণতন্ত্র, তোমার সর্বোত্তম জাহাজে পাল তোল,
মহামূল্য তোমার পশরা, এ শুধু বর্তমান নয়।
অতীতও সঞ্চিত তোমার ভাণ্ডারে,
তুমি শুধু তোমার একার কীর্তির, শুধু পাশ্চাত্য
মহাদেশের কীর্তির ধারক নয়।
হে জাহাজ, সারা বিশ্বের সমগ্র কীর্তিকে ভাসমান রেখেছে
তোমার তলদেশ, স্থগিত রেখেছে তোমার কাঠামো।
তোমার সঙ্গে পাড়ি দিচ্ছে কাল, পুরোগামী জাতিরা
তোমার সঙ্গেই ডুববে কি ভাসবে,
অপরাপর মহাদেশের সকল সুপ্রাচীন সংগ্রাম, শহীদ বীর,
যুদ্ধ সব কিছু সহ তাদের তুমি বহন করে চলেছ,
তোমার ঈপ্সিত, জয়োল্লাসিত বন্দর যতটা তোমার, ততটাই তাদেরও।
অতএব, হে কর্ণধার! হাল ধর শুভ সবল হাতে, রাখ সতর্ক দৃষ্টি,
তুমি আজ বহন করছ দুই মহাসঙ্গীকে,
তোমার সাথী আজ প্রাচীন গ্রন্থের সন্ন্যাসীকল্প এশিয়া,
আর রাজকীয় সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপ।"

আমাদের জেনানা ছাদ

যেসব পণ্ডিত ও শিল্পীমনের লোকেরা কলকাতার এই হিন্দুপল্লীর মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে দু-এক ঘণ্টা কাটাতে আসেন, তাঁরা কখনও কখনও মধ্যযুগীয় শিল্পকলা ও আধুনিক ভয়ঙ্করতা নিয়ে মাথা ঘামান ছেড়ে আমাদের এই বলে সান্ত্বনা দেন যে আমাদের বাইরের গলিটি কিন্তু গোড়ার যুগের ইতালীয় সৌন্দর্যের সত্যিকার একটি টুকরো। একথা শুনতে আমাদের ভালই লাগে, যদিও আমাদের বাড়িটি যে সুন্দর তা কেউ আমাদের বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। নভেম্বরের সান্ধ্য কুয়াশার মধ্যে যখন দূর-দূরের ব্র্যাকেট থেকে ঝোলান গোটা দুই রাস্তার আলো আগে-পিছে দাঁড়ান বাড়িগুলোর সামনে আলো ফেলে,—এই বাড়িগুলো যেন বিনম্র ও ভাব-গম্ভীর আগ্রহে পরস্পরের একেবারে ঘা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে—তখন সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না যে আমাদের গলিটি সুন্দর। এখানে হয় তো একটা ছোট্ট বারান্দা বাড়িটাকে পিছিয়ে দিয়েছে, ওখানে হয় তো একটা পাঁচিল উঁকি দেওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়েছে। কোনও কোনও তোরণের উপরকার সুদৃশ্য সেকেলে ঢালাই কারুকার্য কয়েক প্রস্থ পলেস্তারার দরুন আবছা হয়ে গিয়েছে। আর প্রত্যেকবারের চুনকামের পর এইসব বড় বড় ভারতীয় বাড়িগুলোকে দেখায় যেন আপাদ-মস্তক সাদা ও প্রাচ্য-সুলভ সেলাইবিহীন পোশাকে আবৃত দীর্ঘদেহী লোকের মত, অথবা পরিষ্কার কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাতে হয়তো সাদা চাদরে ঢাকা বিবর্ণ শবের কথা মনে পড়িয়ে গা শিরশির করিয়ে দিতেও পারে।

কিন্তু এইসব বিদেশীরা যাঁদের অন্তরে সৌন্দর্য আছে, তাঁরা যদি আমাদের ভারতীয় গলি দেখে এমন প্রভাবিত হন তাহলে আমাদের চোখ দিয়ে আমাদের জেনানা ছাদ দেখতে পেলে কি বলতেন? পাঠকের পশ্চিমের বাড়িতে কি এমন কোন প্রিয় জানলা আছে যা থেকে সবুজ মাঠ ও গাছ দেখা যায়, আর প্রথম বসন্তে ফুলের কুঁড়িরা যাকে ঘিরে দল মেলে দেয়, কিংবা অগ্নিস্থলীর গা-ঘেঁষে কোনও বিশেষ কোণ আছে যেখানে আগুন ও ছবি আর নীচু আসন স্বাগত অভ্যর্থনা জানায়, আলোর ও শান্তির অনুভূতিতে তাঁর মন ভরে দেয়? তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন আমাদের ছাদ আমাদের কাছে কি। আমাদের চারটি আঙিনার তৃতীয়টি দোতলায় খোলা। তার তিন দিকে আরও উঁচু ছাদ-ওয়ালা ঘর, চতুর্থ দিকটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, পাঁচিলের এক অংশে জালি কাটা, তাতে পর্দার কাজ হয়। মাঝখানে চারটে থামে আটকান কাঠের রেলিং যাতে আমরা নীচের আঙিনায় পড়ে না যাই। সমস্ত জিনিসটা সরল সৌন্দর্যে নিখুঁত। ছাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে একটা সরু সিঁড়ি উঠে গিয়েছে একটা শক্ত পোক্ত চৌকোণা বুরুজ পর্যন্ত, খাড়া উঠে গিয়েছে উপর তলার ছাদ ও খোলা জায়গায়। আহা, কি অপূর্ব সিঁড়িটি! মাটির মেয়েদের মধ্যে ভগবানের আশিসধন্যকে বেছে বের করার জন্য ভগবানের ঘোষিকা (হেরাল্ড অব গড) হিসাবে ক্রিভেলির ঘোষণার দেবদূতীর (ক্রিভেলি'জ এঞ্জেল অব

অ্যানানসিয়েশন) নেবে আসার পক্ষে মানানসই। একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চয় হতে পারি : এ ক্ষেত্রে ক্রিভেলীর দেবদূতী ও তাঁর সিঁড়ির মধ্যে কোনও বৈষম্য হত না।

আর যদি আমরা উল্টো দিকে চাই তা হলে দেখতে পাই পশ্চিমের দেওয়াল পেরিয়ে উঠেছে নিমগাছের প্রশস্ত শাখা-প্রশাখা আর ফার্নের মত পত্রসম্ভার। পুবালী হাওয়ায় বেয়ে আসা ম্যালেরিয়াকে ঠেকানর জন্য প্রতিবেশীর বাড়ির পাশে নিমগাছ পোঁতার পুরোনো কলকাতাই রীতি অনুযায়ী লাগান এই রোগহর নিম গাছটি আমাদের চির আনন্দের উৎস। তার কাছ থেকে পাই অবিশ্রাম নিশ্বাস ও গতি। তার আশ্রয়ে সকল শত্রুভয় মুক্ত চড়াই পাখির দল ভিতরে, বাইরে, চার পাশে খেলে বেড়ায়, তলায় মানুষের দল গল্পগাছা করে, নয় গম্ভীর হয়ে বসে দেখে। কেবল চড়াই পাখিরাই তার অতিথি নয়। প্রসারিত শাখা-প্রশাখায় বসে থাকে কাকেরা, হাসতে তারা পারে না বটে তবু কি রসিক! এই ঘাড়ে-পড়া ভদ্রলোকদের প্রতি আমরা সামান্যই নজর দিই, যদিও আমরা এ বিষয়ে দিব্যি সচেতন যে আমাদের জীবনযাত্রার ধারা তাদের কাছে একটা বরাবরকার কৌতূহলের বস্তু আর তারা অতিশয় বন্ধুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভাবগতিক সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদের সতর্ক করে ও উপদেশ দেয়। কাকের ভাবগতিক দেখলে মনে হয় তার আজকের থবরাথবর সম্ভব হলে তার কালকের নির্দেশ হয়ে উঠবে। পায়রারা আসে, নীচের তলার আঙিনায় তাদের বাস, কথনও কথনও সারারাত ধরে তাদের বকবকম চলে। কথনও হয়তো একটা নিঃসঙ্গ মাছরাঙার আবির্ভাব হয়, দিন পনের ধরে প্রতিদিন একই সময়ে তার স্পষ্ট উঁচু ডাক শোনায়, তারপর উড়ে চলে যায়। কিন্তু সবচাইতে যাদের ভালবাসি তারা হল ছোট ছোট পাখি, হরেক রকমের পাখি—ছোট্ট টুনটুন, চড়াইয়ের চেয়েও অনেক ছোট, এক-আধটা ময়না, কথনও কথনও এক-আধটা নীচে ছোঁ-মারা সোয়ালো, আরও কত যাদের আমরা এমনকি নামও জানি না। হাঁ, আর ভোরে কিংবা পড়ন্ত বিকালে যথন আমরা পাখিদের দল বেঁধে দূরে, সুদূর উত্তরে উড়ে যেতে দেখি, তাদের সাদা বুকের আর ডানার তলায় রোদ ঝকমক করে, তথন এগুলি যদি আমাদের বাড়িটা একটা দিক-চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায় তবে তা কেবল আমাদের প্রতিবেশী এই নিমগাছেরই কল্যাণে। পাখিদের জীবনে ও তাদের যুক্তি পরামর্শে আমাদের যদি কোনও বিশেষ স্থান হয়ে থাকে তা কেবল এই নিমগাছের করুণা ও সৌন্দর্যের দৌলতেই।

আর যতই ছোট হোক একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চয়ই আছে। ভারতবর্ষে সমস্ত ছোট ছোট পশুপাখি যারা বাড়িতে আশ্রয় নেয় তাদের পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। তারা সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে আসে, আর আমাদের আশেপাশে তিনি যে রয়েছেন তার ইঙ্গিত দেয়। একদিন এক গেরুয়া পরা ফকিরই আমাদের সঙ্গে বসে নীরবে চড়াই পাখিদের প্রেম ও কলহ, বিশ্বস্ততা ও পারস্পরিক ক্ষমার খেলা দেখতে

দেখতে হঠাৎ ধ্যান ভেঙে বলে উঠেছিলেন, "কি চমৎকার যে এরা,, ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও এমনভাবে থাকতে পারে।"

ফুলের কেয়ারি ও লতার সাজ নিয়ে আমাদের ছাদের পাঁচিল একটা কোণ কাটে, পশ্চিম থেকে উত্তর মুখে সামান্য একটু যায়। এই উত্তরমুখো যাওয়াটা খুব অল্প একটু, কারণ এর পর থেকেই আবার ঘর শুরু হয়। কিন্তু এইখানেই সেই পর্দার মত জাফরি-কাটা যেখান থেকে মেয়েরা লুকিয়ে চুরিয়ে প্রতিবেশীদের আনন্দময় সংসারের দু-এক টুকরো দেখতে পারে। আর তার উপরে একটু দূরে বাড়ির ভিতর-কার দর্শকদের চোখে পড়ে এক সারি নারকেল গাছের সবুজ পাগড়ি-বাঁধা মাথা। পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান সূর্যের আলোর দিকে মুখ করে একের পর এক শোভাযাত্রার মত তারা দাঁড়িয়ে থাকে। আর এক ঘণ্টা যায়, রোদ এসে পড়ে সেই কাণ্ডের উপরকার পাতার মুকুটের ঠিক তলায়, মুকুট থেকে আলো ঠিকরে ওঠে, তারপর মিনিট দশেক ঊর্ধ্বগামী সূর্যের উদ্দেশে প্রার্থনার মত নিবেদিত হয় আলোকসঙ্গীত। তারপর আবার সব ধূসর হয়ে যায়, গ্রীষ্মমণ্ডলের অত্যুগ্র উজ্জ্বলতার ঘোমটায় ঢাকা পড়ে ; দিন গড়িয়ে যায়। কিন্তু নারকেল গাছের প্রভাতী মহিমাই সব নয়। অপরাহ্ণ এসে যায়, সূর্যাস্তের ঘণ্টা খানেক আগে পুবের দিকে প্রলম্বিত আলোকরশ্মি আবার সবুজ মুকুটের সমান্তরালে আসে। এবার অবশ্য আলো এসে পড়ে নীচের দিকে বাঁকান তলাকার পাতাগুলির উপরের পিঠে। এইভাবে নারকেল গাছেরা প্রতিদিন দুবার ভগবানকে প্রণাম করে। ব্রহ্মাণ্ড দৃশ্য সন্ধানে ও তাতে সাড়া দেওয়ায় অভ্যস্ত হিন্দু চোখগুলি প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত বাসগৃহ থেকে আলোকের এই প্রভাতী ও সান্ধ্য সঙ্গীত লক্ষ্য করার জন্য উঁকি দেয়।

আগে ও পরে প্রতি বাড়ি থেকে পুজোর সময়কার ঘণ্টাধ্বনি আমাদের ছাদে ভেসে আসে। আবার গোধূলি ক্ষণে, তরুণ চাঁদ নিমগাছের মাথার উপরে স্পষ্ট হয়ে আসার আগে মহা অসীমের আবরণ হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় মহৎ চিন্তার অনুকূল পরিবেশ। আমাদের এই ছাদটুকু, আত্মার এই আশ্রয়টুকু নীরব, নিভৃত, পৃথিবী থেকে দূরে, এখানে মধ্যরাত্রি তারার আলোয় দাঁড়িয়েই হোক, আর দিনের বেলায় পাঁচিলের ছায়ায় বসেই হোক, কিংবা ভোরবেলায় রোদ পোহাতে গিয়েই হোক, ত্রিভেনির দেবদূতীর কথা ভোলা অসম্ভব, অথবা কর্তব্য কর্ম করা এবং নিষ্কাম ভাবে ও আধো-আশায় মানবহৃদয়ে অকস্মাৎ দিব্য আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু অসম্ভব।

হিন্দু ও বিধবা জেনানা

ইংরেজের চোখে হিন্দু জীবনের বিরাট বৈশিষ্ট্য হল এর বিপুল প্রাচীনত্ব। এর তুচ্ছাতিতুচ্ছ পর্যন্ত প্রবীণতায় সমৃদ্ধ। বনচারী বীরদম্পতি সীতা ও রামের যে আভাস আমরা পাই তাতে সীতা শাড়ি পরেন ও স্বামীর অনুগমন করেন, যেমনটি তিনি আজও করতে পারতেন। শাড়ি কতকালকার তা বোধহয় কেউ বলতে পারবেন না। মিশরীয় দেবীদের ছবিতেও আমরা শাড়ি দেখি, আর একথা যদি মনে রাখা যায় যে শাড়ি মূলত সেলাই-বিহীন কাপড়, তা হলে, আমার ধারণা গ্রীক স্থাপত্যেও তার দেখা পাওয়া যাবে।

সেলাই করা কোনও কিছু পরা নিতান্ত অপবিত্র, সনাতনীদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চালু এই ধারণাই এই পোশাকটির আদিম সাদাসিদে ভাব বজায় রেখেছে। আরও অনেক নিখুঁত জিনিসের মত এটিও প্রথম দর্শনে এমনকি অতি উৎসাহী দৃষ্টির কাছ থেকেও এর সর্বাঙ্গসুন্দর লাবণ্য লুকিয়ে রাখে। ঘোমটার প্রলম্বিত বাঁক, মাথার লাবণ্যময় ভঙ্গি এবং প্রতিটি খাঁজের সঙ্গে মানানসই প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন কয়েক মাস দেখলে তবে একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক তার সৌন্দর্য পুরো উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রথমটা মনে হয় শাড়ি গোড়ালির দিকে সরু, কাজেই এর ডিম্বাকৃতি চেহারাটি প্রায় "বাণ্ডিলের" মত। তারপর খেয়াল হয় এমনকি তাও সুন্দর, উপরন্তু একটা বৈচিত্র্য আছে যা গোড়ায় লক্ষ্য করিনি। বিশেষ জরুরী দরকারে বা খুব কাজের সময় ছাড়া শাড়ি আঁট-সাঁট করে পরা হয় না, অবসরের সময় এ থাকে স্কার্টের মতই স্বাধীনতা দেয়। কখনও কখনও ঘোমটায় হাওয়া লাগে আর এখানে, এই দৈনন্দিন মানবিক জীবনেই, আমরা সিষ্টিন ম্যাডোনার আভাস পাই।

অরে বেয়ার্ডস্লে ও ফিল মে এবং ফরাসী পোস্টারের সুন্দর শিল্পীরা টেনিস ব্লাউজ, চিত্রকল্প টুপি ও পোশাক নক্সাকারিণীদের ফ্যাশনের ছাঁচের উল্লসিত ভাষ্য দিয়ে কিছু অন্যায় করেন নি। কিন্তু আমরা যদি চাই যে কোনও মানুষ তুচ্ছ জীবনধারণের আধ্যাত্মিক গভীরতার ইঙ্গিত পাক, কি করে একজন যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত ও গ্রীষ্মদিনের মত স্বাচ্ছন্দ্যে লঘু তা জানুক, দুঃখমাতৃকা (মাদার অব সরোজ) ও জয়কিরীটিনী মাতৃকার (মাদার ক্রাউনড) ভঙ্গির মধ্যে চিরবিচ্ছেদকারী পার্থক্য যে চুল-প্রমাণ তা বুঝুক—এই সত্যোপলব্ধি যদি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হয়, তা হলে হিন্দু জেনানায় তা পাওয়া যেতে পারে। কারণ এখানে আমরা এমন এক মর্যাদা ও শোভনতার দেখা পাই যা মহৎ বা ক্ষুদ্র উভয় সম্পর্কেই একান্ত উদাসীন, যা তুচ্ছতম একঘেঁয়েমিকেও উর্ধ্বে তুলে দেয়, ফসল তোলা বা মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার সমস্তরের সুন্দর কর্মের অঙ্গীভূত করে। আধুনিক ইউরোপে কেবল মিলেট সাধারণ জিনিসের এই সম্ভাব্য ক্ষমতা বুঝেছেন। এ বিষয়ে তিনি একা, কারণ তাঁর "দা এঞ্জেলুস" যে পরমাত্মার নিয়ত উপস্থিতি

উদ্ভাসিত, তা আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদ থেকে ততটাই তফাৎ যতটা তফাৎ নদিকা ও পেনিলোপের গল্প থেকে "এ উইণ্ডো ইন থ্রামস" বইটি। কিন্তু মিলেট কখনও ভারতে আসেন নি, আর যদি আসতেন তাহলেও হায়রে, নিজেকে নিতান্ত সাধারণ একটা মানুষ বলেই বুঝতেন।

আর তারপর শাড়ির কি রং-বাহার! আমার অভিজ্ঞতায় বলে যে কোনও একটা জিনিস যখন সঠিক, তখন প্রায়ই গোড়ায় আমি তা বুঝতে পারি না। আমাকে তাতে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হতে হয়। পাড়-বিহীন শাড়ি আমার ভাল লাগত। মনে হত অঙ্গ ঘিরে উপর-নীচে সঞ্চরণশীল ওই ছোট রেখাটি যেন চিত্রটির উপর অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ, ছবিটির মধ্যে পীড়াদায়ক উপাদান। কিন্তু এখন মনে হয় ওটি মহৎ শিল্পীর তুলির টানের মত, সমগ্রকে ব্যাখ্যা করছে, প্রোজ্জ্বল করছে।

কিন্তু কেবল পাড়ই নয়। হিন্দুকে কে কবে রঙের ব্যাপারে ভুল করতে দেখেছে? গাঢ় নীল কখনও নীল নয়, বেগুনি। সবুজ হল রোদে ঝকঝকে ঘাসের মত, বা গোলাপি আভায় উদ্ভাসিত। ধূসর সম্পূর্ণ রুপোলি নয়, তার মধ্যেও নীল পাহাড়ী পায়রার একটু ছোঁওয়া আছে। সাদা-কালোর কোনও চেক বা চোখ ধাঁধাঁর ছক নিতান্ত যাচ্ছেতাই কাণ্ড, চলতেই পারে না।

তবুও, তবুও বিধবার সাদা থানের উজ্জ্বল পবিত্রতার মত আর কিছু আছে কি? পুজোর জন্য রেশম, দৈনন্দিন কাজের জন্য সুতি—কিন্তু সর্বদা সাদা, রঙের লেশমাত্র নেই। এর আকর্ষণ বোধহয় এর অনুষঙ্গের মধ্যে নিহিত। এই কঠোর আড়ম্বর-হীনতা কেবল সর্বোচ্চেরই পরিচায়ক। বিশ্বকে আলিঙ্গনে প্রস্তুত মুক্ত হৃদয়, উৎসর্গীকৃত জীবন, এমন অতীত, যার দুঃখ বর্তমানকে দানে ভরে দেয়—এই গোপন বার্তা বহন করে বিধবার থান।

কারণ একথা বুঝতে হবে যে ভারতবর্ষে এই শোককে মনে করা হয় ধর্মীয় জীবনে প্রত্যক্ষ আহ্বান। ক্যাথলিক দেশগুলিতে যা "এভোকেশন" (ঈশ্বরদত্ত কর্তব্য সম্পাদনের ডাক) বলে পরিচিত, হিন্দু নারীর জীবনে তা কেবল এইভাবেই আসতে পারে। তার জীবন এখন থেকে ঈশ্বরে সমর্পিত, পুরুষে নয়; ব্রহ্মচর্যের প্রতি অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ধারণা বিধবাকে, বিশেষত বাল-বিধবার গৃহস্থালিতে এক অনন্য প্রভাবশালী আসন দেয়। বহুক্ষণ ধরে পুজার্চনার ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের তারিফ ইত্যাদি সনাতনী মনোভাব অদৃশ্য হওয়ার পরও এই শ্রদ্ধার মনোভাব অনেক কাল পর্যন্ত টিকে থাকে। তাই একজন আধুনিক হিন্দু, যিনি "রিফর্মড" সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনিই আমায় বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে সবচেয়ে মহিমান্বিত পোশাক হল বিধবার থান।"

অবশ্য সমাজের কিছু সদস্যের পক্ষে সমস্ত পরীক্ষাই কিছু কঠোর হয়, আর এক বা অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবিচারের মধ্যে বাছবার বিশেষ কিছু নেই। আমার মনে হয় না ঘনিষ্ঠ সাথিত্ব ছাড়া বাস করতে ছোটবেলা থেকেই বাধ্য উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েরা বিশেষ কষ্ট সম্বন্ধে চিরাচরিতের চেয়ে বেশি কিছু সচেতন। তার কর্ম সে

নিজে বেছে নেয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায়ই সে এতে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দেয়, আর সম্পূর্ণ একাগ্রতার মত ভক্তির বিপুল সম্ভার, যা সে স্বামীকে দিত, তাই তার আপন চরিত্র শাসনে নিয়োজিত হয়। আর প্রায়শই সে কি চরিত্র! আমার জ্ঞানে সব চেয়ে আদর্শ নারী হল সনাতনী ব্রাহ্মণ বিধবা। আর সে কিছু একা নয়। তার ভিতর দিয়েই আমি হিন্দুর সেই অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে শিখেছি যখন ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট সমাজে অভ্যর্থনা লাভ করেও সে ইউরোপীয় নারীসমাজের সুরুচি ও উচ্চ শিক্ষাদীক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বেছে নেয় এমন কিছুকে যা এসব ছাড়িয়ে যায়, যা সে পেয়েছিল সরল নিরক্ষর মর্যাদা ও মাধুরীর প্রতিমূর্তি তার মায়ের মধ্যে।

ছোট্ট যে বোনটি বিধবা হয়ে ফিরে আসে তার প্রতি হিন্দু পরিবারের মনোভাব প্রায়ই খুব কোমল। আমরা একান্ত প্রিয়জনের ক্ষেত্রে যা করি, উচ্চতর উৎসর্গে বেদনার্ত সম্মতি জ্ঞাপন, তাদের ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়। অতীতে এ কিছু বিরল ব্যাপার ছিল না যে মা-বাবা, ভাই-বোনেরা এই অবস্থায় তার সব বাধ্যবাধকতা নিজেরাও পালন করত। আমি একজন লোকের কথা জানি যার ছেলেবেলায় এই রকমই হত। শেষ পর্যন্ত তরুণী বিধবাটির চোখে পড়ল যে চারপাশে কেবল নিরামিষ আহার চলছে, তখন সে নিজে মাছ কিনে রান্না করে দিল, এইভাবে পীড়াপীড়ি করে তবেই স্বেচ্ছাবৃত কষ্ট থেকে অন্যদের মুক্ত করল।

পনের দিনে একদিন পালন করতে হয় যে একাদশী, অর্থাৎ উপবাসের দিন, সেটা সত্যিই কষ্টের, বিশেষত গরমকালে। কারণ তাতে চব্বিশ ঘণ্টা শুধু খাওয়াই বারণ নয়, এক ফোঁটা জল পর্যন্তও ঠোঁট দিয়ে গলতে পারবে না। তবু এও কিন্তু হত-ভাগিনীকে আরও হতভাগিনী করার জন্য আবিষ্কৃত অত্যাচার নয়। এক সময়ে এ সমস্ত খাঁটি হিন্দুর পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল, এখনও আশ্চর্যজনকভাবে বহুসংখ্যক লোক এ অভ্যাস বজায় রেখেছে। আমি একজন ভারতীয় রাজপুত্রকে জানি যে এ আচার অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, আর সব চেয়ে রক্ষণশীল জাত—উচ্চবর্ণের বিধবা ভক্তির প্রতিমূর্তি—সে স্বভাবতই অন্য যে কারও চেয়ে বেশি করে একে আঁকড়ে থাকে। আমি যত পুরুষকে জানি তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে একাদশী উদ্‌যাপনের কঠোরতা লাঘব করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেনি, আমি শুনেছি যে একাদশী কলকাতায় যত কঠোরভাবে উদ্‌যাপন করা হয় অন্যত্র তা হয় না।

আমার একবার এক কট্টর নাস্তিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যার বাইবেলের একটি বাণীই কেবল পছন্দ হত, সেটি হল "তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হবে তাকে তোমার সেবক হতে দাও।" আমার বন্ধু বলতে ভালবাসত যে "এ সব সময়ে সত্যি হয়।" কিন্তু ভারতে আসার পর থেকে বাণীটিকে আমি নতুন চোখে দেখছি। এখন যেন মনে হয় এ প্রাচ্য গৃহস্থালি থেকে নেওয়া একটি ছবি। এখানে মেয়েদের মধ্যে অন্তত প্রশাসন প্রায়ই সরাসরি সেবায় চলে যায়। অবশ্য বড় বড় একান্নবর্তী পরিবার, যেখানে চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন খেতে, সেখানে শুধু ভাঁড়ার বের করে দেওয়াই শাশুড়ীর পক্ষে একটা গুরুতর ব্যাপার, নিয়মিত গৃহকর্মের জন্য আর অল্প সময়ই থাকে। তবু

সেই মহিলাও হয়তো স্বামীর ও নিজের জন্য খাবার তৈরি করতে দিনের মধ্যে একবার রান্নাঘরে ঢোকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একথা না উপলব্ধি করি যে বেশির ভাগ জিনিসের মূলে আছে একান্ত আত্মোৎসর্গ, ততক্ষণ কিছুতে বুঝতে পারব না। প্রথা মেনে চলার প্রবৃত্তি যতক্ষণ প্রায় অচেতন থাকে (কখনও কখনও হয় তো তা থাকতে পারে), ততক্ষণ প্রথা সব কিছুকে অসাড় করে দেয়। কিন্তু অনেক সময়ে এ প্রবৃত্তি অত্যন্ত সচেতন। একদিন একটি ধনী হিন্দু পরিবারে আমার রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। পুরুষেরা পর্যন্ত আমার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে দেখে আমি বাড়ির মেয়ের কাছে—বিশেষ করে তারই আমি অতিথি ছিলাম—সকলের শেষে খেতে হবে বলে তার কষ্ট সম্বন্ধে একটা লঘু মন্তব্য করলাম। যেন একটা কোমল জায়গায় হাত লেগেছে এমনভাবে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে সে বলল "ওহো, কিন্তু তাই যে আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগে।" সেই কারণে আমার মনে হয় প্রাতরাশে নিমন্ত্রিত হলে কারও দেরি করা উচিত নয়। অতিথি যখনই আসুন বা যান, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তার খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত নিমন্ত্রণকর্ত্রা খাবে না।

পুরানো বদ্ধ ধারণা অবশ্য চলে যাচ্ছে, এখন পুরুষের পক্ষে সকালে এক কাপ চা দিয়ে দিন শুরু করা তেমন বিরল নয়, যাদের ক্ষমতা আছে তাদের ছেলেমেয়েরা ঘুম থেকে উঠেই একটা মিষ্টি আর এক গেলাস দুধ খায়। মা যেসব বিলাসদ্রব্য অন্য-দের দেয় তা তাঁর নিজে উপভোগ করার দৃষ্টান্ত কিন্তু বিরল। আর বহু পরিবার এমনকি এতটা যেতেও রাজী নয়।

দিনের প্রথম কাজ হল নিজের ঘর ও সাধারণভাবে জেনানা বিভাগকে পরিষ্কার করা। খুব ধনী লোকেরা নিশ্চয়ই ঝি দিয়ে পরিষ্কার করায়, কিন্তু বেশির ভাগ বাড়িতে এ কাজ ঘরের মালিক গৃহিণীর ও তাঁর অল্পবয়সী পুত্রবধূদের। আর যতই ধনী হোক প্রত্যেক মহিলা নিজের হাতে কিছু-না-কিছু সাফ করে, সে তার স্বামীর ঘরই হোক কি গৃহদেবতার মন্দিরই হোক। এ কাজ ভোর চারটে নাগাদ হয়ে যায়। আমি কোনও দিন এত ভোরে উঠতে পারিনি যখনও বাকি বাড়ি পরিষ্কারের কাজ পড়ে আছে।

এর পরের কাজ হল ধ্যান জাতীয় আরাধনা। ঘণ্টা খানেক ধরে এই জপ চলে, চলতে চলতে ভোর এসে পড়ে। তারপর অনেকগুলি দৈনিক স্নানের একটির জন্য গঙ্গায় যাওয়া, যাওয়ার আগে পর্যন্ত হয়তো কোনও পবিত্র গ্রন্থপাঠ। তারপর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানসহ পুজো, এ অনেকটা আমাদের পারিবারিক প্রার্থনার মত, এত সবের পর খাওয়া। খাওয়ার আগে হয়তো তা নিজে হাতে রান্না করতেও হতে পারে। অথবা হয়তো ভিখারী এসে পড়ল তো গোটাটাই তাকে দিয়ে দেওয়া হল, গৃহিণী অপেক্ষা করল যতক্ষণ না তাঁর ভাগটা আবার তৈরি হল। এইভাবে প্রায়ই বেলা দুটো বেজে যায়। আমার এমন ঘটনাও জানা আছে যে বৃহৎ পরিবারের

পৃথিবীর প্রথম খাওয়া থেকেই রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে, অথচ একে একটা কৃচ্ছ্র-সাধন বলে গণ্য করা হচ্ছে না।

সাড়ে বারোটা-একটার সময়ে এই মধ্যাহ্ন আহারের পরই জেনানার মহিলার সুখ শুরু হয়। প্রথম হল তার ঘণ্টা দুয়েকের ঘুম। এ ঘুমটুকু বেচারীর নিতান্ত দরকার। তারপর সে উঠে বসে, একটু পড়ে, একটু গল্প-গাছা করে, সেলাই-ফোঁড়াই করে (এটা অবশ্য বিরল), আর জীবন উপভোগ করে। বিকেল গড়িয়ে গেলে দেখা যায় প্রত্যেকের ডান হাতে একটি করে ছোট থলি, তার ভিতর দিয়ে বুড়ো আঙুলটা বেরিয়ে আছে, আশেপাশের মহিলাদের সকলেরই একটু তন্ময় ভাব। জপের মালা এইভাবে ঢেকে রাখার সম্বন্ধে আমার বেশ কৌতুহল আছে, কারণ আমি শুনেছি সিংহলের বৌদ্ধরা, যারা রুদ্রাক্ষ দক্ষিণ মণিবন্ধে পরে, তারাও তাকে এক টুকরো কাপড়ে ঢেকে রাখে, বাঁহাতে কাপড় জড়িয়ে রাখার ক্রিশ্চান আচারের মত। এই প্রথার উপর কেউ কোনও গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না।

যখন ভগবানের শত শত নাম বলা হয়েছে—অথবা ব্যাপারটা এইভাবে উপস্থিত করা উচিত যে কয়েক শ বার নাম জপ করা হয়েছে—তখন সন্ধ্যা নেমে আসতে থাকছে, আলো নিয়ে ঝি ঘরের সামনে দিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে ঘরের সামনে দিয়ে ছবির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, তারপর গঙ্গা প্রণাম, তুলসী প্রণাম ইত্যাদি নানারকম ভূমিকার পর গোটা সংসারটা পূজায় বসে যায়, এ যারও ধ্যানের রূপে। এই সময়টিকেই দীপালোক বা শান্তির প্রহর বলা হয়।

মেয়েদের দ্বিতীয়বার খেতে খেতে অনেক রাত হয়। মাঝখানের মধুর দুয়েক ঘণ্টায় লণ্ঠন হাতে ঝিদের সঙ্গে নিয়ে বান্ধবী বা প্রতিবেশিনীরা হয়তো গল্পসল্প করতে আসে। সাড়ে নটার মধ্যে সবাই চলে যায়, দশটা বা তার একটু পরে স্নান ও রাতের খাওয়া শেষ হয়, তারপর সবাই শুতে চলে যায়।

উচ্চবর্ণের মেয়েদের পক্ষে এই হল আদর্শ দিন। যেখানে কোনও ঝি নেই কাজের একেবারে সূত্রাতিসূত্র ভাগ করা থাকে। এক পুত্রবধূর উপর ভার সমস্ত রুটি তৈরির, আর একজন ভাত কোটায় ও আলুর তদারক করে, ইত্যাদি। আর এর উপর যদি ছেলেপিলে থাকে তো তাদের "পুকুরে ডুবিয়ে" (এক বন্ধুর ছবির মত বর্ণনামাফিক) সাফ করতে করতে মায়ের প্রাণান্ত। সেই কাক-ডাকা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এক মুহূর্তের অলসতা নেই। সারা পৃথিবীতেই আমাদের সকলের পক্ষে সে কি আরাম যখন :

"থাক না দিনের ক্লান্তি, হোক না দিন দীর্ঘ,
শেষ পর্যন্ত তো বেজে উঠবে সান্ধ্যসঙ্গীত!"

পূজাবর্ষ

অনেকে যে মনে করেন পূজাবর্ষগুলি প্রাচীনতর নাগরিক ধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা সত্যি হোক বা না হোক, এ কোনও খুঁত ধরার আশঙ্কা বা প্রশ্নের অতীত যে হিন্দু পূজাবর্ষের পিছনে থাকে আর একটি ঋতুবর্ষ, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাদর ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। প্রতিটি মহাদিনের আগমন চিহ্নিত থাকে পাতায় পাতায় সূর্যালোকে তার নিজস্ব ঝলক, প্রভাতী হাওয়ায় তার একান্ত আপন টান, অথবা দ্বিপ্রহরে রক্তের নাচনে তার বিশিষ্ট তাল দিয়ে। যখন শারদ প্রাতে শেফালিকা ঝোপ থেকে জনকুইলের মত ছোট ছোট ফুলে মাটি ছেয়ে যায়, বাচ্চারা পুজোর জন্য একটি একটি করে কুড়িয়ে নেয়, লোকেরা তখন শৈশবের আনন্দের মতই একটা সুরে বলে "মা আসছেন, মা আসছেন" কারণ আশেপাশের ওই চিহ্ন তাদের দুর্গাপুজোর কথা মনে করিয়ে দেয়। বসন্তকালে যখন অশোক গাছ থোকা থোকা লাল ফুলে নিজেকে সাজায়, যে অশোক নাকি সুন্দরী নারীর পদপাতের শব্দ না শুনলে ফুল ফোটায় না, বাদামের লম্বা ছাঁদের সুকুমার কলি দেখা দেয়, নীচুজাতের লোকেরা তখন খুশি হয়ে ওঠে, কারণ হোলি আসছে, যে হোলি হল আদিম লোকেদের ইস্টার। গ্রীষ্মের শেষে কৃষ্ণের জন্মদিনে বৃষ্টি হতেই হবে, যখন ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাসুদেব শিশু জগদীশ্বরকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, সুপ্রাচীন কালের সেই রাত্রির স্মরণে বৃষ্টি ঝরবেই। লক্ষ লক্ষ প্রদীপ সহ কালী পুজো মনে হয় বরাবর আসে শ্যামা পোকার বিয়ের ঝাঁকের কোনও রাতে, সর্বদাই মায়ের বেদীমূলের আগুনে ছোট ছোট ডানাওয়ালা প্রাণীগুলো পুড়ে মরে।

কিন্তু কোন প্রকৃতি-উৎসবেরই রাসের সঙ্গে তুলনা হয় না। সুন্দর কার্তিক মাসের গোটা শুক্লপক্ষ জুড়ে রাতের পর রাতে মেয়েরা গঙ্গার ধারে যায় ফুল আর প্রদীপের উপচার সহ সঙ্কল্প নিতে। এবার পূর্ণিমা এল। সবে শীতের শুরু। শীতকালের ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে। সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম থেকে মুক্তি পেয়ে জগৎ স্বস্তিতে ভরা। অনভ্যস্ত শীতলতায় গাছগুলো পর্যন্ত যেন আনন্দে মাতে, আর সেই হল সময় যখন কৃষ্ণ তার রাখালের দল নিয়ে বনে গিয়েছিলেন। গোটা বর্ষাকালটা গরু-বাছুরেরা গ্রামে বন্দী ছিল, এখন তাদের নিয়ে যাওয়া হল দূরের গোচারণ ক্ষেত্রে। বনের সে কি পুলক: জোৎস্নায় ধোয়া দীর্ঘ রাত, গাছে চুপিচুপি কথা, ঘনিয়ে আসা অন্ধকার, গোপালবেশী স্বয়ং ভগবানের উপস্থিতি। যেসব মন্দিরে যথাযথ গৃহ আছে সেখানে নিভৃত আবাস থেকে কৃষ্ণমূর্তিকে বের করে শোভাযাত্রা সহকারে রাসমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে সকাল পর্যন্ত প্রকাশ্যে তার পুজো হয়। গভীর রাতে, চাঁদ সবে যখন অস্তাচলে চলতে শুরু করেছে, সেই সময়ে তিন রাত ধরে মেয়েরা এসে বসে, পুজো করে, নীরবে প্রার্থনা করতে করতে গোল হয়ে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ

চলতে থাকে, মূর্তি-বিক্রেতারা প্রায় নীরবে দিব্যি কারবার চালায়, মন্দির প্রাঙ্গণ মানুষে গমগম করে, সকলে কল্পনা করে নেয় বনে রাখালদের সাথী হয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে।

প্রতিটি পূর্ণিমার আপন এক-একটি সুর আছে। আজ রাতে কোনও এক সময়ে মধুময়ী লক্ষ্মীদেবী ঘরে আসবেন, আজ আমাদের কোনও মতে ঘুম চলবে না, পাছে তাঁর আগমন থেকে বঞ্চিত হই। আবার এ মাসটায় বাড়ির কর্তাদের চাঁদ দেখা অপয়া। কাজেই তাদের জানলা দিয়ে উঁকি দেওয়া বারণ, আর ভালই হল, কারণ আজ হল বাগান চুরির উৎসব, আজ গ্রামের ছেলেদের বাগানে ঢুকে পাকা ফল চুরির অধিকার আছে। কোন চমৎকার যোগাযোগে নষ্টচন্দ্রের রাতটা কি কাঁঠাল গাছের ফল পাকার সময়েই পড়ল?

সমগ্র হিন্দুধর্ম হল সাধারণ জীবনকে বিস্তীর্ণ পবিত্রতাদান, বিশাল হৃদয় এবং চারপাশের জগতের সঙ্গে আত্মার সংযুক্তিসাধন; তীর্থযাত্রা-প্রীতি এবং পবিত্র মন্দিরের সন্ধান গ্রাম্য উৎসবের মতই প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক। প্রকৃতির পবিত্রতা হিন্দু সভ্যতার মৌলিক চিন্তা। তাঁবুতে ও বনে জীবনযাত্রার কষ্টকে কৃচ্ছ্রসাধন বলা হয়, ঘাস গাছের দিকে চেয়ে থাকাকে বলা হয় পূজা। বিশাল নদীর দিকে চাইলে যে স্নিগ্ধতা ও শান্তি পাওয়া যায় তাকে মনে করা হয় মুক্তির ও আত্মাকে মুক্ত করার পথের সোপান।

প্রকৃতির প্রতি এই প্রবল অনুরাগকে সারা বছরের উপবাস ও উৎসবের মধ্যে গাঁথা ও আচার-অনুষ্ঠানে রূপায়িত করা এ একটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ অনুশীলনের ক্ষেত্র। সর্বজনিক সম্মতির একটা স্থির ব্যবস্থার জন্য আগে থেকে একটা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দরকার. যার অন্তত এতকাল টিকে থাকা চাই যার মধ্যে কেবল বিতর্কিত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিধান দিতে পারলেই হবে না, নির্ধারিত বিধানকে প্রথা হিসাবে চালু করতে পারা যাবে। ভারতে এই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হল সেই সাম্রাজ্য প্রায় এক সহস্র বছর ধরে পাটলিপুত্র* যার রাজধানী ছিল। হিন্দুধর্ম যে পরিমাণে দেশে সর্বজনিক তা রূপ পেয়েছিল ও নির্ধারিত হয়েছিল এই কর্তৃত্বেরই নির্দেশে। হিন্দুধর্ম দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে চালু ছিল তা সঠিকভাবে জানতে হলে মাদ্রাজের ও দাক্ষিণাত্যের পূজা সম্পর্কেও বিস্তৃত অনুশীলন করতে হয়। কারণ বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধধর্মের বিপরীতে হিন্দুধর্ম যেভাবে গড়ে উঠেছিল তার মোটামুটি খাঁটি রূপ এখানেই পাওয়া যায়। বাংলার প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর অনেক তফাৎ আছে, কারণ এই ধর্মের ভাষ্য অনেক বেশি সময় ধরে চলেছিল। পাটলিপুত্রের পরে এসেছিল গৌড়, গুপ্তদের পরে এসেছিল সেনরা; আর ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূর সেন, যাঁর উপাধি ছিল পঞ্চগৌড়ের সম্রাট, তিনি তাঁর রাজ্যের প্রজাদের ধর্মাচরণ ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে উন্নত করার জন্য কনৌজের বিখ্যাত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে

* বিহারের পাটনা শহর যেখানে পাটলিপুত্র সেখানে অবস্থিত ছিল; মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী পাটলিপুত্র প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী; খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজধানী।

তাঁর রাজধানীতে এনে বসিয়েছিলেন। আর তাঁরা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন —এই সংক্ষিপ্ত বিশেষণের মধ্যে দিয়ে বোধহয় বলতে চাওয়া হয়েছিল যে এই রাজা গৌড়ে এক প্রামাণ্য ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে বিদ্যাপীঠ আদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাদের রাজা পিতৃপুরুষের কোলে চলে যাওয়ার পরেও বহুদিন পর্যন্ত বাংলার জীবনের উপর প্রভাব বজায় রেখেছিল। হিন্দু সম্রাটদের সম্পূর্ণ পতন ও মুসলমান শাসকদের তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পরেও এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বজায় ছিল ও কাজ করছিল। এ আসলে ছিল পোপতন্ত্রের বাঙালী রূপ, আর এর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বিদ্রোহ করার আগে, সনাতনী অনুশাসন দিয়ে লোকেদের এ যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল তার সম্পর্কে অতিশয় তিক্ত দোষারোপের আগে আমাদের জানা উচিত কি সব সমস্যার সমাধান এদের করতে হয়েছিল। ভয়ঙ্কর বিপ্লবের মুখে এ প্রজাপুঞ্জের সামাজিক বিকাশকে চালু রেখেছিল। ধর্মবিশ্বাসকে এ রুচি ও আচার-ব্যবহারের একটা দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছিল। জাত জন্মের জটিলতা সত্ত্বেও গ্রামকে এ একটা সত্যিকারের অখণ্ড নাগরিক রাষ্ট্রীয় পরিচালন সংস্থায় পরিণত করেছিল। সাহিত্যের উন্নতি ও মহাকাব্য রচনার ক্ষমতাকে এ বজায় রেখেছিল। সর্বোপরি বজায় রেখেছিল হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ অবদানকে, ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব মনশ্চর্চার যে রূপ তার শিক্ষাকে আরও গভীর ও ব্যাপক করে চলেছিল। মনশ্চর্চার এই রূপকে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যাশিক্ষা হিসাবে জানে না, জানে ভক্তিমূলক ধ্যান হিসাবে; জগৎসভায় ভারত যদি আবার নিজের আসন ফিরে পায় তো তবে যে শক্তির কাছে সে ঋণী থাকবে সে এই ভক্তিমূলক ধ্যানের শক্তি।

যতক্ষণ না আধুনিক শিক্ষা লোকের সামনে নতুন পরীক্ষা এনে ফেলল ততক্ষণ বাংলায় ব্রাহ্মণের শক্তি কখনও ভাঙেনি। ইসলাম ধর্ম তাকে কখনও স্পর্শ করে নি। চৈতন্যের নবধর্ম একে অমান্য পর্যন্ত করেনি। এ আপনা আপনিই বেড়েছে ও কাজ করেছে। সংস্কারের নামে পুরাতনকে পালটে ফেলতে পৃথিবী সর্বদাই প্রস্তুত, কারণ কোনও কিছু দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকলে তার মধ্যে সব সময়ে এমন অনেক কিছু থাকে যা পাল্টান দরকার। ছাঁটকাট করা ও আগাছা পরিষ্কার করা চিন্তা ও সমাজের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত। কিন্তু তাকে সংস্কার বলে কি করে অভিহিত করব যদি না জানি যে পুরাতনের জায়গায় কি নতুন আদর্শ বসান হবে? ধ্বংস যে হয়েছে তা তর্কাতীত, কিন্তু কেবল ধ্বংসই কি সংস্কার? সে যাই হোক, বাংলা তার নিজের সংহতি, জটিলতার মধ্যে তার ঐক্য, তার জাতীয় উপলব্ধির সম্পূর্ণতার জন্য বহু শতাব্দীর অন্য যে কোনও একক ঘটনার চেয়ে আদিশূর ও তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য বিদ্যাপীঠের কাছেই বোধহয় অধিকতর ঋণী।

এই তত্ত্ব যদি ঠিক হয়, ব্যাপকতর হিন্দুয়ানি আনুষ্ঠিকতা যদি পাটলিপুত্রের গুপ্তদের কাজ হয়ে থাকে এবং বাংলায় সনাতনী ভাব যদি বিশেষত গৌড়ের সেন রাজাদের

হয়ে থাকে, তা হলে এই দুয়ের পার্থক্য অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে বিরাট একটা ইতিহাস পাওয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে আমরা বাংলার বাইরে এই ধর্মমতের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও কম সমরূপত্বসম্পন্ন টুকরো-টাকরা পাওয়ার আশা করতে পারি। উপরন্তু বাইরে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পাল্টাপাল্টিভাবে জনগণের মধ্যে হিন্দু ধর্মমত কিভাবে বিকশিত হয়েছিল সে বিষয়েও অনুশীলন করতে পারি। কারণ এখানে একটা অপরটার উপর দীর্ঘস্থায়ী কুয়াশাচ্ছন্ন প্রক্রিয়া চাপিয়ে দিয়েছে। হিন্দুধর্মের যেসব উপাদানের মধ্যে ইউরোপের চিরায়ত ধর্মগুলির সাদৃশ্য দেখা যায়, সেগুলিকে খুঁজতে হবে বাইরে, দূর দূরের প্রদেশগুলিতে। কিন্তু হিন্দুধর্মের সম্ভাব্য ক্ষমতা তার গ্রন্থন ও ঐক্যবিধানের ক্ষমতা, তার সভ্যতা বিস্তারক ও উদারতা সঞ্চারক প্রভাব—এসবের জন্য বাংলায় যাওয়াই সব চেয়ে ভাল। যেসব প্রভাব বাংলাকে সে যা তাতে পরিণত করেছে, এখানে আমরা তার সুদীর্ঘ কাহিনী ক্রমে ক্রমে গ্রন্থিমুক্ত করতে পারি। প্রথম প্রতিমা-নির্মাতারা কি চীন থেকে এসেছিল? কখন এসেছিল? প্রধান পূজাগুলি কি ক্রমানুসারে প্রবর্তিত হয়েছিল? গ্রহ সংক্রান্ত দেবদেবী, সাপ ও গাছ ইত্যাদির আদিতে ছকের মধ্যে কোন জায়গায় ছিলেন? যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বাংলার সনাতন ধর্ম গঠিত সেগুলিকে বুঝতে ও তাদের কাল ও উৎস নির্ণয় করতে হলে তার আগে আমাদের এইসব ও আরও এমনি হাজার প্রশ্নের জবাব বের করতে হবে। তবু যেখানেই আমরা যাই—উত্তর, পূর্ব কি পশ্চিম সব সময়েই দেখতে পাব ভারত নিজেই হিন্দুধর্মের প্রেরণা, আর ভারতভূমি ছাড়া এ ধর্ম মানুষহীন নাম, আত্মাহীন সুর।

দোলযাত্রা

ফাল্গুনের পূর্ণিমা নিশি অবসানের পর সুন্দর ভোর। রোগীর ঘরের ছোট মাটির প্রদীপের শিখাটি দপ করে উঠে নিভে গেল। ঘরে প্রথম আলো ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শীতল বাতাস যেন রোগী ও রাতজাগা সেবিকাকে ডানা দিয়ে হাওয়া করে গেল। তারপর সূর্যোদয়ের প্রথম তন্ময় মুহূর্তগুলিতে দূরের গঙ্গার দিক থেকে ভেসে এল ভারতীয় বাঁশীর মধুর সুর। অবিশ্রান্ত রকমের রহস্যময় ও সুদূর, মৃদুমন্দ সুরের উত্থান-পতন, মাধুর্যে স্থির, কোমলতায় ছুঁয়ে থাকা, আপন বিষাদে আচ্ছন্ন। এই বাঁশীর সুর হল পূজার কীর্তনের সুর। আর গতরাতেই জন্মেছিলেন চৈতন্য—নদীয়ার সিদ্ধপুরুষ চৈতন্য, বাংলার কবি ও মুক্তিদাতা চৈতন্য। মানুষকে যিনি ভালবেসেছিলেন, মানুষের এত আনন্দের মধ্যে তাঁর জন্ম কি অপরূপ। কারণ ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুধু গৌরাঙ্গের জন্মদিন নয়, নীচুজাতের মানুষের হোলিপূজা ও হিন্দু পঞ্জিকা মতে দোলযাত্রার দিনও বটে।

প্রাচীন দেশগুলি সম্পর্কে আর যা কিছু নাই জানি, একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারা যায় যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আছে ইরসের স্মরণে বার্ষিকী উৎসবের মত উৎসব। উপরন্তু প্রত্যেকটি দেশের আবহাওয়াগত ও ভৌগোলিক সংশ্লেষ থেকে প্রত্যেকটি উৎসবের ক্ষেত্রেই চাঁদের দেখা মেলে। আর সর্বদাই এ উৎসবের কাল হল বসন্ত। এখানে একটা মেলা, ওখানে একটা ফুলের লড়াই, অন্য কোথাও মে-দিবসের আমোদ আহ্লাদ এখনও তার স্মৃতি বহন করছে, উৎসবের গমনপথের হদিশ দিচ্ছে উত্তর কালকে। একের পর এক বিন্যস্ত ভূস্তরের মত সকল যুগই যেখানে টিকে আছে সেখানে এই উৎসবকে আজও তেমনই রাখা হয়েছে।

যেমন হয়তো ছিল আসিরিয়ায় কি মিশরে, প্রাচীন গ্রীসে কি হিত্তিবংশীয়দের সাম্রাজ্যে।

যখন অশোক ও আমগাছ মুকুলিত হয়, যখন নীল আকাশে হেলান দেওয়া বাদাম গাছের পাতার কুঁড়িগুলি দীর্ঘ ও সুচারু হয়ে ওঠে, পলাশের ঘোর লাল পাপড়িগুলি রিক্ত শাখাকে আলো করে—সেই মধুর ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে হয় হোলি উৎসব, অথবা পুরানো প্রাক্-হিন্দুদের দোলযাত্রা। তারা প্রাক্ হিন্দুই ছিল। প্রাক্-হিন্দুরা এই দোলযাত্রায় যে কাব্য এনেছিল হিন্দুধর্ম অবশ্য তাকে আত্মস্থ করে নিয়ে-ছিল। লোকে বলে সুন্দরী মেয়ের পায়ের শব্দ শুনলেই কেবল অশোক মঞ্জুরিত হয়, আর মদনের ধনুর পঞ্চশরের একটি হল আমের মুকুলের সৌরভ—এ হল লোক-গাথার দুটি কলি, য স্পষ্টতই বসন্তের প্রকৃতি উৎসবের সঙ্গে জড়িত। ভারতের প্রেমের দেবতা মদনকে সব সময়েই তরুণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, শিশুরূপে নয়। কোনও এক সময়ে তিনি ফুলের পোশাক থাকতেন—শুধু তাই-ই নয়, তাঁর অস্ত্রই ছিল ফুলের তৈরি। ধনু যখন আলগা হয়ে তূনীরের পাশে ঝুলত তখন উৎসুক উড়ন্ত মৌমাছিদেরই দেখাত ধনুর মত। কালিদাসের অমর কাব্যে এই কথাই পড়েছি।

শিক্ষিত সমাজে যখনই মদনের কথা ওঠে তখন কালিদাসকে স্মরণ করার প্রয়োজন হবেই, কারণ তাঁর কল্পনাই এই তরুণ ভীরুদ্বাজকে জীবন-উপাখ্যান যুগিয়েছে। প্রেমের দেবতা ও তাঁর সাথী বসন্ত একত্রে যখন মহাদেবের হৃদয়ে শরাঘাতের অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হলেন সে কাহিনী ও ধ্যানের পবিত্র কক্ষে তাঁদের সে অভিযানের ভাগ্যে কি হল সে কাহিনী জানতে হলে সকলকেই কালিদাসের কাব্যের শরণ নিতে হবে। ভারতের মাটির ও ভারতের প্রকৃতির সকল প্রেম যা নিশ্চয়ই একেবারে গোড়ার যুগগুলির আদিম মানুষদের জংলি কাব্যে গাওয়া হত, তা এখানে মহান হিন্দু কবির কাব্যে তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও চিন্তার সমন্বয়ে যুদ্ধের দেবতা কার্তিকের জন্মকথায় রূপ নিয়েছে। কিন্তু কালিদাস তাঁর বীণার ঝঙ্কার তোলার অনেক আগেই ইহসের উৎসবের ভারতীয়করণ হয়ে গিয়েছিল। তার বর্ণনা মেলে বৃন্দাবনের মাঠে মাঠে খেলাধুলার রাখালিয়া কবিতায়। যমুনার তীরে গোপ ও গোপিনীদের মধ্যে গোপালরূপী ভগবান কৃষ্ণের শৈশবের গাথার মত এত সুন্দর কাব্য আর নেই। এগার বছর বয়সে কৃষ্ণ চিরদিনের মত তাঁর কৃষক জীবন ছেড়ে চলে যান। যখন তাঁর বনের সাথীরা রাজপ্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন তারা রাজপোশাকে তাদের বাল্যসখাকে দেখে চিনতে রাজী হল না, তারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হল না যতক্ষণ না তাদের জন্য কৃষ্ণ আবার শিখিপুচ্ছের মুকুট পরলেন, হাতে বাঁশী নিলেন ও গ্রামের সাদাসিদে পোশাকে সাজলেন, এমনি করে তাদের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসার কাছে তিনি আগেকার চেনা সেই গোপালরূপেই আত্মপ্রকাশ করলেন।

উত্তর-পশ্চিমের গ্রাম্যপ্রথার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা সবাই জানে যে উৎসব সম্পর্কে ভারতীয় কৃষকদের ধারণার মধ্যে ঝুলন কি স্থান অধিকার করে আছে। ছেলে ও মেয়ের', তরুণ ও তরুণীরা মেলায় গ্রামীণ ইংরেজদের মতই দুলছে ও চিৎকার করছে, পরপারের উদ্দেশে করতালি বাজাচ্ছে ও হাসি-ঠাট্টা করছে, যে প্রাচ্য মানবের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার লেশমাত্রও এখানে নেই। একটু ফূর্তির জন্য এত সহজে একটি দড়ি, কয়েকখানি বাঁশ ও একটি কাঠের আসন দিয়ে একটা দোলনা তৈরি করা কি যে চমৎকার। কিন্তু হিমালয়ে প্রত্যেকটি মন্দিরের সামনে আমরা দেখি দোলনায় দেবদারু গাছের খুঁটি ও লোহার শক্ত শিকল। এমন দিন ছিল যখন এ উৎসব সর্বত্রই পালিত হত। আর বৃন্দাবনেও এই মাথা ঘোরান ফূর্তি নিশ্চয়ই চালু ছিল, কাজেই বসন্তোৎসবের দিন ঝুলন উৎসব পূজার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে উঠল। অন্যভাবে বললে হিন্দুধর্ম কৃষ্ণ-উপাখ্যানকে মাধ্যম হিসাবে নিয়ে গ্রামীণ লোকদের প্রেমের উৎসবকে আত্মস্থ করছে, এবং তা করতে গিয়ে তাকে বৃহত্তর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

হিন্দুধর্ম বহু জিনিস গ্রহণ করেছে, হিন্দুধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা হয়েছে, কিন্তু সে ধর্ম কখনও আদিম জাতিগুলির আমোদ-প্রমোদের সমালোচনা করেনি বা সেগুলিকে নিরুৎসাহ করেনি। নীচু জাতের লোকেরা এখনও বসন্ত ঋতুর পুরানো চালচলন

অনুসরণ করে। মদন উৎসবের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হয়তো দুটি অপরিহার্য উপাদান আছে। তার একটি হল নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, হয়তো এতে ইউরোপের পুরানো সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'স ডে-র মত স্থূল ভাঁড়ামির উপাদান আছে; দ্বিতীয়টি হল পরবর্তী যুগের উচ্চতর সভ্যতার সামাজিক পার্থক্যকে উপেক্ষা করে সমস্ত শ্রেণীগুলিকে কাছাকাছি টেনে আনা। নীচুজাতের হিন্দুদের হোলিপূজা উৎসবের মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য এখনও রয়ে গিয়েছে। বয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোকেরা বলবেন যে তাঁরা বাল্যকালে দেখেছেন যে তাঁদের মায়েরা বাড়ির হিন্দুস্থানি চাকরের হাতে আবীরের তিলক পরার জন্য মাথা নোয়াতেন।

ইতিমধ্যে বাইরের রাস্তায় ছেলেরা চলমান পথিকদের সঙ্গে যুদ্ধে নেবেছে, এই বিশেষ দিনটিতে তারা লাল আবীরের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য। হলদে আবীরও ব্যবহার হয়, কিন্তু বিজ্ঞলোকদের মতে সেটা ঠিক নয়। লাল আবীরই যথার্থ, কারণ এই আবীর হল কৃষ্ণ যে দানবদের হত্যা করেছিলেন তাদের রক্তে রঞ্জিত বালুকণার প্রতীক। অবাধ্য, উল্লসিত ও পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ সম্পর্কে অধীরেরা সরাসরি দোকান থেকে আবীর কিনে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দেয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত মার্জিতরা অপেক্ষা করে, পুজোর নিয়ম অনুযায়ী উৎসর্গীকৃত ও পবিত্র আবীর নিয়েই দোল খেলে; কারণ লোকে বলে এই পবিত্র আবীর ঋতুর সমস্ত রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

এখনও তাই ভারতে বসন্তকালে গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে পুরানো যুগের এই নাটকটি প্রতি বছরই অভিনীত হয়, আর এমন কায়দাতে হয় যা হয়তো কোনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞজনেরা ও কবিরা এর কোন জিনিসটিকেই ছাড়তে রাজী হবেন না। প্রকৃতির মিলনোৎসবে সরল মানুষদের আনন্দ এবং জাত ও স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সুগভীর গণতন্ত্রের উৎসব—এই হল দুটি প্রবৃত্তি যা পৃথিবীতে যত সমস্ত মেলা ও হোলিপূজার জন্ম দিয়েছে। আর তাছাড়া আপন প্রসন্ন উপস্থিতি ও সদয় সহিষ্ণুতা নিয়ে উৎসবটির উপর দৃষ্টি মেলে, এবং তাতে একটা কিছু কাব্য ও পবিত্রতার উপাদান প্রবর্তন করে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন হিন্দুধর্ম। এর সঙ্গে আশ্চর্য নাটকীয় সঙ্গতি রয়েছে আর একটি বিরাট ঘটনার। ফাল্গুনের পূর্ণিমায়, দোল উৎসবের দিনে বাংলায় আনন্দের মহাদূত, গরিব ও নীচু জাতের মানুষদের প্রতি প্রেমে ভরপুর, জাতীয় মহাপুরুষ, গণতন্ত্রের বার্তাবহ চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জন্মাষ্টমী : মহা জন্মদিন

হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি, পূজাবেদীর সামনে উজ্জ্বল আরতি, এদিকে বাইরে রাতের প্রহরী তারারা আর মধ্যরাতের আকাশের বেগুনি অন্ধকার নীচের দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে আছে—এমনই এক পবিত্র মুহূর্তে জন্ম হয়েছিল কৃষ্ণের।

একমাত্র এ দেশেই বোধহয় বারান্দার রূপ নিতে হয় মন্দিরকে যাতে মানুষের মধ্যে দিব্য অনুভূতি সঞ্চারের জন্য প্রকৃতি নিজের পূজার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। পশ্চিমী সন্ন্যাসীরা সূর্যোদয়ের বহু আগে থেকে প্রত্যূষে, মধ্যদিনে, সন্ধ্যাগমে, গভীর রাতে, নানা সময়ে তাঁদের লর্ড, প্রাইম ও ম্যাটিন, টিয়ার্স ও সেকসট, ভেসপার ও নন প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ের উপাসনা করে। কিন্তু সূর্যের যেসব নানা পদক্ষেপকে তাঁরা স্মরণ করে, সেসব পদাঙ্ক পড়েছিল বহুকাল আগে থিবেড়ের মরুভূমির উপর আর এখানকার পশ্চিমী সন্ন্যাসী ঘরের ভিতরে, বাইরের হিমশীতল হাওয়া থেকে সুরক্ষিত থেকে সেইসব স্তব উচ্চারণ করেন। ভারতবর্ষের ধর্মাচরণ কিন্তু ভারতভূমিরই আর এখানে প্রতিদিনই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেইসব ঘটনা নতুন করে উপলব্ধি করি যা এই ধর্মের জন্ম দিয়েছে। দুপুরের রোদে ঘাসে ঢাকা মাঠ ও নদীর উপর যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে তা কে অনুভব করেছে? বিনিদ্র রজনীর পর দূর গঙ্গাতীর থেকে ভেসে আসা বাঁশীর সুর ভোরের প্রথম আলোয় কে শুনেছে? গোধূলিতে মাঠে মাঠে কে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর একটা বিশেষ সময়ে গ্রামের ঘণ্টা কেন বাজে, উপাসনা কেন শুরু হয়, তা না বুঝেও ঘনায়মান সন্ধ্যার পরশ মনে মনে কে অনুভব করেছে? কারও চোখে এ কুসংস্কার, কারও কাছে অনুভূতির মধ্যে আরও বেশি দৃঢ়তার সঞ্চারক। হিন্দুধর্মে যত পুজো আছে তার ভিতর মাঝরাতের পুজোর মত শক্তি ও ক্ষমতা আর কারও নেই। রাত্রের মহামধুচক্রে সমবেত মানুষগুলির উপর যখন ঘুম নেমে আসে, যখন বন্য প্রাণীগুলি পর্যন্ত আপন আপন পাহাড়ের কোলে বা গাছের ডালে নিথর; যখন যা কিছু তুচ্ছ ও ব্যক্তিগত দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও মিলিয়ে যায়; নদীর কুলকুল ধ্বনির মধ্যে আমরা প্রায় সুদূর সিন্ধুর কলনাদ শুনতে পাই, তখন পূজাবেদীর সামনে যে প্রদীপ জ্বলে সে যেন ব্রহ্মাণ্ডের হৃদকেন্দ্র, তখন উপাসক নিজেকে মনে করে অসংখ্য তারা ও জগতের সেও যেন একজন, তাদের সঙ্গে মিলেই যেন প্রতীক্ষা করছে তমোনাশী জনপদের আলোকের আত্মপ্রকাশের জন্য। আর জন্মাষ্টমীর মাঝরাতের পূজার পক্ষে এ সবই প্রযোজ্য।

বাংলার উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যে একটা রীতি আছে যে প্রত্যেক বাড়িতে একটা পারিবারিক পুজোর ঘর থাকবে, আর কেবল গরিব ও নীচুজাতের লোকেরাই এই মহোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য মন্দিরে যাবে। তবে আমাদের বিকৃত স্বভাবের প্রমাণ হিসাবে এই কারণেই ঘরে পুজোর বদলে ঘন ঘন মন্দিরের যাওয়া

হয়। সরল ভক্তদের দেখতে আমাদের ভাল লাগে, তাদের বেশির ভাগই স্ত্রীলোক, তারা যখন-তখন আসছে, বাইরের উঠানে বসে অনুষ্ঠান দেখছে আর একজন বয়স্ক পুরোহিত পুজোর প্রারম্ভিক কাজকর্ম সম্পর্কে নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছেন। এইসব নির্দেশ এবং তার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝেই যে সব বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান করতে হয় সেগুলি শুনতে আমাদের বেশ ভাল লাগে। এই রকম এক রাতে আমরা এক কালী মন্দিরের সিঁড়িতে বসেছিলাম। মন্দিরটি কাছেই এক কোণে, মুখ দূরের গঙ্গার দিকে, আর গঙ্গার তীরে বাঁধা খড়ের ছাউনি দেওয়া সারি সারি নৌকো, সেগুলি যেন পৃথিবীর দূর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন শহর পরিকল্পনার প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিসুলভ প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্যে মন্দিরের কোণগুলিকে গোলাকার করা। ভিতরে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় যে প্রতিমার অধিষ্ঠান তিনি "খড় ব্যবসায়ীদের কালী" বলে পরিচিত। মাত্র কয়েক বছর আগে জায়গাটা ছিল কলকাতার একেবারে প্রান্তে। কিন্তু এখন আর তা বলা যায় না। যদিও এখনও সেখানে সামনে মস্ত খোলা জায়গা, তার উপর মস্ত একটা গাছ। গাছটা মাঝে মাঝে বহুক্ষণ ধরে কাঁপা কাঁপা আওয়াজ তোলে, যেন প্রতিবেশীদের আসন্ন ঝড় সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চায়।

সারা সন্ধ্যা ধরে পথে পথিকদের যাতায়াত চলছিল, হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে শঙ্খ, ঘন্টা বেজে উঠল, স্তবগান ধ্বনিত হল। আমরা কলকাতার সাবেকী এলাকার বাসিন্দা, দশটা বাজতে না বাজতেই এখানে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। নৈঃশব্দ্য নেমে আসে। এমনকি জন্মাষ্টমীর রাতেও এগারোটার মধ্যেই মন্দির ছাড়া সব কিছুই বন্ধ হয়ে যায়। আর এই মন্দিরের একজন ওড়িয়া পুরোহিত বেদীর আলোতে বসে তখনও একখানি তালপাতার পুঁথি থেকে পবিত্র জন্মবৃত্তান্ত সুর করে পড়ছিল। যে মূর্তিটিকে পূজা করা হবে তাঁকে ঘিরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছিল। কিন্তু বাঁশের চিকগুলো সব তোলা ও দোকানের সামনে কুলুপ আঁটা। একমাত্র মন্দিরের খোলা দরজা থেকে প্রদীপের আলো এসে পড়ছিল।

এইভাবেই জন্মমুহূর্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। মন্দিরটি অদৃশ্য হয়ে গেল। স্নেহশীল বৃদ্ধ পুরোহিতের কণ্ঠস্বর দূরাগত মনে হতে লাগল। শতাব্দীর পর শতাব্দী পিছিয়ে চলে গেলাম। সামনে কারাগারের রুদ্ধ প্রাচীর, রাজবন্দী মাতা দেবকী ও পিতা বাসুদেবের সঙ্গে পবিত্র শিশুর আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। জন্মের প্রথম দিনের মতই আবার মনে হল বৃষ্টি পড়ছে, ঝড় বইছে, ঝড়ের গর্জন ছাড়া কানে আর যে শব্দটি এল তা প্রহরীদের প্রগাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ, সর্বোচ্চ সত্তার নির্দেশ পালনের জন্য কংসের কারাগারে প্রেরিত আত্মারা তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। মাতৃত্বের উদ্বেগ ওই রাতের মত আর কখনও হয়নি। দেবকী সাতবার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, আর সাতবারই জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাই নিষ্ঠুর রাজা তাদের ছিনিয়ে নিয়েছে। কারণ তাকে বলা হয়েছিল

যে দেবকীরই এক শিশু তার শত্রু হয়ে উঠবে ও তাকে হত্যা করবে। অষ্টম সন্তানের নাম যখন দৈববাণীতে উচ্চারিত হয়েছিল এবং ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও ঈর্ষাভরে তার সন্ধান রাখা হচ্ছিল, তখন সাতবার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তার আগমনের সময়ে কেমন করে আনন্দের অবকাশ থাকতে পারে? এই মুহূর্তগুলি কষ্টকর, আশা ও ভয়ের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিদীর্ণ; প্রবল বেদনাময় ভালবাসা যা ব্যাকুলভাবে বাঁচাতে চায়, কিন্তু পরমপ্রিয়কে রক্ষা করার কোনও উপায় দেখতে পায় না। তথাপি এমন সব মুহূর্ত একই সঙ্গে আসে যখন বিপুল বিশ্বাস, ক্রমবর্ধমান প্রগাঢ় ভক্তি, অসীম স্নেহ এবং বিজয়ের অনুভূতি একত্র মেশে।

এবার সে যন্ত্রণার অবসান ঘটল। চোখের সামনে সেই শিশু ভগবান স্বয়ং শয়ান, হাসিতে, দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। অবতারদের 'দুর্দশার মধ্যে জন্ম' তে আর একটি যোগ হল, অবতারের রহস্য এমনকি কারাগারেও অনুভূত হল।

বইতে আছে যে এই নবজাত শিশুই বাসুদেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁকে যেন পরনের কাপড়ে জড়িয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে যমুনার ওপারের গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নন্দ গোপের নবজাত শিশুকন্যার জায়গায় রেখে আসা হয়। সত্যি কি শিশুই একথা বলেছিলেন? নাকি দিব্যসত্তার উপস্থিতিতে অন্তর্দৃষ্টির আশ্চর্য স্বচ্ছতাকেই বাণী বলে মনে করা হয়েছিল?

সে যাই হোক না কেন, রাজবন্দীরা উৎসুক আজ্ঞাবাহকের মত সে নির্দেশ পালন করেছিলেন। ঘটনার গতি রোধ করার জন্য দেবকীর মাতৃত্বের দুর্বলতা, বাসুদেবের পুরুষত্বের সন্দেহপ্রবণতা কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। দীপ্তিমান শিশুটিকে আমার হাতার মধ্যে লুকিয়ে অন্ধকার ও ঝড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পিতা। প্রহরীরা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন; কারাগারের দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল নিঃশব্দে। জগদীশ্বরকে যিনি বয়ে নিয়ে গেলেন তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। ভয়ঙ্কর ঝড়, পার হবার পূর্বমুহূর্তে যমুনায় বিপুল জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল, বাসুদেব ইতস্তত চেষ্টা করলেন, কিন্তু পার হওয়ার কোনও উপায় বের করা অসম্ভব হল। তখন হঠাৎ একটি শেয়াল দেখা দিল, এই তুচ্ছতম জন্তুর প্রদর্শিত পথে বাসুদেব নিরাপদে নদীর উপর দিয়ে হেটে পার হয়ে গেলেন ও নন্দ গোপের আলয়ে পৌঁছলেন। সেখানেও সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন এবং যশোদা নিজেও সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর জানতে পারলেন না যে তাঁর কোলে যে শিশুপুত্রটি রয়েছে সেটি বদলী শিশু, আর স্বপ্নেও ভাবতে পারলেন না যে রাজগৃহ থেকে তাঁর আগমন হয়েছে।

এদিকে কারাগারে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটল। ক্রোধান্বিত রাজা কংসকে এই দীর্ঘ-প্রত্যাশিত জন্মের খবর শেষ পর্যন্ত দেওয়া হল ও সে কারাগারে এল। শিশুকন্যা দেখে সে একটা কিছু গোলযোগ সন্দেহ করল। কিন্তু সন্দেহের কোনও প্রমাণ না পেয়ে সেই শিশুটিকেই দেওয়ালে আছড়ে মারার জন্য রাজা তার পা ধরে টান দিল। কিন্তু এ কন্যা ছিলেন যোগমায়া অবতার। রাজা হঠাৎ দেখতে

গেল তার হাতের মুঠো খালি, তার উপরে দাঁড়িয়ে মহাদেবী, তাঁর জ্যোতিতে কারাকক্ষ উদ্ভাসিত। দেবী বললেন "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"। তারপর সব ঝাপসা হয়ে গেল, দেবী অদৃশ্য হলেন।

বেচারা ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাজা! যতদিন পর্যন্ত না নিয়তির অমোঘ নির্দেশে সেই মহাপুরুষ এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে নিহত করে নিজের আত্মীয়স্বজন ও জনগণের বিরুদ্ধে সকল অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নিলেন, ততদিন রাজার প্রতিটি কর্ম কেবল তার পাপের ভারই পূর্ণ করতে লাগল। কি দুঃখজনক অথচ কি প্রয়োজনীয় ভূমিকাই না সে নিল বৃন্দাবনের ও ওই পরমাশ্চর্য শৈশবের কাহিনীতে। কি অপূর্ব,—এমন সময়ে পুরোহিতদের নড়াচড়ায় আমাদের স্মৃতিচারণা বাধা পেল, আমরা আবার বর্তমানে ফিরে এলাম। মাঝরাতের সেই রহস্যময় মুহূর্তের আবির্ভাব হয়েছে। পবিত্র সেই শিশু মানুষের মধ্যে আবার জন্মালেন, এবার কারাগারে নয়, এই মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে। এখন ফুল, প্রদীপ ও ধূপধুনো নিয়ে আমাদের জগদীশ্বরের পুনরাবির্ভাব উদযাপন করতে হবে। নিঃশব্দে ও ভক্তিভাবে প্রণত হয়ে কয়েক মিনিট কাটালাম, তারপর ঘণ্টাধ্বনি অবসানে নৈঃশব্দ্যের ভিতর দিয়ে পথে বেরিয়ে নিজেদের দরজায় পৌঁছলাম।

ঘরের দরজায় পৌঁছে কিন্তু বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে চৌকাঠের উপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বললাম "এ দৃশ্য রোজ দেখতে পাওয়া যায় না, কারণ আসলে আমরা ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে যমুনা পেরিয়ে এসেছি, কাপড়ের তলায় করে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র শিশুটিকে। তার এখন পৌঁছেছি গোকুল গ্রামের নন্দ গোপের কুটিরে।"

সরস্বতী পুজো

বিশ্বের সর্বোত্তম প্রতিমা ও মূর্তিগুলি যেন পর্বতশৃঙ্গ, যেখানে আত্মার ও পরিবারের ব্যক্তিগত ভক্তি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। একথাটা কিন্তু আমরা সামান্যই উপলব্ধি করি। ম্যারাথনের লুঠের অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এথিনি প্রমাকসকে, যাতে অ্যাক্রোপলিসের পার্বত্যশৃঙ্গ থেকে তিনি ভায়োলেট নগরীর উপর নজর রাখতে পারেন, তার কারণ কেবল এই যে ফিডিয়াসের সময়ের আগেকার দুই শতাব্দীরও অধিককাল ধরে তাঁর নাম এথেন্সের ঘরে ঘরে ঘরোয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমাদের সন্তান-সন্ততির কাছে তিনি ও পার্থেননের দেবী যা হয়ে উঠেছেন তার পিছনকার যে সুদীর্ঘ ভাব-ভাবনা ও স্বপ্ন তাঁকে তা করে তুলেছিল, সে বিষয়ে কিছু বুঝতে হলে সবচেয়ে ভাল হল এই বাংলার বিভিন্ন মাসের সরল পূজাগুলি সম্বন্ধে অনুশীলন করা। কারণ গ্রীস তার স্বর্ণযুগে যদিও রাজনৈতিকভাবে মুক্ত ছিল, মননগত দিক থেকে আসলে ছিল এশিয়ারই একটা প্রদেশমাত্র। আর আজকের হিন্দু ভারতে সেই একই এশিয়া এখনও জীবন্ত ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর। পেটারের রোমান স্টাডি অব মারিয়ুস দা এপিকিউরিয়ানে দেখা যায় মারিয়ুস দেবতা ও পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্নের সামনে অর্ঘ্যপাত্রে ভায়োলেট ফুল ও মৌচাকের টুকরোসহ কেক সাজিয়ে দিচ্ছেন; ঠিক সেই জিনিসই বর্তমানের বাঙালী মহিলাদের সম্বন্ধে একেবারে নিখুঁতভাবে প্রযোজ্য, তাঁরাও তাঁদের ঠাকুরঘরে গৃহদেবতার সামনে প্রসাদ ও ফুল দেন, দুর্বা ও জল দেন। ঠাকুরঘর বা ঘরোয়া পুজোর জায়গা পরিবারের দৈনন্দিন পুজোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যখন বড় পুজো আসে তখন বাড়ির সবচেয়ে ভাল জায়গা আঙিনার সামনেকার বড় দালানে প্রতিমা বসান হয়, আর গোটা বাড়িটাই যেন দেবমন্দির হিসাবে প্রণত হয়।*

প্রজ্ঞার দেবতা সম্পর্কে মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু বাংলার সরস্বতীর মত এমন মর্মস্পর্শ করতে প্রায় কেউ পারেনি। সরলা নারী, তাপসী ও দরিদ্রা, শ্বেতপদ্মাসনা, মণি মাণিক্যে নয় পুষ্পে পরিবৃতা, শুভ্র, বর্ণহীন ও অনাড়ম্বর সকল কিছুর 'স্ফাটিক', অতীন্দ্রিয় বীণা করে, বীণার করস্পর্শে রহস্যময় সুরব্যঞ্জনা—এই হলেন তিনি, যিনি গত সপ্তাহে আমাদের অতিথি হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ও মহারাষ্ট্রে তিনি কল্পিতা হন ময়ূরবাহিনী রূপে, সুসজ্জিত বেশ-বাস ও মুকুটের মত কবরীশোভিত মহাত্রের সুন্দর মূর্তির জাঁকজমক সামান্য নয়। কিন্তু বাংলায় দেবী যেন কিছুটা বিধবার মত, আসলে অবশ্য বিধবা নয়, কারণ পূজার উপচারের মধ্যে এয়োতির লোহা—এখানে তিনি প্রকৃত তাপস-কন্যা ও দরিদ্র

---

* এই প্রবন্ধে রমাজিনে নিবেদিতারা নিম্নোক্ত মন্তব্য আছে: কিন্তু এ তিনটে দিন চলে গেল, আমাদের পক্ষেও তাই, কারণ এ সপ্তাহে আমরাও কি সরস্বতী পুজোর হৈ-হৈ-এর মধ্যে ছিলাম না?

ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষিকা, তাঁর ভগ্নী সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব।

গোধূলিতে অথবা উষায় প্রথম দেখলে প্রতিমার শোভন দেহরেখা সব চেয়ে সুন্দর লাগে; শুভ্রোজ্জ্বল, লঘু ও আলগা ভঙ্গি, আসনপদ্মে পা ছোঁয়া কি না ছোঁয়া। কিন্তু সরস্বতী পূজার জন্য প্রতিমার পর্যন্ত দরকার হয় না। তার বদলে তাঁরে পবিত্র আসনে দোয়াত কলম রেখে তাদের প্রতি আমাদের প্রণাম ও প্রীতি নিবেদন করলেই যথেষ্ট। কারণ জ্ঞান অর্জনের এই সামান্য উপকরণের মধ্যেই সরস্বতীর বাস ও তাঁকে সেখানেই পাওয়া যায়; আর এরই চিহ্ন হিসাবে—ব্যবহার ও পূজার মধ্যে গুলিয়ে ফেলা সম্পর্কে হিন্দুর আতঙ্কের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে পূজার সময়ে বই খোলা বা লেখার উপকরণ স্পর্শ করা পূজকদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানের পিছনে লুকান থাকে শৈশবের স্মৃতি ও কোমল আনন্দে ভরা একটা জগৎ। এ দিনে স্নেহশীল বাবা-কাকারা বাড়িতে থাকেন, মই বেয়ে উঠে তোরণের উপর আমপাতার শুভসূচক শিকলি লাগান, অথবা কলসীতে জল ভরা, মুখে নারকেল বসিয়ে সমস্ত খিলান ও থামের গায়ে কলাগাছের ছত্রছায়ায় সেগুলিকে বসান, এই সবেতেই তৈরি থেকে ছুটির দিনে তাঁদের পৌরুষের কত মূল্য তার প্রমাণ দেন। আর বাচ্চারা তো স্ফূর্তিতে ডগমগ। পেরেক আর হাতুড়ি এগিয়ে দেওয়া, কিংবা ফুল ও মাদুর বয়ে দেওয়া তো গৌরবের চূড়ান্ত। রান্নাঘরে বাড়ির মেয়েরা খাবার তৈরিতে ও নানারঙের ফল কাটায় ব্যস্ত। ইংরেজদের ক্রিসমাসের খুশির মত হৈ-হুল্লোড় গোটা বাড়ি ছেয়ে ফেলে, সব কিছু তুঙ্গে ওঠে দুপুর নাগাদ ভাব-গম্ভীর পূজার সময়ে, যখন প্রজ্ঞার অনাড়ম্বর আত্মার আবাহন হবে, তাঁর কাছে মিনতি জানান হয় যাতে যে ভবনে তিনি দুদিনের আতিথ্য নিয়েছেন সম্বৎসর সেখানেই যেন ঘর-সংসার পাতেন।

পূজা-বেদী সাজানর জন্যও কত কাজ করতে হয়! গোড়ায় জায়গাটিকে পরিষ্কার করতে হবে, শুদ্ধ করতে হবে। তারপর একখানি কাঠের চৌকিতে প্রতিমা বসাতে হবে, দেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তাঁর সামনে যথাযথক্রমে সাজাতে হবে। আদ্যিকালের ধাগের কলম, অদ্ভুত মাটির দোয়াত, আধুনিক ধাঁচের চলবে না, চিরুনী, গন্ধতেল, ছোট্ট গোল আয়না, মুখে মাথার নানা চূর্ণ সহ মজার প্রসাধন পেটিকা, অসংখ্য মাটির পাত্র, পুজোয় এসব চাই-ই চাই। পুরোহিত ও ধর্মতত্ত্ববিদরা আয়নাকে নির্মেঘ মনে দিবাসত্তার প্রতিফলন বা বুদ্ধি বলে যত ব্যাখ্যাই দেন না কেন, নবাগতর প্রবল অনুভূতি হয় যে মনোভাবের দিক থেকে অন্তত দেবী কিছুটা পরিমাণে মহিলা অতিথি, যাঁকে নারীত্বের সুযোগ-সুবিধা ও সৌজন্য দিতেই হবে; নারী-ভগ্নীদের নিজেদের যেসব বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের আদৌ সামর্থ্য নেই সেগুলি তারা দেবীর জন্য প্রয়োজন বলে মনে করবে। উৎসবের প্রাথমিক প্রস্তুতিগুলির মধ্যে সর্বশেষ ও সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক

বোধহয় পবিত্র বেদী ঘিরে গণ্ডীবন্ধন। চার কোণে মাটির চারটি তাল রাখা হয়; সেগুলিতে নিম্নমুখী করে তীর বেঁধান থাকে, তারপর কোণ থেকে কোণে সুতো বাঁধা হয়, অন্য দেবদেবীর ক্ষেত্রে লাল, সরস্বতীর ক্ষেত্রে সাদা সুতো, এমনিভাবে তীর ও সুতো দিয়ে বেড়া বাঁধা হয়। বন ও জন্তুজানোয়ারের মধ্যে কি পরিস্থিতিতে হিন্দুদের প্রথম প্রতিমাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

সরস্বতী নামটি বেদেই পাওয়া যায়, এই নামটি যে সেই নদীকে দেওয়া হয়েছিল যার তীরে সমস্ত পবিত্রতম যজ্ঞানুষ্ঠান হত, এ থেকেই বোঝা যায় এর আদিম তাৎপর্য কতখানি ছিল। সরস্বতী শব্দটি সাবিত্রীর অন্যতম প্রতিশব্দও বটে, আর সাবিত্রী আবার জাতীয় জপমন্ত্র গায়ত্রীর অন্যতম নাম। সেই কারণে একটি বিশেষ অর্থে হিন্দুরা তাদের এই দিব্য প্রজ্ঞা সম্বন্ধে বলে যে তিনি বিষ্ণুর শাশ্বতী স্ত্রী, আর জগদীশ্বর নারায়ণের মুখ থেকে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা রূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। "হে দেবী যাঁকে ছাড়া স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বিরাজ করতে পারেন না, সেই তুমি আমাদের মধ্যে বিরাজ কর।"—এই মর্মে একটি স্তোত্র আছে। এতে মনের যে বাঞ্ছিত অষ্টগুণের বর্ণনা দেওয়া সেগুলি কৌতুহলোদ্দীপকভাবে সূক্ষ্ম। উদাহরণস্বরূপ স্মৃতিশক্তি এবং যথাযথ ব্যাপারকে যথাস্থানে ও যথাকালে স্মরণ করার ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য টানা হয়েছে।

মানুষের ভঙ্গিতে বললে সরস্বতী ও তাঁর ভগ্নী ভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর মধ্যে একটা অনুচ্চারিত ও অনমনীয় মন-কষাকষি আছে বলে মনে করা হয়। লক্ষ্মীর দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়া এক ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য। তার মানে সবরকম সৌন্দর্য ও আকর্ষণী শক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, মানুষের জগতে যেন বনে চেঁচান পেঁচার মত থাকা। গরিব ছাত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এক মুঠো যব ও মাঝরাতের তেলটুকুর জন্য সরস্বতীকে পর্যন্ত লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্যের শরণ নিতে হয়। কিন্তু উভয় ভগ্নীর কাছ থেকেই একে অপরের একনিষ্ঠ ভক্তকে পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্য বিতরণের আশা করা অসম্ভব। প্রত্যেকেই অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, সমগ্র মনপ্রাণ ও অখণ্ড ভক্তির কাছেই কেবল নিজেকে সম্পূর্ণ ধরা দেন। এ কথা বিশেষ করে প্রযোজ্য সাদাসিদে বেশবাস পরা পদ্মাসনা মায়ের সম্পর্কে, তিনি তাঁর আপন আড়ম্বরহীনতার সম্রাজ্ঞীসুলভ শক্তিতে দাঁড়িয়ে তাকেই আপন প্রসাদ-ধন্য করেন জীবনের ভোজের সুস্বাদু বস্তুগুলির প্রতি যার সামান্যই নজর। আধুনিক বাণিজ্যিক মনোভাব থেকে বিদ্যার কি সর্বনাশ হবে সে সম্বন্ধে আধা-বিদ্রূপাত্মক এই পৌরাণিক কাহিনীটির মারফৎ ভারতবর্ষ এইভাবেই বিনা সোরগোলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল! সরস্বতীর গাথার মধ্যে আরও অনেক ইঙ্গিতবহ জিনিস আছে। সমস্ত বই ও পাণ্ডুলিপি—যেমন চিরায়ত সংস্কৃত, তেমনিই ফার্সি ও ইংরেজি—তাঁর কাছে পবিত্র। ছেলেরা তাঁর পাদস্পর্শে আশিসধন্য হওয়ার জন্য যেসব পাঠ্যবই সলজ্জে তাঁর বেদীতে রাখে তার মধ্যে অনেক বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদির বইও দেখা যায়। ভারতবর্ষে ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে, সৃষ্টির দেবতা ও প্রজ্ঞার দেবীর মধ্যে বিচ্ছেদের কোনও আশঙ্কা

করা হয় না। ব্যাপারটাকেই বোকামি বলে মনে করা হয়। ধর্মই কি সর্বোচ্চ জ্ঞান নয়, জ্ঞানই কি সর্বোচ্চ ধর্ম নয়?

এর থেকে বোঝা যায় যে বর্তমান প্রজন্ম যে কঠিন মননগত উত্তরণের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে হিন্দুধর্মে তার পুরো মঞ্জুরি আছে। মননগত সমস্যায় যে অভিনিবেশ মায়ের নাম ভুলে যায় মা তাকে আশীর্বাদ করেন। এই রকম তন্ময়তাকে তিনি সবচেয়ে মূল্যবান পূজা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু সে জ্ঞানচর্চা কেবল জ্ঞানের জন্যই হতে হবে, পার্থিব লাভের জন্য নয়। আমাদের মধ্যে যারা ভারতের বর্তমান সঙ্কটকে প্রায় সম্পূর্ণত মন ও চিন্তার সঙ্কট বলে বুঝতে শিখেছি তারা এইসব ধারণার গতিশীল ক্ষমতা উপলব্ধি করব। কারণ নিঃস্বার্থ সংস্কৃতির নব নব রূপকে পুরো আত্মস্থ করা ছাড়া আর কোনও শর্তে কোনও জাতি আধুনিক জগতে তার যথার্থ আসন পেতে পারে না। আর মননজগতে এ রকম অভিযানকে প্রাচীন কর্তৃত্বের উৎসগুলি পূর্ণ উৎসাহ ও আশীর্বাদ দেয়। নিজের অতীত থেকে কোনও বিচ্ছেদ না ঘটিয়েই ভারত আধুনিক প্রগতির একেবারে পুরোভাগে দাঁড়াতে শিখতে পারে। এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি, কম-বেশি স্তিমিত হলেও, যেসব জায়গায় সরস্বতী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার তুচ্ছতম ঘরটিতেও প্রবেশ করে। যেটা নেই তা হল কোনও বৈপরীত্য বোধ, মতের এমন উদারতার মধ্যে যে চমকপ্রদ বা অসাধারণ কিছু আছে সে জ্ঞান।

আধুনিক ভারতে সরস্বতী প্রত্যেক ঘরের প্রিয় দেবী, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক এথেন্সে এথিনি যেমন ছিলেন তেমনিই নিশ্চয়। কিন্তু এথিনির পূজাবেদী ছিল এক বিপুল নাগরিক জীবন ও সংগঠনের ধাত্রী, সরস্বতীর সিংহাসন এ পর্যন্ত কেবল হৃদয় এ আত্মায় এক অদৃশ্য সংস্কৃতি চর্চা উৎসাহিত করেছে, যে সংস্কৃতি তীব্রতায় মধ্যযুগীয়। ভারতীয় মনস্তত্ত্বের রত্নরাজি, ভারতীয় ভাব-ভাবনার রত্নরাজি পথের পাশে তার জন্য ছড়িয়ে আছে যে হিন্দু পূজার্চনার আঁকাবাঁকা পথ মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ করতে প্রস্তুত আছে। তবু নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা যে দেখেছে তার এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না যে প্রাচীন গ্রীকদের মত বর্তমান ভারতীয়দের পূজাগুলির মধ্যেও বিপুল নাগরিক সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

নানারকম পবিত্র অনুষ্ঠানের অবিশ্রান্ত পরম্পরা নিয়ে দিন দুটি চলে গেল। পূজামণ্ডপে সারারাত্রি ধরে প্রদীপ জ্বলত, সন্ধ্যা নামার অনেক পরেও কোনও কোনও পথিক প্রবেশদ্বারের উপরকার পাতার মালা দেখে দরজা ঠেলে আঙিনায় ঢুকত, বেদীর সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াত। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা পা টিপে টিপে চলতাম, প্রায় ফিসফিসিয়ে কথা বলতাম, মনে হত যেন বাড়িটা আর আমাদের নেই, দেবতাদের বাসস্থান হয়ে গিয়েছে। এবার দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যাসঙ্গীত বেজে উঠল, মহিলাদের দ্বারা করুণ বিদায় বরণ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকঢোল ও জয়ধ্বনির মধ্যে দেবী চললেন মরণশীল মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে সেই স্রোতে বিলীন হতে যা চির-পবিত্র। জনাকীর্ণ রাজপথ ও নদীতীর তাঁর

আগমন প্রতীক্ষায় রয়েছে, একটি শোভাযাত্রী দল যেতে যেতেই সাক্ষাৎ পায় আর এক দলের, তারা ফিরছে ঘট ভরে গঙ্গাজল নিয়ে, ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় সেই ঘট থেকে শান্তিবারি সিঞ্চিত হবে নতজানু ভক্তদের মাথায়, যে ঘরে তিনি দুদিন ছিলেন সেখানে উচ্চারিত হবে সমাপ্তি আশীর্বচন। শান্তিবারি সিঞ্চনের মুহূর্তটি কি অনির্বচনীয়, প্রার্থনা ও প্রণতি কত না ভক্তিপূর্ণ! দীর্ঘায়িত ছায়াগুলির মাঝখানে শারীরিক উপস্থিতির চেয়ে অধিকতর বাস্তব কিছু একটা আমাদের ঘিরে ধরে, আমরা অবাক হয়ে ভাবি প্রজ্ঞা দেবীর কাছে সেই যে প্রাচীন প্রার্থনা—"হে দেবী, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাকে ছাড়া বিরাজ করেন না, সেই তুমি আমাদের মধ্যে বিরাজ কর" —তার কিছু ফল কি আমাদের কাছেও এল!

দুর্গা পূজা

"আর স্বর্গে যুদ্ধ লেগে গেল : মাইকেল ও তাঁর দেবদূতরা ড্রাগনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন ; ড্রাগন ও তার দূতরা যুদ্ধ করল, পারল না, স্বর্গে আর তাদের জায়গাও হল না।" পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলিতে এখানে সেখানে অনেক সেকেলে বাক্য পাওয়া যায়, যাতে বলা আছে সৃষ্টির আদিকালে স্বর্গে যুদ্ধ হয়েছিল, আর বলা আছে মানুষ ও দেবতাদের কাছে সে যুদ্ধের উত্তর ফলের কথা, যে উত্তর ফল আবছায়া, প্রাগৈতিহাসিক, প্রাকৃতিকের মধ্যে অতি-প্রাকৃতিক।

পৌরাণিক কাহিনীতে এই যুদ্ধের উপাদানটি কেন এত স্পষ্ট, এই বিশেষ ক্ষেত্রে কি শক্তি তাকে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী অংশে বর্ণিত অতখানি তাৎপর্য দিয়েছিল? এটি সর্বোপরি বাংলার পুরাণ। কিন্তু এখানে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শৌর্য ও সৌন্দর্যে দৃপ্ত কোনও দেবদূত, প্রধান নয়, মা নিজে, যে মা মূর্তিমতী সৃজনশীল কর্মশক্তি, দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিঃকেন্দ্র ও কেন্দ্রবিন্দু। স্বর্গের করতালের মধ্যে চির-পরিবর্তনশীল দৈত্যদের তিনি ইতস্তত পশ্চাদ্ধাবন করেন, আর তাঁর বিজয়ের মুহূর্তটিতে যখন জীবন্ত সিংহারূঢ়া, দশভুজা, খড়্গ করে তিনি শত্রুকে চিরতরে পরাস্ত করেন, তখন তাঁকে দুর্গা প্রতিমা রূপে চিত্রিত করা হয়। ধর্মগ্রন্থে আধা-মহাকাব্য, আধা-সর্বজনিক পূজাবিধির মত করে এই বিবরণই দেওয়া আছে, এর শ্লোকগুলি নিয়ে আশ্বিনের অমাবস্যা থেকে দশেরা, অর্থাৎ দশমী পর্যন্ত বাংলার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে আবৃত্তি চলে, পূজা ও উপবাস চলে। এখানে ওখানে হয়তো মঠে সন্ন্যাসীরা, ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র চণ্ডী বার বার পাঠ করে। কিন্তু চণ্ডী পাঠ করুক আর নাই করুক সকলের সমভাবে একটিই ভাবনার বিষয়—স্বর্গের সেইসব যুদ্ধ ; একটি এবং একটি মাত্রই আশা—দেবতাদের কাছে দৈত্যদের পরাজয়।

ভারতের সর্বত্র দুর্গাপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎসবটির চরিত্র সামরিক। হয়তো বর্ষা সবে শেষ হয়েছে বলে, উত্তরে অন্তত প্রথম সাত দিন যায় অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার ও সেগুলির প্রদর্শনীতে, আর দশমীর দিনে হয় প্রণাম ও অস্ত্রকৌশল দেখান। নাগপুরে এইদিনে এক মজার দৃশ্য দেখা যায়, ভোঁসলাদের শেষ বংশধর বেরোন রাজকীয় পরিব্রাজনে, তাঁর পিতৃপুরুষের পক্ষে সেই যাত্রা হয়তো ছিল লুটের অভিযানের, আর তারও বহু আগে হয়তো ছিল শিকার সফরের শুরু।

কিন্তু বাংলাদেশে পারিবারিক দিক থেকে উৎসব সম্পর্কে গৃহের মনোভাব যার দ্বারা নির্ধারিত হয় সে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের উপাদান। যে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে জলধারার প্রতিটি ঝলক হয়তো মুকুট ও তরবারিধারিণী দুর্গার কমবেশি জীবন্ত স্মৃতি বহন করে আনবে, সেও কিন্তু শৈশবে তাঁকে দিকদর্শন যন্ত্রের দশমুখ নিঃসৃত মহা-জাগতিক মহাশক্তিরূপে কল্পনা করে না। কারণ মানবিক জীবনে জগন্মাতা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠেন নারীরূপে, গার্হস্থ্য জীবনরূপে, দেশরূপে। এখানে তিনি তরুণী, সৌন্দর্যে নিখুঁত, পবিত্রতায় সন্ন্যাসিনীর মত, যাঁর অতীত ও ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল পত্নীত্ব, যাঁর

ভক্তির উল্লাসের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে স্বয়ং মহেশ্বরের, আর যিনি দেবী ও রাজ্ঞী হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় গৃহস্থালিতে প্রবেশ করেন অল্পবয়সী বিবাহিতা কন্যা হিসাবে, যেন পিতৃগৃহে দশদিনের জন্য পুনরাগমন করেছেন।

একথা সত্য যে বালকের যখন ক্রমশ বয়স বাড়বে সে অবশ্যই বুঝবে যে এ অতিথির পিতা স্বয়ং হিমালয়, কাজেই তাঁর কন্যা ঈশ্বর-পত্নী—পুরাকাহিনী অনুসারে স্বয়ং ভারতমাতা। তবে এতে কেবল পুরাণের উপাখ্যান সম্পর্কে তার ধারণায় নিরবচ্ছিন্নতা ও নমনীয়তা আসে। প্রথমে দশদিনের অতিথি হিসাবে দুর্গা; দ্বিতীয়ত উমা হৈমবতী হিসাবে ভারত; শেষত অসীম শক্তি হিসাবে মহাশক্তি; কিন্তু সর্বদা এবং তার চেনার ক্ষমতা যত বাড়ে তত বেশি করে, সেই অফুরন্ত কর্মশক্তি, যা তার বাইরে ও চারপাশে যা কিছু দুষ্ট, যা কিছু অন্যায় ও অসমীচীন তাকে জীবন ও প্রকৃতির ক্ষমতার দ্বারা পরাভূত করার জন্য কাজ করে যায়।

বাঙালী শিশু তাহলে কত মমতা ও অন্তরঙ্গতা নিয়ে নিজের দেশ ও ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করতে শেখে। এ এমন একটা মমতা ও অন্তরঙ্গতা যা প্রতিমা ব্যবহার করা থেকে শুরু করে ভাষার মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে উঠতে পারে এবং পুরানো জাতি-গুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও পরিণত হতে পারে। পূর্ববাংলার মুসলমান মাঝি নিজে দুর্গার উপাসক নয়, তবু "মায়ের সামনে করজোড়ে" এ কথাগুলির আবেদন তার কাছে একজন হিন্দুর মতই হতে পারে। এ কথা অবশ্য সন্দেহাতীত সত্য যে উচ্চতর ধর্মতত্ত্বগত তাৎপর্যই দুর্গা পূজাকে নাগরিক সমারোহের বিপুল উপাদান ও জাতীয় ব্যাপকতা যোগায়। যারা ধর্মকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের উপাদান হিসাবে অনুশীলন করেছে তারা অবশ্যই যে কোনও একটি ধর্মীয় আচারের মধ্যে বহু রকম সূত্রের একত্রে গ্রন্থন সম্পর্কে সচেতন। সেমিটিক জাতিগুলি কেন ভগবানকে পিতা বলে উপাসনা করে, আর ভারত কেন তাঁকে মা বলে উপাসনা করে? সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির এই বিরাট জট কি কখনও সম্পূর্ণ খোলা যাবে? উপরন্তু এই ব্যক্তিত্ব আরোপের ব্যাপারে ভারত কি একলা, নাকি এ সমগ্র পূর্ব এশিয়ার পক্ষেও প্রযোজ্য? শেষোক্ত বিষয়ে ব্যাপারটা বোধহয় এইরকম যে অন্যান্য জায়গায় যা খণ্ডিত ও অবশেষ হিসাবে দেখা যায় ভারত তাকে একটা সঙ্গতিপূর্ণ সমগ্র হিসাবে গড়ে তুলেছে ও রক্ষা করেছে। আর ভারতের মধ্যেও এই পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি ও মতবাদ যেগুলি অনেক প্রদেশে কম-বেশি পরস্পরে অ-সম্পর্কিতভাবে রয়েছে, বাংলায় সেগুলিকে একত্রে গ্রথিত করে একটি নিখুঁত এককে পরিণত করা হয়েছে। কে জানে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে চণ্ডী এই অঞ্চলে কতকাল ধরে বিরাজিত ছিল? আর এই প্রদেশের বাইরে কোথায় আমরা যেতে পারি যেখানে প্রাচীন মাতৃপূজার কিছু না কিছু প্রতিধ্বনি আমাদের কানে আসবে না?

আম্মা অর্থাৎ মা দক্ষিণের প্রতিটি গ্রামের প্রহরায় রয়েছেন। ভয়ঙ্করী মা ভবানীই মারাঠাদের বিজয় অভিযানের নেতৃত্ব করেছিলেন। শিখও তার তরবারিকে মাতৃ-

মূর্তি হিসাবে নিয়ে মাতৃপূজা করে। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও কালী। আজ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রামলীলা বা রামায়ণের আশ্চর্য কাহিনী দিয়ে মহা জন্মদিন প্রতিপালিত হয়। আজ পর্যন্ত মহীশূরে ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে দসেরা পূজাই হল বছরের প্রধান উৎসব। আজ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত অঞ্চলে উচ্চবর্ণের গৃহস্থদের কোনও না কোনও লোক নবরাত্রির নয় দিনের উপবাস করে থাকে। আজ পর্যন্ত মাদ্রাজে, বিহারে এবং সামরিক ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবারগুলিতে বীরাষ্টমী অর্থাৎ পবিত্র অষ্টম দিবস প্রতিপালিত হয় তরবারিকে পূজা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন হিসাবে।

বাংলাদেশে অবশ্য সামাজিক, সামরিক ও ধর্মতত্ত্বগত এই তিনটি উপাদানই সমন্বিত ও যুক্তিসিদ্ধ করা হয়েছে দেবী মায়ের দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী এই বৈশিষ্ট্যসূচক ধারণার মধ্যে : দিব্য কর্মশক্তি দুর্গা, তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন, পরাজিত হন, আবার জয়লাভ করেন, তিনি নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন; কালী অন্ধকারের জন্মদাত্রী, তিনি ধ্বংস করেন, বলি গ্রহণ করেন, তাঁর কৃপা হল মৃত্যু; আর শেষত ভগবানের হৃদয়ের মমতা জগদ্ধাত্রী, তিনি সতী নারীর মধ্যে প্রোজ্জ্বল, তাঁর থেকেই উৎসারিত পৃথিবীর সকল জননী। এই বাংলাতেই যখন নয় দিনের পূজার্চনা ও দান-ধ্যানের সমাপ্তি ঘটে, মায়ের প্রতিমা ছেলেমেয়েদের ছেড়ে শূন্যে মিলিয়ে যান, তখন আসে মহাদশমী, সে দিনটাকে রাখা হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের স্নেহপ্রীতির বন্ধন নতুন করে শক্ত করার জন্য, সারাদেশ জুড়ে চলে বিজয়া-সম্ভাষণ ও পারিবারিক পুনর্মিলন। কারণ আত্মীয়তার সকল বন্ধনকে কি প্রতি বছর দিব্য অতিথির পদপ্রান্তে নতুন করে সুদৃঢ় ও পবিত্র করে নিতে হবে না? মায়ের সামনে সারা দেশটাই কি এক হয়ে যায় না?

বিখ্যাত বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি নদীর ঢেউয়ের মধ্যে মায়ের মূর্তিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে দেখে পরিসমাপ্ত দুর্গাপূজার মুহূর্তটিকে মাতৃভূমির প্রয়োজনের ক্ষণ হিসাবে নিয়ে মহাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, সে আজ তিরিশ বছরের উপর হয়ে গেল। কবি যে তাঁর স্বদেশবাসীর অন্তরতম চিন্তাকে তুলে ধরেছিলেন, এই যে বাৎসরিক নাটক, যা যত দূরবর্তী ক্ষেত্রের মানুষই হোক না কেন, জাতীয় অর্থে সকলের আপন জিনিস, তার যে তিনি যথাযথ ব্যাখ্যা করেছিলেন, প্রতিটি পরিবার ও প্রতিটি ব্যক্তি নিজের মনে মনে যা ইতিমধ্যেই জেনেছে তাকেই যে তিনি কাব্যে ধ্বনিত করেছিলেন, সে কথা এই সঙ্গীতকে ঘিরে গড়ে ওঠা ইতিহাসের দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। বছরের পর বছর কাটছে, ভারতবাসীর হৃদয়ে মায়ের প্রতিমা প্রতি বছরে আরও গভীরভাবে ভারতমাতৃকার ধারণার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মা ও মাতৃভূমি—একের শেষ ও অন্যের শুরু বা কোথায়? কোনও সন্তান যখন করজোড়ে নতমস্তকে নতুন করে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে বলে "মাকে প্রণাম করি," তখন সে কার সামনে দাঁড়ায়?

রাস উৎসব

নভেম্বর মাসের পূর্ণিমার পরের পরের দিন উষাগমের ঘণ্ট। দুয়েক আগে দক্ষিণের আকাশে বহু উঁচুতে ঝকঝক করে উঠল কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জ, বাড়ির সদর দরজা খুলে আমরা নিস্তব্ধ গলিতে বেরিয়ে পড়লাম। চারদিকে মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দ্য। সামান্য ক্ষয়প্রাপ্ত চাঁদ কৃষ্ণ আকাশকে কৃষ্ণতর করেছে, উজ্জ্বল তারাগুলি উজ্জ্বলতর হয়েছে, বাতাসে হিমের পরশ। আমরা যখন মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছি পথে মাঝে মাঝে ঘোমটায় ঢাকা নিঃশব্দ নারীযুগল দ্রুতপায়ে আমাদের পার হয়ে যাচ্ছে, তাদের খালি পা মাটিতে পড়ে আমাদের চেয়েও কম শব্দ করছে। যে পথ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে হবে সে অতি সঙ্কীর্ণ। প্রাঙ্গণের আকার সামন্তরিক ক্ষেত্রের মত, ওপ্রান্তে রাস্তার উপর প্রবেশতোরণ। ডান ও বাঁ দিকটায় বাড়ির লম্বা সারি। পূজাগৃহ মন্দিরটির প্রবেশদ্বার আমাদের ডান দিকের পাঁচিলের গায়ে। আর ঢোকার মুখে এপ্রান্তটি একটি ছোট গোলাকার বাড়ি দিয়ে প্রায় বন্ধ, বাড়িটি গম্বুজের মত খিলানওয়ালা, মাটি থেকে অনেক উঁচু খিলান, চতুর্দিকে শোভাযাত্রার পথ, ডাইনে-বাঁয়ে সিঁড়ি।

বস্তুত এটি হল ঠাকুরকে প্রকাশ্যে আরাধনার মণ্ডপ, সারা বছর এটি উন্মুক্ত, নীরব ও শূন্য পড়ে থাকে। আজ সকালে অবশ্য এটি শূন্য নয়; উঁচু খিলানের তলায় পূজাবেদীতে পুষ্প সিংহাসনে আজ রাধা ও কৃষ্ণের মূর্তি মাঝরাতের পর কোনও এক সময়ে নিভৃত মন্দির থেকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হয়েছে। সিঁড়িতে ও উপরের দালানে একসারি মেয়ে নীরবে চলেছে, তাদের অবনত মস্তক ও তন্ময় মুখ, অথবা ঘোমটার তলায় আধ-ঢাকা জপমালাগুলি তাঁদের ভক্তিমগ্ন উপাসনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এমনকি দূরে সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণের বাইরে প্রদক্ষিণরতা এই মেয়েদের দেখলে একটা অপ্রত্যাশিত চাঞ্চল্যের অনুভূতি হয়। কিন্তু ঢোকার পর যে দৃশ্য দেখা গেল তার জন্য কিছুতেই আমাদের আগে থেকে তৈরি হতে পারতাম না। সমস্ত আঙ্গিনাটা আলোয় আলোময়। দড়ি ঘেরা চৌকো চৌকো খোপের মধ্যে দুটি পৃথক গাইয়ের দল মাটিতে বসে একতারা বাজিয়ে কীর্তন গাইছে। ডাইনে বাঁয়ে পাঁচিলের গায়ে সারি সারি ছোট ছোট চালা, সেখানে ছোট ছোট দেবদেবী মূর্তি, গৃহস্থালির বাসনপত্র ও নানারকম ঝুড়ির কেনাবেচা চলছে। আর ভক্তদের ও বিকিকিনিওয়ালাদের মাঝখান দিয়ে শত শত মেয়ে আসছে যাচ্ছে। এখানে ওখানে, ছায়াময় কোণে কেউ একা বসে প্রার্থনায় তন্ময় হয়ে রয়েছে, আর আমাদের মাথা-সমান উঁচু ভিতের উপর পূজার্থীদের নীরব শোভাযাত্রা চলছে, একসিঁড়ি দিয়ে উঠছে, আর এক সিঁড়ি দিয়ে নেবে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। নিচে আঙিনায় বিধবারা, এক এক পরিবারের মেয়েরা, মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে মায়েরা কিংবা সঙ্গীসাথী নিয়ে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুজো শেষ করে এদিক-ওদিক যাচ্ছে, এখানে

ওখানে থেমে হয়তো কোনও বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে অথবা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিসের দর-দাম করছে। কিংবা হয়তো বাড়ির কারও জন্য খেলনা কি অন্য কোনও উপহার কিনছে। নতুন নতুন আগমনে ভিড় যেমন ক্রমাগত বাড়ছে তেমনি স্নানার্থীরা দলে দলে গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার দরুন বা বাড়ি চলে যাওয়ার দরুন আবার ক্রমাগত কমছেও। ভোর হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাঙ্গণ শূন্য হয়ে যাবে। রাত্রে আবার যুগলমূর্তিকে তাঁদের মন্দিরের নিভৃত ছায়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আপাতত অবশ্য গোটাটাই ভক্তিতে ও বিমল আনন্দে ভরপুর। বাইরে অস্তগামী চাঁদ ঘুমন্ত শহরের উপর হাসি ছড়াচ্ছে। বাইরে অন্ধকারের আচ্ছাদনে কিছুই নড়ছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু ভিতরে উজ্জ্বল দীপালোকে আলোকিত এই ছোট্ট প্রাঙ্গণটি সৎকুলোদ্ভবা সুচারু ছন্দোময়ী নারীকুলের ভিড়ে মুখর। এখানে এই পৃথক দুনিয়ায় দিবালোকের আগেই দিন এসেছে, সামান্য একটু দূরেও যারা ঘুমিয়ে আছে তারাও হয়তো নারীদের এমন একটি দুনিয়ার অস্তিত্ব আছে বলে সন্দেহ পর্যন্ত করেনি।

হিন্দুধর্ম কেমন চমৎকার বুঝেছিল যে তার প্রত্যেক সন্তানের জন্য এমনকি তার আচ্ছাদিত, নিভৃত নারীদের জন্যও কিভাবে সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তারা সারা বছরের চক্রবৎ পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারে। মাসের আবর্তের মধ্যে শীতের এই প্রথম পূর্ণিমার মত সুন্দর আর কোনও পূর্ণিমা নয়। বর্ষা বিদায় নিয়েছে। মা দুর্গার পুজো শেষ হয়েছে, এবার মুক্ত আকাশের নীচে বনে বনে মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে ফেরার পালা। এই সময়েই রাখালদের মধ্যে যমুনাতীরবাসী প্রভু কৃষ্ণ গোকুলের গোপবালক ও গোপবালিকাদের নিয়ে বৃন্দাবনের প্রান্তরে গোচারণে গিয়েছিলেন। বছরের এই সময়টিতেই সেই অপূর্ব জীবনযাত্রা শুরু হয়, এ জীবন খেলাধুলো ও জয়লাভের, ক্রমাগত আত্মত্যাগ ও সহজ বিজয়ের, এই জীবনের কাহিনীতেই মুখর ভারতীয় কৃষকের পল্লীগীতি, ভারতীয় হেরোকলদের ইপোজ (বীরগাথা)। ভারতের প্রতিটি বনভূমিতে বৎসরের এই সময়ে অন্তরের কান দিয়ে শোনা যায় দিব্য বংশীবাদকের সেই বাঁশীর সুর। যে কোনও ঝোপের আড়াল থেকে হয়তো উঁকি দেবে শিখীপাখার মোহনচূড়া মাথায় সেই দেবশিশুটি। সকল খেলার প্রতি মায়েদের ও ধাত্রীদের এক ভক্তিভাব দেখা যায় কারণ শীতকালে গোকুলের বনে বনে খেলে বেড়ান স্বয়ং কৃষ্ণ!

তিনদিন আগে পূর্ণিমা তিথির গোধূলি বেলায় মূর্তিগুলিকে মন্দির থেকে নদী তীরের পূজা-মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, গ্রামের সকল মানুষ ছিল শোভাযাত্রার সঙ্গী। এইভাবেই রাখালদের গোচারণ যাত্রার দৃশ্যের অভিনয় হয়েছিল। সারা রাত পুরোহিতেরা প্রহরা দিয়েছিল ও সেবা করেছিল, মাঝরাত থেকে শুরু হয়েছিল মেয়েদের আরাধনা। দিব্য রাখাল যেন গোচারণভূমিতে বাস করছেন, তাঁর দর্শন পেতে, তাঁর প্রতি অনুরাগ জানাতে! পরের দিন এই রাত্রের উপাসনা শুরু হয়েছিল রাত দুটোয়, আর আজ ভোর চারটেয়। এই তিনটি ভোরই ছিল মেয়েদের

কাছে পরম পবিত্র। আজ সকল আটটায় উৎসব সমাপ্ত হবে। তবে ধনীদের গঙ্গাতীরের বাগানে বিশেষ পূজার্চনা হয়তো সপ্তাহ, কি পক্ষ ধরে এমনকি সারা মাস ধরেও চলবে। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের অনেক আগে মূর্তিগুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে রাসমঞ্চের পুষ্প-সিংহাসনে, সেখানে মুক্ত আকাশের নীচে দর্শনার্থীরা আসবে, পুজো করবে, ঘন্টার পর ঘণ্টা প্রার্থনা অনেকটা যেন খেলার মত, আত্মার রাখাল ধেনু চরিয়ে ফিরছেন বৃন্দাবনের বনে বনে, তাঁরই সঙ্গে নিত্য খেলা।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বছরের মত উৎসব বিদায় নেবে। কিন্তু ধার্মিক মনে যে সুর বেজে উঠেছে শীতকালটা তাতেই মুখর থাকবে। মায়ের কাছে ও স্ত্রীর কাছে তাদের যে কোনও প্রিয়জনের মুখেই কি দেখা দেবেন না বৃন্দাবনের সেই দিব্য রাখাল, কখনও হৃদয়স্বামী রূপে, কখনও সহাস্য মানবশিশু রূপে? কোনও আবেগ কোনও মাধুর্যের স্মৃতি কি এমন আছে যা মাঠের ওপর থেকে ভেসে আসা সেই বাঁশীর সুরের কথা মনে করিয়ে দেবে না? আহা সে বাঁশী যখন বেজে উঠবে তখন হৃদয়ের গোপন রহস্যঘন বনপথ বেয়ে ছুটে যাওয়ার জন্য পদযুগল কত না চঞ্চল হয়ে উঠবে!

একটি লোকগীতিতে আছে "তাঁর বাঁশী যখন ডাকবে আমায় প্রস্তুত থাকতে হবে; আগে হোক তার পরে হোক, সহজ হোক আর কঠিন হোক, আমাকে যেতেই হবে; বনপথ যদি কাঁটায় ছাওয়াও থাকে তবু আমায় যেতেই হবে যখন সে সুর বাজবে। প্রতিদিন আঙিনায় কাঁটা বিছিয়ে আমি তার উপর দিয়ে চলা অভ্যাস করি। বর্ষার মধ্যে যদি ডাক আসে তাই আমি জল ঢেলে পিছল পথে হাঁটতে শিখি, কারণ ডাক যখন আসবে আমায় ছুটে যেতে হবে, পথের মাঝে পা পিছলালে চলবে না।"

যারা মনে করে রাসমেলা বছরে কেবল একবারই আসে তারা কি বোকা! বিজ্ঞজনের চোখে জীবনই হল যমুনাতীরের সেই বন যেখানে প্রভুর নিত্য বসতি, তিনিই মধুর দিনগুলিকে আনন্দময় কর্মে ভরে দিচ্ছেন, আত্মাকে ডাক দিচ্ছেন গোপন আনন্দের শিখর থেকে শিখরে উঠতে।

প্লেগ

"ভগিনী, আপনার একজন রোগী আছে।" দোরগোড়ায় ডাক্তারের গলা শোনা গেল, তখনই বুঝলাম তিনি কি বলতে চাইছেন। আমার প্রথম প্লেগ রোগী। কয়েক মিনিট পরে একটা কুঁড়েঘরে ঢুকলাম, রোগী সেখানে শুয়ে। সাধারণ মাটির কুঁড়ে, আলোহীন ছোট ছোট কামরাগুলো মাঝখানের আঙিনার দিকে মুখ করা। একটা ঘরে একগাদা কাচা জামাকাপড়—বোঝা যাচ্ছে এরা ধোপা; আর একটি অংশে বাড়ির গরু। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রথম কাজ দাঁড়াল অক্ষম ছেলেটিকে বদ্ধ ঘর থেকে বের করে বারান্দায় একটা তক্তপোষে নিয়ে আসা। বেচারা একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, বারো কি চোদ্দ বছরের উজ্জ্বল ছেলেটি। গতকাল সন্ধ্যা থেকেই অসুস্থ; এখন সকাল নটা; কুঁচকি অল্প অল্প ফুলে উঠেছে; সঙ্কট যে ঘনিয়ে আসছে সে কথা বারবার বলে ও নানারকম নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার ঝটিতি বেরিয়ে গেলেন আর একজনকে দেখতে।

করবার সামান্যই ছিল। খাদ্য ও ওষুধ দেওয়া, আর স্নান করান—এইটুকুই শুধু। বড়জোর মাথাটা কামান যায়, বরফ দেওয়া যায়, পাখার হাওয়া দেওয়া যায়; কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও বসে বসে একটি মানুষকে মরতে দেখতে হবে—বাঁচানর কোনও আশা ছাড়াই কেবল চেয়ে-চেয়ে দেখা। কারণ কি ভয়ানক তীব্র লড়াইয়ের মধ্যে ওকে এখন ঢুকতে হবে তা কে জানে, বাচ্চাটার শরীরের অতিরিক্ত বাড় ও অপুষ্টির কথা যে জানে, এ লড়াই কিভাবে শেষ হবে সে সম্বন্ধে তার সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। সন্ধ্যা নামবে, ছেলেটিও মরে যাবে। ডাক্তার তাই বলেছেন। আমিও যে বুঝতে পেরেছিলাম তা নয়, যদি পারতাম তাহলে ওর মাকে তখনই ওখান থেকে সরিয়ে দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ। সে কাজ করেছি এক তীব্র জ্বালা নিয়ে, করেছি এই ধারণা থেকে যে আমি যা করতে পারি তা হল রোগীকে তফাৎ করা ও রোগ যাতে না ছড়ায় তার ব্যবস্থা করা; আর তা আমার নিখুঁতভাবেই করা উচিত। মা ছেলের কাছেই বসেছিল, হয়তো তাকে পাখা দিয়ে হাওয়া করছিল এবং সবসময়েই ছেলেটির প্রশ্বাস থেকেই নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। আমি কি জানতাম যে সে ওর মা? ভাবতে ইচ্ছে হয় জানতাম না। তাহলে তার কিছু দূরে বসা উচিত, তা বলার জন্য একটা অজুহাত খুঁজে বের করতাম। বেচারী মা। একেবারে মুষড়ে পড়ে নীরবে চলে গেল। কিন্তু তার শুকনো গাল বেয়ে নিঃশব্দে চোখের জল পড়তে লাগল, চাপা কান্নায় বেচারী ভেঙে পড়ল। এ সহ্য করা যায় না! সে করতে পারে এমন একটা কাজ আমি পেয়ে গেলাম এবং সাবধান থাকার উপদেশ দিয়ে কাজটা করার জন্য তাকে ফিরিয়ে আনলাম। তখন থেকেই বালিসের পাশে কুঁকড়ে ছেলেটার মাথা পায়ের কাছে করে সে শুয়ে রইল।

ছেলেটা ভয়ঙ্কর অস্থির হয়ে পড়ছিল। তাকে শান্ত করতে রীতিমত চেষ্টার দরকার হচ্ছিল, কারণ কোনও বে-ফসকা নড়াচড়া ওর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু ছেলেটা এমনকি যখন প্রলাপও বকছিল তখনও সর্বদা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মা ও ছেলের মধ্যে কি প্রগাঢ় ভালবাসা। একবার সে আমাকে তার মা বলে ভুল করে হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরল, তারপর নিজের হাতখানা নিজের ঠোঁটের উপর নিয়ে গেল। প্রায়ই সে মায়ের চোখ না দেখতে পেয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছিল—সব সময়েই তার চোখে নির্ভরযোগ্য সাথীর উপযুক্ত ফূর্তিবাজ ও কোমল চাহনি, যেন সমস্ত বোঝাই নিজে বয়ে মাকে খুশি করে তুলতে চাইছে। ভোরবেলার সেই সময়টার কথা আমার মনে পড়ে যখন ছেলেটি শুনল যে দু-তিন পয়সার কমে কোনও নাপিত পাওয়া যাবে না। জোর করে বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করতে করতে সে চিৎকার করে বলল, এক পয়সা দিয়েই সে নাপিত আনবে।

বোঝাই যাচ্ছে যে ছেলেটি একাধিক অর্থে সত্যিই ভাল ছেলে—ভক্ত ও স্বপ্নদ্রষ্টা। মাঝে মাঝেই তার বড় বড় দুটি বাদামি চোখে ভয়ঙ্কর সুদূর একটা দৃষ্টিকে সরিয়ে চেতনার আভাস ফুটে উঠত,—প্রায়ই সে শিব, কালী বলে ডেকে উঠত, অথবা কোনও মন্ত্র আওড়াত, বারবার হরিবোল উচ্চারণ বা তখন রাস্তাঘাটে চালু নামগান ছাড়া আর কিছুই তাকে শান্ত করতে পারত না। সে গানটি হল :

"বল হরি নাম,
বল হরি নাম,
বল হরি নাম, ভাইরে,
ওই নাম বিনে
নশ্বর মানবের
গতি আর কিছু নাইরে।"

আমার দিকে চেয়ে তার দুর্বল স্বর মাঝে মাঝে গুঞ্জন করে উঠছিল—"গতি আর কিছু নাইরে," তারপর মনে হল অদৃশ্য হস্ত যেন একটা পর্দা টেনে দিল, আত্মা যে মুহূর্তের জন্য জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছিল তাকে আর দেখা গেল না।

তারপর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল। সারাদিন ধরে পরিবারের আর সবাই উঠোনে দাঁড়িয়ে এবং ওর মা ও আমি ছোট্ট বারান্দায় বসে সব দেখছিলাম। ওরা সারাদিনই চাইছিল যেভাবে পারে ছেলেটির সেবা করতে। দুয়েক ঘণ্টার জন্য যখন আমায় চলে যেতে হয়েছিল তখন আমার জায়গা নিয়েছিল প্রতিবেশী একটি তরুণ। সে যে রকম ধীরস্থিরভাবে রোগীর কাজ করছিল তা আমার খুব ভাল লাগছিল। বিকেল পাঁচটায় ডাক্তার এলেন। তিনি বললেন "ছেলেটির অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে, বড়জোর আর দু-এক ঘণ্টা, একটা বিস্ফোরণের পর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।"

মিনিটগুলো মনে হয় কত লম্বা, শেষ বিস্ফোরণ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হল, টেনে টেনে

হরিবোল উচ্চারণের চেষ্টার ভিতর দিয়েই তা শেষ হয়ে গেল। ওর কাছে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে আমিও ওই শব্দটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলাম। মনে হল ছেলেটির মাথাটি বেশ শান্তিতেই আবার বালিসে ঢলে পড়ল। সে চুপ করে পড়েছিল, নিঃশ্বাস ক্রমশ ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছিল, তারপর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

ডাক্তার বললেন, "একার বদলে বারোজন হলে আমি বাঁচানোর চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

এ কথা স্পষ্ট যে একা কিছু করার আশা করা বৃথা। সমস্ত ডাক্তারেরই ধারণা ছিল যে একবার প্লেগ হলে আর বাঁচে না। অনেক কিছুই জানার আছে, আর কাজের ক্ষেত্রও বিরাট। এ রোগ যদিও মারাত্মক, তবু বীভৎস বা বিশেষভাবে সংক্রামক নয়। চিকিৎসার আরও সূক্ষ্ম পদ্ধতির জন্য সাহায্যের দরকার, আর সব চেয়ে বড় কথা হল আমাদের সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে জাত বা ধর্ম কোনও প্রতিবন্ধক হবে না, পরবর্তী কালে একথা সঠিক বলে আমি প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু এইসব জ্ঞান নিয়ে কাজ করতে হলে মধ্যযুগের ফ্র্যান্সিস্কান, যারা ইউরোপ থেকে এই রোগ নির্মূল করেছিল, তাদের মত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হবে। কাজেই তখনকার মত সে চিন্তা আমরা পরিত্যাগ করলাম।

তারপর প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করা হল। আমরা যদি আমাদের বাড়িটিকে একটি মেয়েদের হাসপাতালে পরিণত করি তাহলে জেনানার মেয়েদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেল। এই সময়ে আমাদের সামনে যেসব বাধাবিঘ্ন দেখা দিল সেগুলো হাস্যকর। মেয়ে নার্স হতে হবে, আর রোগীও তাই। কথাটা শুনতে বেশ সহজ, কিন্তু মেয়ে রোগীরা দাবি করবে যে তারা তাদের স্বামী, ভাই বা ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে আসবে ও তারা দিনরাত ওদের বিছানার পাশে বসে নজর রাখবে। তা হলে নার্সরা তাদের সেবা করবে কি করে ?

যে সহানুভূতিশীল কর্মকর্তাটি আমাদের পরামর্শ দিচ্ছিলেন তিনি বললেন, "আপনার বাড়িটিকে হাসপাতালে পরিণত করতে হলে খরচ-খরচা আছে, তাছাড়া আপনি কি জানেন রোগী পাওয়ার সম্ভাবনা আপনার কি রকম ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন "কলকাতায় ছ'শটিরও বেশি হাসপাতাল আছে, এবং সেগুলিতে গড়ে মাত্র চার জন করে রোগী আছে।"

কাজেই বাঙালী মেয়েদের পরিচালনায় বাঙালী মেয়েদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার এখানেই সমাপ্তি ঘটল। রোগের মোকাবিলা করার চেয়ে রোগটা কি অবস্থার মধ্যে হচ্ছে সেটা ধরাই প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করে সরকার যে বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছে তা আমরা উপলব্ধি করলাম। এখনই যা প্রতিরোধ করা সম্ভব তা মনে হয় দু রকমের : (১) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং (২) অজ্ঞতা ; এই

সব দূর করার কাজ যদি বলিষ্ঠভাবে করা হয় তবে শেষ পর্যন্ত প্রেগ মানবজাতির বন্ধু বলে প্রমাণিত না হয়ে পারবে না।

সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ কাজ হল নীচু জাতগুলিকে মনুষ্যোচিত করে তোলা। তাদের শ্রমের এখন বিপুল চাহিদা। প্রফুল্ল চেহারায় ঝাড়ুদার বালকদের কাজের ঘণ্টা কম হলেও মজুরি বয়স্কদের মতই। আর তাদের কাজে উদ্দীপকও যথেষ্ট। হাতে বেলচা, কাঁধে বালতি ধাঙড়দের দেখে মনে হয় কি গর্ব তাদের! একটা যুগের মহান লক্ষ্যসাধনের জন্য সব কিছু কেমন একত্রে কাজ করে যাচ্ছে এবং বর্তমানের মত এ রকম একটা বিপর্যয়ও কেমন ভারতে ইংরেজদের সর্বোচ্চ কর্তব্যকে অর্থাৎ ভারতীয় জনগণকে গণতন্ত্র দেওয়াকেই আসলে ত্বরান্বিত করতে পারে তা দেখলে অবাক লাগে। ভাল কাজ ও ভাল মজুরির আশু ফল নিশ্চয়ই দাঁড়াবে ঝাড়ুদারদের গ্রামগুলিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের দিকে এখনই তাকান খুব অবাস্তব হবে না যখন তারা তাদের জাতির মধ্যে মানুষ হিসাবে গৃহীত হবে।

কাজকর্মের অগ্রগতি ও অবস্থা দেখার জন্য বস্তীতে ঘুরতে ঘুরতে রোজই এই জিনিসটা আমার চোখে পড়ত যে উঁচু জাতের তুলনায় এই "অস্পৃশ্য"দের গড়ন অনেক সুঠাম। একটু বেঁটে ধরনের হলেও দেহ নমনীয়, কর্মঠ ও আঁট-সাঁট। খুব গরিব ছেলেপিলেদের মধ্যে যেমন অপুষ্টি ও অসুস্থতার দরুন দৈহিক অঙ্গবৈকল্য প্রায়ই দেখা যায়, এদের মধ্যে তা কখনও দেখা যায় না। কিন্তু একথা বলতেই হবে এ বিষয়ে উন্নততর হওয়া ছাড়া গড়নের দিক থেকে কোনও লক্ষণীয় পার্থক্য দেখিনি। আমার মনে হয়েছে যে সারাজীবন অপরাপর হিন্দুদের যে ধরনের মুখ আমি দেখেছি এদের দেখতেও সেই একই রকম, শুধু চামড়াটা কালো এই যা। আমি যদি এ দেশটাকে না চিনতাম তবে আমার এই বিশ্বাসই হত যে এই তথাকথিত নেগ্রিটয়েড পারিয়ারা আমার মতই আর্য। নিজেদের জাতির জন্যই কাঠ কাটা, জল বয়ে আনার কাজ যাদের করতে হত এরা সে আদিবাসী নয়, এরা কেবল সেই বৃত্তিগত পার্থক্য তৈরি হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াতেই মর্যাদা হারিয়েছে, যা ঘটেছিল আরও অনেক জাতের ক্ষেত্রে। একথা ঠিক যে লোকগুলো খুব কালো, কিছু ক্ষেত্রে গাঢ় বাদামি রঙের। তবে সব ক্ষেত্রেই এক রকম নয়। আর উচ্চতম শ্রেণীগুলির মধ্যেও এই বিশেষ রঙটি আমার চোখে পড়েছে, বিশেষত যেখানে রোদ-হাওয়া গায়ে লাগে বেশি। সামাজিক স্তরের উঁচুতে যারা তাদের তুলনায় হয়তো এই পারিয়াদের চেহারায় অসমাঙ্গতা বেশি; কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এ কি নীচু জাত হওয়ার দরুন, না কি সামাজিক নিয়ম-কানুনের শৈথিল্য থেকে উদ্ভূত অবাধ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দরুন? ধর্মান্তরিত ইহুদীদের সন্তানদের তাদের পূর্বপুরুষের চেহারার বৈশিষ্ট্য হারাতে যারা দেখেছে জাতীয় গড়নের উপর ভাবধারার প্রভাব তারা অবজ্ঞা করবে না।

আমাদের এই ছেলেদের ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন বর্তমানে তারা হাস্তে-

লাল্তে ভরপুর। একটা যাচ্ছেতাই নর্দমা তাদের কাছে আবিষ্কারের মত, আর তত্ত্বাবধায়কদের অধীনে তারা বেশ ধৈর্য ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করে। নীচু জাতগুলির হীনতার আসল কারণ এই যে দেশের বেশি ভাগ্যবান লোকেদের কাছ থেকে তাদের এত সংগঠন ও তত্ত্বাবধান নিতে হয়। আমি যে ধাঙড় দলটির ব্যাপারে আগ্রহী তাদের ক্ষেত্রে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন লোক তাদের কাজ দেখাশোনার জন্য সময় ও মনোযোগ দেয় এবং এর নীচে আবার থাকে দলের মুখিয়া; আর এর সবটুকুই একেবারে অপরিহার্য।

সবচেয়ে অসহ্য একটা জঘন্য ব্যাপার হল একেবারে মাঝখানে ও বাসগৃহের একেবারে গা-ঘেঁষে এই পায়খানাগুলো ও বস্তী থেকে ক্রমাগত চোঁয়ান ময়লা ও দূষিত জলে টইটম্বুর পুকুরগুলো হল শহরের স্থায়ী উৎপাত। এসব সম্পূর্ণ তুলে না দিলে কোনও ফলপ্রসূ স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে না; তবে একথাও এখানে বলে রাখা দরকার যে এ ব্যবস্থা বহুদিনের, সম্প্রতিকালের নয়।

অসুবিধাগুলো কি কি তা জানতে গিয়ে আমি দেখলাম যে একটা সীমা আছে যার পরে পরিশ্রম বিষাদময় ও নৈরাশ্যজনক। একজন ঝাড়ুদারের কাজ সে ধরনের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়, সেখানে আমাদের কর্মীরা এমন এক নর্দমার দেখা পেল যার মোকাবেলা স্বয়ং হেরাকলস-এরও অসাধ্য। ওখানে মুসলমানদের বাস, মুরগী, ছাগল ও মানুষ তালগোল পাকিয়ে গাদাগাদি করে থাকে। এইসব গ্রামে সবুজ ঘাসে ঢাকা খোলা জায়গাও আছে, একটা ভাল করে পরিষ্কার করা ও মেরামত করা খাল, গোটা গ্রামের জন্য একটা মনোরম সবুজ মাঠ; এখানে-ওখানে দু-চারটে ফুলের ঝাড়— মনশ্চক্ষে এগুলো দেখলে বোঝা যায় জায়গাটা কি মনোহর হতে পারত। জমি পেলে পৃথিবীর অন্যতম সবচেয়ে ধনী শহরে মিউনিসিপ্যাল করদাতা দুহাজার লোকের পক্ষে এগুলো পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর খাল থেকে ঝিরঝির করে একটু জল বের করার জন্যও আমাদের কুড়িজন লোককে এক সপ্তাহ করে কাটাইয়ের কাজে লাগিয়ে রাখতে হয়েছিল। ওরা বলল, গেল পনের বছরে নাকি ওতে একবারও হাত দেওয়া হয়নি। গ্রামের মাঠটা যদিও আমরা পরিষ্কার করিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে বাগান পত্তনের সঙ্গতি আমাদের ছিল না, থাকলেও আমরা করতাম না, কারণ পরে সে বাগানকে মধুর ও সুন্দর রাখার প্রয়োজনীয় খরচ যোগাতে আমরা পারতাম না।

এই বীভৎস এলাকায় আমরা ছোট একটা মুসলিম কবরখানা দেখলাম। সাদাসিদে প্যাটার্নে জাফরি-কাটা নীচু একটি পাঁচিল শান্ত দোলায়িত রেখায় জায়গাটি ঘিরে রেখেছে। কোনও স্মৃতিফলক বা স্মৃতিসৌধ নেই, এক কোণে কি একটা ন্যাড়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে, অনেকটা ইংলিশ ব্ল্যাক কান্ট্রির সামান্য পাতাওয়ালা এল্ডারের মত, গাছটি দিয়েই বোধহয় জায়গাটিকে চেনা যায়। ওরা বলে এখানে একজন পুণ্যবান মানুষ শেষ বিশ্রাম নিচ্ছেন, পাথরের স্মৃতিফলক

বসানর সঙ্গীত ওদের নেই, অথচ সে ভক্তি ভুলতেও পারে না, কাজেই ওই একটা বুড়ো গাছ দিয়েই তাঁর স্মৃতিকে সবুজ রাখার চেষ্টা করছে যে মানুষটি ওদের মত গরিব হয়েও ওদের পূর্বতর জীবনের স্বাদ পাওয়াতে দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করছিলেন।

এই ধরনের একটি পল্লীতে একটা মজার ব্যাপার হল যে মাঝে মাঝে এক-একটা পুরানো আভিজাত্যসম্পন্ন বাড়ি ও বাগান দেখা যায়। ধনীর পরিত্যক্ত জায়গায় দরিদ্রকে সবসময়ে বাস করতে হবে এটা কি জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা বিধান? তা নইলে অতীত আভিজাত্যের যে চিহ্ন সর্বত্র দেখা যায় তার ব্যাখ্যা কি? এই রকমই একেবারে হতভাগা ধরনের আর একটা বস্তীতে মাঝখানের বিরাট পুকুরে একটা ভাঙাচোরা ঘাট রয়েছে যেটা এককালে চমৎকার ছিল। এই ঘাট, জলে আকাশের এবং এখনও বছরে বছরে আগুন রঙের ফুলের পশরা সাজান পুরানো গাছটির ছায়া —সব মিলিয়ে দৃশ্যটির সঙ্গে বিপুল সাদৃশ্য রয়েছে কাশ্মীরের চিত্রকল্প বিধ্বস্ত গ্রামগুলির।

এখানে যে প্লেগ আদৌ হচ্ছে তা বোঝার জন্য বেশ খানিকটা গভীরে যেতে হয়। ইউরোপে আমরা যখন শুনি কোনও জায়গা "আক্রান্ত" হয়েছে আমরা মৃত্যুর সর্ব প্রকার রূপ সেখানে কল্পনা করি: পরিত্যক্ত ফুটপাতগুলোর উপর ঘাস গজাচ্ছে, বাড়িতে বাড়িতে ক্রশ চিহ্ন আঁকা, মাঝরাতে 'মড়া বের করে আন,' বলে অলৌকিক স্বরে চিৎকার—কত কি। আসলে ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। প্লেগের আক্রমণের কথা আমি প্রথম শুনলাম ইউরোপীয়দের একটা ভোজের নিমন্ত্রণে গিয়ে, বাড়ি ফিরে এসে খোঁজখবর করে জানলাম যে আমাদেরই রাস্তায় এক সপ্তাহে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে।

এমন একটা আওয়াজও ওঠেনি যাতে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। চিরাচরিত বিলাপের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মৃতদের রাতে রাতেই পোড়ান অথবা কবর দেওয়া হয়েছে। প্রিয়জনের মৃত্যুশয্যার পাশে যারা জেগে বসে থেকেছে তাদের উদ্বেগ এতটুকু কথার মধ্যে দিয়েও বাইরে প্রকাশিত হয়নি। একটা মানুষ যে জীবন্ত প্রাণিজগৎ থেকে বিদায় নিল কোনও লক্ষণ থেকেই তা বাইরে বোঝা যায় নি। এ অবশ্য প্লেগের আক্রমণের গোড়ার দিকে।

দিন যত কাটতে লাগল লোকে বোধহয় তত বুঝল যে তাদের পারিবারিক গোপনতার মধ্যে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য কারও নেই। ক্রমে ক্রমে পথে শববাহকদের প্রকাশ্যভাবে বেশি বেশি দেখা যেতে লাগল, দুলে দুলে চলার তালে তালে "রাম নাম সত্য হ্যায়" (একমাত্র ভগবানের নামই সত্য) বলতে বলতে শবদেহ সৎকারে চলেছে; মাঝে মাঝে সন্ধ্যার মুখে মুসলমান শববাহকদের শোকার্ত শবযাত্রা দেখা যেতে লাগল, তাদের হাতে মশাল, মুখে পবিত্র আওয়াজ: আল্লা ইল্লা, ইল ইল আল্লা!

ভারতের মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ তাদের কলা, তাদের বিজ্ঞান, তাদের রীতিনীতি, তাদের নির্মাণকার্য ইত্যাদির মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে আধ্যাত্মিক হল তাদের ভাষা। এর ভিতর দিয়েই জাতির আত্মার প্রকাশ হয়, ভাষার মধ্যেই তাদের প্রেম ও আশার, সাফল্যের, আদর্শের ও বিশ্ব সম্পর্কে সমালোচনার ছাপ পড়ে।

কোনও জাতির নিজেদের দেশ বাদ দিলে আর এমন কোনও উপাদান নেই যা তাদের চরিত্র ও ভাগ্যকে ভাষার মত নির্ধারণ করে। জাতি ও ধর্মবিশ্বাস আসে ও যায়, শিশু জন্মায়, বৃদ্ধ হয় ও মরে। প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ভাষায় যতটা পারে দান করে, কিন্তু ভাষা তাদের সকলের উপরে। ভাষা যেমন জাতির আত্মাকে ধরে রাখে তেমনি সাহিত্য ভাষার আত্মাকে ধরে রাখে। জাতির এই স্বপ্নরাজ্যে, অর্থাৎ ভাষায়, ভাবধারা, চরিত্র ও সৌন্দর্যের রূপ যোগান দেওয়ার ক্ষমতার ভিতর দিয়েই প্রতিটি জাতীয় উপাদান সমগ্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও অমরত্ব লাভ করে।

ভারতীয় কোনও ভাষার অনুশীলন করতে গেলে দেখা যাবে যে ভারতীয় স্বপ্নরাজ্যের বিশালতা ও বিশিষ্টতা ক্রমশই বাড়ে। প্রথমে রয়েছে দার্শনিক ভাবধারা, যা স্বপ্নে সুর যোগায়। তারপর রয়েছে আদর্শ চরিত্রগুলির এক বিপুল সমারোহ, যার দরুন প্রত্যেকটি ভারতীয় শিশু জন্মেই স্বাধীন মানুষে পরিণত হয়। আনুষ্ঠানিক ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ না করেও চরিত্রের এই সমারোহের মধ্যে যে কোনও লোক সারাজীবন ঘুরে বেড়াতে পারে: এ হল জাতীয় সংগ্রামের প্রত্যেকটি প্রজন্মের নাটকীয় পশ্চাদপট। তারপর রয়েছে অসংখ্য প্রবচন ও রূপকথা, গ্রাম্য গাথা, রমনীয় অথচ অদ্ভুত সব গল্প, ভিখারীদের গান, পূর্বপুরুষদের বীরগাথা, ঋষি ও নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধেয় স্মৃতিকথা এবং এমন সব ভাসমান সাহিত্য যা অক্ষরে মূর্ত না হয়েও মানুষের আত্মিক কোটরের অনেকখানি জুড়ে বসে।

লোকে ক্রমশই দেখতে পায় যে এসবের পিছনে রয়েছে চিন্তা ও শক্তির একটি কেন্দ্রীয় উৎস, প্রামাণ্যতার এক ফোয়ারা, মর্যাদা ও বিশ্বাস আনতে সক্ষম নির্ভুলতার একটি মান। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রামাণ্যতা নিহিত আছে সংস্কৃতের মধ্যে। ভারতের প্রত্যেকটি ভাষা তার দীর্ঘ ইতিহাসে দৃঢ়ভাবে এই চিরায়ত ভাষাটিরই অনুগমন করেছে। ভারতের সমস্ত উচ্চতর সাহিত্য হল অনুবাদ এবং এমনকি যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অনুবাদ হয়নি, সেক্ষেত্রেও মূল উপাদানের উৎস ছিল সর্বদাই সংস্কৃত। ওই ভাষাতেই জাতির মহান সংস্কৃতিগুলি রক্ষিত হয়েছে। এই ভাষার মাধ্যমে যে কোনও লোক ওই জাতির চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসতে পারে।

কিন্তু সংস্কৃত নিজেই একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা; এ ভাষা শিখতে মানুষের জীবনের অনেক বছর কেটে যায়। প্রশ্ন ওঠে: যুগ যুগ ধরে এই ভাষা কেমন করে তার বিশুদ্ধতা ও শক্তি বজায় রাখছে? প্রত্যেকটি সম্পদই তার নিজস্ব

সামাজিক গঠন দ্বারা রক্ষিত ও বিকশিত হয়। কোন সমাজ ও কোন শিক্ষা এই ভাষাকে জীবন্ত রেখেছে? এখানেই আমরা ব্রাহ্মণের বিদ্যালয়গুলির কথায় এসে পড়ি। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া পুরানো হিন্দু সংস্কৃতির নির্দিষ্টতা ও সঙ্গতি উপলব্ধি করা অসম্ভব। এমন কি আজও যারা কোনও পূজারী পুরোহিতের পরিবারের কাছাকাছি থাকে তারা শুনতে পাবে যে পিতা ও পুত্র পবিত্র গ্রন্থ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভোর থেকে সারাক্ষণ আবৃত্তি করে চলেছে। ব্রাহ্মণের কাছে তার গৃহও একটি বিদ্যালয়। কিন্তু টোল অর্থাৎ সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলির সংগঠন অধিকতর বিধিবদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক। এই টোলগুলি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জালের মত ছড়িয়ে আছে এবং কোনও বিখ্যাত গুরুর পদপ্রান্তে স্থান পাওয়ার জন্য দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে। এই নবশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের বিশেষ তোয়াক্কা করে না। এখানে ছাত্রদের নাম কোথাও নথিভুক্ত থাকে না, কোনও পরীক্ষা বা কোনও উপাধি ছাড়াই কেবল জ্ঞানলাভের জন্যই তারা বছরের পর বছর পড়াশোনা করে। এখানে আত্মসচেতনতা এত কম যে কেউ কোনও দিন তাদের নামের তালিকা করার কথা ভাবেনি। তথাপি মতের জন্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং গভীর ও জটিল জ্ঞানের উত্তরাধিকার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হয়, তবে বহু সুবিখ্যাত মহাবিদ্যালয়ও বিপুল আয়সম্পন্ন এই নবশিক্ষা ভারতীয় অতীতের জ্ঞানপীঠগুলির কাছে স্বচ্ছন্দে প্রণত হতে পারে। বারাণসী ও নাসিক, উজ্জয়িনী, কাঞ্চিভরম ও প্রাচীন তক্ষশীলা—এই নবশিক্ষার বিদ্যাপীঠগুলির মধ্যে বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নাম—মনশ্চক্ষে কি চিত্রই না তারা উদ্ভাসিত করে! সমস্ত প্রদেশগুলি একই জিনিসের জন্য বিখ্যাত ছিল না। দক্ষিণ বেদের স্মৃতিরক্ষা করে চলেছে। উজ্জয়নীতে জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র, বারাণসীতে ব্যাকরণ ও বাংলায় তর্কশাস্ত্র সুবিখ্যাত।

ভারতবর্ষের দূরদূরান্ত থেকে তরুণ ছাত্ররা এর যে কোনওটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ও পছন্দসই গুরুর কাছে শিক্ষালাভের জন্য পদব্রজে আসত, কপর্দকহীন হওয়ার দরুন তারা পথে পথে ভিক্ষা করে এগোত। বুদ্ধের সময়ে একজন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার আশায় রাজগীর থেকে তক্ষশীলায় (বর্তমান পেশোয়ারে) পদব্রজে গিয়েছিল। চিকিৎসাবিদ্যার যে বিরাট পণ্ডিতের দ্বারে সে পৌঁছেছিল তিনি তাঁকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং যতদিন সে সেখানে কাজ করেছিল, জ্ঞান অন্বেষণে নিমগ্ন ছিল, ততদিন তার দিন সুখেই কেটেছিল। তারপর এল সেই দিন, যেদিন তার গুরু তাকে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে বসালেন, অর্থাৎ বর্তমান কালের ভাষায় তাকে ডাক্তারির থিসিস দিতে বললেন। তাকে মাঠে যেতে বলা হল ও সে যত ওষধি গাছ-গাছড়া চেনে তা খুঁজে নিয়ে আসতে বলা হল। সে চলে গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দারুণ মানসিক অশান্তি নিয়ে ফিরে এল। সে বলল যে নিরাময়কারী সব ওষধি নিয়ে আসতে পারেনি, কারণ সব গাছই কোনও না কোনও ভাবে ওষুধের কাজে লাগতে পারে। তারপর সে গুরুর সামনে দেখাল প্রত্যেকটি

গাছ-গাছড়া কিভাবে চিকিৎসার কাজে লাগতে পারে। কথিত আছে, বহুকাল পরে এই তরুণ যখন কৃতবিদ্য হয়ে মগধে ফিরে এল তখন তাকে ভগবান বুদ্ধের জ্বরের চিকিৎসা করতে দেওয়া হয়েছিল।

যে সময়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিরাজিত ছিল তখনকার সেগুলির রেশ পঞ্চশত শতাব্দীর নদীয়ায় চৈতন্যের কালেও তেমনিই দেখা যেত। বৃদ্ধদের কাছ থেকে শুনেছি যে তাদের বাল্যকালেও, অর্থাৎ এই সেদিনও ওই রকমই ছিল। পুরানো টোলগুলির কর্মসূচীর ভিতর দিয়ে যে জীবন আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা আশ্চর্য ভাবঘন ও একাগ্র। পঞ্চাশ কি ষাটটি ছাত্রের একটি পরিবার, একটি পুকুরের চারপাশ ঘিরে কয়েকটি মাটির কুটিরে তাদের বসবাস, এই হল গুরুর মহাবিদ্যালয়। বিশ বছর বয়সে ছাত্ররা এখানে আসে, হয়তো অধীতব্য বিষয়ের প্রথম পাঠ তারা সমাপ্ত করেই আসে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তারা প্রায়ই অবিবাহিত থাকে। বাংলাদেশের বিক্রমপুরের একটি টোলের কথা তো আমি নিজেই শুনেছি যে সেখানে মহারাষ্ট্র থেকে তিনজন ছাত্র এসে ভর্তি হয়েছিল, কারণ বাংলার তর্কশাস্ত্রের খ্যাতি দূরদূরান্তে বিস্তৃত ছিল এবং তার শ্রেষ্ঠ গুরুদের নাম সারা ভারত জানত। এই ধরনের টোলেই ব্রহ্মচর্যের মহান আদর্শে জীবন যাপিত হত, পুত্রের মত ছাত্র ব্রহ্মচর্য পালন করত।

একটি প্রাচীন জ্ঞানপীঠ সংশ্লিষ্ট গ্রাম

আমরা একটি ছোট্ট হাসিখুশি দল গিয়েছিলাম খড়দহ গ্রাম দেখতে। চৈতন্য নিত্যানন্দকে গৃহীজীবন যাপনের নির্দেশ দেওয়ার পর এই গ্রামেই নিত্যানন্দ বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন, আর তখনকার প্রাথমিক স্তরের সমাজকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ও সংগঠিত করেছিলেন। প্রায় ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে একদিন আড়াই হাজার নরনারী, "সকলেই মুসলমান", প্রেম ও ক্ষমার এই মহাগুরুর কথা শুনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আসে এবং ন্যাড়ানেড়ী অথবা মুণ্ডিতমস্তক পুরুষ ও স্ত্রী হিসাবে তাদের তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন। নথিপত্রে তাদের মুসলমান বলা হয়েছে কারণ লেখকেরা তাদের হিন্দু হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি, আর বহুদিন আগে এ কথা লোকে ভুলে গিয়েছিল যে গোঁড়া হিন্দুসমাজের বাইরেও এমন কোটিবিভাগ থাকতে পারে যার অন্তর্ভুক্ত তারা হতে পারে। আসলে তারা ছিল বৌদ্ধ আর নিত্যানন্দের জীবনের এই স্মরণীয় দিনটি নিশ্চয়ই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু চিহ্নিত করেছিল।

এর চেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন আর কি উঠতে পারত? দুয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এই ঘটনা যেখানে ঘটেছিল সেখানে তার আর কোনও চিহ্ন আছে কিনা দেখবার জন্য সেদিকে এগোলাম। গঙ্গা কানায় ভরা। সুন্দর আবহাওয়া যে একঘেঁয়েমি আনত মাঝে মাঝে হঠাৎ বৃষ্টি তাতে বৈচিত্র্য যোগাচ্ছিল। কিন্তু তার ফলে ছোট্ট নৌকোটি বৃষ্টির হাত থেকে সবসময়ে আমাদের বাঁচাতে পারছিল না। বরানগরের কাছ থেকেই শুরু হল মন্দির ও পবিত্র স্থানগুলির লম্বা সারি। গঙ্গার একূল পবিত্র বলে চিরকাল পরিচিত। একজন বললেন, চৈতন্য এই পর্যন্ত এসেছিলেন, কারণ এ কথা কি সত্য নয় যে বরানগরের যে বাড়িটিতে চৈতন্যের পদধূলি পড়েছিল সেটি আজও বিরাজমান? এখান থেকেই মাঝে মাঝে আমাদের চোখে পড়তে লাগল সাধারণ স্নানের ঘাটের থেকে পুরানো ও সুন্দর কিছু কিছু ঘাট, যেগুলি কোনও না কোনও বিশিষ্ট কেন্দ্রের পরিচায়ক; পানিহাটিতে মোগল দুর্গের সাক্ষ্য রয়েছে; আবার রয়েছে শুভ্রশিবের মন্দির, যেখানে অনাবৃষ্টির সময়ে কৃষকেরা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে; এই রকম আরও কত কি! কখনও এ প্রশ্ন আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল যে অতীতে এই শহরে যা ঘটেছিল তার কোনও রেশ কি এখনও আছে? নিত্যানন্দের স্মৃতির কোনও রেশ কি এখনও জীবন্ত আছে? সর্বোপরি, এই বিরাট ঘটনাটির, অর্থাৎ ন্যাড়ানেড়ীদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার কোনও ঐতিহ্য কি এখনও টিকে আছে?

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার চৈতন্য, নিত্যানন্দের এই কাহিনীটি অপূর্ব। এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে ভারতের মত আর কোনও দেশ নেই যেখানে প্রতিভার জাগরণকে এমন করে স্বাগত জানান হয়। যে প্রেম সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার কথা, মাত্র আঠার বছর বয়সে নদীয়ার চৈতন্যকে সেই প্রেম তার

পরমানন্দের প্রবল স্রোত ও ঘূর্ণাবর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরও তিনবছর তাঁর শৈশবের পালিত ভাই তাঁর সকল চিন্তা ও উদ্যমের সঙ্গী ছিলেন। তারপর অন্তর্লোকের বাণীই বড় হয়ে উঠল। পৃথিবীর ভাবগতিক চৈতন্য আর সহ্য করতে পারলেন না, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুক্ত হয়ে তিনি একাকী গৃহত্যাগ করলেন। কিন্তু চলে যাওয়ার আগে এক অদ্ভুত ভবিষ্যদৃষ্টি নিয়ে যে জগৎ তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন সেখানে যেসব পরিকল্পনাহীন কাজকর্ম করতে হবে তার জন্য নিত্যানন্দকে গৃহীর জীবনে প্রবেশ করতে অনুরোধ করে গেলেন, আর এই নির্দেশ নিষ্ঠাভরে প্রতিপালিত হল, চৈতন্যের পালিত ভাই বাকি জীবন গঙ্গাতীরে খড়দহে কাটিয়ে দিলেন। নিজের মতের সমর্থনে পণ্ডিত ভদ্রলোক বলে চললেন, "প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গঠন এবং গোঁড়া সমাজ থেকে চ্যুত নীচুজাতের লোকেদের এই ধর্মে নিয়ে আসার নিয়মাবলী প্রণয়ন নিত্যানন্দই করেছিলেন। চৈতন্য থেকে যা তাঁকে তফাৎ করেছে তা কোনও ক্রমেই উচ্চতর জীবন থেকে পতন নয়, এ হল কঠোরভাবে আজ্ঞাপালন এবং যে কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে সে সম্পর্কে চেতনা। এই নিত্যানন্দই ক্রোধহীন, অচঞ্চল ও নিরহঙ্কারভাবে এই শহরে বিচরণ করতেন। আর চৈতন্য তাঁর বাকি জীবনের ছাব্বিশ বছর প্রথম কাটালেন পরিব্রাজনে, তারপর বৃন্দাবনে ও শেষে পুরীর মন্দিরে। সেখানে তিনি আঠার বছর ছিলেন এবং ওড়িষ্যায় এমন কোনও গ্রাম ছিল না যেখানে তিনি পূজিত হতেন না। আমরা বাঙলার লোকেরা তাঁকে একজন গরিব ব্রাহ্মণ হিসাবেই জানি। আমরা তাঁর কুলজী জানি, তাঁর পরিবার সম্পর্কেও বলতে পারি। কিন্তু ওড়িষ্যার লোকেরা মনে করত তিনি স্বয়ং ভগবান।

অতি শান্ত পরিবেশের ভিতর দিয়ে আমরা টালির মত চেহারার ইটে তৈরি একটা সুন্দর ঘাটের সামনে এলাম। ঘাটের উপরের দিকে দুধারে দুটি কারুকার্য করা বাড়ি। কাছেই একটি অদ্ভুতদর্শন মন্দির। রাসমেলায় মূর্তি দেখানর জন্য এটি তৈরি। শহরের আরও ভিতরের দিকটি গঙ্গার এপার থেকে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকলেও আমরা জানতাম যে সেখানে নিত্যানন্দের নিজের তৈরি শ্যামসুন্দরের বিখ্যাত মন্দিরটির দর্শন পাওয়া যাবে।

এখন বর্ষাকাল, গঙ্গার তীরে বেড়ানর পক্ষে সবচেয়ে সুন্দর সময়। কানায় কানায় ভরা নদী ও তাজা সবুজ গাছপালা প্রাচুর্যের ও অসামান্য সাধারণ সৌন্দর্যের পরিবেশ রচনা করে। এখানে নামার পরেই এখানকার যে বিপুল বৈশিষ্ট্য চোখে পরে তাহল গোসাইদের সুন্দর সুন্দর পুরানো বাড়িগুলি। পলেস্তারাহীন ইটের দেয়ালগুলি রাজমিস্ত্রীদের অত্যুৎকৃষ্ট কাজের নিদর্শন, তাদের নির্মাণকার্য এত উঁচু মানের যে কোনও অলঙ্করণের প্রয়োজন হয় না। খড়দহের নিস্তব্ধ অলিগলির বাড়িগুলো পশ্চিমের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নগরীর অষ্টাদশ শতাব্দীর কলেজগুলির মত, তেমনি নিখুঁত কারুকার্য ও সচেতন মর্যাদার পরিবেশ। নিত্যানন্দের আধ্যাত্মিক বংশধরদের বাড়িগুলির দিকে এইভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে আমরা

মনে মনে বললাম হয়তো এসব বাড়ির লোকেরা তাদের বাড়ির ঐতিহ্য অনেক দিন ভুলে গিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই এতদিনে গোড়ামির অতি-কঠিন খোলসের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করেছে। পূর্বপুরুষরা যা চেয়েছিলেন তার উল্টোটাই যদি এরা প্রমাণ করে তবুও কারও অতিরিক্ত হতাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ এ আশা করা উচিত নয় যে একটি মহৎ চিন্তাধারা একই জায়গায়, একই প্রাণশক্তি নিয়ে চারশ বছর টিকে থাকবে। এইসব ভাবতে ভাবতে আমি শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যাওয়ার ইট-বাঁধান পথে এসে পড়লাম। ইট-বাঁধান পথটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেটি বেয়ে আমি মন্দিরেরই চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে গেলাম। প্রবেশদ্বার থেকে যতটুকু দেখা যায় দেখলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে যখন ফিরে এসেছিলাম তখন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রবেশ করলেন। তিনি হেঁকে বললেন "না, না, আপনারা নাটমন্দিরে আসুন, সেখান থেকে ভাল দেখতে পারবেন।" আমন্ত্রণের আন্তরিকতায় খুশি হয়ে আমি তাঁর নির্দেশমত এগোলাম, আর তিনি মন্দিরের ভিতরে নিজের কাজে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে আমরা ন্যাড়া-নেড়ীদের জায়গাটা খুঁজে বের করলাম। একথা নিশ্চিত যে নিত্যানন্দের কুটিরের সামনের আঙিনায়, যেখানে নেড়া-নেড়ীদের আদি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল সে জায়গাটি আজও ওই নামেরই স্মৃতি বহন করছে। ঘাসের উপর এককালে যেখানে বাড়িটি ছিল সে জায়গাটি এখন আবৃত বারান্দা, আর যে ঘরে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র জন্মেছিলেন সেটি কয়েকটা তুলসী চারার দ্বারা চিহ্নিত করা রয়েছে। কল্পনা করা যায় যে নিত্যানন্দ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, আর নিজেদের বিষয়টি বিবৃত করে তাঁর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় সামনে জড়ো হয়েছে আড়াই হাজার মানুষ। গ্রাম থেকে আসা এই ভিখারী-ভিখারিনীদের অনেকেই নিজেরা কোনও না কোনভাবে পতিত ও অযোগ্য সে বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতন, কোনও কালে হয়তো তারা যে এক মহামানবের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন। কারণ বহু পুরুষ ধরে, বরং বহু শতাব্দী ধরে সমাজের ব্যর্থতার দরুন তারা ক্রমাগত ধর্মান্তরিত হয়েছিল, মাথা মুড়িয়েছিল, কনুইয়ের উপর তামার তার বেঁধেছিল, বিনয় ও ধর্মের এই চিহ্ন ধারণ করে, গেরুয়া বসন পরে অন্নভিক্ষায় বেরিয়ে পড়েছিল কারও উপর নিজেদের না চাপিয়ে। তাদের নেড়া-নেড়ী নাম সব সময়ে ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচিত হত কারণ এই সব ভিখারী-ভিখারিনীরা কি জোড়ায় জোড়ায় ঘুরত না? বস্তুত বাংলার কথা ছিল "চুলোয় যাক ভণ্ডামি।" ধনীদের ভুক্তাবশিষ্ট অবহেলায় তাদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হত, কারণ ভারতীয়রা কাউকে না খেয়ে মরার শাস্তি দেয় না কিন্তু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সুরুচির অভাব লোকদের মধ্যে একটা চলতি কথা হয়ে উঠেছিল। কেউ প্রথম অপরাধ করলে তাকে তাচ্ছিল্য করে ওই নামে অভিহিত করা হত। কি আশ্চর্য যে মানবজীবনের দুঃখকষ্টই তাদের এই ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য করেছিল। পাপীরা মাথা মোড়াতে, গেরুয়া বসন পরতে ও ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ফিরতে থাকল; অথচ নিজেদের লজ্জাজনক অবস্থা সম্পর্কে

অত্যন্ত সচেতন থাকার দরুন অপরাপর মানুষের কাছ থেকে সামান্য শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য অনেক কিছু করতে, এমনকি হয়তো সম্পূর্ণ আত্মশুদ্ধি করতেও তারা প্রস্তুত ছিল। এই রকমই ছিল সেই দুঃখী মানুষেরা যারা সেদিন খড়দহে নিত্যানন্দের আঙিনায় আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামবাসীরা আমাদের বললেন, এখনও ওখানে নেড়া-নেড়ীদের বাস আছে; কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাদের জন্য বছরে একবার করে একটা মেলা বসানর রেওয়াজ ছিল। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সেটাকে অসম্ভব করে তুলেছে। স্থানীয় গোসাঁইদের কয়েকজন বয়স্ক লোক মর্মাহতভাবে কথাটা বললেন যেন পিতৃপুরুষদের দ্বারা ন্যস্ত একটা দায়িত্বের প্রতি তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। দুয়েক বছর আগেও রেওয়াজটা চালু ছিল, এখনও আবার চালু করার আশা তাঁরা রাখেন। এবার তাঁরা আমাদের আর একটা মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সেটি শ্যামসুন্দরের মন্দির নয়। এই মন্দিরটি পরবর্তী কালে তৈরি হয়েছে মেলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য এবং নেড়া-নেড়ীরা এটাকে এখনও ধর্মশালা হিসাবে ব্যবহার করে। মন্দিরের নির্মাণকার্য কখনও সমাপ্ত করা হয়নি, ফলত দেবপূজার উৎসর্গ করা হয়নি। কিন্তু বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে মহাবলীপুরে যেমন দেখা যায় তেমনি পুরানো ধাঁচের বৌদ্ধ মঠের কায়দায় তৈরি; আর তা যথোপযুক্তই হয়েছে, কারণ এখানে এখন যাদের ঘুমোবার জায়গা দিতে হচ্ছে তাদের অনেকেই নামে সেই ধর্মের লোক।

অতএব খড়দহে নিত্যানন্দের আত্মার মৃত্যু হয়নি। সেইসব ভিক্ষুকদের কথা কল্পনা করা যায় ইউরোপে মধ্যযুগে কোনও কোনও রাজা ভোজসভায় বসার আগে নিজের হাতে যাদের পা ধুইয়ে দিতেন—আমরা কল্পনা করতে পারি যে রাজগৃহে এইসব ব্যাপার প্রতীকধর্মী চরিত্র নিয়েছিল, অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের মধ্যে যেন রাজা ও ভিক্ষুককেই বিশেষ সম্মান দেওয়ার কথা। আমার কল্পনায় খড়দহে যেন এমনিই একটি অনুভূতি আমি আবিষ্কার করেছিলাম। আমরা যে এখানে আগন্তুক ও আমাদের মধ্যে একজন যে আবার বিদেশী মহিলা সেইটেই বোধহয় এখানকার লোকেদের পক্ষে আমাদের সাদর আতিথেয়তা দেখানর বিশেষ কারণ হয়ে উঠেছিল। এবার তাঁরা আমাদের আবার মন্দিরের পথে নিয়ে গেলেন। ওঁরা আমাদের পছন্দ ও মনোবাসনার কথা মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন। এবার আমাদের এমন কিছু দেখাবেন যাতে আমরা খুশি হতে পারি। নিত্যানন্দের নিজের হাতে লেখা একখানি ভাগবত তাঁদের কাছে ছিল। সেই পুঁথি। ওঁরা পুঁথিখানা আমাদের সামনে খুলে ধরলেন। তার প্রত্যেকটি শব্দই একটি করে ছবি। পুরানো কলমে, পুরানো কাগজে অম্লান পুরানো কালিতে লেখা পুঁথিখানিতে এমন কোনও অক্ষর নেই, এমন কোনও ফাঁক নেই, এমন কোনও শব্দ নেই যা নিখুঁত নয়। মনে হল নিত্যানন্দের সেই মুক্ত, মধুর, সৌন্দর্যে পুলকিত হৃদয়টিই আমাদের সামনে উন্মোচিত হল। কিন্তু অপরাপর স্মারকচিহ্নগুলি কোথায়? যেগুলির কথা কেউ না কেউ বলবে, হয়তো ফিসফিস করেই বলবে? চৈতন্য যখন তাঁর ভ্রাতাকে

সংসারে ফিরে গৃহী ও নাগরিকের জীবন যাপনের নির্দেশ দিলেন, তখন নিত্যানন্দ তাঁর সন্ন্যাসের দণ্ডটি ভেঙে ফেলেছিলেন। খড়দহের মন্দিরে সেই দণ্ডের মাথাটি আজও রয়েছে। ওঁরা সেটি বের করে এনে আমাদের দেখালেন—এই সেই দণ্ড যেটি হাতে নিয়ে নিত্যানন্দ চৈতন্যের পাশাপাশি বাংলার নগরে ও গ্রামে তিন বছর ধরে প্রেমের ধর্ম প্রচার করেছিলেন। ওই সাধারণ ভাঙা কাঠের টুকরো—দণ্ডের ওই মাথাটার দিকে আমরা স্বপ্নাবিষ্টের মত চেয়ে রইলাম। হে দণ্ড, তুমি যা দেখেছ তা যদি দেখতে পেতাম, তুমি যা ছুঁয়েছ তা যদি ছুঁতে পারতাম!

তবে খড়দহ কেবল সেখানকার বড় বড় ঘটনাগুলির স্মৃতি অথবা স্মারকচিহ্নই বহন করছে না। খড়দহ এমন একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যাদের উপর একটি বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। শত শত বছর ধরে হিন্দুধর্মের নিজের মধ্যে সকলকে স্থান দেওয়ার শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব তাদের উপর দেওয়া হয়েছিল। আর এখানে কি সেই রকম তিনজন আগন্তুক নেই যাদের ওই হিসাবে নাগরিকত্ব দেওয়া যেতে পারে? তাই প্রসাদ না খাওয়া পর্যন্ত আমরা মন্দির ছেড়ে যেতে পারলাম না। সকলেই একত্রিত হবেন ও আমাদের সঙ্গে খাবেন। তাড়াতাড়ি ভোগ আনা হল, সঙ্গে সঙ্গে উৎসর্গ করা হল, শ্যামসুন্দরের মন্দিরের তলায় দাঁড়িয়ে যখন এই প্রসাদ পেলাম তখন গোধূলির আলো মিলিয়ে যেতে শুরু করেছিল। খড়দহের সকল ভদ্র ও সরল মানুষ, ব্রাহ্মণ ও সাধারণ লোকেরা আমাদের সঙ্গে বসে খেলেন, কারণ মনে হল সকলেই বোধহয় সন্ধ্যারতির প্রণাম জানাতে সমবেত হয়েছেন। কারও এরকম অনুভূতি হতে পারে যে "কৌপীন পরে, দণ্ড হাতে ভগবানের ভুক্তাবশেষ দ্রুত ভোজন করছেন"; অনেক সৌজন্য ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যখন এই ত্বরিত ভোজনপর্ব থেকে সরে এলাম, তখন ঘণ্টা বাজতে লাগল ও সন্ধ্যারতির দীপশিখা জ্বলে উঠল।

তারপর আলোয় আমরা নদীর বুকে নেমে এলাম। আমাদের ঘরের কাছেই ইতিহাস সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কিছুই মনে হতে লাগল, চারশ বছরেও যে জায়গা তার ব্রত ভোলেনি সেখানকার অপরূপত্বের কথা বার বার অনুভব করতে থাকলাম।

পূত-নগরী

সম্প্রতি ক্যালকাটা আর্ট গ্যালারির কমিটি একখানি চিত্র ক্রয় করেছেন। মধ্যযুগীয় ইতালির শিল্পকলা সম্বন্ধে যাঁরা কিছু জানেন তাঁদের পক্ষে চিত্রটির তাৎপর্য বিপুল।

ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার গবেষকরা এই সভ্যতার জাতীয় আদর্শের চেয়ে বরং তার নাগরিক আদর্শের প্রাণশক্তি দেখে ক্রমাগত চমৎকৃত হন। আমরা সুস্পষ্ট ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাবি মিশর, জুডিয়া, সিরিয়া, গ্রীস, ইতালি, স্পেন ও আফ্রিকার কথা ততটা নয়, যতটা মেম্ফিস, থিবেস, জেরুজালেম, তাইয়ার, দামাস্কাস, এফিসাস, এথেন্স, রোম ও কার্থেজের কথা এবং আরও হয়তো বিশ-বাইশটা শহরের কথা। শহরের এই ধারণাটির পাশে রাষ্ট্রকে যেন কেবল একটা অস্পষ্ট, পশ্চাদভূমি গোছের যোগানদার বলে মনে হয়। নাগরিক ভাবধারা অনুসরণ ইহুদী ধর্মীয় ও তার পরবর্তী ক্রিশ্চান ধর্মীয় ধারণাগুলির মধ্যেও যে প্রভাব ফেলেছে তা না দেখে উপায় নেই।

একজন ইহুদী যে কেবল একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাম উচ্চারণ করেই নিশ্চিন্তে এত কিছু বোঝাতে সক্ষম হয় তা হিন্দুদের কানে কেমন অদ্ভুত শোনায়। "মঠ থেকে সাহায্য পাঠাও ও জিয়ন থেকে শক্তি আহরণ কর।" কিন্তু এ কথা বলা শক্ত যে "মঠ থেকে সাহায্য পাঠাও ও ইন্দ্রপ্রস্থ (উদাহরণস্বরূপ) থেকে শক্তি আহরণ কর।" কিন্তু কেন? ইহুদীদের অভ্যস্ত ভাবনা এমনই ছিল যে তাদের অতুলনীয় সাহিত্যের সাহায্যে তারা প্যালেস্টাইন তো বটেই, তা ছাড়াও আরও অনেক শহরের নামকে এমন একটা প্রাণবস্তুতায় অভিষিক্ত করেছিল যে আজও পর্যন্ত ব্যাবিলন, নিনেভ ও দামাস্কাস কেবল নাগরিক গুণাবলী ছাড়াও আরও অনেক কিছু মনে করিয়ে দেয়, যেসবকে তারা কমবেশি সঠিকভাবেই ওই শহরগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দেখে। কাজেই এ খুবই স্বাভাবিক যে একজন ইহুদী ধর্মসংস্কারক স্বর্গকে তাঁর জাতির প্রিয় শহর জেরুজালেমের স্মরণে নিউ জেরুজালেম বলে অভিহিত করবেন। ইউরোপীয় মধ্যযুগের স্বপ্নদ্রষ্টারা যে সমানে স্বর্গকে এমন একটা জায়গা হিসাবে দেখান যার দেশ অথবা পিতৃভূমির চেয়ে নগর বা শহরের সঙ্গে সাদৃশ্য অনেক বেশি, সেটা তাঁদের পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এমনকি মনের বিপুল পরিসর সত্ত্বেও দান্তে ও গিয়োত্তো উভয়েই ছিলেন নাগরিক স্বপ্নদ্রষ্টা, তাই বিয়াত্রিচে যে স্বর্গের আকাশে তেমনই উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করবেন যেমন করতেন ফ্লোরেন্সে, এ জিনিস তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হত।

আলগা পাঠক একথা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেবেন যে এমন প্রবল নগর-প্রীতি ভারতে কখনই ছিল না। কারণ এমনকি বারাণসী—তিন-তিনটি ধর্মের পূতনগরী হওয়ার দরুন যার জেরুজালেমের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে সেই বারাণসীও চরিত্রের দিক থেকে নাগরিকের চেয়ে জাতীয়ই বেশি। ভারতের সকল রাজাই এর পবিত্র এলাকার মধ্যে একটি করে প্রাসাদ বানিয়েছে। এখানে প্রত্যেক

ধর্মেরই ভজনালয় রয়েছে এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অভাবই বরং অনুভূত হয়। সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয়, তীর্থযাত্রা ও গরিব ছাত্রদের দৈনন্দিন ভিক্ষার জন্ম ভিক্ষাসত্র, ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ মঠ—এ সমস্ত গোটা নগরীর প্রয়োজন মেটায়নি অর্থাৎ যথাযথ নাগরিক ধারণা অনুযায়ী নিছক আকৃসিক বিচারে যাকে নগরী বলা যায় তার প্রয়োজন মেটায় নি; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম যেসব দানসত্র তা কেবল আধুনিক কালেই গড়তে শুরু করেছে। তা সত্ত্বেও ভারতীয় চিত্তবৃত্তির মধ্যে নগর-প্রীতি ছিলই না এ রকম ঢালাও সিদ্ধান্তে আসার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতেও সকল যুগেই অনেক মহান ও মুখর নাম শোনা যেত। রাজপুতানার মরুভূমির শৈলকিরীট চিতোর নগরী সম্বন্ধে কি বলা যাবে? কি বলা যাবে দিল্লি, অমৃতসর, পুনা, কাঞ্জিভরম ও আরও শত শত নগরী সম্বন্ধে? হ্যাঁ, আরও একটি নগরীর কথাও আছে, কলকাতায় সম্প্রতি কেনা ছবিটিতে যেটি প্রস্ফুটিত, সেই অযোধ্যা?

ওই ছবিখানি আকারে খুব ছোট, দুদিকে কয়েক ইঞ্চির বেশি নয়। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার শৈলীতে আঁকা উজ্জ্বল, কোমল বর্ণবহুল। সামনে আঁচলের মত ছড়ান একদল মানুষ, বেশির ভাগই আদা রং ঘেঁষা কমলা ও হলুদ রঙে আঁকা। পিছনে শ্বেতপাথরে গড়া অযোধ্যার প্রাচীর ও বুরুজের মেলা। সেগুলির পিছনে দিগন্তের উপরে সরু এক চিলতে আকাশ।

ইতালির ম্যাডোনা ও শিশুর ছবিগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত সামনের মনুষ্যমূর্তি-গুলি তাদের কাছে সহজবোধ্য। রাজছত্রের নীচে জোড়া সিংহাসনে আসীন সীতা ও রাম। রাজছত্র আবার আসল মুক্তোয় সাজান, দেখলেই রোমান গীর্জায় বাল-দাচিনোর কথা মনে পড়ে। রামের হাতে চমৎকার অলঙ্করণে শোভিত একটি শ্বেতপদ্ম, দেবদূতের হাতে অ্যানানসিয়েশনের লিলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজার ডান পাশে তাঁর ভাইয়েরা, রানীর বাঁ পাশে তাঁর সখীরা, আর রাজদম্পতির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে হনুমান। দৃশ্যপট হল অযোধ্যার উদ্যান। পিছনের পরিখায় দেখা যাচ্ছে স্নানার্থীদের, দেখা যাচ্ছে জলক্রীড়ারত হস্তী-হস্তিনীকে, আর রাজকীয় বজরা পূর্ণ গৌরবে শোভমান।

কিন্তু পরিখার ওপার থেকে আকাশের নীল পর্যন্ত বিস্তৃত অযোধ্যার তুষারশুভ্র অট্টালিকারাজিতেই শিল্পীর সকল শক্তি নিয়োজিত। তাঁর হয়তো ইচ্ছা ছিল প্রাসাদের রূপরেখা আঁকার, কিন্তু তিনি আসলে ফুটিয়ে তুলেছেন একটি নগরকে, যে প্রাণচঞ্চল, গতিময় ও সুখমধুর। কিন্তু এ নগর স্বর্গের নগর। কোনও মানবিক দৃশ্য পৃথিবীর ও স্বর্গের মাঝে এমন স্বপ্নরাজ্য হিসাবে বিরাজ করেনি। কোন মানবিক দৃশ্য কখনও এমন নিখুঁত হয় না, যত মনোযোগ দিয়ে, খুঁটিয়ে দেখা যায় তত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে না।

চিতোর

তখন প্রায় মাঝরাত, চাঁদ প্রায় পূর্ণ হয়ে আসছে। আমরা চিতোরের দুর্গের দিকে প্রথম চাইলাম। দুর্গের নীচেকার গ্রামের আলো নেভান এবং উঁচু জাঁতাকলটি একাকী আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোমুখের কালো ফাটলের ঠিক উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাণা কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ, যেন অতীত গৌরবের সাক্ষী হিসাবে আকাশের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। আর এমনকি অন্ধকারের মধ্যেও আমরা দেখতে পেলাম দেওয়ালের বাঁকা রেখাগুলি লম্বায় তিন মাইল ও চওড়ায় এক মাইল জোড়া পাহাড়টির ঢালের সীমারেখা অনুসরণ করে চলেছে। মাইল খানেক দূরে একটা নীচু পাথরের উপর আমরা নীরবে বসলাম এবং সেখানকার দৃশ্যের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। এইভাবেই হয়তো প্রাচীনকালের কোনও রাজপুত তার যাত্রার প্রথম বা শেষ রাতে নিজের প্রিয় গৃহটির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকত। এমনকি হয়তো পদ্মিনীও তাঁর নিয়তির নগরীকে এমনি করেই প্রথম দেখা দেখেছিলেন।

চিতোর যে জন্য বিখ্যাত তার কোনও বাঁধা গল্প নেই। চিতোরের ইতিকথা যে রক্তাহীন রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ সেগুলি দীপ্তি ও চমকের এক সুদীর্ঘ পরম্পরা, শত শত বৎসর ধরে সংঘটিত। চিতোরের অতীতকে আঁকার চেষ্টা অনেকটা সমতল থেকে পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ অবলোকনের মত। বিভিন্ন পারিবারিক পতাকাগুলি গাছ ও উঁচু-নীচু পাহাড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, আবার হারিয়ে যায়। যেখানেই ইতিহাসের কুহেলীর আবরণ উন্মোচন করা হবে সেখানেই দেখা যাবে প্রাচীন কালের মেয়েদের সাহস ও গর্ব আর পুরুষের গরিমা। চিতোর শুধু একটা কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী নয়, চিতোর এক শাশ্বত প্রতীক, ভারতীয় প্রতিভার একটি পর্যায়ে হৃদয়ের মর্মস্থল।

স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে এই শহরের জাঁকজমক তার গর্বের ন্যায্যতাই প্রমাণ করে। যে পাহাড়ের উপর শহরটির অবস্থান সেটি ভিতরের দিকে ঢালু, ফলে অসংখ্য পুকুর ও অফুরন্ত জল সরবরাহ রয়েছে। প্রাচীরের ভিতরের দিকে যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তা আসলে দুটি শহরের। একটি হল উত্তর-পূর্বে, সেটি বাপ্পা রাউলের পূর্বে স্থাপিত প্রাচীন রাজধানী। আর একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেটি তৈরি হয়েছে ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্পার সিংহাসনে আরোহণ এবং আকবরের আমলে চিতোর পরিত্যাগের অন্তর্বর্তী সময়ে।

যে প্রাচীন খামার-বাড়ির বারান্দায় বাপ্পা রাউল অষ্টম শতাব্দীতে বিচার করতেন প্রাসাদ সম্পর্কে আমাদের আধুনিক ধারণার সঙ্গে তার সঙ্গতি প্রায় নেই। সামনে অনতিদূরে বিজয়স্তম্ভ ধসে পড়েছে। চতুর্দিকে কাছাকাছি মূল ভিত্তিপ্রস্তরগুলি ছড়িয়ে আছে। এই দুর্গের ভিতরকার সৈন্যদের জীবন শিবিরের জীবনের মতই অদ্ভুত ছিল।

উঁচু-নীচু পাহাড়ের উপর প্রাচীর ঘেরা চিতোরকে দেখায় যেন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত কৃশ, ধূসর সিংহের মত। সাতশ বছর আগে পদ্মিনীর বিবাহ শোভাযাত্রা বাড়ির পথে যখন শেষ বারের মত থেমেছিল তখন তার প্রহরীর চোখে চিতোর দুর্গ যেমন দেখিয়েছিল কোনও নব আগন্তুকের চোখে আজ রাতেও তেমনই দেখাতে পারে। এখনকার মত তখনও শহরের চারদিকের লম্বা পুরু প্রাচীরগুলি তাঁবুর ঢেউ-খেলান ক্যাম্বিশের মতই দেখাত। পিতার সুদূর দুর্গ থেকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শেষ পাদে সে রাতে "শোভন কমল" পদ্মিনী সামান্যই ঘুমোতে পেরেছিলেন। তিনি বরঞ্চ নিশ্চয়ই স্বপ্নময় বিনিদ্রতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়েছিলেন, আগামীকাল যে দুর্গে বধূ ও রানী হিসাবে প্রবেশ করবেন তারই মিনার ও বুরুজে আঁকা শত সহস্র কাহিনী স্মরণ করছিলেন। তাঁর ভিতরে ছিল সেই ভারতীয় স্ত্রীর আত্মবিশ্বাস, যে নিজেকে এক পুরানো কাহিনীর একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু বলেই মনে করে, এমন একটি সুতোকে আবার তুলে ধরেছে বলে মনে করে যা কিছুকাল আগেও ধরা ছিল, কেবল মৃত্যু এসে ফেলে দিয়েছিল। এই প্রথমবার নয় যে তারা একত্রে আগামীকালের জীবন উপাখ্যান শুরু করবে, এ হল আত্মার সুপ্রাচীন সাথীত্ব; গৌরবময় গৃহপ্রবেশের পথে ভবিষ্যৎ দর্শনের ছায়া এসে পদ্মিনীকে কি কুণ্ঠিত করেনি, ক্ষণতরে কি তাঁর গতিরোধ করেনি? মহত্বের যে বিয়োগান্ত পরিণতি তাঁর সামনে আসছে সে সম্বন্ধে কোনও চারণকবির চাপা স্বর কি তাঁর দোলায় পৌঁছয়নি? পদ্মিনী কি জানতেন যে বাতাস যতকাল চিতোরের উপর বিলাপ করবে ততকাল তাঁর নাম কীর্তিত হবে, জগতের স্মৃতিতে চিরকাল এখানকার প্রতিটি পাথর, প্রতিটি গৃহের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে থাকবে? যা ঘটবে তা তাঁর কাছে কেবল রাজপুত সম্মানের পথ অনুসরণ মাত্র। বরাবর কি একথা শোনা যেত না যে জন্মের সময় ছেলের চোখ থাকে ছুরির উপর, আর মেয়ের চোখ থাকে দীপের উপর, কারণ পুরুষকে তরবারির আশ্রয়ে বাঁচতে হবে, আর নারীর আশ্রয় আগুন?

একটি ভারতীয় মাদুলি

এখন আমি লিখছি, আমার পাশে রয়েছে বিবর্ণ পুরনো ব্রোঞ্জের হৃদপিণ্ড আকৃতি একটি ভারী অলঙ্কার, অদ্ভুত রমণীয় দুটি ময়ূর খোদাই করা। ময়ূর দুটি তাদের মাঝখানে রাখা মামুলি ধরনের তুলসী পাত্রের মত একটি পাত্রের মধ্যে ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাচ্ছে। এর মূল্য মাত্র কয়েক ফার্দিং। জিনিসটা কেনা হয়েছিল হয়তো একটু বেশি দামে, বিক্রি করা হয়েছিল নিশ্চয়ই আরও কম দামে। এমন লোকেরাই এ মাদুলি পরে যারা তাদের অভাবী জীবনে রুপোর জিনিস কেনার পক্ষে প্রয়োজনীয় কয়েক শিলিংও খরচ করতে পারে না।

দামে যতই সস্তা হোক না কেন কোনও কালে এই ভারতীয় মাদুলি হয়তো বংশানুক্রমিক সম্পত্তি ছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মায়েরা কাজে বেরোবার সময় থেকে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা পর্যন্ত পরে থাকত; পরিশ্রম ও বিশ্রামের সময়ে সমভাবেই পরে থাকত। বারবার হয়তো বিয়ের সময়ে ছোট্ট মেয়েটিকে দিত অথবা নববধূ ঘরে এলে দিত। হার বা মুক্তার মালা যাতে ওটা ঝোলান থাকত সেটিকে বৈধব্যের তিক্ত সময়ে নারী চিরকালের মত খুলে ফেলত অথবা তার বিমর্ষ পুত্র বা কন্যা মৃত মাকে গ্রামের শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ভক্তিভরে সেটি খুলে রাখত। কারণ এই সরল গ্রাম্য অলঙ্কারটি বর্তমান কালের নয়, সে আর এক কালের। এই অলঙ্কারটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন শিল্প থেকে কলাকে কোনও বাঁধাধরা রেখা দিয়ে ভাগ করা যেত না; প্রয়োজনীয় সব জিনিসই কায়িক শ্রম দিয়ে তৈরি করতে হত, স্রষ্টার উৎসাহ তার কাজকে সীমাবদ্ধ করে রাখত, সম্পত্তি তখন তাড়াতাড়ি বদলান যেত না, এমন শক্ত করে সেগুলিকে তৈরি করতে হত যাতে যুগ যুগ ধরে সঞ্চয় করে রাখা যায়। এক শতাব্দী আগেকার ইউরোপের খামার-বাড়িতে পিতলে আর ওকে ঝকঝকে রান্নাঘর, সুদক্ষ আঙুলে একটি একটি বোনা ভারতের কাশ্মীরী শালের পাড়, আর আমার এই মাদুলি—ধাঁচ ও উৎপত্তির দিক থেকে এগুলি আধুনিক নয়, মধ্যযুগীয়।

মাদুলির যা মনে আছে সেসব গোপন কথা যদি সে বলতে পারত কত কথাই না শুনতে পেতাম! শিলাও নামে যে গ্রাম থেকে এটা এসেছে সেখানকার প্রথা অনুযায়ী এর স্থান হল গ্রাম্য কুমারীর হৃদপিণ্ডের উপর। এইভাবে বছরের পর বছর এ সেখানেই কাটিয়েছে, কত কিছু না এ শুনেছে—সেইসব জিনিস যা হয়তো একটুখানি দম আটকে আসা, নাড়ীর স্পন্দন একটু দ্রুত হওয়ার ভিতর দিয়ে নীরবে কথা কয়, স্ত্রীর সুখ আর মায়ের উদ্বেগের দীর্ঘ মধুর কাহিনী, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সম্পদের সাফল্য; তন্ময়তা ও অন্তর্দৃষ্টির মুহূর্তগুলি, কোনও মন্দিরে মূর্তির সামনে প্রণত হওয়া অথবা গোধূলি বেলায় ঘরে ফেরা গরুর পালের দিকে চেয়ে থাকা—এ সবের কত কিছুই না তার জানা! কথা কইতে পারলে কত কিছুই না এ খুলে ধরত!

তা সত্ত্বেও এমনভাবে ও এমন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গল্পটি বলা হয় যাতে আশ্চর্য পরিচিত লাগে। কারণ এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে কোনও দুটি গ্রামের একটি যদি ভারতীয় ও আরটি ইংরেজ বা ইতালীয় হয় তাহলে তাদের মানুষদের মধ্যে দূরত্ব কতখানি। বাইরের দিক থেকে দেখলে অবশ্য তাদের পার্থক্য খুবই লক্ষণীয়, একটাকে আর একটা বলে ভুল করার উপায় নেই। শিলাও নামে পরিচিত বিহারের প্রাচীন গল্পটিকে প্রথম যখন দেখেছিলাম সে কথা এখনও আমি ভুলতে পারিনি। বিহার প্রদেশটাই কেমন চিত্তাকর্ষক। ব্রিটানিতে পরিব্রাজকরা শুনে থাকবেন যে কৃষকরা বলছে "ফ্রান্সে যাচ্ছি," একইভাবে বিহার যদিও বাংলারই একটি অখণ্ড অংশ তবু ওখানকার লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটনদের মত মনোভাব দেখায়, তারা গাঙ্গের উপত্যকাকে বিদেশ বলে মনে করে। প্রাচ্য অর্থে শিলাও সত্যিই প্রাচীন। একটি ছোট্ট শহর, মাটির তৈরি। তবু এ খুবই সম্ভব যে এখানকার খৈ সাড়ে তিন হাজার বছর আগেও আজকের মতই প্রসিদ্ধ ছিল। ইতিহাসের মঞ্চে এই গল্পের প্রথম আবির্ভাব অন্তত অতকাল আগেই বোধহয় হয়েছিল। এখানকার ধুলোও স্মৃতিতে ভরপুর। নালন্দার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বড়গাঁও এবং বাংলাদেশের রাজাদের প্রাক-অশোক রাজধানী রাজগীরের মাঝখানে কালজীর্ণ রাজপথের উপর ধানের ক্ষেতের দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামলিমায় ঘেরা এই গ্রামটি। হাড়িকাঠের জন্য রওনা হওয়া বিরাট বিরাট পাঁঠার পালকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আগেই বুদ্ধ নিশ্চয়ই এ গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কিংবদন্তী অনুযায়ী খোঁড়া ছাগলছানাটিকে তুলে তিনি নিজের কাঁধে বহন করেছিলেন যাতে সে তার পালের সঙ্গে তাল রাখতে পারে। এমনকি এখনও প্রায়ই শিলাও-এর কাছাকাছি রাস্তায় এ রকম সহৃদয় রাখাল দেখা যায়, আরও ভাল দেখা যায় আরও কয়েক মাইল আগে আধুনিক রাজগীর গ্রামের বাইরে। সেখানে রোজই ভোর থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত শত শত গোরু, মোষ, ভেড়া-ছাগলের গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়কার ক্ষুরের শব্দ ক্রমাগত শোনা যায়, উষ্ণ প্রস্রবণ সমন্বিত সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে তারা যায় পাহাড়ের পাশে ও পুরানো রাজগীরের ধ্বংসাবশেষের উপরকার গোচারণভূমিতে। আর এখানে আবার বিকেল গড়িয়ে যখন গোধূলি বেলা আসে তখন দেখা যায় পশুর পাল ঘরের দিকে ফিরছে, অথবা আরও পরে ছোট নদীটির তীরের উঁচু পাথরের উপর থেকে রাখালের ডাকে সাড়া দিয়ে দু-একটা গোরু ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে আসছে। তখনই হয়তো লোকে খুশি হয় কোনও একটি পিছিয়ে-পড়া রাখালকে দেখে, দ্রুত বিলীয়মান গোধূলির আলোয় তার শরীরটা সাধারণের চেয়ে বড় দেখাচ্ছে, দেরী না হয়ে তার উপায় নেই, কারণ একদিকে খোঁড়া ছাগলটিকে কাঁধে নিয়েছে, অপরদিকে অন্ধকার হয়ে আসা পথ দিয়ে ক্লান্ত মাকে আদর করে ধরে ধরে নিয়ে চলেছে।

পুরুষদের মত মেয়েরাও রাখালের কাজ করে। গ্রামের এইসব হিন্দু মেয়েরা মাথায় লম্বা, তাদের চলনভঙ্গি স্বচ্ছন্দ, তারা অতি নম্র আর অত্যন্ত বেশি গর্বিত। যদিও তারা কৃষক তবু তারা যে সুন্দরী ও মর্যাদার অধিকারিণী তা বোঝার পক্ষে

তাদের সাজপোশাকই যথেষ্ট। কারণ এখানে এমন বিধবা মোটেই পাওয়া যাবে না যে বাংলাদেশের উঁচু জাতের বিধবাদের মত একেবারে সাদা কাপড় পরে আছে। বিহারে শাড়ির পছন্দসই রঙ হল সবুজ, গাঢ় লাল ও উজ্জ্বল লাল—ওই লম্বা-চওড়া শাড়িটি ভারতীয় নারীদের প্রধান পোশাকও বটে, ঘোমটাও বটে। মোটা, গায়ে লেপ্টে থাকা সুতীর কাপড়টি মাথার উপর দিয়ে ঘুরে কোমরে এসে স্কার্টের মত ঝোলে, সে কাপড়ের সর্বাঙ্গে বড় বড় ফোঁড়ের সুন্দর সুতোর কাজ, আনারসী বা তালপাখার মত নক্সা কাটা—ভারতীয় অলঙ্করণের যেগুলি বিশিষ্ট উপাদান। কোথা থেকে ও কেন এ নক্সা এল এই মেয়েরা তা বহুকাল হল ভুলে গিয়েছে। রাজকীয় উষ্ণীষের উপরকার বিশেষ চিহ্নস্বরূপ মণিটির সঙ্গে তাদের ওই পছন্দসই নক্সার যোগাযোগের কথা তারা স্বপ্নেও ভাবে না। তবু এটা অসম্ভব নয় যে এই নক্সাটিকে তাদের বরাবর ব্যবহারের ভিতর দিয়ে এই কথাটিই চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে যে খ্রীষ্ট-জন্মের ছ'শ বছর কিংবা হয়তো হাজার বছর আগে রাজগীর ছিল রাজার শহর।

ছোট্ট কাঁচুলীটিও আপন কায়দায় শাড়ির মতই সুন্দর। কাঁচুলির রঙ প্রায়ই হয় ঘোর নীল, আর কিনারায় থাকে উজ্জ্বল লাল। বুক ঢেকে কাঁচুলী গলার কাছ থেকে অনেকটা নেমে আসে, যাতে শাড়ির কুঁচির মাথাটি ঢেকে যায়, ঘাড়ের পিছনে যাতে মাথাটা মুক্ত থাকে, আঁট-সাঁট হাতা কেবল কনুইয়ের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছায়। সবার বড় সৌন্দর্য অবশ্য এর ঋজুতায়; প্রাচীন কালের পোশাকে কাট-ছাঁট খুব অল্পই থাকত। গ্রীক কিটন, জাপানি কিমোনো, হিমালয়ের চোগা আর উত্তর ভারতের এই জামা ও শাড়ি কাপড়ের ঋজুরেখার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল, আমরা যাকে পোশাক তৈরি বলি দেহ-রেখার খাঁজ অনুযায়ী সেই রকম কাট-ছাঁটে কাপড়ের ঋজুতাকে খর্ব করতে দিতে তারা মোটেই রাজি নয়। কাজেই এই বিহারী ব্লাউজ চার টুকরো কাপড়ে তৈরি; ফাসান-দুরস্ত পোশাক নির্মাতাদের ভাষায় সামনে ও পিছনে একখানা করে দুই আড়, আর এক এক বগলের তলায় আধখানা করে আড় —আর তার প্রত্যেকখানাই ঋজু। কিন্তু ভিতরে দেহসৌষ্ঠব কি কমনীয় ও লাবণ্যময়! উজ্জ্বল রঙের ঘোমটার ছায়ায় পিঙ্গলাক্ষীর কালো মুখখানি কি অপরূপ সুন্দর!

শিলাওতে এই আমরা প্রথমবার এলাম। আমরা বাজারের ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে তিনটি রাস্তা এসে মিশেছে। আমাদের গাড়িটি গ্রামের পথ দিয়ে সশব্দে এগোচ্ছিল, পুরানো একটা পিতলের জিনিসের দোকান পেরোলাম, আমার ভারতীয় বান্ধবী হয়তো এক সময়ে আমারই মত শহর থেকে এসে এই দোকান থেকেই মাদুলি কিনে আমায় দেবে। তারপর পেরোলাম গ্রামের স্কুল, সেখানে বারো কি পনেরটি উস্কোখুস্কো মাথা ছেলে মেঝেটাকেই শ্লেট হিসাবে ব্যবহার করে প্রাথমিক লেখাপড়া শিখছিল; তারপর এল ময়রার দোকান, সামনে পিতলের পাত্রে কাটা মাছ আর ময়ূরের সারি ঝুলছে, যেন এগুলিই তার সাইনবোর্ড। আমরা সবচেয়ে ভিড়ের রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। তারপর রাস্তার কিনার দিয়ে এক ঝটকায়

ডানদিকের পথে মোড় ঘুরলাম। যে রাস্তাটা পেরিয়ে এলাম সেখানে কয়েক পা ঘুরে চোখে পড়ল একটি মেয়েকে। লম্বা, তারার মত চোখ ও রানীর মত ভাবভঙ্গি। বয়স আঠার কি বিশ হবে। পরনে সবুজ শাড়ি। আকাশ ও মন্দিরের প্রেক্ষাপটে সে দাঁড়িয়ে আছে শিশুর মত সরল চাহনি মেলে, তাকে যে কেউ দেখেছে সে সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন। দুহাতে তার দুগাছা শাপলার লম্বা ডাঁটা, সাদা কুঁড়িদুটি যেন দু' কাঁধে ঘুমিয়ে আছে।

অতএব কেনা-বেচা ও খাওয়া-পরাই শিলাওয়ের জীবনযাত্রার সবটা নয়। এ হল আর একটা প্রমাণ—কেউ কি এমন বোকা আছে যার আরও প্রমাণের দরকার, যে প্রকৃতির সৌন্দর্য ক্ষেত-খামারের ও বনের মানুষেরা যেমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে তেমন করে শহর থেকে আসা কোনও কবিও পারে না। ওই শাপলা কলিগুলি ধানক্ষেতের মাঝখানকার পুকুর থেকে বড়জোর ঘণ্টাখানেক হল সংগৃহীত হয়েছে। কৃষকের জগতে এরা সবচেয়ে সাধারণ বন্য বস্তু, তারা একে "চাঁদের প্রণয়নী কুমুদিনী" বলে ডাকে, সূর্যের পদপাত যে জাগ্রত দৃষ্টি মেলে অনুসরণ করে সেই পদ্মরানীর মত এরা নয়, এরা রাত হলে ফোটে। আর এখানে এমন একজন এ ফুল বেচছে যে তাদের সোনার হৃদয় দেখেছে ও তাদের লাবণ্যের খোঁজ রাখে, আর সে বেচবে এমন কারও কাছে যে দূরের মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ও প্রার্থনা করতে ব্যগ্র। শাপলা ফুল হাতে সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটি কর্মব্যস্ত বাজারে প্রভাতী পূজার আহ্বানের নীরব প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতীয় গ্রামের স্থিরচিত্ত ও সরল জীবন জানা ও অজানার মাঝখানে দৃঢ়মূল!— আমার মাদুলি কি আমাকে সেই কথাই বলত? হয়তো বহুদিন হল পরলোকগত আর এক কৃষক রমণীর কাছ থেকে কি এই বাণীই আসছে যে যদি পারত তবে মাদুলির ভিতর দিয়ে সে এই একই কথাই বলত পুরোহিত, মন্ত্র ও গুরু সম্পর্কে, আর কোনও ভারতীয় গ্রামের ছায়াচ্ছন্ন, কুমুদে আকীর্ণ, শীতল সেই ক্ষুদ্র ভজনালয়টি সম্পর্কে, যেখানে প্রভাতী পূজার আয়োজন হয়?

গোপালের মা : খ্রীষ্ট-শিশুর মাতা

ভারতীয় ভাষাগুলি আদরের সংক্ষিপ্তরূপে আশ্চর্যরকম সমৃদ্ধ, এই সংক্ষিপ্ত রূপগুলি পরিবেশের সঙ্গে এত সংশ্লিষ্ট যে তার অনুবাদ অসম্ভব। যথা, তিন বছরের একটি মেয়েকে যদি মা বলে ডাকি, কিংবা ওই বয়সের ছেলেকে যদি বাপ বলে ডাকি তা হলে তার মধ্যে দিয়ে আমরা গাম্ভীর্য ও আনন্দের যে সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ বোঝাতে চাই তা সম্পূর্ণ গলার স্বরের তফাতের ব্যাপার, বিদেশী ভাষায় তা অনুবাদ করাই যাবে না। এই শ্রেণীর সবচেয়ে লক্ষণীয় শব্দের একটি হল গোপাল। আক্ষরিকভাবে এর মানে হল রাখাল, ব্যবহৃত হয় কৃষ্ণকে, বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে বোঝাতে। কিন্তু সেদিক থেকে কথাটি এত লাগসই যে ইংরেজিতে এর প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যায় "ক্রাইস্ট-চাইল্ড" বললে। আর যে নারীটি গোপাল বলে ডেকে তার শিশুপুত্রটিকে কোলে তুলে নেয় ইংরেজ মায়েদের মধ্যে তার সঙ্গে তুলনীয় কেবল সেই মা যে নিজের সন্তানকে মনে করে সেই খ্রীষ্ট-শিশু, যিনি অন্ধকার ও ঝড়ের মধ্যে আপন জনের সন্ধানে তার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। এই অর্থে এ নাম আমাদের ঘরে ঘরে শোনা যায়। কারণ আমাদের জেনানার একটি ঘরে এক বৃদ্ধা বাস করেন, গোপালের মা অর্থাৎ খ্রীষ্ট-শিশুর মাতা—এই নামেই তিনি পরিচিত।

* * *

সারা রাত ধরে আমরা মৃত্যুপথযাত্রীনীর কষ্টদায়ক মন্থর শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করছিলাম। নিঃশ্বাস অতি ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকছে, ক্রমে ক্রমে আরও নিথর হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন ওই বুড়ো হাড়ে আর নড়াচড়া দেখা যাবে না, কিন্তু তারপর আবার প্রশ্বাসের মুক্তি, সঙ্গে সঙ্গে আবার গভীর নিঃশ্বাস টানা। লোকে বলে এ ধরনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কচিৎ দেখা যায়। এ বহুদিনের প্রাণায়ামের ফল। জপের মালার রুদ্রাক্ষের পর রুদ্রাক্ষ পেরিয়ে দিবারাত্র "গোপাল, গোপাল, গোপাল" ইষ্টনাম জপতে জপতে বৃদ্ধা এ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অচেতনভাবে অভ্যাস করেছেন।

যাঁর শয্যাপার্শ্বে আমরা বসেছিলাম তিনিই হলেন গোপালের মা, সেই সন্ন্যাসিনী, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে আপন মায়ের মতন দেখতেন।

সারাজীবন যেমন কোনও চাহিদা না নিয়ে কাটিয়েছেন তেমনিই তিনি এখনও শায়িতা, যে চিন্তায় সমগ্র জীবন আচ্ছন্ন ছিল তাতেই চিত্ত স্থির হয়ে রয়েছে, অন্তিম মাধুর্য ও শান্তিতে মুখখানি পরিপূর্ণ। গঙ্গাতীরে শয়ান অবস্থায় একদিন, একরাত্রি ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে। পূর্ণচাঁদের উদয়ের মুহূর্তে তাঁকে নিয়ে আমরা দরজার বাইরে এসেছি, অনুভব করেছি প্রথম বহিরাচ্ছাদন ছিঁড়ে অর্থাৎ ঘরের খোলস ভেঙে ঊর্ধ্বলোকের উদ্দেশ্যে তাঁর আত্মার নিঃশব্দ জয়যাত্রার শুরু। কিন্তু ঘাটে পৌঁছে ঠাণ্ডা হাওয়া ও উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে আবার তিনি খানিকটা সামলে উঠেছেন, অনেক মৃত্যুপথযাত্রীর ক্ষেত্রেই যেমন হয়ে থাকে।

চূড়ান্তভাবে নির্বাপিত হওয়ার আগে জীর্ণ খোলের মধ্যে জীবনপ্রদীপ আরও বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে জ্বলছে।

তাঁর এ শয়ন হয়তো পুরো অচেতনায় নয়। কারণ কখনও কখনও কাউকে যেন চিনতে পারছেন, দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছেন। গতকাল ভোরে যখন একজন ব্রাহ্মণ উপনিষদ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন তখন তিনি যে সাড়া দিচ্ছিলেন তা তাঁর প্রায় উত্তেজিত অবস্থা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। সারা জীবন ধরে তিনি দেব-শিশুর ধারণাটিকে পূজা করে এসেছেন, এখন এই নব্বই বছরের উপর বয়সে মৃত্যুশয্যায় যে তাঁর জীর্ণ কাঠামো আবার শৈশবে ফিরে গিয়েছে তার মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিছু আড়ামোড়া ভাঙা কি একটু মাথা ঘোরান, একমাত্র এই নড়াচড়াটুকুর মধ্যে দিয়েই তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ হচ্ছে।

কিন্তু এও কিছুক্ষণ আগেকার কথা। এখন রাত্রি নামার পরে আবার বহুক্ষণ হল তিনি নিথর হয়ে আছেন, সমস্ত চেতনা অন্তর্মুখী হয়ে গিয়েছে এবং চারপাশের দুনিয়ার কাছ থেকে যার কোনও চাহিদা নেই তেমন এক শান্তি বিরাজ করছে।

তাঁকে ঘিরে জমায়েত মেয়ের দল আমরা গঙ্গার ঘাটের শেষ পৈঠাগুলোতে গঙ্গার মৃদু আছড়ে পড়া দেখতে পাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম বর্ষার হাওয়ার চাপা বিলাপ, দমকা হাওয়ায় গঙ্গার জলে মাঝে মাঝে ঢেউয়ের আওয়াজ। একবার, সেটা কি মধ্যরাত্রে, না তার দু-এক ঘণ্টা পরে?—একবার মেঘ-ঢাকা চন্দ্রালোকে নৈঃশব্দ্য ভেদ করে ঘূর্ণি তুলে নদীর জল ছুটে এল, গঙ্গার উপর নোঙর করা নৌকাগুলোতে ঠোকাঠুকি লাগল, চারদিকে আওয়াজ উঠল "জোয়ার আসছে।" যাদের কাছে ওই মৃত্যুপথের পথিক আত্মা বন্ধু ও গুরুস্থানীয় তারা, আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, কারণ জোয়ার এসে আমাদের কি সাবধান করে দিল না যে তিনি চলে যাচ্ছেন, তাঁর গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন আর তাঁকে পাবে না?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, তবু কোনও পরিবর্তন নেই। যারা কিছুটা বিশ্রাম পেয়েছে তাদের কেউ কেউ উঠে রোগিণীকে একটু-আধটু শুশ্রূষা করছে, অন্য কেউ কেউ একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় শুয়ে পড়ছে। হঠাৎ একটা সাড়া পড়ল, কোমল ছোঁয়ায় নিদ্রিতাদের জাগিয়ে দেওয়া হল। একজন বলল "শববাহকদের ডাক, শেষ এসে গিয়েছে।" শববাহকেরা ঘাটের সিঁড়ির উপরকার চাতালেই সারারাত বসেছিল, তন্ময় হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল অতীতের কথা, সেইসব জীবনের কথা যাঁদের সঙ্গে এই মৃত্যুপথযাত্রী জীবনের যোগাযোগ ছিল। কাজেই তাঁদের সহজেই ডাকা গেল। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই মুমূর্ষু দেহটিকে খাটে তোলা হল, তারপর সাদা ও হলুদ পোশাক পরা বাহকেরা কাঁধে করে উত্তরের ঘর থেকে দ্রুত দেহ নিয়ে কয়েক সিঁড়ি নেবে গেলেন, এমনভাবে রাখলেন যাতে গোপালের মা গঙ্গার পবিত্র জলে পা ডুবিয়ে থাকতে পারেন।

যেখানে তিনি শয়ান হইলেন, শেষ নিঃশ্বাসগুলি সহজভাবেই পড়তে লাগল। একজন সন্ন্যাসী, যাঁকে তিনি শিশুকাল থেকে জানতেন, ঝুঁকে পড়লেন তাঁর দেহের

উপর, কপালে কপাল ঠেকিয়ে আধ-স্ফুট আধ-অস্ফুট স্বরে সেই "ওঁ, গঙ্গা নারায়ণ, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম জপতে লাগলেন, যা হিন্দুর শেষ মুহূর্তের অতিপ্রিয় নাম। আর এক মুহূর্ত পরেই সমবেত সকলে সমস্বরে "হরিবোল" বলে উঠলেন, কারণ শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। গোপালের মার আত্মা মুক্তি পেয়েছে, পড়ে আছে শুধু দেহের আবরণ।

খাটের মাথা থেকে একজন মেঘের আড়াল থেকে আভাসিত আকাশের দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন "ভোর হল কি?" পায়ের দিক থেকে জবাব এল "হাঁ, ভোর হয়েছে।" নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম যে ঢেউ এতক্ষণ পা ধুইয়ে দিচ্ছিল সে সরে গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কয়েক ইঞ্চি নীচে নেবে গিয়েছে। ভাঁটা শুরু হওয়ার ঠিক মুখে সত্যিকারের ব্রাহ্মমুহূর্তেই মারা গেলেন গোপালের মা।

ভারতীয় অ্যাশ বা রোগহর গাছ

পদ্ম, অলিভ ও অ্যাশের নাম কি রহস্যময় প্রাচীনতা মাখা! নামগুলি শুনলেই মনে ভেসে ওঠে প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। গ্রীকরা প্রতিটি গাছে যে সব বনদেবীদের দেখত তারা যেন আজও এদের প্রতিটি অক্ষরে ভর করে আছে। এরা আমাদের সেকালের পুকুর ও সমুদ্র-বাসিনী জলবালাদের যুগে নিয়ে যায়। এককালে মানুষের কাছে প্রকৃতি ছিল কিছু বৃহৎ মধুর অস্তিত্বের পরিচ্ছেদের মত, প্রকৃতির মধ্যেই তারা বাস করত, শ্বাস-প্রশ্বাস নিত। হায়রে, সেসব দিন কবে গত হয়েছে। আইরিশ এল্ডার ও পার্বত্য অ্যাশ গাছ এখনও প্রায় নব-প্রস্তরযুগের যাদু রক্ষার কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু রহস্যময় আশীর্বাদ দিয়ে তার গ্রাম রক্ষা করবে বলে এখন তার কেউ মনে করে না। অলিভ আজও প্রাচীন কালের মতই ফল দেয়, তেল দেয়, কিন্তু এথিনী যেসব হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিলেন সেখান থেকে তিনি আজ অন্তর্হিতা। ভারতেই কেবল প্রাচীন ভাবনা বেঁচে আছে। এখানেই রোগহর নিমগাছের তলা দিয়ে যেতে গিয়ে এখনও মেয়েরা গলা নামায়, মাথা নোয়ায়। এখানে এখনও নিমগাছের গোড়ার মাটি নিরাভরণ প্রজাবেদীতে পরিণত হয়, এক টুকরো পালিশবিহীন খুঁচোল পাথর উঁচিয়ে থাকে সকল প্রাণীর সেই মহাজননীর প্রতীক হয়ে, শাখা-প্রশাখার তলায় রোদের হাসিমাখা জায়গাটুকু যাঁর সোনালী সবুজ ঘর।

আমরা যদি উদ্ভিদবিজ্ঞানীসুলভ কোটি-বিভাগকে মানদণ্ড হিসাবে না ধরি, সাধারণ লোক যা দিয়ে চেনে সেইসব চোখে পড়া মিল দিয়ে বিচার করি, তা হলে হয় তো মনে করতে পারব যে ফার্ণের মত পাতা, ছোট ছোট সোনালী সবুজ ফল-ওয়ালা পালকের মত শাখা-প্রশাখা ও সুদূরপ্রসারী মূল সমন্বিত গ্রন্থিবহুল ছিপছিপে নিমগাছ গ্রীষ্মমণ্ডলে উত্তর ইউরোপের অ্যাশ অথবা ভূমধ্যসাগরীয় অলিভের সমগোত্রীয়। সেলটিক পুরাণে, আরও বেশি করে নর্স পুরাণে অ্যাশ গাছের অত প্রাধান্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের কেউ কেউ বিভ্রান্ত বোধ করে থাকতে পারে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ইগড্রাসিল, অর্থাৎ শাশ্বত বৃক্ষ কেন এক অ্যাশ গাছ হতে গেল, যার মূল থাকবে অতীতে, কাণ্ড থাকবে বর্তমানে আর পত্রকিরীট থাকবে ভবিষ্যতে? আদি মানব আসকর-এর সে গাছেই জন্ম হল? অ্যাশ এমন অবিরল দেখা যায় না যার দরুন এর ব্যাখ্যা মেলে। যে সব দেশে অ্যাশ পবিত্র সেখানে বীচ বা ওকের মত অ্যাশের জঙ্গল হয় না। একথা যেমন আমাদের জানা আছে যে যারা তাদের ছেলেমেয়েদের "আসগার্ড-এর স্বপ্ন" শিখিয়েছিল সেই মানুষেরা উত্তরে এসেছিল পুরানো বাণিজ্য পথ বেয়ে, সম্পদ, বিলাস ও সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ এশিয়ার সুন্দর শহরগুলি, যথা নিনেভ ও ব্যাবিলন থেকে, তেমনি এ সিদ্ধান্তেও না এসে আমরা পারি না যে অ্যাশ যে এই গুরুত্ব অর্জন করেছিল তার কারণ অন্যত্র যে গাছের সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল অ্যাশকে তারা সেই গাছ

হিসাবে চিনেছিল। এই যুক্তি অবশ্য ততক্ষণ সম্পূর্ণ হতে পারবে না যতক্ষণ না পারস্যে অনুরূপ গাছ আবিষ্কৃত হয় ও তার সঙ্গে সংশিষ্ট, লোক-গাথার অনুশীলন হয়। কারণ ইউরোপে অ্যাশ প্রধানত ব্রোঞ্জ যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যে যুগে ঘোড়া এল ও ঘোড়াবলি চালু হল; আর এর রাষ্ট্রিয় আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে ওঠার ব্যাপারটার চাবিকাঠি খুঁজতে হবে মেসোপটেমিয়ায়—দুই প্রধান রাজপথের সংযোগে যেখানে নিনেভ ও ব্যাবিলন গড়ে উঠেছিল সেইখানে এবং পারস্য ও এশিয়া মাইনরের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে। এইসব দেশে ইসলাম ধর্ম যদি ভারতের ইসলাম ধর্মের মত হয়, অথবা আরও দূরপ্রাচ্যে বৌদ্ধধর্ম যে প্রভাব ফেলেছিল এখানকার ইসলাম যদি সে প্রভাব ফেলে থাকে, তাহলে তার অনেক কিছু সমাজের নীচুস্তরে সংরক্ষিত আছে যা উচুস্তরের স্বীকৃতি কখনও পায়নি; তাছাড়া সূর্য-উপাসনা—যে সূর্যের কাছে বরাবর ঘোড়া বলি দেওয়া হত ও একটা বিশেষ পবিত্র গাছের মধ্যে যোগাযোগ কি ছিল সে সম্বন্ধেও অনেক কিছু আবিষ্কার করার আছে। এই যোগাযোগের একটা রেশ বাংলার কায়স্থদের* মধ্যে এখনও রয়ে গিয়েছে। তারা রবিবারে নিমের পাতা বা ডাল ভাঙে না, কারণ তারা বলে যে রবিবারেই নিমগাছ ও গোরুর জন্ম হয়েছিল। আর এমন অনেক লোক আছে যারা যদিও মহামাতৃকার পুজো করে কিন্তু তারা মায়ের বিশেষ রূপ শীতলা দেবীর সঙ্গে ছাড়া আর কোনও ভাবে মায়ের অস্তিত্বকে নিমগাছের সঙ্গে জড়ায় না।

এই ভারতীয় অ্যাশ গাছের স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও রোগ-হরণের অনেক আশ্চর্য গুণ আছে। এর পাতা ওষুধ ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রোজ এর পাতা খানিকটা করে খেলে মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে, সঙ্গে দুধ খেলে দুই মিলে প্রচুর ও ক্ষুধানিবারক খাদ্য হয়ে ওঠে। ছোট ছোট অলিভের মত এর তিতো ফলগুলি অত্যন্ত গরিবদের প্রদীপের তেল ও মলম যোগায়। নিমগাছের শাখা-প্রশাখার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বাতাস স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর; তাই কলকাতায় একটা প্রাচীন প্রথা আছে বাড়ির পূর্বদিকে নিমগাছ পোঁতার যাতে জ্বরের বাতাস ঘরে ঢুকে প্রিয়জনদের আক্রমণ করার আগে নিমগাছ তার বিষ হরণ করতে পারে। একসময়ে যে মারাঠা ডিচ শহরকে বেষ্টন করেছিল, এখন যা সার্কুলার রোড, তার দুধারে এখনও নিমবীথিকার রেশ দেখা যায়—কারণ শহরেই তো বাচ্চাদের বাস। আর শেষত নিমগাছ যখন বুড়ো হয়ে যায় তখন নাকি তার ভিতর থেকে নিমদুধের রজত-শুভ্র ধারা বেরোয়। বেশ কয়েক মাস ধরে মাঝে মাঝে এই দুধ বেরোয়। চার পাশের গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষ জড়ো হয় দেখতে। এই

* কায়স্থ হল হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণের নীচে দ্বিতীয় বর্ণ। কিছু লোক মনে করে যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় থেকে এসেছে ও নামটা আসলে বিকৃত হয়েছে; তাদের কথা সত্যি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মাতৃভাষায় পাণ্ডিত্য দরকার যেসব বৃত্তিতে তার সবগুলিতেই কায়স্থরা আছে। প্রশ্ন হল: তাদের আসল উৎস কি? সে কি পারসিক?

মহামূল্য দ্রবের প্রতিটি বিন্দু আহরিত হয় ও সঞ্চিত হয় রোগ নিরাময়ের জন্য। তারপর পুরুষের পর পুরুষ এই অলৌকিক নিঃসরণ নিয়ে আলোচনা করে।

ইতিহাসের প্রত্যূষের বহু আগে থেকে কালের অন্ধকারময় যুগ থেকেই ভারতের সাধারণ মানুষের এই সব কতকগুলি সুবিদিত অনুষঙ্গ চালু রয়েছে। দুটি বা তিনটি পবিত্র গাছ রয়েছে যেগুলি সবই নিঃসন্দেহে সুপ্রাচীন। নীচু জাতের মুসলমান মেয়েরা বো অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষবাসী রোগহর আত্মার পুজো দেয়, অশ্বত্থ আবার বৌদ্ধ যুগের পবিত্র গাছ। ওই প্রথা হয়তো দীর্ঘকাল আগে, প্রাক-বৌদ্ধ যুগ থেকে চালু পুজার্চনার রেশ। অথবা ভারতে ইসলাম যে সরাসরি বৌদ্ধ ধর্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে এই সর্বজনিক বিধানেরই এ আর একটা উদাহরণ মাত্র। ওড়িশায়, ছোট-নাগপুরে ও বারাণসীর কিছু কিছু জেলায় আবার একেবারে আদিবাসীরা পলাশ গাছে অনুরূপ পুজো দেয়। পলাশ গাছের রিক্ত শাখার ঘোর লাল পাখার মত ফুল ধরে, তার উদ্ভিদবিজ্ঞানসম্মত নাম হল বুটিয়া ফণ্ডোসা। কথিত আছে যে এই গাছের তলাতেই মিরি-আম্মা অর্থাৎ পৃথিবী-মাতার উদ্দেশ্য কৃষির কল্যাণে মানুষ বলি দেওয়ার ভয়ঙ্কর প্রথা চালু ছিল। বুদ্ধের সময়ে পাটলিপুত্রের পূর্বে যে লোকেরা বাস করত, যাদের বিরুদ্ধেই অজাতশত্রু সেই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন যা পরবর্তী কালে তাঁর রাজধানী হয়ে উঠেছিল, তাদের নাম হয়েছিল এই গাছের নাম থেকেই। যে আদিবাসীরা এখনও মিরির নাম যুক্ত করে পলাশকে পুজো দেয় তারাই নিঃসন্দেহে সেই প্রাচীন জাতির বংশধর, মেগাস্থিনিস যাদের পলাশী বলে বর্ণনা করেছিলেন।

এই গাছগুলির সঙ্গে প্রায় সর্বজনিকভাবে স্ত্রী দেবতাদের সংশ্লিষ্ট করার ভিতর দিয়ে যে প্রাচীন প্রথা উদ্‌ঘাটিত হয় তার ব্যাপ্তি আরও আরও ঢের বেশি। কেউ কেউ যে বলে থাকেন* প্রকৃতির নাটক সব পৌরাণিক কাহিনীরই বিষয়বস্তু, কাজেই পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে ঐক্য খুঁজে বের করার ভিতর দিয়েই সর্বক্ষেত্রের পক্ষে মৌলিক মহান আদিম দৃশ্য উদ্‌ঘাটনে আমাদের সক্ষম হওয়া উচিত, সে কথা সত্য। কিন্তু এই নাটক সম্পর্কে নিজের ভাবা দিতে গিয়ে মানুষ তার আশপাশের সামাজিক রূপগুলি থেকে এবং যেসব সমস্যা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলি থেকে আহরিত ধারণা তার মধ্যে না ঢুকিয়ে পারেনি। সেই কারণেই পৌরাণিক কাহিনীগুলির পার্থক্য অনুশীলন করে আমরা যে সময়কাল ও জাতির মধ্যে সেগুলি উদ্ভূত হয়েছিল তার কিছু কিছু হদিশ পাওয়ার আশা করতে পারি। যখন মিশর সবে ইট তৈরি করতে শুরু করেছে ও ব্যাবিলন একটা গ্রাম মাত্র, হয়তো তখনই দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গ্রামগুলি তাদের গ্রামসীমার বাইরেকার বিশেষ বিশেষ পালিশ-বিহীন প্রস্তরখণ্ড থেকে পূতমন্ত্র পেয়েছিল, আর সেইসব পাথরই এখনও তাদের আত্মার, অর্থাৎ অনন্ত মাতার পূজাবেদী হিসাবে বিরাজ করছে। এ কথা ভাবা যেতে পারে যে এখনও নিমগাছের তলায় যে ছোট ছোট সূচ্যগ্র পালিশ-

* রেভারেণ্ড জর্জ কক্স লিখিত "মাইথলজি অব দা এরিয়ান নেশনস" দেখুন।

বিহীন পাথরকে পূজা করা হয় আদর্শ প্রতীক হিসাবে সেগুলির প্রবর্তন কেবল পুরানো প্রস্তর-যুগেই হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তা যদি হয়ে থাকে তবে সেই তথ্যের মধ্যেই আমরা মানুষের একেবারে প্রথম দিককার সমাজতত্ত্বগত চিন্তার কিছু হদিশ পেতে পারি। বর্তমানকালে যে কোনও দেবতার উপর স্বতস্ফূর্তভাবে আমরা পৌরুষ আরোপ করি। তার কারণ আমাদের সমাজ এখন পিতৃ-তান্ত্রিক ও পুরুষ-প্রধান। একটা সময় কিন্তু ছিল যখন নারীই কেবল স্থায়ী কোষ ছিল। বিয়ে ছিল এক ঘণ্টার কারবার, শিশু মায়ের গ্রামেরই হত; তখন গ্রামের সব পুরুষেরাই ছিল মায়ের ভাই, অর্থাৎ মামা এবং তার শিশুর স্বাভাবিক রক্ষাকর্তা; তখন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মেয়ে-পুরুষের মধ্যে বিয়েই কেবল বৈধ ছিল; এবং তখন নারীই ছিল গোটাটার স্বতঃসিদ্ধ প্রধান ও পরিচালক। সংগঠন ও দক্ষতার উচ্চতম পর্যায়ে নীত এই রকম সমাজের উপরই ভিত্তি করে উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন মিশরীয় রাজতন্ত্রের, ব্যাবিলনের সরকারের এবং দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরের বর্তমান রাজপরিবারের। এই রকম সমাজে ভগবানকে স্ত্রীলোক বলে ভাবা ততটাই স্বাভাবিক ছিল যতটা হয়েছে এখন উল্টোটা। তখন-কার দেবতার আদর্শ ছিল পাকা-মাথা বুড়ীরা, যারা জন্তু-জানোয়ার ও গাছগাছালি সম্পর্কে বহু আশ্চর্য কাহিনী জানত, যাদের কোটরগত চোখে বিজ্ঞতার ছাপ, চালচলনে কোমল কর্তৃত্ব। এই রকমই ছিলেন নর্নরা, পক্বকেশিনী তিন ভাগ্যদেবী (Fates), যাঁরা ইগড্রাসিল অ্যাশ গাছে স্মৃতিসমুদ্র থেকে দিবারাত্র জলসেচ করতেন, আর কেউ যদি সে গাছে হাত দিত তবে তাকে তুষারে পরিণত করতেন। তবু ইগড্রাসিল ভারতীয় নিমের চেয়ে পরবর্তী কালের। কারণ ইগড্রাসিলের এক বিরাট শিকড় স্বর্গে মহান ঈশ্বর আসিরের সিংহাসনের পাশে প্রোথিত ছিল, যেখানে ঈশ্বর ও নর্নরা সভা বসাতেন ও পৃথিবীর বিচার করতেন। এই কাহিনীর ভিতর দিয়ে আমরা এমন এক যুগের হদিশ পাচ্ছি যখন পুরুষ নিজেকে রাজা করে ফেলেছে এবং নারী ইতিমধ্যে অধঃস্তন অবস্থায় চলে গিয়েছে।

নিমগাছ পুজোর কেন্দ্র হল অযোধ্যা ও বিহার অর্থাৎ প্রাচীন কোশল ও মগধ। সেখান থেকে এর প্রসার হয়েছে উত্তরে ও দক্ষিণে, সিন্ধুর মরুভূমিতে ও দাক্ষিণাত্যে। একেবারে দক্ষিণে সালেমের কাছে এক সুন্দর ছোট্ট উপত্যকায় আমি নিমগাছ দেখেছি। সেখানে পাঁচ-ছ ফিট উঁচু ধূসর পাথরের এক বিরাট পাঁচিলে ঘেরা পবিত্র অঙ্গনে নিমগাছটির অবস্থান। তার তলায় একটি কলসীর মত জিনিস উপুড় করে বসান, আর আরতির আলো জ্বালার জন্য অঙ্গনের চতুর্দিকে ছড়ান ছোট ছোট নৌকাকৃতি প্রদীপ। সিন্ধুদেশে নাকি এই পবিত্র গাছটিকে যোগাড় করার জন্য লোকেরা বহু কষ্ট করে ও বহু অর্থ ব্যয় করে; এই মরুভূমির দেশে কোনও কুয়োর পাশে তারা এ গাছ বসায় যাতে একটা ক্ষুদ্র কৃত্রিম মরূদ্যানের কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। কেবল পূর্ববাংলায় এক শীতলা দেবীর নিবাস হিসাবে ছাড়া এর পুজোর কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। সেখানে অশ্বত্থ গাছ আরও পবিত্র, ওখানকার

থেকে আসা চাকরদের ধারণা যে অশ্বথ গাছে ভূত থাকে, আর যে সেই ভূত দেখতে পায় তার মৃত্যু সন্নিকট বলে মনে করা হয়।

পবিত্র গাছ হিসাবে নিমের বিপুল প্রাচীনত্বের আর একটা প্রমাণ হল মেয়েরা যে পুজো করে তার ধরন। পরবর্তী কালের হিন্দুধর্মে প্রায়ই দেখা যায় ভক্তি প্রকাশের একটা উপায় হিসাবে প্রদক্ষিণ করা হয়, গাছ পুজোর ক্ষেত্রেও সেই রকমই হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয় না। নিমগাছের সামনে সেই পালিশবিহীন পাথরখণ্ড পড়ে থাকে, দেশের যেসব অংশে এগুলি স্পষ্টতই সর্বজীবের মাতৃদেবীর অস্তিত্বের সূচক, সেখানে কতকগুলি বিশেষ পূর্ণিমার রাতে দীপ, চন্দন, মিষ্টান্ন, দুধ ইত্যাদি যথাযথ তর্পণ সামগ্রী নিয়ে উঁচুজাতের মেয়েরা দলে দলে যায়। তর্পণের পর মেয়েরা গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, গাছ বা পাথরকে কেন্দ্র করে নয়, তাদের সামনে জ্বালান ছোট অগ্নিকুণ্ডকে কেন্দ্র করে; এই আগুনে ধূপ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ঘুরতে ঘুরতে তারা বিয়ের গান গায়, মনে মনে সন্তান কামনা করে। শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ, গান ইত্যাদির মারফৎ আমোদ-আহ্লাদ করে। এখানে আমরা আদিম যুগের সেই বিশেষ ঋতুতে নাচের রেশ পাই, যে নাচ ছিল তাদের গোষ্ঠী-বিবাহের রূপ। আমরা এরও একটা ইঙ্গিত পাই যে বিয়ের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে অগ্নিসাক্ষ্য কত আগে থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল। আগুন, গ্রহ-উপগ্রহ, পৃথিবী ইত্যাদি মহান ধর্মীয়ভাব উদ্দীপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত হিসাবে এটাকে কতটা গ্রহণ করা যেতে পারে?

যে নারী প্রথমে অন্তত দশজন ভিক্ষুককে খাইয়ে সমাজের সেবা করেছে সে যে কোনও সময় নিমগাছে পুজো দিতে পারে। তবে নিমগাছ পুজোর সব চেয়ে বড় উৎসব হয় শ্রাবণ ও ভাদ্র, অর্থাৎ আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের শুক্লপক্ষের রাতগুলিতে। তিজ উৎসব হয় শ্রাবণ অর্থাৎ আগস্টের শুক্লা তৃতীয়াতে। এই দিনে বিবাহিতা তরুণীদের শাশুড়ীর কাছ থেকে কাপড়, গহনা বা মিষ্টান্ন উপহার পাওয়া বিশেষ কল্যাণের লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। এই তত্ত্ব এলে তরুণীরা তাদের সখী ও সঙ্গীসাথীদের ডেকে দেখায়, তারপর চাঁদের আলোয় দল বেঁধে যায় স্নান করে নতুন কাপড়-গয়না পরতে, নিমগাছের তলায় পুজো দিতে ও তারপর অবাধ ফুর্তিতে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে। এইসব সময়ে নিজেদের গ্রামের বাচ্চা ছেলে ও তরুণদের নেওয়া ও পরবর্তী খেলাধুলোয়ও তাদের যোগ দেওয়া সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাপারটা বোঝাও কঠিন নয়, কারণ এ রাত সেই গোষ্ঠী-বিবাহের পুরানো উৎসবে ফিরে যাওয়ার প্রতীক, যখন পাত্রীর নিজের গ্রামের ছেলেদের তার ভাই মনে করা হত, আর তাদের কারও সঙ্গে বিয়ের কথা উঠতই না। এখানে আমরা ইউরোপের মে-দিবসের খেলাধুলার সমতুল্য জিনিস দেখছি, আর বিয়ের পক্ষে মে মাস অপয়া বলে গীর্জা থেকে যে প্রচার হয়েছিল তারও পিছনে ছিল পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের বিলোপ সাধনের আকাঙ্ক্ষা।

হিউইট একথা উল্লেখ করেছেন যে ওই যুগেই মায়ের ভাই মামা সেই মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল হিন্দু সমাজে যা এখনও দেখা যায়। বিয়ের সময়ে তার উপস্থিতি অপরিহার্য, আর বাচ্চা ছ'মাসের হলে মামাকেই তার মুখে ভাত দিতে হয়, তার ভিতর দিয়ে স্বীকৃত হয় যে বাচ্চা তার আত্মীয়ের বৈধ সন্তান। কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক যুগের গোষ্ঠী-বিবাহের যুগের পর যে সহস্র সহস্র শতাব্দী কেটে গিয়েছে তার প্রতিফলন দেখা যায় এই প্রথার মধ্যে যে মায়ের ভাইকে এখন মুখে ভাত দিতে ছেলের বাপের বাড়িতে আসতে হয়।

কাজেই মহা-মাতৃকার গাছের সামনে গোষ্ঠী-বিবাহের স্মৃতির মধ্যেই নর্সদের এই বিশ্বাসের ব্যাখ্যা মিলতে পারে যে আদি মানব আসকর অ্যাশ গাছে জন্মেছিলেন। এইসব বিয়ের মাসগুলি স্পষ্টতই ভারতীয় জলবায়ুর দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, যাতে এমন সময়ে ছেলেমেয়ে হতে পারে যখন গরম থাকবে, শস্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকবে ও শ্রমের প্রয়োজন সবচেয়ে কম থাকবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এখনও স্ত্রী ও মায়েরা ছেলে জন্মানর জন্য নিমগাছের সামনে প্রার্থনা করে। কারণ সর্ব-মাতৃকা ঘরে একটি নতুন পুরুষ ছেলে পাঠানর আগে, কত হাজার হাজার বছর ধরে তারা এই নিমের তলায় চাঁদনি রাতে সন্তান-সম্ভাবনা সংবাহী ভালবাসাকে পবিত্র করে নিয়েছে।

নিমগাছ উপাসনা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এল ইতিহাসের দ্বারদেশে। এখন রাত হয়েছে, এই রাতই আদিম মানুষের কাছে শীতলতা ও আনন্দের বাহক, কাল-নির্ণয়ের ভিত্তি। দক্ষিণের বনানী ঘুমোচ্ছে আমাদের ঘিরে। পবিত্র গাছের তলাকার পাথরের সামনে যদি কোনও দীপ রাখা হয়ে থাকে তো অনেকক্ষণ হল সে জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছে। মানুষ এখনও শিকারী প্রাণী, সামান্য বাসস্থানটুকুর জন্য পাল্লা দিতে হচ্ছে লোমশ বন্যজন্তুর সঙ্গে। সম্পত্তির মধ্যে পাথরের কয়েকটা স্থূল অস্ত্র-শস্ত্র, রোদে শুকোনো সামান্য মাটির পাত্র, আর কষ্টে গজান আধা বুনো চাল। এখনও কি সে আগুনের সন্ধান পেয়েছে? যদি পেয়ে থাকে প্রদীপের তেল ও ওষুধের জন্য এই পবিত্র গাছের কাছেই আসতে হচ্ছে। এখনও বিয়ে পর্যন্ত তার নিজস্ব নয়, বোনের সন্তানদেরই কেবল সে জানে। তবু এখানে, এই ভারতে ইতিমধ্যেই মানবসমাজের জন্ম হয়েছে। বিধি-বিধান মান্যকারী ও লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। রক্ষক দিব্যশক্তির ধারণা ইতিমধ্যেই উদ্ভূত হয়েছে। মাতৃত্বের মাধুর্য এখনই কীর্তিত হচ্ছে। সীমারেখার অলঙ্ঘনীয়তার ভিতর দিয়ে নাগরিক চিন্তার উন্মেষ ইতিমধ্যেই দেখা দিচ্ছে। পবিত্র গাছের সামনেকার পাথর এক দিব্যসত্তার ইঙ্গিত দিচ্ছে যাঁর পাদস্পর্শে অভয় পাওয়া যায়। এখনও যুগের পর যুগ কাটবে, বহুদিন ধরে মানুষ স্বপ্ন দেখবে পৃথিবী অপরিবর্তনীয়। তার পর আসবে উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে সেই মহা-আন্দোলন যা ভবিষ্যৎ জাতিদের ও সভ্যতাগুলির জন্ম দেবে। আশ্চর্যের কথা যে এমনকি এখনও এমন সব প্রত্যয় তৈরি হচ্ছে ও প্রকাশিত হচ্ছে যা মানুষ যতদিন টিকে থাকবে ততদিন কখনও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হবে না। এই প্রস্তরযুগে, দক্ষিণাত্যের এই বনেই পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে মানব ইতিহাসে অলিভ শোভিতা এথিনীর স্থান, অ্যাশ গাছ ইগড্রাসিলে নর্সদের স্থান।

সাত ভয়ঙ্করী

ইগড্রাসিলের তলায় যেমন প্রাচীন নর্নরা থাকতেন তেমনি নিমের তলায় সাত ভয়ঙ্করী ভগ্নীর বাস। তাঁদের মধ্যে প্রধানা হলেন শীতলা—গুটিবসন্তের দেবী। শরীরে যত চুলকানি ও ফোট বেরোয় সেসব এঁদেরই সম্পত্তি; সাত বোনের কনিষ্ঠাটি আর কেউ নয়, আমাদের ছোটবেলার বন্ধু হাম। আমাদের এটা অদ্ভুত মনে হয় যে প্রাচীন পুরাণগুলিতে ভয় জিনিসটাকে নারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়। ভাগ্যদেবীদের প্রধানা (হেড অব দা ফেটস) তিনি, যিনি জীবনসূত্রটি ছিন্ন করেন, আর তিন তিন জন ফেটই স্ত্রীজাতীয়া। কারও রক্ত যে ঝরায় তাকে তাড়া করে বেড়ায় যে বিনিদ্র সর্বনাশী এট সেও নারী। দেবতার ঔরসে ও রাত্রির গর্ভে জন্মেছিলেন হারপিস ও প্রতিশোধকামিনী এরিনিস, তাঁরাও পুত্র নয়, কন্যা। এখানে এই ভাবতে জ্বরের তাপ ও রোগের ক্ষয়ের মধ্যে যে শক্তি দেখা যায় তাকে মনে করা হয় মানুষের মধ্যে স্বয়ং মায়ের উপস্থিতি।

এই অনুসঙ্গের প্রাচীনত্বের আরও একটি নিদর্শন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ব্যাপার থেকে। যখন অপরাধের বিচার হত অভিশাপ বা প্রতিশোধ গ্রহণের ভেতর দিয়ে, আর সেই শাস্তির বিধান উচ্চারিত হত গ্রামের পককেশ বৃদ্ধাদের দ্বারা; যখন ও সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত ছিল মায়েদের হাতে, আর পুরুষেরা ছিল বড়জোর তাদের দুর্ধর্ষ ও সাহসী সন্তান; যখন নারী ছাড়া আর কারও শাসন কল্পনাই করা যেত না,—সেই অতি প্রাচীন কালেই ভয়ঙ্কর ও অপরিবর্তনীয়ের মধ্যেকার শক্তিকে দৈবশক্তি বলে ভাবা শুরু হয়েছিল। ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জনবসতির আপেক্ষিক ঘনত্ব যে মানবযূথের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ দ্রুততর করেছিল সেখানে স্বভাবতই মানুষের ভয় ও তার ন্যায্য ক্রোধের ভয়ের প্রতিফলনই ভীতির প্রধান রূপ হয়ে উঠেছিল। ন্যায়সঙ্গত শাস্তি তখন পাওনা বলেই মনে করা হত। সকল শত্রুর মধ্যে রক্তের বদলা নেওয়ার শত্রুকেই সবচেয়ে ভয় করা হত। কিন্তু বিপুল ভূখণ্ড ও ছড়ান ছড়ান জনসংখ্যাসম্পন্ন ভারতবর্ষে ভয়ঙ্করী শক্তির ধারণাটা রহস্যময়, ধারণাতীত ও অতি-প্রাকৃতিক হয়ে গেল। সর্বত্র বিরাজমানতার প্রয়োগে গোড়া থেকেই ব্যাখ্যার অতীত কিছু ছিল। জ্বরের তাপ কিংবা চুলকানির ঝাঁঝের চেয়ে দৈবশক্তির উপস্থিতির আর কোনও চিহ্ন কি এমন প্রত্যয়জনক হতে পারত? এত দুর্বোধ্য বলেই এত প্রত্যয়জনক। এই অবস্থায় পূজা স্বভাবতই পাল্টা শক্তিকে, অর্থাৎ নিরাময়ের শক্তিকে গড়ে তুলল।

ভক্তরা সাত ভয়ঙ্করী বোনের যে বর্ণনা দেয় সে বড় মজার। বলাই বাহুল্য গুটি বসন্ত ভয়ানক ভয়ের সঞ্চার করেন। তাঁর শক্তি প্রকাশ্য ও অদম্য, মানুষকে তা দিবা-দ্বিপ্রহরে আক্রমণ করে। কিন্তু প্রত্যেকেরই, এমনকি কনিষ্ঠারও একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে। হাম কনিষ্ঠা বলেই হয়তো তাঁর দুষ্টুমি করার একটা বিশেষ ক্ষমতা

আছে। তাঁর কম বয়সের দরুন তিনি মা-বাবার বিশেষ প্রিয়, কাজেই বিশেষ প্রশ্রয় পান। তাঁর জীবন অবদমিত: অর্থাৎ তিনি তাঁর ক্ষমতা গোপনে প্রয়োগ করা পছন্দ করেন, আর বিদায় নেওয়ার সময়ে আগমনের ভয়ংকর একটা কিছু স্মারক রেখে যান স্থায়ী অন্ধত্ব, বধিরত্ব অথবা খঞ্জত্বের রূপে। এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সাত বোনের এই কৌতূহলোদ্দীপক পৌরাণিক উপাখ্যান রচনায় বেশ কিছুটা চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত পর্যবেক্ষণের দরকার হয়েছে।

রোগনির্ণয়ের এমন সতর্ক চিহ্ন নির্ধারণ যদি চিকিৎসাপদ্ধতির বিবেচনার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হত সে খুবই আশ্চর্য ব্যাপার হত। স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুযায়ী দেখা যায় শীতলার পুরোহিতরা একটা বিশেষ জাত থেকে আসে, তারা হল ডোম ব্রাহ্মণ, বস্তুত এরা অতি প্রাচীন এক ধরনের চিকিৎসকই ছিল। প্রাচীনতম পূজাগুলি তরল পদার্থ উৎসর্গ করা, দেবতার সামনে জল ঢালা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল; কিন্তু শীতলা পূজায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা বিশেষ করে ফুটে ওঠে। কোনও ব্যস্ত শহরের অলি-গলিতে কখনও কখনও দেখা যায় রাত হলে মেয়েরা রাস্তায় মন্দিরের সামনে জল ঢালছে, ঝাঁটা দিয়ে জায়গাটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্ছে। পথপ্রদর্শক আমাদের বলে দেবে যে এরা শীতলা পুজো করছে। কারণ প্রাজ্ঞ লোকেরা বিধান দিয়ে গিয়েছেন যে এই দেবীটি জল ও ঝাঁটা দিয়ে প্রণাম চান। বস্তুত তাঁর মূর্তি থেকে দেখা যায় এগুলি তিনি নিজের হাতেই রাখেন। লোকে বলে তিনি একটি নোংরা জন্তুতে, অর্থাৎ ধোপার গাধায় চড়ে আসেন। এই শেষ ব্যাপারটিতে জনমত অনস্বীকার্যভাবে প্রবল হলেও তবু সে মত বোধহয় ভুল। শীতলার মূর্তি সত্যিই গাধার পিঠে আসীন থাকেন, কিন্তু তার কারণ হয়তো তিনি যে স্মরণাতীত কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেকালে গাধা ছিল দ্রুতগামী জীবযূথের অন্তর্ভুক্ত, সে ছিল চমৎকার ও রোমাঞ্চকর বাহন, এখন ঘোড়াকে ঘিরে যত কাব্য তখনকার দিনের সেই রকম সব কাব্যের নায়ক। অধঃপতনের যুগে সে হয়তো ধোপাদের ব্যবহারের জন্য নেমে গিয়েছে, ধোপাবাড়ির ময়লা কাপড়ের বোঝা বয়ে রোজ শহরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু একথা জোর করে বলা যায় যে গাধারও সুদিন ছিল। একদা প্রাণিজগতে তার রাজকীয় স্থান ছিল। সেমিটিক জাতিগুলির মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান যুগের গোড়ার দিক পর্যন্ত শোভাযাত্রায় গাধার অবস্থান অর্ধ-রাজকীয় ব্যাপারের ইঙ্গিত দিত। আরবের মরুভূমির বন্য গাধাকে মিশরের প্রাচীন পূজাপদ্ধতিতে সূর্য-দেবতা বলে উল্লেখ দেখা যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই পরিচয়ের চিহ্ন হয়তো ঋগ্বেদ খুঁজলেও পাওয়া যাবে। এখনও পারস্যে একজাতের গাধা পাওয়া যায় যা বিখ্যাত ও সম্মানিত, ক্ষিপ্রতায় ঘোড়াকেও ছাড়িয়ে যায়। কাজেই কোনও দেবীর পক্ষে গাধার উপর আসীন হওয়াটা এমন একটা হাস্যকর কিছু নয়।

অনেক ছাত্রের মনে হবে যে একটিই রোগের ক্ষেত্রে একটি গোটা দেবীকে আরোপ করা এমন একটা সমাজের পরিচায়ক যেখানে শ্রমের বিভাগ অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ছিল। শীতলা পূজা যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের রেশ সেই বিজ্ঞানের হঠাৎ

প্রাধান্য লাভের সঙ্গেও সামাজিক সংগঠনের এই অগ্রগতিকে সংযুক্ত না করে আমরা পারি না। গোটা ভাবনাটাই ভক্তি ও প্রজ্ঞার একটা বিরল সংমিশ্রণ। কোনও লোক যখন গোড়ায় এই রোগে আক্রান্ত হয় তখন বহু গ্রাম্য মহিলার রোগনির্ণয় চিকিৎসক বা পুরোহিতের রোগনির্ণয়ের মতই মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়। একটা উদ্বেগের ব্যাপার হল গুটিগুলো যদি ফুটে না ওঠে। গুটি যদি চাপা থাকে তাহলে অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে আশা থাকে। পরবর্তী পদক্ষেপ হল যথেষ্ট পরিমাণ দুধ খাওয়ান। শক্তসমর্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী গুটি বসন্তের রোগী যে কি পরিমাণে দুধ হজম করতে পারে তা অবিশ্বাস্য। রোগটা যদি সঙ্কটজনক হয় তবে অবশ্য শীতলার পুরোহিতকে বিশেষ চেষ্টার জন্য ডাকা ছাড়া আর করার কিছু থাকে না। এই অবস্থায় রোগীকে ঠাণ্ডা কলাপাতা বিছিয়ে তার উপর শোয়ান হয়। পুরোহিতের আনা ওষুধও তাকে দেওয়া হয়। তার হাতে একখানা নিমডাল দেওয়া হয়, সেই নিমডাল দিয়ে ছাড়া নিজের চামড়া ছোঁওয়া তার বারণ। পবিত্র ডাল দিয়ে চামড়ার উপর সুড়সুড়ি দেওয়াও এক ধরনের আশীর্বাদ ভিক্ষা। সেই সঙ্গে ভক্তিমূলক আচার-অনুষ্ঠানও চলতে থাকে। গোড়ায় যখন ওই পতিত আগন্তুকের আগমন ঘোষণা হল বাড়ির মেয়েরা তাদের নিজেদের সান্ধ্য-পূজা দেওয়ার জন্য মন্দিরে বা গাছতলায় চলে গেল। এই পূজার একটা অঙ্গ হল দেবীর পায়ের কাছে একটা উল্টোন কলসীর উপর ফুল রাখা। ফুলটা যদি পড়ে যায় তা হলে বুঝতে হবে দেবী প্রসন্না হলেন ও প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু ফুলটা যেখানে রাখা হল সেখানেই যদি রয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে দেবী অপ্রসন্না এবং সেক্ষেত্রে শুভ পরিণতির আশা নেই। আমি একটা ঘটনার কথা শুনেছি যখন ফুল রেখে মেয়েরা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে নিজেদের ভাগ্য জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ফুল আর পড়ে না। উদ্বেগে অধীর গোটা দলটা আরও প্রণত হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, হাত জোড় করে দেবীর করুণা ভিক্ষা করতে লাগল, যাতে তিনি প্রিয়জনের প্রাণ রক্ষা করেন। এই দ্বিতীয় বার প্রার্থনার পর যখন তারা ফুলের উপর নজর রেখে অপেক্ষা করছিল ফুলগুলি ধীরে ধীরে নীচে পড়ল, অপেক্ষমাণ সকলের মনে হল যে কোনও অদৃশ্য হস্ত সেগুলিকে গ্রহণ করল ও তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হল।

এটা অবশ্য প্রয়োজনীয় পূজার অর্ধাংশ মাত্র। বাংলায় অন্তত ভাবটা এইরকম যে মাকে ডাকা হচ্ছে সন্তানদের গৃহে এসে তিনি যেন তাদের রোগহর স্পর্শ দেন। পৌরাণিক কাহিনীর এই উপাদানটির উপরেই জোর দেওয়া হয়, যদিও এটা পরিষ্কার নয় যে এর সঙ্গে দেবীর উপস্থিতিই সর্বনাশ এনেছে এবং তাঁকে চলে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে এই মর্মের প্রাচীনতর ধারণাটির সংমিশ্রণ ঘটেছে কিনা। বাংলার বাইরে শেষোক্ত ভাবটাই খোলাখুলি দেখা যায়। কিন্তু এখানে আমরা মাকে গৃহে আসতে ও দুর্ভাগ্য দূর করতে অনুরোধ করার ভাবটাই বেশি দেখি। আরও সেকেলে ভয়ের রেশ বোধহয় এই কথার মধ্যে পাওয়া যায় যে বাড়িতে

যতক্ষণ রোগটা থাকে তখন তাকে "মায়ের দয়া" ছাড়া অন্য কোনও নামে অভিহিত করা হয় না। রোগীকে দেখতে যেসব আগন্তুক আসে তারা এখানে চৌকাঠের বাইরে থাকে এ কথা সত্যি, কিন্তু তবু তারা এই কথা বলেই আসে যে রোগীর ভিতরে উপস্থিত মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছে। কাজেই রোগহর মাধুর্যের দেবীর ধারণাটি এখনও ভয়কে পূজা করার প্রাচীনতর ও অপেক্ষাকৃত কম মহৎ ধারণাটি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেনি। কিন্তু সে পথে এ পা দিয়েছে, কারণ যখন আরোগ্য লাভ হয় তখন সর্বদা দৈব করুণাকেই তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়। এর উদাহরণ হিসাবে বিশেষ অভিজ্ঞতার বহু ঘরোয়া গল্প চালু আছে। যে মুহূর্তে রোগ ধরা পড়ে ও পূজা শুরু হয় তখন থেকে বাড়িটিকে ও বাড়ির সকলকে দেবীর আবির্ভাবের আশায় যেমনটি থাকা উচিত তেমনি শুদ্ধ পরিবেশে রাখতে হয়। বাড়ির ভিতর মাছ বা মাংস রান্না করা বারণ থাকে। স্নান করে ও সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরেই কেবল রোগীর সেবা করা যায়। প্রতিদিন তাজা ফুল দিতে হয়, নতুন ধূপ জ্বালাতে হয়। জল ও ঝাঁটাকে সাধারণ অবস্থার চেয়ে আরও অনেক বেশি সাফাই অবিরত করতে হয়। আর শেষ পর্যন্ত রোগের শেষ রেশটুকুও যখন মিলিয়ে যায় তখন মনোরম স্নানের ভিতর দিয়ে রোগী তার সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ সূচিত করতে হয়। এর জন্য তাকে আগে থেকে তৈরি করা হয়, প্রাচীন প্রসাধনের উপাদান সুগন্ধ ও সুশীতল যথা চন্দন ও হলুদ দিয়ে তার সর্বাঙ্গ মার্জনা করা হয়।

কথিত আছে যে আসকরের পুত্ররা অথবা অ্যাশগাছ ইউরোপে ব্রোঞ্জের ও গৃহপালিত ঘোড়ার ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে মালিশ, রোগহর ওষুধ ও তেল প্রভৃতির জ্ঞানও নিয়ে গিয়েছিল। আমরা দেখেছি যে গাধা অনেক কাল চালু থাকার পর ঘোড়াকে পোষ মানান হয়েছিল এবং পৃথিবীর বিরাট বিরাট বাণিজ্য-পথ বেয়ে ব্যাবিলনে ও নিনেভে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমরা একথাও জানি যে ঘোড়া নিশ্চয়ই মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিল, আর খুব সম্ভব বর্তমান ঋগ্বেদ কণ্ঠস্থ হওয়ার অনেক আগেই ঘোড়াকে পোষ মানান হয়েছিল, কারণ ঋগ্বেদের চলনের সময়েই আর্যদের মধ্যে তার পূর্বসূরী গাধার ব্যবহার একটা স্তিমিত, অর্ধ-চেতন ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। শীতলা ও তাঁর ভগ্নীরা মিলে সংখ্যায় যে সাতজন এর থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা এমন কোনও জাতির সৃষ্টি যাদের ভিতরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ও গ্রহ-সম্বন্ধীয় গাথা ইতিমধ্যেই সাত সংখ্যাটিকে বিশেষ পবিত্র ও প্রভাবশালী করে তুলেছিল, যেমন ছিল বেদ গায়কদের ভিতরে। ইউরোপের ভয়-সঞ্চারী দেবীদের সঙ্গে তাঁদের চরিত্রের তুলনা করলে মনে হয় তাঁরা এমন একটা সভ্যতার অঙ্গ ছিলেন যেখানে রাজনৈতিক ও সামরিক ভাবধারার উৎপত্তির গতি ছিল মন্থর, ব্যক্তিগত সংস্কৃতির উপাদানটিই ছিল বৃহত্তর। জাতিসমূহের অভ্যুত্থানের আগে এশীয় বাণিজ্যিক সভ্যতার যে যুগ চালু ছিল সেই সময়েই তাম্রলিপ্তি বা তমলুকে মালাক্কার টিনের বিনিময়ে ব্রোঞ্জের পত্তন হয়েছিল বলে কিছু পণ্ডিত মনে করেন।

মনে হয় উত্তর আমেরিকায় কিছু যাযাবর জাতির মধ্যে এবং এশিয়াতেও ব্রোঞ্জ যুগের আগে এক স্বল্পস্থায়ী তাম্রযুগ চালু ছিল। ভারতে তামার কুঠার ও তামার ক্ষুর আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রাচীন ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে তামার ছুরি। তারপর এল ব্রোঞ্জ, আর ইউরোপে ব্রোঞ্জের সঙ্গে এল ওষুধের জ্ঞান ও ঘোড়ার ব্যবহার। এর যে কোন কিছুর চেয়ে অনেক অনেক প্রাচীন হল নিমগাছের তলায় মায়ের সিংহাসন হিসাবে পালিশবিহীন পাথরের পুজা এবং সেইসব ঋতু-সংশ্লিষ্ট নাচ যেগুলি থেকেই হয়তো অ্যাশ গাছ থেকে আদিমানব আসকরের জন্মের পুরাকাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। অলিভ ও নিমগাছের তলাকার মাটি সত্যিই পবিত্র ছিল। এখানেই ছিল তৈল-মাতার পবিত্র বাসভূমি, সেখান থেকে এবং সেখানকার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য থেকেই এসেছিল পুরোহিতদের মন্ত্রপূত তৈল প্রলেপের সমস্ত ধারণা, পরবর্তী কালে তরুণতর জগৎ যা প্রত্যক্ষ করেছে। দীক্ষা দেওয়ার সময়কার প্রলেপের তেল, রাজার অভিষেকের তেল, এবং বিদায়ী আত্মার বেদনার্ত শেষকৃত্যের আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তেল—যেসবের জন্ম হয়েছিল হয়তো আমাদের মোগহর ভারতীয় নিমগাছের পল্লবে পরিশুদ্ধ শীতল বায়ুসেবিত এই পবিত্র স্থানে, এখানেই হয়তো জন্ম হয়েছিল যুগ যুগ ধরে মানুষে মানুষে সহায়তা ও সহমর্মিতার আরও কত উপাদানের।

কাশ্মীরী শাল

শ্রীনগরের গৌরব অস্তমিত হয়েছে, কারণ সে প্রায় আঠার শত বছর হয়ে গেল যখন একজন বৌদ্ধ-সম্রাটের আমলে শ্রীনগর ভারতের অধিকাংশ ভূখণ্ডের রাজধানী ছিল। কিন্তু প্রাচীন গৌরব যদি তিরোহিত হয়ে থাকে তবে তার জায়গায় আবির্ভূত হয়েছে এক নতুন ও মহত্তর গৌরব। এই অদ্ভুত মনোরম শহরটি এখন বিশ্বের কয়েকটি প্রধান চারুশিল্পের কেন্দ্র, অপরাপরের মধ্যে কাশ্মীরী শালের বাসভূমি। প্রায় চার থেকে পাঁচ শতাব্দী আগে তাতাররা এদেশে শাল বোনার শিল্প আমদানী করেছিল; তারপর ভারতীয় রুচির উদ্দীপনাময় প্রভাবে এ শিল্প পারিবারিক কুটির শিল্প থেকে দ্রুত চারুকলার পর্যায়ে উন্নত হয়। এতে যে ছাগলের লোমের দরকার তা এখনও ইয়ারখন্দ থেকে শ্রীনগরে আনা হয়, এক বছরের বাচ্চা ছাগলের লোমকেই এর পক্ষে যথোচিত সূক্ষ্ম মনে করা হয়।

এই শিল্প সৃষ্টির জন্য তিন মাথা এক হয়। প্রথম আসে নক্সাকার, তার ঝামেলার জন্য সে শিলিং দুয়েক পায়; তারপর নকলনবীশ, সে ওই প্যাটার্নটিকে কারখানায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করে; আর সর্বশেষ আসে তাঁতী। এদের মধ্যে দ্বিতীয় জনকেই সবচেয়ে কুশলী বলে মনে করা হয় এবং আদি শিল্পীর চেয়ে পাঁচগুণ বেশি মজুরি তার বরাদ্দ। আমাদের কাছে এটা দুঃখের কথা মনে হয়। প্রতিভাধরকে কেবল একজন শ্রমিক বলে গণ্য করা হবে ও মাঝারি লোকের ভিড়ে সে বেচারা হারিয়ে যাবে এ আমাদের অতি বিশ্রী লাগে। হোকুসাইয়ের খেলনার বইতে কিংবা ডেল্লা রব্বিয়াদের একটা মডেলিং-এ যে ব্যক্তিত্বের মাধুর্য থাকে এতে তা একেবারে হারিয়ে যায়। কিন্তু যে রীতি যশের সমস্ত প্রভাব, যদি উদ্দীপকও হয় তবু অধঃপতন ঘটান প্রভাব, তুলে নেয় এবং কর্মীকে কেবল শিল্পীসুলভ বিবেকের সর্বোচ্চ অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধীন করে, তার সপক্ষেও অনেক কিছু বলার আছে। এই রকম পরিবেশ বড় তাড়াতাড়ি চলে যায়। সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্বাসের যে মহাযুগ বিস্তৃত ছিল এই রীতি সে যুগের জিনিস। এইসব রীতির ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহত্তম আত্মাদের ক্ষেত্রে ছাড়া সকলের ক্ষেত্রে পবিত্রতার বিনাশ ও উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। উপরন্তু দক্ষতার ব্যাপারেও এই শ্রেণীবিন্যাস, হাজার হলেও, এমন কিছু অবাস্তব নয়, কারণ রুচি কেবল রেখা ও রঙকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া নয়, তাদেরকে সঙ্গীতের সুরে বাঁধা।

তাঁতীর হাতে এই স্বরলিপি ছাড়া নক্সার কোনও নকল থাকে না। তার সামনে থাকে এই সুরের পাণ্ডুলিপি, আর তা থেকেই সে সেই প্যাটার্ন বুনে তোলে যা আমরা দেখি। কাশ্মীরী তাঁত আসলে একটি ঐকতান বাদক, প্রত্যেকটি শাল রঙের এক-একটি ঐকতান, কর্মরত লোকগুলি ফোঁড়ে ফোঁড়ে একটি একঘেয়ে

সরল গানের তান ধরে থাকে। ভারতীয় কারুকার্য করা কাপড়ের ক্ষেত্রে বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যেকার সম্পর্কটি মৌলিক—এই কারুকার্যে সমন্বয়ে ও সামঞ্জস্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায় এই সম্পর্কই তার চাবিকাঠি।

যে সমস্ত পুরানো প্যাটার্নের আজকাল আর পুনরাবৃত্তি হয় না সেগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষজ্ঞদের এই নকলনবীশদের কাছেই খোঁজ করতে হবে। তাদের দ্বারাই ওই বস্তুর উৎপাদন হতে পারে এবং পরে পশ্চাতে সেগুলিকে একত্র করে একটা জাতীয় যাদুঘর তৈরি করা উচিত। বর্তমানে এইসব অপরূপ সুন্দর অলঙ্করণের নক্সাগুলির কোনও রেকর্ড রাখা হয় না, আর ব্যবসার স্বার্থে ব্যাপারীরা যে সংগ্রহ করে তা ছাড়া অন্য কোনও সংগ্রহও নেই। তা সত্ত্বেও অবশ্য এই শিল্পের অগ্রগতি অনুশীলন করার যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং এর যাদু এড়ানোর কোনও উপায় নেই।

দু'শ বছর আগেকার শালের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করলে আধুনিক নমুনাগুলিতে অনেক বেশি সাহস ও রূপরেখার স্বাধীনতা দেখা যায়, বর্ণ-সমন্বয়ের ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে বলে বোঝা যায়। নিছক জ্যামিতিক উপায়ে উদ্ভিজ্জ রূপগুলিকে প্রচলিত রীতিবদ্ধ করার দিকে স্পষ্ট ঝোঁক দেখা যায়, একঘেয়ে বাঁক (ভারতীয় আনারসী প্যাটার্নের একটা স্থানীয় রকমফের) ও গোলের জায়গায় বহুলাংশে আসছে টানা টানা কুণ্ডলী পাকান লতা ও শঙ্খিল অলঙ্করণ। ইসলাম ধর্মে জন্তু-রূপের অনুকরণ নিষিদ্ধ : কাজেই ফুলের ভিতর আমরা হুপোয়ে, বুলবুল, নীল মাছরাঙা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কাশ্মীরী পাখির দেখা পাই না। রং প্রয়োগের ক্ষমতার অসাধারণ বিকাশ হয়েছে। পুরানো শালের কয়েকটি অতুলনীয় সুন্দর, কিন্তু এই সব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলিতে রঙের যত রকমফের ব্যবহার করা হয়েছে তা এখানকার সাধারণ কাজগুলির তুলনায়ও অনেক কম। এই ধারায় উইলিয়াম মরিসের সাফল্য ইংরেজদের খানিকটা ধারণা দিতে পারে যে এখানে কি ধরনের কাজ হয়। কিন্তু মেরটনের ছাপা পর্দার কাপড় ও কারুকার্য করা ঢাকনা এখানকার অপূর্ব জিনিসগুলির তুলনায় স্থূল ও প্রায় জবড়জং মনে হয়।

ভারতীয় রুচি সজ্জাশিল্পীর কাছে তিনটি জিনিস দাবি করে: খুঁটিনাটির সূক্ষ্মতা, উজ্জ্বল প্রভাব ও প্রাচুর্য। যে আবহাওয়া স্বস্তি বা বিরতিবিহীন সৌন্দর্য এমন বিপুল প্রাচুর্যে উৎপাদন করে তার পক্ষে এ স্বাভাবিক। কাশ্মীরের পুষ্পে-রত্নে-খচিত উপত্যকাই প্রতিফলিত হয়েছে তার জাতীয় শিল্পে, ঠিক যেমন বনরাজির প্রাচুর্য হাত ও চোখকে শিখিয়েছিল তাজ গড়তে ও আমেদাবাদের মর্মর খোদাই করতে।

এ কথা স্মরণ করার যোগ্য যে প্রাচ্য গহনাকে যা চোখ-ধাঁধান সৌন্দর্য দেয় সেই একই জিনিস পাশ্চাত্যকলাকে ভাবপ্রকাশের এক সুন্দর মাধ্যমে পরিণত করে। আমাদের দেওয়ালগুলো কুৎসিত, কিন্তু আমাদের রাফায়েল, রসেটির মত চমৎকার ভাস্কর আছে। আমাদের জাঁকাল প্রাসাদ নেই বটে, কিন্তু আমাদের ধূসর গীর্জাগুলি

দিল্লির গোলাপী লাল প্রাচীরগুলি আরও ভেঙেচুরে গেলেও যেমন বিশ্ব দরিদ্রতর হবে, ইংল্যাণ্ডের পুরানো গ্রাম্য গীর্জা নষ্ট হলেও তাই-ই হবে। অপরপক্ষে একথা আমাদের কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে সমগ্রের পক্ষে চীনের পোর্সিলেনগুলি ও আগ্রার মিনের কাজগুলি ততটাই অপরিহার্য যতটা ইউরোপের মঠগুলির ধ্বংসাবশেষ অথবা ওয়েস্টমিনিস্টার কি ভার্সাইয়ের রাজকীয় স্থাপত্য। ভারতীয় উল্লাসের বস্তু যে কাল ও শূন্যের মহাছন্দ, তা এখানে আর একটা দৃষ্টান্ত পাচ্ছে। ঐক্যের স্বরূপ দেখতে হবে কেবল শুভের মধ্যে নয়, অশুভের মধ্যেও; মরণেও বটে, জীবনেও বটে; পাশ্চাত্যেও বটে, প্রাচ্যেও বটে, বস্তুত সকল প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে। সর্বত্র থেকে আগত সকল পথের মহামিলন ক্ষেত্র থেকেই সেই পরম এক মানুষকে দেখা দেন।

শাল তৈরির জন্মভূমি এই মধ্য-এশীয় উপত্যকায় বর্তমানে এটি একটি জীবন্ত শিল্প, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান কারিগর এমন সব দূষিতকারী প্রভাবের মধ্যে কাজ করে যা তাদের পূর্বপুরুষের কাছে অজানা ছিল। বিগত বিশ বছর ধরে এই সুন্দর উপত্যকাটিতে ইউরোপীয় যাতায়াত চলছে, ফলে ফ্যাশান ও অর্ধ-শিক্ষার ভয়াবহ প্রভাব যেমন কাঠখোদাই ও পাপিয়ার মাথের প্রাচীন কলার উপর, তেমনি এর উপরও সুস্পষ্ট। জাতিভ্রষ্ট ইতরতার হাত থেকে কাশ্মীরের তাঁতীকে যদি আদৌ বাঁচাতে হয়, তাহলে তা করা যায় কেবল পুরানো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-গুলির ঘনিষ্ঠ ও সহানুভূতিশীল অনুশীলনের এবং পাশ্চাত্য রুচির সঙ্গে পরিচয় ঘটানর ভিতর দিয়ে।

শেষ ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন শাল ব্যবহারের উপর মরণ আঘাত দিয়েছে, তার হয়তো আর কখনও পুনরুজ্জীবন হবে না; কিন্তু আমাদের মধ্যে জ্ঞান ও বাছ-বিচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহসজ্জার উপাদান আসবাবপত্রের ঢাকনা হিসাবে এই চমৎকার আচ্ছাদনটির স্বীকৃতিলাভ অনিবার্য। তার ফলে চৌকো না হয়ে সরু, লম্বা ও অপরাপর নানা ধরনের আকৃতি ধরতে এ বাধ্য, আর যথেষ্ট ভয় আছে যে এর চেয়ে কম লক্ষণীয় নানারকম ফলাফলও হতে পারে। কাজেই এইসব লোকসান যাতে বৃহত্তর স্বাচ্ছন্দ্য, মৌলিকতা ও অপরূপ লাবণ্যলাভের মধ্য দিয়ে পুষিয়ে যায় সেটা জরুরী; আর আমরা সকলেই এ বিষয়ে একমত হব যে এ করতে হবে পুরানো কাজের মর্মবস্তু বজায় রেখে, বেমানান উপাদানের প্রবর্তন রোধ করে, তবেই তা অবনতির বদলে উন্নতি সূচিত করবে।

এই চমৎকার শিল্পটির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটা আদিম ভাব আছে। এর লোকের কাছে পৌঁছনর মস্ত মাধ্যম হল ফেরিওয়ালা, আর তার সঙ্গে কারবার করতে হলে দর-দস্তুর ব্যাপারটা বিজ্ঞানের মত জানা চাই। নিজের তাড়া থাকলে বাজারে অসতর্ক ক্রেতার অবশ্য খুবই মুস্কিল; কারণ সুদূর চীনে মাটির পেয়ালায় চা আসবে, আর বাধ্যবাধকতাটাকে আরও পাকা করার জন্য প্রাচ্য ভদ্রতার সুমধুর ভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়া হবে। কায়রোতেও তেমনি দোকানে বসে ডিম্বাকৃতি কাপ

থেকে কফি খেতে খেতে দশ শিলিং ব্যয় করার জন্য একটা গোটা বিকেল কাটাতে হবে।

কিন্তু কেনা-বেচার এইসব ভালপালাকেই যদি আমাদের মজার মনে হয়, যেখানে শাল তৈরি হয় সেইসব ছোট ছোট কারখানা সম্বন্ধে আমরা কি ভাবব?

ভারতীয়দের যাকে বস্তী মনে হয় সেইরকম খামারবাড়ির বাঁকা-চোরা উঠোন ঘিরে খাড়া অনেকগুলি মাটির কুঁড়ের মধ্যে একটি, রোদে পুড়ে পুড়ে রুপোলী ধূসর রং হয়েছে, তারই দোতলার একখানি ঘর। তাতে একখানা খাটও আছে, আবার তারই মধ্যে দেখা যাবে জানলার সঙ্গে সমকোণে স্থাপিত তিনটি তাঁত, তাতে মোট ন'জন বসার জায়গা। আমরা ঢুকতেই তাঁতীর একঘেঁয়ে তান থেমে গেল, আঙুলগুলো অলস হয়ে পড়ল যাতে আমরা স্বচ্ছন্দে খুশিমত যন্ত্রপাতি দেখতে পারি। এই লম্বা লম্বা নীচু ফ্রেমগুলি তুলনামূলকভাবে ছোট, পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত শালের সুতোর টানাগুলি টান টান করে বাঁধা। আর সে কি সুতো! মাখনের মত সাদা কিংবা চকচকে ধূসর, অথবা সবুজের কোনও অপূর্ব রকমফের, কিংবা গোলাপী কি নীল রঙের দীর্ঘ, সুচারু সুতো। একবছরের তুলতুলে নরম বাচ্চা ছাগলের লোম প্রায় মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম করে পাকিয়ে এই সুতো তৈরি হয়।

আরও বেশি রং করা পশমও সমানই সূক্ষ্ম, কাঠিমের বদলে টাকুতে জড়ান। পুরুষেরা সামনে রাখা পাণ্ডুলিপিটা উচ্চারণ করে পড়েছে আর আঙুল দিয়ে যেন প্যাটার্নটি শুনছে এমনভাবে ওই পশ্চাদপটে উপর ও নীচে দিয়ে টাকুগুলো অবিশ্রান্ত রকমের তাড়াতাড়ি ঢোকায় ও বের করে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণতে থাকে। এইভাবে মাকুর ঝকমক বা যন্ত্রপাতির আওয়াজ ছাড়াই মানুষের আঙুলের ধৈর্যশীল শ্রমে রেখার পর রেখায়, ফোঁড়ের পর ফোঁড়ে কাশ্মীরী শালের জাল বিস্তারিত হয়, মাথার উপর ঝোলে উজ্জ্বল রঙে রাঙান সুতোর ফেটি। নানা বর্ণের এই সমাহারেই নক্সাটি তৈরি আর তাতেই ঐকতান সঙ্গীতের তুলনাটি আরও লাগসই হয়। সমস্ত সূঁচের কাজ বিশেষত রিপুকর্মের যে অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা তার কাছে আত্মসমর্পণ করে পুরুষেরা যখন এবার আরও জোরে তান তুলল, তখন আমরা আবার নতুন করে সেকথা উপলব্ধি করলাম যে কানে যা এত সহজে ভাল লাগে সেই শব্দের সম্পর্ক চোখে যা প্রীতিকর লাগে তার সঙ্গে অভিন্ন। একই সঙ্গে দুটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা আমাদের প্যাটার্নটি পড়ছি।

এটা সত্যিই প্রাচীন কালের হস্তশিল্প। লক্ষ্য করুন যে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াই একই ছাদের নীচে চলতে পারে। নীচের আঙিনায় পাঁচিলের ছায়ায় তিনটি মহিলা বসে। প্রতিমার মত কাশ্মীরী সৌন্দর্যে তারা গ্রীক ভাগ্যদেবীও হতে পারত। চরকা নিয়ে ঠাকুমা, পাশে দুই বৌমা এখনও না-রঙান পশম নিয়ে টানছে ও পাকাচ্ছে। বৃদ্ধা মুসলিম মহিলাটিকে ঘিরে আছে বয়সের মর্যাদা। ঘোমটা ও শিরোভূষণের নীচেকার মুখখানি দেখলে মনে হয় এমন একজনের মুখ যে ভালবেসেছে ও দুঃখ পেয়েছে, আর রানীর মত বিজয়িনী হয়েছে। ওর ধর্ম কি

জিজ্ঞাসা করুন, জবাবের সময় খেয়াল করুন গলার স্বরে গর্বের অনুরণন : "রহ্‌মান্না আল্লার দোয়ায় আমি মুসলমান।" "আল্লার দয়া", আর সেই পতাকাকেই আমরা সংশ্লিষ্ট করি তরবারি ও হত্যার সঙ্গে।

বাচ্চারা কিন্তু রোদে বেপরোয়াভাবে খেলে বেড়ায়, চরকা মনের খুশিতে ঘুরতে থাকে আর উপরের খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসে বুনতে বুনতে পুরুষদের গানের তান। এ তান সত্যিই সুদূর অতীত যুগের, ওদিকে চেয়ে শুনতে শুনতে মনে হয় আমরা যেন এক প্রাচ্য পুঁথির সেই কথাগুলি শুনছি "মানুষের দিন তাঁতীর মাকুর চেয়ে তাড়াতাড়ি যায়।"

গতকাল তাতাররা শ্রীনগরে ঢুকেছিল, আজ ইংরেজ রয়েছে, আগামীকাল তারাও চলে যাবে, রেখে যাবে এক পুরানো জাতিকে আবার প্রেম, কাব্য ও সৌন্দর্যের স্বপ্নে নিমগ্ন হতে, যতদিন পর্যন্ত না, তাদের নিজেদেরই ভাষায়, মায়াজাল ছিঁড়ে যায় ও স্বর্গের পরমসুখসাগরে তারা হারিয়ে যায়।

পুষ্পতরী

টেবিলের যে জায়গায় ছোট্ট পুষ্পতরীটি ছিল সে জায়গাটা এখন খালি। ঘণ্টাখানেক আগে অন্ধকার নামার মুখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সে তরী ভাসিয়ে দিয়েছি। গঙ্গার হিমশীতল তীর ঘেঁষে ছোট্ট নৌকোটি ঢেউয়ের তালে তালে হেলেদুলে একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল। আমরা নদীর ধারে একটু আগেই গিয়েছিলাম। ফিরে আসার সময়ের মধ্যে কেবল আর একটি এগারো বারো বছরের পূজারিণী এসেছিল, মহান অজানার কাছে তার অর্ঘ্য নিবেদন করতে। একটু অপেক্ষা করে তাকে আমরা দেখতে লাগলাম। মেয়েটি সতর্কভাবে গাছের ছালের নৌকোটি থেকে নৈবেদ্য বের করে নৌকোর পিছনের দিকে একটা ছোট্ট বাতি বসাল, তারপর জলে ভাসিয়ে দিল। আমরা জানতাম যে ভাটার টানে এই ক্ষুদ্র তরী প্রধান স্রোতে গিয়ে পড়বে ও সুদূর সমুদ্রে ভেসে যাবে। যতক্ষণ এই ভঙ্গুর তরীটির উপর তারার আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ ধরে রুদ্ধশ্বাস ঔৎসুক্য নিয়ে বসে দেখা ছাড়া আমরা আর কি করতে পারতাম? আজ বাংলার সব গ্রামেই নদীর ও পুকুরে ভাসছে অসংখ্য ছোট ছোট নামহীন নৌকোর সারি। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নৌকোর ভিতরকার আলোগুলো মিট মিট করে জ্বলছে, ঠিক যেন জীবনের মত, ঠিক যেন মৃত্যুর মত।

এই দিনটি বাংলার পৌষসংক্রান্তি। এটিই হল গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রার দিন। —সাগর ও নদীর মোহানায় এই দ্বীপ। উপরন্তু এই দিনটি সকল পরিব্রাজকের পক্ষে, সকল গৃহত্যাগীর পক্ষে, নিশাগমে যাদের পদযুগল নিজগৃহে পৌঁছবে না তাদের সকলের পক্ষে উপাসনার দিন। আজ সকালে একটি ছোট বাজার পেরোবার সময়ে এক জনাকীর্ণ রাস্তায় দেখলাম ব্যগ্র স্ত্রী-পুরুষেরা পুষ্পতরী হাতে দ্রুতপদে চলেছে। এই নিতান্ত সাদামাটা নৌকোগুলোর একটাকে আমিও কিনলাম আমার প্রীতিমধুর চিন্তার ডালিতে তাকে ভরিয়ে দিতে। কলাগাছের ঝকমকে সাদা খোলার তৈরি এই নৌকোগুলো যেমন-তেমন করে একত্রে গাঁথা, বাঁশের কঞ্চির মাস্তুল দেওয়া আর কঞ্চিকেই ধনুকের মত বেঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে নৌকোর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কঞ্চিতে বুক ফুঁড়ে গাঁথা রয়েছে হলদে হলদে গাঁদাফুল। বিক্রেতারা হেথায় হোথায় রঙীন কাগজ ও দড়ি দিয়ে পুরানো দেশী নৌকোর হাল, দাঁড় ও দড়ি-দড়ার নকল করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি কেবল ইঙ্গিতেই পর্যবসিত হয়েছে, ঝকঝকে জাহাজ ও জ্বলন্ত-বুক ফুলের ইঙ্গিত।

ইঙ্গিত মাত্র, সে কথা সত্যি—কিন্তু কিসের ইঙ্গিত! আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না যে শান্তমুখী মেয়েরা নৌকোটির সামনে তন্ময় হয়ে বসে তাতে বেলপাতা, ফুল, নৈবেদ্যের ফল ও শস্য সাজাচ্ছে এবং কোনও প্রিয়জনের জন্য নতুন করে আশীর্বাদ

চাইছে যাতে সে আগামী বছরে যে কোনও ঋতুতে নিরাপদে পাড়ি দিতে পারে অথবা কোথাও যদি বিপদেও পড়ে তবু যেন নিরাপদে ঘরে ফিরে আসতে পারে। এখানে কি আমরা মানবতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি না—কোনও দূর সীমান্তে পুরুষ কষ্টকর জীবনসংগ্রামে নিরত, আর মেয়েরা সোনাদানার জন্য নয়, ভালবাসার জন্য উপবাসী থেকে প্রার্থনা করছে?

মনে পড়ে ইহুদীর সেই চিৎকার, যুগযুগান্ত পার হয়ে তবু সুরেলা, যে ইহুদী সমুদ্রকে ভালবাসেনি, সাহায্যের আশায় চোখ তুলেছিল পাহাড়ের দিকে, আর আশীর্বাদ-সুখের এক অন্তর্বস্থায় "আমি" ও "তুমি"র জ্ঞান হারিয়ে বলে উঠেছিল: "ভগবান তোমার যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন নিরাপদ করুন, এখন থেকে ও এমন কি বরাবরের জন্য।" মনে পড়ে ব্রিট্যানির গীর্জাগুলির কথা ও জাহাজের সেই ছোট্ট নমুনা, জীবনতরী বার্ক দ্য মা ভি-র কথা, যেগুলি প্রতিটি বেদী ও ব্যক্তিগত উপাসনার স্থানের সামনে ঝোলান থাকে। সমুদ্রের ফেনা ও ঝড়ের ভিতর দিয়ে নাবিকের আহ্বানের প্রতিধ্বনি ফিরে আসে "সান্তে অ্যান! সান্তে অ্যান!"

এখানে এই বাংলাতেও এক সমুদ্রযাত্রী জাতি আছে, এককালে পৃথিবীর সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে যারা বিখ্যাত ছিল। পৌষসংক্রান্তির দিনে আমরা উদ্‌যাপন করি পুরাকালের সেই বার্ষিক বাণিজ্য ঋতুর শুভারম্ভ, যখন বাণিজ্যের পসরা নিয়ে সমুদ্রসন্ধানে বেরিয়ে পড়ত বাণিজ্যতরীর দল। এই বাণিজ্যিক অভিযান ফিনিশিয়ার এবং মধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী সমস্ত শুভ-লক্ষণসম্পন্ন জাতিদের বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, কিন্তু প্রাচ্যে অবশ্যই সুবিদিত ছিল। চীন ও জাপান, কাম্বোডিয়া ও বর্মা তাদের বন্দরে বাংলার বণিকদের স্বাগত জানাত, তার ভিতর দিয়ে সম্মান ও সম্পদ লাভ করে খুশি হত। ভারতের যে ক্ষমতা ছিল অন্যান্য কম অনুগ্রহপ্রাপ্ত জাতিকে জ্ঞান ও অনুপ্রেরণা পাঠানর, তার জন্য ভারতের উপকূল সন্ধান করেছিলেন বা উপকূল ছেড়ে গিয়েছিলেন যে অসংখ্য মানুষ তার মধ্যে ফা হিয়ান, হুউয়েন-সাঙ ও আই-চিং কেবল তিনটি নাম। কিন্তু স্মৃতিকে অত পিছনে পাঠানর দরকার কি? একশ বছরের সামান্য কিছু কাল আগে পর্যন্তও ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণ পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে এখনও যে কাঠের জাহাজ আছে সেগুলি হয় পরিত্যক্ত ভারতীয় জলযান অথবা ভারতীয় সেগুনের তৈরি। আর ভারতীয় বণিকরা যদি মানুষের কাছেও ব্যবহারিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য না হত তা হলে এইসব জলযান এমন খ্যাতি লাভ করেছিল কি করে?

সারা দিন ধরে আমার ডেস্ক-এর উপরকার পুজোর তাকে মঠের তোরণের আলোর মত গাঁদাফুলগুলি ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়েছে, হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে অসংখ্য স্বপ্ন, অসংখ্য স্মৃতির তরঙ্গ তুলেছে। "ভগবান আশীর্বাদ করুন—ভগবান আশীর্বাদ করুন যাওয়ার সময়ে—আসার সময়ে—চিরকাল ধরে।" এখনও কি আমরা জীবননদীর তীরে

দাঁড়িয়ে প্রিয় আত্মাগুলিকে পৃথিবীর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিপদের মধ্যে, সুদূর শূন্যালোকে, মৃত্যুর রহস্যের মধ্যে পাড়ি দিতে দেখছি না? তবু তারার মত যে আলো তারা সামনে বয়ে নিয়ে চলেছে সেই আলোর নামেই আমরা কামনা করি যে তাদের যাত্রা যত সুদূর লক্ষ্য অভিমুখীই হোক না কেন, তারা যেন আমাদের এই ভালবাসা ও প্রার্থনার নাগালের বাইরে না যায়, ভগবানের হৃদয় যে পরিবেষ্টনী রচনা করে রেখেছে সে গণ্ডীর বাইরে যেন গিয়ে না পড়ে।

ভাষণের রিপোর্ট

হিন্দু নারীদের শিক্ষা ও তাদের আদর্শ

[লণ্ডনের অ্যাডেলফিতে ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৯০১ সালের ৩০শে নভেম্বর, শনিবারে প্রদত্ত ভাষণ।]

মিস মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) তাঁর ভাষণে এ ধারণা সম্পর্কে দ্বিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে শিক্ষা এমন একটা জিনিস যাকে প্রণালীবদ্ধ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে আটকে রেখে তারপর শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট মাত্রায় দেওয়া যায়। হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল তাদের উপর জাতির প্রাচীন গাথাগুলির প্রভাব। কোনও জাতির শিক্ষার পরিকল্পনা রচনার আগে প্রয়োজন হল সে জাতির জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ও ধৈর্যশীল অনুশীলন। বাঙালী মেয়েদের সম্পর্কে এই অনুশীলনের জন্য তিনি অল্প কিছু সময় দিয়েছিলেন, বছর দেড়েক। হিন্দু ধর্মের মধ্যে যা মহত্তম ও সর্বোত্তম তিনি কেবল তার প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিলেন না, সমগ্র হিন্দুধর্মের প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সব দোষগুণসহই তাকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে সামগ্রিক বিচারে এ প্রায় মহত্তম সভ্যতা এবং পৃথিবীতে শিক্ষার যত উপকরণ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার উপকরণ-গুলি এসেছে হিন্দুসভ্যতা থেকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীদের মধ্যে পার্থক্য বিপুল, নিজে হিন্দু হতে ইচ্ছুক না হলে কোনও ইংরেজ মহিলা হিন্দু কন্যার উন্নতির ব্যাপারে ফলপ্রসূ সাহায্য করার আশা করতে পারেন না। পশ্চিম অনেক বড় বড় রানী ও কর্মোদ্যোগিনী মহিলার জন্ম দিয়েছে, প্রাচ্যে আবির্ভূতা হয়েছেন মহাসন্ন্যাসিনীরা। এই প্রভেদ কেবল নারীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, ভারতীয় জনগণের বাস্তব, অন্তরতম, আদিম জীবনের সমস্ত বিভাগেই এর অস্তিত্ব আছে। হিন্দু যা ছোঁয় তাই নীতিশাস্ত্রগত হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে যত সুন্দর জিনিস আছে তার মধ্যে বোধহয় হিন্দু গৃহস্থালির মত সুন্দর আর কিছু নেই। হিন্দু নারীত্বের মহান আদর্শ রোমাঞ্চিত প্রেম নয়, আত্মত্যাগ। এই আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে হিন্দু মেয়েদের আধুনিক বাস্তবতা বোধ দিতে তিনি উৎসুক ছিলেন।

ভারতে পারিবারিক জীবন ও জাতিত্ব

[লণ্ডনের এসেক্স হলে লণ্ডন পজিটিভিস্ট সোসাইটির কাছে ১৯০৮ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে প্রদত্ত ভাষণ।]

ভাষণপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে ভারতীয় পারিবারিক জীবনে মূর্ত আদর্শকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ইউরোপের মধ্যযুগের সন্ন্যাসজীবনে ফিরে যেতে হবে। যথাযথভাবে বিচার করলে হিন্দুগৃহ ছিল একটি আশ্রম, হিন্দু নারী হল সন্ন্যাসিনী; ম্যাডোনার ভজনার মধ্যে সন্ন্যাসিনীর যে ভক্তি প্রতিভাত হত হিন্দুনারী তার স্ত্রীসুলভ ও মাতৃসুলভ কর্তব্য পালনে সেই ভক্তিই অর্পণ করে। ভারতীয় গৃহের সমস্ত রূপ ও কর্তব্য—যথা প্রত্যুষে ওঠা, স্নান করা, প্রস্তুত হওয়া, খাওয়া—সবই ছিল ধর্মীয় সংস্কারমূলক। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে সবচেয়ে সুন্দর ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অবদান হল তার নাগরিক জীবন; ভারতবর্ষে বোধহয় নাগরিকবোধের কিছু অভাব ছিল। পরিবারকে মনে করা হত সমাজের স্থায়ী কোষ, আর হিন্দু জীবন ছিল তার নিখুঁত প্রতিমূর্তি। বক্তা আরও বলেন যে ভারতবর্ষ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখত না বলে যে সাধারণ ব্রিটিশ ধারণা আছে, তার চেয়ে ভুল আর কিছু নেই। এই রকম প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সমাজের মর্মের অঙ্গ ছিল। ২০০ অথবা ৩০০ পর্যন্ত লোক নিয়ে যেসব হিন্দু যৌথ পরিবার গঠিত হত তাদের নিয়ন্ত্রণ করত পারিবারিক পর্ষদ, আর সেখানে সিদ্ধান্ত হত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। জাত ও গ্রামের ব্যাপারেও তাই হত।

ভারতীয় নারীত্ব

[বোম্বের গেইটি থিয়েটারে ১৯০২ সালের ৬ই অক্টোবর, সোমবারে প্রদত্ত ভাষণ।]

পুরানো সংস্কৃত সাহিত্য অনুযায়ী একবিবাহ প্রতীচ্যের চেয়ে প্রাচ্যে অনেক আগে থেকে চালু ছিল। একথা সত্য যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়েই সভ্য ছিল, কিন্তু দুই অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে রীতিনীতি ও প্রথার অনেক পার্থক্য ছিল। প্রাচ্যের বৈদিক পূর্বপুরুষেরা সভ্যতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, আর তাঁদের কালে নারীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল ইউরোপের বর্তমান কালের নারীদের মত। প্রাচ্যের নারী ছিল সলজ্জ, নীরব, পৃথিবী থেকে আড়ালে, বশীভূত ও বাধ্য। বাংলায় প্রাচ্য নারীর একেবারে চরম উদাহরণ মেলে। ইউরোপীয় নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। একে বলা যায় সঙ্কর সভ্যতা, যেন আর্য মন পশ্চিমী ভাবধারায় পূর্ণ। ইউরোপে ক্রুসেডের পরবর্তী কালে দান্তে কর্তৃক বিয়াত্রিচেকে স্তুতির ভিতর দিয়ে নারীত্বকে আদর্শায়িত করা হয়েছিল। ভারতের সীতা ও সাবিত্রী বহু শতাব্দী ধরে পূজিত হয়ে আসছেন। মেয়েদের উপর গীর্জার প্রভাবের উল্লেখ করে বক্তা বলেন, এ হল মেয়েদের প্রাচ্যভাবাপন্ন করার চেষ্টা। ধর্মীয় চেতনাই নারীর আদর্শকে সমগ্র এশিয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য করে তোলে। মেয়েদের মধ্যে প্রতিভার বীজ বপন ও লালন করার পদ্ধতি এশিয়াতে আরও ভাল করে উপলব্ধি করা হয়েছিল। এশীয় নারীদের ব্যক্তিগত চরিত্রে নৈতিক প্রতিভা ছিল। ভারতীয় নারীর ভবিষ্যতের পক্ষে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল কি ধরনের শিক্ষা। ব্যাপারটা এই নয় যে তাকে ইংরেজি পড়তে ও লিখতে শিখতে হবে। তাকে মানবিক হতে হবে এবং উন্নতির সম্ভাবনার পথের প্রতিবন্ধকগুলি দূর করতে হবে: তবেই ভারতীয় নারী শিক্ষার আধার হয়ে উঠবে।

আগ্রাসী হিন্দুধর্ম

১

বনিয়াদ

"প্রকৃত হিন্দুধর্ম মানুষকে কর্ম দিয়েছে, স্বপ্ন নয়।" ডঃ জে. সি. বোস।

ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক কালে আধুনিক যুগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সার্বজনীন সংজ্ঞার প্রথম উপলব্ধি ঘটেছিল এই যে, ব্যষ্টি তার বিকাশের পথে জাতিকে অনুসরণ করে। একথা বলা যায়, প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর যখন শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে তখন সে নিজের জাতির ইতিহাসের অথবা সমগ্র মানবতার সংক্ষিপ্তসারে পরিণত হয়। এই বিরাট প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি নূতন শিক্ষা পরিকল্পনায় নিজেকে সুনির্দিষ্ট একটি অপরিহার্যতা হিসাবে মনে করে, যা বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমী দুনিয়ায় সাধুপুরুষ ও শিক্ষকদের গুরু পেস্‌টালজ্‌জির মাধ্যমে গৃহীত। পেস্‌টালজ্‌জি দেখেছিলেন, যদি জনসাধারণের জন্য কোনদিন কিছু আশা করতে হয় তবে তা অচিরাৎ আধুনিক উদার ও মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা, যা হবে মানসিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের পথ অনুসারে।

ফরাসী বিপ্লবের শেষে জনগণের প্রেমিক ও সন্তান তরুণ ছাত্র পেস্‌টালজ্‌জিকে সুইজারল্যাণ্ডে সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে সমস্যার, আজকের ভারতপ্রেমিক ও সন্তানকে যে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তুলনামূলক বিচারে তা ছিল অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। তবুও দুজনের অন্তরতম প্রকৃতির রূপ অভিন্ন। কারণ, নূতন চিন্তার ফসল উৎপাদনের জন্য মানবতার ক্ষেত্রে পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার কঠিন সমস্যা ও একই সঙ্গে বাহ্যিক সংস্কৃতির কুফলগুলিকে পরিহার করে চলার সমস্যা এর মধ্যে নিহিত। যে মাটিতে আম ও তাল সদৃশ ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে সেই মাটিতে কেবল লাউ আর কলাই জাতীয় পশুখাদ্যের উৎপাদনরূপ অধঃপতন কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। বেদ ও জ্ঞান-যোগের দেশ কেবল সমালোচনা ও ইউরোপীয় বিদ্যার হাস্যকর নকলনবিশীর মধ্যে তলিয়ে যাবে, এ অধিকার তার নাই।

তবু, এই হল ভারতীয় সংস্কৃতির বর্তমান রূপ, এবং যতদিন না ভারতীয় জনমানস সুচিন্তিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির নিয়মানুবর্তিতায় অভ্যস্ত হয়, ততদিন এই অবস্থাই চলতে থাকবে, এইরকমই প্রতীয়মান হয়। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের অর্থ নবতর বিস্তৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন। এ যাবত যে সকল বিষয় পরস্পরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, সহসা সব পৃথক বৈশিষ্ট্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যা আজ পর্যন্ত ছিল অস্পষ্ট, হঠাৎ তার লক্ষ্য স্থিরীকৃত, তা নিজের রূপ পরিবর্তনের স্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে সক্ষম। ইসলাম ধর্মের মত হিন্দুধর্মেরও সামাজিক ও ধর্মীয় নীতি অতীতে নির্ণয়সাধ্য ছিল না। অবশ্য দার্শনিক বিচারে প্রত্যেক শিক্ষানবীশ তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারলেও বা বাস্তবে

আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক নীতি অনুশীলনে এক এবং তাদের পৃথক করা যায়নি। ধর্মীয় কারণে, যেমন অনুমিত হয়েছিল, আমরা একটা নিয়মিত পথে খাদ্য গ্রহণ করব, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করব, এবং বিশুদ্ধতার একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পূর্ণ করে তুলব, কিন্তু, হঠাৎ আধুনিক যুগের বিপর্যয়ের মাধ্যমে তুলনামূলক বিচার ও সম্পর্কের সূত্রে সূর্যালোকের মত সমগ্র বিষয়ের উপর ঝরে পড়ল এবং আমরা আবিষ্কার করলাম যে, শুধুমাত্র পুরাতন প্রথা ও রীতিনীতি নিয়ে বেঁচে থেকে আমরা শুভ উদ্দেশ্যের উৎকর্ষ গুণ সঞ্চয় করতে পারিনি, কেবল পূর্ণ সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতার আদর্শের নিকটবর্তী হতে চেয়েছি, যা আমাদের মত অথবা আরও ভালভাবে অন্য যে কোন আদর্শের অনুশাসনে অর্জিত হতে পারে। এইভাবে আমাদের সামনে লক্ষ্য যদি স্পষ্ট হয়, অপরের নৈতিক মূল্যগুলি আমাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করে নেবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক বিচার করে দেখতে পারি ও সব মন্দগুলিকে বিসর্জন দিতে পারি। সর্বোপরি, আমরা দেখতে পাব, কি করে সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও ধর্মের কার্যকরীভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। এইভাবেই আগামী হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হতে পারে।

এই আগ্রাসী চিন্তা ও নীতিগুলি তাদের প্রভাবশালী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্তার করতে পারে আজকাল ভারতের স্কুলগুলিতে ও ক্লাসরুমগুলিতে। নিষ্ক্রিয়তা নয়, কর্মতৎপরতা; দুর্বলতার মানদণ্ড নয়, শক্তির মানদণ্ড; আত্মরক্ষার নীতিকে অবিচলরূপে স্বীকার করে নেওয়ার পরিবর্তে আক্রমণকারী বাহিনীর আনন্দধ্বনি। মনের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই কেবল বিরাট এক বিপ্লবের সম্পাদন করতে পারে। এইরূপ পরিবর্তনের সূচনা আমাদের সামনে আগামী বার বছরের মধ্যে স্পষ্টতই দৃষ্টিগোচর হবে।

কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার সঙ্গে সারবস্তুগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিন্তার প্রয়োজন থাকতেই হবে। সব ধর্মীয় রীতিনীতির উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। ঐশ্বরিক শাসনাধীন ধর্মীয় প্রথাগুলির লক্ষ্য নিয়ম শৃংখলার মধ্যে ব্যক্তিগত অভ্যাসের মাধ্যমে চরিত্র গঠন করা। ঐ প্রথাগুলির দ্বারা অভ্যাস নয়, চরিত্র গড়ে তোলাই তলার দিকের ইচ্ছা হিসাবে কাজ করে। কেউ প্রশ্ন তুলবেন না যে, ভারতের হিন্দুধর্মের বিপুল বিস্তৃত সংস্কৃতি অপেক্ষা তার আদর্শের ফসল আরও গর্বের কারণ। একথা সত্য যে জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতেই একজন কপর্দকহীন পরিব্রাজক মর্যাদায় একজন রাজাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। আবার, জনকের মত রাজা ও শুকদেবের মত চরিত্রের মহত্তর কাহিনীও আছে।

এখন আমরা চরিত্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে অভ্যাসের মূল্য যে একটি উপাদান এবিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। আমরা দেখতে পাই, ভারতে সমাজ একজন মানুষের সারা জীবনের উপর লক্ষ্য রাখে। সে কোন সময়ে স্নান করে, খায়, প্রার্থনা করে, তার চলাফেরার ধরন এবং বোধহয় কোন ফ্যাশনে

ভুলের বিন্যাস করে এই সব কিছুকেই সমালোচনা করতে সর্বদা প্রস্তুত। বিবাহ বা শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন কিছু প্রবর্তনের চেষ্টা করে সামাজিক প্রথা প্রবর্তনের ঐকান্তিক কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আতঙ্কজনক জনমত শুধু স্বার্থপরই নয়, পূজার মন্দিরে ঢুকে চুরি করার মত অপবিত্র কাজ। যতই লোকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে, এই ধরনের সমালোচনা তত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রতর কোন সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব চিহ্নিত করার সাহস রাখে, তার পক্ষে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজের পথে চলা দুঃসাহসিকতার নামান্তর। সুতরাং, পুঞ্জীভূত মানুষের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বহুগুণ বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে। নীচ সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতদুষ্ট বিচার ওজনে দ্রুততম গতিতে বৃদ্ধির পথে।

এখন আমরা এমন একটি সমাজের দিকে লক্ষ্য করতে পারি, যার মধ্যে কার্যকরী পরিণাম ও নীতিগুলি উৎসাহের সঙ্গে অনুসৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি ও সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড ভারতের মতোই কঠোরভাবে প্রত্যাশাযোগ্য। কিন্তু জনমত যথেষ্ট শক্তিশালী বিধায় এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় ঝুঁকে পড়েন। আচরণ-পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা শিশুপালনের প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেখানে মহিলারা এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই অধ্যায়ের শিক্ষা অতিক্রম করে এলে, আশা করা যায় না যে, কারও মানদণ্ড ভবিষ্যতে নীচে নেবে যাবে। যদি তাই হয়, তার অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করে কি করে তাকে শাস্তি দিতে হয়, সমাজ তা জানে। এর মধ্যে, তার পক্ষে যেগুলি অধিকতর গৌরবজনক সেইসব প্রচেষ্টায় সে এবং সমাজ যাতে সক্ষম হতে পারে এজন্য উদ্যম বিনিয়োগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, তার চোখের সামনে সম্পূর্ণ একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। যে সময় থেকে পাশ্চাত্যের একটি শিশু নার্সারী বা শিশু-প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসে, তার শিক্ষক ও অভিভাবকরা তার মধ্যে যতখানি শক্তি, উদ্যম, দায়িত্ববোধ ও বিদ্রোহের ক্ষমতা উজ্জীবিত করে, ততখানি শান্ত, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের ভাব শিখায় না। মানসিক ভাব ও স্ব-ইচ্ছা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের কাছে খুব মূল্যবান ক্ষমতা হিসাবে বিবেচিত। এই মানসিক ভাব ও ইচ্ছাশক্তিকে কোন ক্রমেই ভেঙে চুরমার করে দেওয়া বা ধ্বংস করে দেওয়া যায় না, যদিও এই গুণগুলি নিঃসন্দেহে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ব্যক্তি-স্বার্থহীনতার লক্ষ্যের অধীন। এই জন্যই খেলার মাঠে লড়াই করাকে উপহাস করা হয়ে থাকে, যা সততা ও ন্যায়বিচারের একমাত্র যুক্তি। আমরা মনে করি, কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে কোন বালককে নিষেধ করার অর্থ তার আন্তরিকতা ও সাহসের ক্ষতিসাধন করা। কিন্তু সে যদি দুর্বলতর কাউকে আঘাত করে, তাহলে তার সমকক্ষদের মধ্যে সে ধিকৃত হয়েই থাকে।

অর্থাৎ, একটি সামাজিক ক্রমবিকাশের জন্য এশিয়াতে যেক্ষেত্রে বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হয়েছে, পাশ্চাত্যের সমাজে একটি বালকের বড় জোর প্রথম দশ বছর

তাকে বড় করে তোলার জন্য দায়িত্বভার অর্পিত হয়। তারপর সে বীরত্বপূর্ণ জীবনে প্রবেশ করে। কারও কারও ধারণা অনুসারে যদি বাস্তবিকই তাই হয় যে, বিষ্ণুর দশ অবতার এক-একটি পূর্ণ জীবনেরই প্রতীক, তাহলে ভারত নিজে এই শিক্ষার দিকে লক্ষ্য দিতে ভুল করেনি। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ অবতারের অধ্যায় নিরাপদে ও আনন্দে অতিক্রম করার পর শিশুটি একটি ক্ষুদে পুরুষে পরিণত হয়েছে, এবং বুদ্ধ হওয়ার আগে তখনও তার দু'বার ক্ষত্রিয় হতে বাকী আছে। আধুনিক যুগের সর্বজনীন সংজ্ঞা যে, একজন স্বতন্ত্র মানুষ তার বিকাশের ক্ষেত্রে জাতিকেই অনুসরণ করে, এ ছাড়া আর কি হতে পারে? এবং কল্কি অবতারের সর্বশেষ পৌরাণিক মহিমা কি হতে পারে না যে, উত্তরকালের বিরাট এক বিবর্ধনেরই ভবিষ্যদ্বাণী? এবং যার মধ্যে বুদ্ধত্ব আরও একবার প্রেম ও দয়ার সার্বভৌম কর্মের দায়িত্বে ঝাঁপ দেবেন, আর আমাদের প্রত্যেকের জন্য সক্রিয় ও আগ্রাসী আদর্শের বিজয় অভিযানের সূচনা করে দেন?

তাহলে আমরা এখন মনে করতে পারি যে, হিন্দুধর্ম শুধু হিন্দু রীতিনীতি ও প্রথাগুলিরই রক্ষক নয়, হিন্দু চরিত্রের স্রষ্টাও বটে। এই কল্পনার দ্বারা কত মৌলিক ভাবে একটি পরিবর্তন কত উপায়ে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, একথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। আমাদের সামাজিক ধর্মীয় চেতনার উপর যখন আমরা হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করি, তখন আর আমরা হিংসা অথবা ভয়ে ভারাক্রান্ত হই না। প্রকৃতপক্ষে হস্তক্ষেপের ধারণা এখন পরিত্যক্ত, যেহেতু, আমাদের কাজ এখন নিজেদের রক্ষা করা নয়, অপরকে ধর্মান্তরিত করা। একটি বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির যে, আমাদের অতীতে যা ছিল, তাই শুধু আমরা রক্ষা করব না, কোনদিনই যা আমাদের ছিল না তাও আমরা জয় করে নেব। অপরে আমাদের কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে, এ প্রশ্ন আর নয়, বরং, আমরা তাদের সম্পর্কে কি চিন্তা করি, এইটেই প্রশ্ন। এ প্রশ্ন নয় যে, আমাদের কত আছে, বরং প্রশ্ন এই যে, আমরা কত সংযোজন করেছি। আমরা এখন আর ক্ষয় স্বীকার করতে পারি না, কারণ, আমরা আমাদের লড়াইকে দূরতম সীমান্তেরও বহুদূর ওপারে টেনে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছি। আমরা আর আত্মসমর্পণের স্বপ্ন দেখি না, কারণ আমাদের সংগ্রাম এক দূরবর্তী জয় ছিনিয়ে নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর আর কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের মত এত শক্তিশালী রূপান্তর ক্ষমতার অধিকারী নয়। নাগার্জুন ও বুদ্ধঘোষের মতে, বহু ছিল বাস্তব এবং অহং অবাস্তব। শংকরাচার্যের মতে একই বাস্তব, বহু অবাস্তব। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মতে বহু এবং এক একই সত্যের প্রকাশ, মানবচেতনায় বিভিন্নভাবে উপলব্ধিযোগ্য। এই অর্থ কি আমরা উপলব্ধি করতে পারি? এর অর্থ, চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা। এর অর্থ, আলস্য ও পরাজয়ের নাম নয়। এর অর্থ, নিজের মুক্তি অপেক্ষা অন্যকে

রক্ষা করা অনেকগুণ বেশি মহত্তর। এর অর্থ, মুক্তির জন্য তৃষ্ণাকে পরাস্ত করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত। এর অর্থ, সন্ন্যাসের উচ্চতম রূপ হতে পারে জয়লাভ করা। সংক্ষেপে এর অর্থ, হিন্দুধর্মের আগ্রাসীরূপ প্রতিভাত, আমাদের মাঝখানে বেজে উঠেছে কন্বির ভেরী, এবং তাঁর আহ্বান আমাদের মধ্যে যা মহৎ, যা কিছু কষ্টসাধ্য এবং যা কিছু বীরত্বপূর্ণ, সেইসবের প্রতি। তাঁর আহ্বান সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে পশ্চাদ্‌পসরণের বাদ্য আর কোনদিন শোনা যাবে না।

২

আমাদের সামনে করণীয় কাজ

"ক্ষমা যদি দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়, তা ভাল নয় ; সংগ্রামই শুভতর। ক্ষমা তখনই, যখন তুমি বিরাটসংখ্যক দেবদূতকে সহজ জয়ের পথে আনতে পারবে।"
—বিবেকানন্দ।

এটা একটা ক্ষুদ্র বিস্ময়ের ব্যাপার, যদি পুরাতন রূপ থেকে নূতনরূপে সংক্রমণের কাজে, যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য কয়েক শতাব্দীর চিন্তাপ্রণালী নূতন কোন অপরীক্ষিত বা বড় জোর আধুনিকতার পথে রূপান্তরের প্রসব-বেদনাজনিত সংকট-জনক সন্ধিক্ষণে ভারত তার বুদ্ধিগত বিভ্রান্তির মধ্যে দু-একটি প্রজননকাল কাটিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলেও এমন কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। বরং, বিস্ময়কর ব্যাপার তার নূতন সমন্বয়ের গতি ও সহজ সাফল্য। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটি নূতন ভাষাকে আত্মসাৎ করতে পারা এবং তাও তার মুদ্রাক্ষর অচিন্ত্যপূর্ব, এবং আদর্শ সংস্কৃতির সোপানের প্রত্যেকটি ধাপে পরিবর্তন আনতে পারা কি ক্ষুদ্র ব্যাপার? এই ঘটনার কোথাও কোন বিকল্প আছে কি? উত্তরে জাপানের কথা বলা কেবল নির্বুদ্ধিতা মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল থেকে জাপানের সঙ্গে কদাচিৎ ভারতের তুলনা করা যায়। জাপান একটি ক্ষুদ্র ও ঘনসন্নিবিষ্ট অধিবাসীদের দ্বীপ, তাদের উৎপত্তির আদি উৎস একটাই এবং তাদের দ্বীপজাত চেতনাও শক্তিশালী। সুতরাং, যে কোনদিকে নিজেদের ইচ্ছামত তারা নিজেদের চালিত করতে পারে খুব স্বাভাবিক কারণেই। আজ ভারতে যতসংখ্যক লোক সাবলীল ইংরেজীতে কথা বলে, তাদের সংখ্যা প্রায় দুটো-তিনটে জাপানের লোকসংখ্যার একবারেরও অধিক। ইংরেজীর জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

এ যাবত যে সমস্যা দেখা গিয়েছে, জনসাধারণ আধুনিক সংস্কৃতি গ্রহণে তেমনই উৎসাহহীন, যেমন তারা প্রাচীনের প্রতিও উদাসীন। হাজার হাজার বছর ধরে যে দেশের নিঃসঙ্গ আত্মার লক্ষ্য ছিল উচ্চতম চিন্তা, তার পক্ষে হঠাৎ প্রতিটি উদ্যম, কর্ম ও পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ঘুরিয়ে দেওয়া সহজ কাজ নয়। যাই হোক, নীচের তলায় ভারতের শক্তি যথেষ্ট, ক্ষুধা ও ব্যর্থ আশার নীতিভ্রষ্টতা সত্ত্বেও, তার জনগণ এক নূতন যুগের দরজায় উপস্থিত। ভাটার টান ইতিপূর্বে চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এখন ভাগ্যের প্রতিক্রিয়া শুরু হবার সময় এসেছে। এটা এই কারণে যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় জনতা এক নজরে তাদের অতীত ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারে ও তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিতে পারবে।

ভারতে একটি কথা আছে যে মায়ার চোখে তাকে দেখার অর্থ তার ধ্বংসসাধন করা। কিন্তু, একথা আক্ষরিক অর্থে কতখানি সত্য, কম লোকেই তা বোঝেন।

যে বিপর্যয় ও প্রতিবন্ধকতা আমাদের আর বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি করতে পারছে না, তাদের পরাজিত হওয়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। যে মন্দ বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি ও স্পষ্টভাবে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করে থাকি, তার ক্ষমতা ইতিপূর্বেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদের পরাজয়ের সঠিক হিসাব করতে গেলে, একে উল্টে দিতে হবে। যখন জনগণ সমগ্রভাবে উচ্চতর থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত নিজেদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরল সোজা ও স্থির উপলব্ধির মধ্যে মিলিত হতে পারে, এবং তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ বা মোহ থাকে না, তখন ঘটনাগুলি নিজেরাই অধঃক্ষিপ্ত অবস্থায় এসে যায়। সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতার পরিচয় বিচারশক্তি। আধ্যাত্মিকতাই একমাত্র অপ্রতিরোধ্য শক্তি। দাবানলের শিখা যেমন সমগ্র অরণ্যকে বেষ্টন করে ফেলে, একটি সমগ্র জাতির মানসিক ক্ষমতাও অনুরূপ।

১৮৫৮ সাল থেকে উত্তরকালে ভারতীয় জনগণের আধুনিক চেতনাকে আত্মসাৎ করা ছাড়া সম্ভাব্য আর কোন লক্ষ্য ছিল না। ঐ সময় মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার অস্তিমলগ্ন ছিল। পৃথ্বীরাজ ও শাহজাহান, অশোক এবং আকবর একই সাধারণ বিস্মৃতির অন্ধকারে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কেবল জন্মভূমির প্রতি জনগণের ভালবাসাই নূতন দায়িত্বের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য ও নূতন অবস্থার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজেদের শক্তিতে উত্থান বা পতনের জন্য অবশিষ্ট ছিল। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যেকার পার্থক্য গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যেমন তুলনামূলক তীব্র বৈষম্য, সেইরূপই ছিল। ভাগীরথীর বাধাবন্ধহীন অজেয় প্রবাহের মত উভয়ের মিলিত ধারাতেই নব ভারতের সৃষ্টি হবে।

যাই হোক, বর্তমান কাল পর্যন্ত যুগ পরিবর্তনের শেষ অবস্থায় জাতীয় মনের পক্ষে এর বিশেষ অবস্থার স্পষ্টরূপ দেখা বা এর স্থিতিকাল বর্ণনা করার মত সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হয়নি। এখন, এর প্রথম অধ্যায় অতিক্রান্ত। ভারতীয় মন আর অন্ধের মত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না। এই মন একটি সজীব শক্তিতে জেগে উঠে তার অতীত ও বর্তমানের মূল্যায়ন করতে উদ্যত। এবং এই উপায়গুলির দ্বারা তার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য কী? আধুনিক যুগের নির্দিষ্ট সমস্যাই বা কী? সংজ্ঞা-গুলি প্রবাদতুল্য বে-পরোয়া গতি-সম্পন্ন, কিন্তু যথেষ্ট নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিষয়ের উপর কিছু বর্ণনা ও বিবেচনা কঠিন কাজ নয়। নিঃসন্দেহে আধুনিক কাল সম্পর্কে অসাধারণ ঘটনা এই যে, সমগ্রভাবে জগতের ভৌগোলিক আবিষ্কার। আধুনিক মনের একটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এই, যে সম্পূর্ণতার সঙ্গে পৃথিবীর উপরের স্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব হয়েছে, তা অন্যকোন যুগের মত নয়। বাষ্পের আবিষ্কার ও তার অনুগামী রেল এবং বাষ্পীয় পোতের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ আবিষ্কারের ফলপ্রদ কারণ এবং এর অনুবর্তী বিষয় হিসাবে বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ থেকে ব্যক্তিগত অথবা পৌরাণিক সমীকরণের শক্তি এসেছে। এই শক্তি কমবেশি সন্তোষজনকভাবে একটি নির্দিষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে স্থানীয় গোঁড়ামিকে অগ্রাহ্য করতে

পারে, এবং এই থেকেই আবার আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার জন্ম। আধুনিক সংস্কৃতি সাধারণভাবে এবং পোশাকের আবরণ ভেদ করে সব বিস্ময়কর বিষয়ের বৈচিত্র্যের নির্যাস টেনে আনার প্রচেষ্টার জন্ম ঐ শক্তি থেকে।

এইভাবে জগতের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদী ও আধ্যাত্মিক আবিষ্কার দৃঢ় অনুসরণ করেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নূতন যুগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষিত। কোন একটি বিষয় ভালরূপে জানা আজকাল আর যথেষ্ট নয়। অন্য বিষয়সমূহের মধ্যে তাঁর স্থান এবং জ্ঞানের সমগ্র পরিকল্পনায় তার সম্পর্ক অনুধাবন করার দায়িত্বও আমাদের আছে।

এর মধ্যে আধুনিকতার পথিকৃৎরা যন্ত্রের আদর্শে প্রভাবিত, যে যন্ত্রবিজ্ঞানের নিকট তাদের সফলতার জন্য ঋণ প্রচুর। এই ঘটনার মধ্যে আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থার ও দক্ষতার মানদণ্ড খুঁজে দেখতে পারি। একটি বৃহৎ ব্যবসা-কেন্দ্র তার কর্মচারীবর্গ সহ সাধারণত একটি জটিল ধরনের মানবিক যন্ত্র। একথা বলা হয়েছে, পাশ্চাত্যে যেমন বহুসংখ্যক গোপন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে, প্রাচ্যদেশীয়রা তেমন ভৃত্যদের ব্যক্তিগত পরিচর্যাকারী বলে গণ্য করে। এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নাই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাচ্যদেশীয়রা কৃষক; বীজ বোনা ও ফসল কাটার সময়, গোশালা ও শস্যাগারে চিত্রবৎ বিশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত এবং এসবের জন্য তাদের মনে কোন যন্ত্রণাদায়ক ক্ষোভ নাই। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যবাসীর প্রতিটি চিন্তা ও অভ্যাস যান্ত্রিক নির্ভুলতা ও দক্ষতাদ্বারা এবং যন্ত্রনির্মাতার সম্ভাব্য উপায়ে সর্বাধিক মিতব্যয়িতাদ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টায় প্রভাবিত।

কোন সমাজে উচ্চতম জ্ঞান দ্বিবিধ বিজ্ঞানের অভীপ্সা ও সমন্বয়কে পূর্ণ করে, সেখানে প্রাদেশিকতা বড় পাপ। এবং, একত্রে নূতন জগতের সঙ্গে পুরাতনের পার্থক্য আছে, আর মধ্যে অভিজাতদের রুচিই ছিল প্রধানতম বিষয়। অশ্লীলতাই সাংঘাতিক অপরাধ।

যেহেতু, প্রাদেশিক সংকীর্ণতার মধ্যে আজকালকার বুদ্ধিগত ও সমাজগত বিরাট ব্যর্থতা নিহিত, কোন গুরুতর চিন্তাশীল মন এরূপ ধারণা পোষণ করে না যে, বিশ্বজনীন ধারণা সহজে অর্জন করা সম্ভব। যে গাছের শেকড় মাটির গভীরে সুদৃঢ়সংবদ্ধ, তা আমাদের সম্পূর্ণ পত্রপুষ্পের শোভা উপহার দিতে পারে। অনুরূপ, কেবল সেই হৃদয় যে অবিলম্বে প্রত্যক্ষ পরিবেশের দাবির কাছে সাড়া দিতে পারে ও যে চরিত্র তার নাগরিক কর্তব্যের নির্দিষ্ট অংশ চূড়ান্তরূপে সার্থক করতে পারে, কেবল সেই হৃদয় ও মনের অধিকারী ব্যক্তিই প্রকৃত বিশ্বনাগরিকতার পর্যায়ে নিজের স্থান অর্জন করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখে। সম্ভবত একজন পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি বিশ্ব-জাতীয়তার ক্ষেত্রে তার অবদান দিতে পারে।

আজকাল জগৎব্যাপী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা এ কথাটা বোঝেন। যে তরুণ কাম্স্কাটকা অথবা উগাণ্ডাতে তার গ্রামকে পেছনে ফেলে রেখে ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক

রীতিনীতি ও অভ্যাসের মধ্যে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে এবং এই কারণে নিজেকে একজন উচ্চস্থানীয় ব্যক্তি ও নিজের দেশের জনসাধারণের একজন উপযুক্ত সমালোচক বলে মনে করে, তার উন্নাসিক দৃঢ়ভঙ্গি শুধু হাসিরই উদ্রেক করে। তার সাহচর্য কেউ কামনা করে না, কারণ, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে বলে সে এতখানি গর্বিত, তাদের চিন্তাজগতে দেবার মত তার কিছুই নাই। তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণের দ্বারা কপালের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়ে যায়, "হীন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি" এই কথাগুলি।

অপরপক্ষে, কেউ যদি কামস্কাটকা অথবা উগাণ্ডায় তার স্থানীয় গ্রামীণ কুসংস্কারগুলি নাছোড়বান্দা হয়ে আঁকড়ে থাকে, তা যথেষ্ট পুরুষকার ও আত্মসম্মানের পরিচয় হলেও অত্যন্ত তুচ্ছ। অশ্লীল হওয়া অপেক্ষা প্রাদেশিক হওয়া বরং ভাল, কারণ অশ্লীলতা সম্পর্কে আমাদের আতঙ্ক দীর্ঘদিনের সৃষ্টি। উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকরী সাফল্য অর্জিত হয় না। আজকের যুগ আমাদের কাছে দাবি করে, আমাদের সমগ্র অতীতকে এই পার্থিব জীবনের একটি অংশ করে নিতে হবে। একেই বলা হয়, জাতীয় ধারণায় উপলব্ধি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই জাতীয় ধারণাকে বিশ্বজনীন ধারণার মধ্যেই অনুভব করতে হবে। আরও অধিক দানের ক্ষমতালাভের জন্য আমরা যে কোন রীতিনীতির বাধা ভেঙে ফেলতে পারি। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও অপ্রতিহত যে, যদি আমরা কোন নীচ বা স্বার্থপর মতলব সিদ্ধির জন্য আমাদের প্রথাগুলিকে বিসর্জন দিয়ে থাকি, সর্বত্র সুরুচিসম্পন্ন পুরুষ ও নারীরা তাদের সাহচর্য দিতে আমাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

সুতরাং, কোন মানুষের পক্ষে চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে বিশ্ব-জাতীয়তা অর্জন সহজলভ্য নয়। একমাত্র নিজের পূর্ণ স্বাজাত্যবোধের মাধ্যমেই যে কেউ যে কোনস্থানে এটি অর্জন করতে পারে। বিশ্বধারণার মধ্যে স্থানীয় ধারণার অন্তর্ভুক্তিই বিশ্ব-জাতীয়তা। এটা সুস্পষ্ট যে, সংস্কৃতি কোন তথ্যমূলক বিষয় নয়, সহানুভূতির বিষয়। সমগ্র মানবচেতনার অনুশীলন করা আধুনিক শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, শুধুমাত্র ভৌগোলিক জ্ঞান দ্বারা একে লাভ করা যাবে না। জগতের ঐক্যসাধন মানুষের মনকে কিছুটা মুক্তি দিতে পেরেছে। এবং, এখন আমরা বুঝতে পারি যে, একজন মানুষের চরিত্র তার অঙ্গীভূত অভিজ্ঞতাসমূহের সমষ্টি। অন্য কথায় তার ইতিহাস তারই মুখের ওপর লেখা আছে। ব্যক্তি-চরিত্রের ক্ষেত্রে যে কথা সত্য, আমরা দেখতে পাই, দেশগুলির ক্ষেত্রেও সে কথা সত্য। ভু-চিত্রই মানুষের আশা ও স্বপ্নের চাবিকাঠি। তাদের আশা ও স্বপ্ন, যে উত্তরাধিকার তারা ফেলে এসেছে, তারই বর্ণনা দেয়। সুতরাং, ভূগোলের মত ইতিহাসও আধুনিক সচেতনতার জন্য সমানভাবে অপরিহার্য। এটি ছিল সত্যের দ্বিতীয় বিস্তার, আর, এখন আমরা চাই, ইতিহাস হোক অবারিত ও প্রচণ্ড শক্তিশালী।

আমাদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ধ্যান-ধারণাকে বদলে দিচ্ছে। আমরা

নূতন করে আমাদের জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি, এবং এখন আর আমরা কুকুরকে কুকুর ও গরুকে গরু হিসাবে বিচার করে সন্তুষ্ট নই, বরং তাদের সব যোগসূত্র ও বিকাশের খবর জানতে চাই। বর্তমানে আমরা তাদের পার্থক্যগুলিকে তাদের সম্প্রদায়গত উৎসের মৌলিক দায়িত্ব বলে মনে করি। আমরা পাহাড় বিদীর্ণ করে জগতের অব্যবহৃত স্থানগুলিকে আবর্জনামুক্ত করে নেব ও ঘোড়ার ক্ষুর থেকে গরুর ক্ষুর, মাছ থেকে সরীসৃপ শ্রেণীর এবং উভয় থেকে পক্ষীজাতীয় শ্রেণীর পার্থক্যের স্বরূপ খুঁজে বের করে নেব, যা আমাদের কাছে বিশ্লেষণমূলক হবে।

অথবা, আমরা শিল্প ও সাহিত্যের দিকে নজর দেব। এখানে আবার আমাদের সমীক্ষা তুলনামূলক অধ্যায়ে এসে পড়েছে। আমরা যদি বাগদাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখি, তাহলে মুর অধ্যুষিত স্পেনের ইতিহাসও আমাদের জানতে হবে। ফরাসী দেশের বীরত্বের ইতিহাস জানাটাই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না তাদের জার্মানীর অরণ্যে জন্ম-বৃত্তান্ত জানতে পারি। ঐক্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা যান্ত্রিকতায় পরিণত, অভিব্যক্তিমূলক, এবং সামগ্রিকভাবে জগতের কিছু আন্দোলন ও সংঘর্ষের ছবি আমাদের পক্ষে প্রভূত কর্তৃত্বশালী বিষয় হিসাবে প্রয়োজন।

তবুও সূক্ষ্মতম রুচির মন তার নিজের অজ্ঞতার সীমায়তনের মধ্যে বন্দী। আধুনিক সংস্কৃতির জগতে কী বেদনাদায়ক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, যখন আমরা 'চীন' এই শব্দটির উপর চর্চা করি। ভারত সম্পর্কেই বা কতটুকু বলা সম্ভব হয়েছে, যাতে যে কোন একজনকে পরিশীলিত রুচির ভারতীয় অনুকম্পার একটুকরো হাসির বেশি দিতে পারে। মুসলিম জগৎ সম্পর্কে কত চরম ভুল বোঝা হয়েছে! মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক দুর্নীতি দ্বারা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জগৎ কলঙ্কিত হয় না। জ্ঞানান্বেষণের আদর্শগত বাসনার ব্যাকুলতায় জাতিগত সংকীর্ণতার স্থান নেই। তাহলে, কেনই বা একটা নীরবতা, যার প্রায় সবটাই রাজনৈতিক কারণে, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকবে, যা আধুনিক চিন্তায় প্রাচ্যদেশীয় ব্যাখ্যায় ভরে ওঠা উচিত।

ভারত সম্পর্কে এই কারণ খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট সহজ। ভারতীয় মন সামগ্রিকভাবে জগতে নিজেকে বিজয় অভিযানে প্রসারিত করেনি, এবং একান্তই তার নিজস্ব ভূমি, যার অংশ ও দায়িত্বের অধিকার রাখার চেষ্টা করেনি। তারা আধুনিক বিষয়গুলি পেয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে ও তার মধ্যে যাই থাক, আনুগত্যের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছে। আর নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব দেখে হতবুদ্ধি হয়েছে। সমগ্রভাবে ভারতীয় জনগণ গত দুই পুরুষ ধরে স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলেছে। পুরুষকারহীন, অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাহীন, এমন কি কাণ্ডজ্ঞানহীন।

কিন্তু, আজ ধীরস্থির বুদ্ধিতে আগ্রাসী কর্মপন্থা গ্রহণ করে আমরা এইসব পিছনে ফেলে এসেছি। জীবন যে সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়, একথা উপলব্ধি করে আমরা আমাদের বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং কেবলমাত্র

জগতেরসংস্কৃতি থেকে নিজেদের উপযোগিতাটুকু নেওয়া নয়, আমরা তার সমষ্টিতে আরও কিছু সাংস্কৃতিক অবদান দিতে সক্ষম হব। এর পর থেকে আমাদের ভূমিকা হবে সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় নয়। ভারতের ভারতীয়করণ, আমাদের জাতীয় চিন্তার সংগঠিত রূপদান ও আমাদের অগ্রগতির রূপরেখা, সবই আমরা নিজেরাই করব, আমাদের হয়ে অন্য কেউ করবে না। এখন থেকে আমরাই আমাদের কর্মসূচী প্রণয়নের কর্তা হব। আমরা কোন কর্মকৌশলের বাধ্য হব না, বরং, আমরাই সৃষ্টি করব কর্মকৌশল। দশ টাকার কেরানীগিরির শিক্ষানবিশীকে 'শিক্ষা' এই আখ্যা দিতে এবার থেকে আমারা প্রত্যাখ্যান করব। যথাস্থানে আমরা উপযুক্ত আখ্যাই ব্যবহার করব। শিক্ষাকে অধিষ্ঠিত করব উপযুক্ত মর্যাদায়। বুদ্ধিগতভাবে আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করব মুক্ত জীবনে। তাহলে আমাদের সামনে কাজ কী?

আমাদের কাজ প্রাচীন জ্ঞানকে আধুনিকতার উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা। পুরাতন শক্তিকে নূতনরূপে সজ্জিত করা হবে আমাদের কাজ। পুরাতনের শক্তি ছাড়া নূতনের রূপ একটা মিথ্যা অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। উপযুক্ত প্রকাশ ব্যতীত পুরাতন দিনের কালবিরুদ্ধ আদিমতার শক্তিও প্রায় একই রকম নির্বুদ্ধিতা। বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার কোন জামিনদারী নেই, কিন্তু চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

আদর্শের বিরাট জগৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার জন্য আমাদের সামনে উন্মুক্ত। জীবন, কর্তব্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে নূতন কল্পনা; নাগরিকত্বের নূতন বোধ; প্রেম ও বন্ধুত্বের অজানা অভিব্যক্তি—সমস্ত শক্তি নিয়ে এই সবকিছুর মধ্যে আমরা নিজেদের নিক্ষেপ করব, এবং আপনার করে নেব।

আমাদের জীবন্ত ভাষায় রচনা করতে হবে ভারতের ইতিহাস। ইংরেজী ভাষায় আজ পর্যন্ত যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তার শুরু ওয়ারেন হেষ্টিংস্ থেকে এবং কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস নির্দিষ্ট অপরিহার্য ভূমিকাগুলির মধ্যে ঠেসে বোঝাই করা হয়েছে এবং অসুবিধা আছে বলেই সেগুলিকে সর্বতোভাবে বাদ দেওয়া যায়নি। এ সবই কেবল ছেলেখেলা ও এগুলির প্রতিরোধ করা উচিত। প্রথম ভারতীয় ইতিহাস রচনা এখনও অসম্পূর্ণ। এই ইতিহাসকে মনুষ্যত্বপূর্ণ ও আবেগপূর্ণ করতে হবে, ভেরীধ্বনি দিয়ে করতে হবে ঘোষণা, এবং ভারতের অধিবাসী জাতিসমূহের ভগবদ্বাণী সংক্রান্ত মতবাদের কথা বলতে হবে। এবং এ কাজ করতে গেলে নূতন করে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইর সঙ্গে, যে স্থানগুলি বর্তমানের লক্ষ্যস্থল! নিশ্চয়ই, যে বীরপুত্রেরা প্রাচীন রণাঙ্গনে ঘুমিয়ে আছেন, যে পূর্বপুরুষেরা তাঁদের বিস্তৃত প্রাচীরবেষ্টিত নগরগুলি নির্মাণ করেছিলেন, যে মনীষীরা তাঁদের মূল্যবান চিন্তা ও শাস্ত্র রেখে গিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের বংশধরদের এমন অদ্ভুত বন্ধ্যা দেখে স্বর্গ থেকে যখন চোখের জল ফেলতে পারেননি, তখন হেসেছেন কখনো কখনো! ভারতবর্ষের ইতিহাস কমপক্ষে তিনহাজার বছরের বাস্তব সামাজিক স্তরের ইতিহাস ধারণ করে আছে।

সমুদ্র-তট, নদীর বালুকা, অরণ্য এবং জলাভূমি একের পর এক এসেছে এবং প্রতি যুগে কোন না কোন নূতন স্থান হয়েছে কেন্দ্রস্থল। অযোধ্যা এবং হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ এবং পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী এবং দিল্লী, কাঞ্জিভরম্ এবং অমরাবতী— কোন বিস্মৃত জগতে এদের উৎপত্তি হয়েছিল? পূজা ছাড়া কোন মতবাদ হয় না। ভারতের সন্তানগণ! এইসব স্মৃতির ও তোমাদের সমগ্র অতীতের আরাধনার মধ্যে নিজেদের নিক্ষেপ কর! প্রবল আবেগে জ্ঞানান্বেষণের প্রচেষ্টা কর। এই খননকার্যে তোমরাই কোদাল ও হাতিয়ার। কারণ, পুরাতন বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরুদ্ধারের কাজ প্রশস্ত করার জন্য চিন্তা ও ভাবা তোমাদের, বিদেশীদের নয়। ভারতের সব আশা গভীরতর গবেষণা ও ঘটনাসমূহের কঠিনতর অনুসন্ধানের মধ্যে নিহিত। তার সঙ্গে সত্যের পাশাপাশি আছে উৎসাহ, হতাশা নয়।

প্রতিটি মাতৃভাষাতে বড় বড় সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। এইসব সাহিত্যে থাকবে অতীতের কণ্ঠস্বর, বর্তমানের ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যতের বাণী। মাতৃভাষার মাধ্যমে ইউরোপের বিজ্ঞান ও কল্পনা নিয়ে এসে প্রতিটি দরজায় পৌঁছে দিতে হবে। ভারত বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির নকল করতে পারে না। আবার, বিদেশী আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাও ভারতের উচিত নয়। অতীত ইতিহাসকে সহজ ভাষায় নূতন করে লিখতে হবে। জাতির সার্বজনীন প্রার্থনার মত প্রকৃত আশা একদিন সকলের হৃদয় ভরে তুলবে। মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির উপর নারীদেরও কার্যকরী শিক্ষা নির্ভরশীল।

শিল্পকে নূতন করে সৃষ্টি করতে হবে। এখন আমরা যা জানি, সেরূপ, ইউরোপীয় শিল্পচর্চার হাস্যকর অনুকরণের জন্য যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম নয়। জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিল্পের মত আর কোন কণ্ঠস্বর নাই। একটি ছবি, একটি গান আবেগপূর্ণ আহ্বান হতে পারে, যা সব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে এক করে তুলতে পারে। শিল্পের নবজন্মের প্রয়োজন, কারণ, সে একটি নূতন বিষয় আবিষ্কার করেছে, সে বিষয়টি হল, ভারত স্বয়ং। আহা, মাদ্রাজের বীচ রোড ধরে প্রায় অনাবৃত শরীর বক্র-রেখায় দ্রুত আন্দোলিত গতিতে হেঁটে যাওয়া একজন দক্ষিণী পারিয়ার সৌন্দর্য জগৎকে কি একজন ব্রোঞ্জ-শিল্পী হয়ে উপহার দেওয়া যায়! আহা, যদি একজন মিলেট হওয়া যায়, আর, ভোরে সমুদ্রের ধারে পূজারতা মহিলাদের ছবি আঁকা যায়! আহা, একটি পেন্সিল, ভারতীয় শাড়ীর সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারে; গ্রাম ও মন্দিরের নম্র জীবন, গঙ্গার তীরে যাওয়া-আসা, শিশুদের খেলাধুলা, আরও কত মুখ, কর্মরত শ্রমিকদের আর গরুগুলির!

কিন্তু ভারতের পক্ষে আরও অনেক বেশি চাই, আমাদের প্রয়োজন শিল্পীর, অর্ধেক কবি ও অর্ধেক নক্শা-অঙ্কনকারী, যারা আমাদের বিরাট নব-চেতনার মধ্যে বিনিদ্র প্রহরারত হয়ে থাকবে। আমরা ভারতীয় রক্তের মানুষ চাই, যারা

পুরাতন দিনের মানুষদের, —ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠির, আকবর এবং শেরশাহ, প্রতাপসিংহ এবং চাঁদবিবি—এঁদের প্রতিকৃতি আঁকবে এমন ভঙ্গিতে, যা রক্তকে তোলপাড় করে তুলবে। আমরা চাই এইসবের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের কর্তব্য সম্পর্কে জনগণের কর্তব্যবোধ জেগে উঠুক, প্রসারিত হোক্। জগৎকে কেবল ভারতের কথা শোনানো নয়, ভারত নিজেকেও নিজের কথা শোনাবে—আদর্শের পবিত্র জননী শিল্পের মহৎ অভিযান, যে শিল্প বাস্তবরূপে আবৃত হয়ে মানুষের জীবনে নেমে আসে। তাই, প্রতি পদক্ষেপে এই অভিযানকে হতে হবে দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে বিশ্ব-জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কিছু অংশ যুক্ত করতে হবে, আর একদিকে ভারতকে এই প্রথম তার নিজের বাণী দিতে হবে। বর্তমান বংশধরদের সামনে যুদ্ধের এই ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের যুদ্ধ যদি যুদ্ধের মত হয়, তবে তার উপর নির্ভর করবে আমাদের ভবিষ্যৎ পুরুষের অস্তিত্ব। আমাদের জাতীয় জীবন অবশ্যই জাতীয় অবমাননায় পরিণত হয়েছে। এখনও অবরুদ্ধ শহরের বহির্বিভাগের কাজ প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়নি। তাহলে, একে এখন আমরা আক্রমণ করি এসো। অতীত ভারতের সন্তানগণ, তোমরা কি রাত্রের অন্ধকারে তোমাদের বর্মের উপর শুয়ে ঘুমুতে ভয় পাও? আধুনিক জগতের সম্পদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য নূতন এক আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে এগিয়ে চলো! ভারতমাতার সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধের প্রাচীর দখল করে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ো! সৈন্যবাহিনী সাজাও, কঠিন সংগ্রামে বিজিত দুর্গের মধ্যে পাহারা দাও, নতুবা, তোমাদের পতন হোক, যেন অন্য সকলে তোমাদের মৃতদেহের উপর পা রেখে তোমরা যতদূর উচ্চতা জয়ের জন্য সংগ্রাম করেছিলে, ততদূর উঠে যেতে পারে!

৩

আদর্শ

"তুমি যা হতে প্রার্থনা করেছ, তাই হও।"

মনের কর্মতৎপরতা বা আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার ফলে আমাদের সব তত্ত্বের পরিবর্তন সাধিত হয়। আমরা এখন লক্ষ্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। নিমিত্ত পরিণামে ও পরিণাম নিমিত্তে পরিণত হয়েছে। হিসাব পরীক্ষার ক্ষমতা ও ইতস্তত ভাব চিরকালের মত চলে গিয়েছে। ক্ষুদ্র আশাগুলিকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে আমরা বিরাট সব লক্ষ্যবস্তুর অনুসন্ধান করছি ও তাদের সৃষ্টি করছি। আমাদের চারিদিকের ভারত আজ মহাভারত ও বীরের ভারতে পরিণত। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ আমাদের আত্মত্যাগের সুযোগ অনেক বেশি দিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য, আমাদের প্রাচীন পুরুষদের চেয়েও ভবিষ্যৎ বংশধরদের আরও মহান করে তোলা।

শব্দগুলির অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। কর্ম আর অদৃষ্ট হিসাবে গণ্য নয়, বরং একটি সুযোগ। আমি কি অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করছি? অত্যাচারকে বাধা দেওয়ার অধিকার আমার আছে, এবং আমি তা করব। একজন নির্ভীক মানুষের সততাযুক্ত ঘৃণার ক্রোধের সামনে সমগ্র মায়া কেঁপে ওঠে ও পালিয়ে যায়। আমার কাছে অদৃষ্ট একটি নিষ্ক্রিয় বিষয়। আমি একে জয় করি। যে কর্মশক্তি জীবনকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করার ক্ষমতা রাখে, আমরা সেই শক্তির অধিকারী ও এর দ্বারা আমরা পৃথিবী জয় করব। কেউ এতখানি অজেয় নয় যে, মানুষ পরাজয়ের স্বপ্ন দেখেনি। জয়ের ওপারেও তার একটি জগৎ আছে, যা তাকে পেতে হবে।

আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি অপরিমেয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রেরণা দেওয়ার জন্য, নেওয়ার জন্য নয়। আমরা জয়ের আনন্দকে পিছনে পরিত্যাগ করে এগিয়ে যাব। কারণ, আমাদের স্বার্থের চেয়েও যা প্রিয়তর, আমরা আকুলভাবে সেই জীবনকে দূরে নিক্ষেপ করতে কামনা করি, এবং এই পরাজিত আত্মত্যাগ আমাদের সব কাজকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। সমগ্র জীবনটাই মৃত্যুর দুঃসাহসিক অভিযানে পরিণত হয়। যারা আমাদের ঘনিষ্ঠ তারা আমাদের দায়িত্ব ও বিরোধিতার মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়। আমরা উপলব্ধি করতে শিখি যে, এই ঘটনার মধ্যে স্বর্গসুখ নিহিত। বুদ্ধ যখন যশোধারাকে ছেড়ে চলে যান, তখন তাকে ত্যাগ করেন না। তিনি নিজের সঙ্গে তার ওপর ত্যাগের গৌরব প্রদান করেন।

অথবা এ কী ব্রহ্মচর্য? এ শুধু সন্ন্যাসীর জন্য নয়। সম্পূর্ণ দেবের ব্যাপারও নয়। "মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া উপরতি অর্থহীন। এ শুধু অপর একটি শক্তির ক্ষয়," এ কথা কেউ বলে থাকেন। তবু, ব্রহ্মচর্যকেও আগ্রাসী হতে হবে। এখানে, চিরকৌমার্য জীবনের একটি নিষ্ক্রিয় দিক, যা মনুষ্যসত্তাকে কার্যকরীভাবে মন এবং আত্মা হিসাবে

দেখে। প্রথমত, বিবাহ হওয়া উচিত মনের বন্ধুত্ব। চিন্তার বিনিময় ও সংগ্রামের অংশীদারত্ব সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের আরও অনেক ওপারে, এবং একজনকে বাদ দিয়ে চলবে না। বীরের ব্রহ্মচর্য বিবাহকে মহৎ করে তোলে, কারণ, একজনের জন্য আর একজনের কল্যাণ কামনার মধ্যেই তার পরিণতি। সত্যিকারের ব্রহ্মচর্যের মধ্যে স্ত্রী-জাতির শিক্ষা জড়িত। চিন্তা, জ্ঞান ও লব্ধ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ফললাভ পবিত্র দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়। সন্ন্যাসিনীর মত বিবাহিতা স্ত্রীরও ব্রহ্মচর্য আছে।

তপস্যার জীবন অবিরত শক্তি এবং আলোর পুনর্নবীকরণ। যিনি সরস্বতীর সাধক তাঁর নিকট প্রত্যেকটি কাজই সহজ হয়ে যায়। তিনি আরামকে পদদলিত করে চলেন। প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় তাঁর ব্যক্তিসত্তার উপর নৈর্ব্যক্তিক সত্তার জয় হতে থাকে। তাঁর আদর্শ জলন্ত অগ্নিশিখার মত উর্ধ্বগামী। প্রতিটি বৃত্তের প্রকাশ নূতনতর উচ্চতা অর্জনের ইচ্ছায়। স্ত্রী স্বামীর আদর্শের অংশ গ্রহণ করে। সে সেই আদর্শগুলিকে নিজের সন্তানের মত রক্ষা করে, এমনকি স্বামীর বিরুদ্ধেও। স্বামী একা যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে, স্ত্রী উভয়ের গৌরবের পরিমাপ করে। তার নারীত্ব চিরন্তন ঈশ্বরের অনুগ্রহের মত গভীর ও নমনীয়। দু জনের কানে বাজে একই আর্তনাদের সুর, "এ নয়, এ নয়!" স্বার্থের জন্য সুখের হিসাব তুচ্ছ জিনিস, তারা পরস্পরকে এটা দিতে চায় চারপাশের জগৎকে অবলম্বন করে।

আবার, সন্ন্যাসী এমন একটি শব্দ, যা নূতন বৈশিষ্ট্যে শক্তিসম্পন্ন। গেরুয়া পোশাকের জন্য নয়, তাঁর নিঃস্বার্থপরতার জন্যই তিনি সন্ন্যাসী। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জগতে সন্ন্যাসী হতে পারেন, হতে পারেন শিল্পকলা ও শ্রমশিল্পের জগতে সন্ন্যাসী, হতে পারেন জনজীবন ও জনসেবার সন্ন্যাসী, আর্ত অসহায়ের রক্ষক সন্ন্যাসী। ত্যাগের প্রেরণা মহৎ, মহত্তর বীরত্বপূর্ণ জীবনের উর্ধ্বায়িত আত্মত্যাগ। কখনো কখনো এ কথা বলা কঠিন হয়ে পড়ে, মহাপুরুষের জীবনে সৈনিক অথবা সন্ন্যাসী, কোন্‌টি অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট। তিনি সৈনিকের সাহস ও সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা উভয়ের যোগফল। আগামী জীবনের উপর বয়স কোন রেখাপাত করে না। তরুণ বয়সের মত বৃদ্ধ বয়সেও ইনি তালগাছের উচ্চতা থেকে নীচে ঝাঁপ দিতে পারেন। অথবা তার চেয়েও বেশি। কারণ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক ইচ্ছাশক্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে। ব্যক্তিগত আশা বা ভয় থেকে তাঁর কোন কিছুই পরিমাপ করা হয় না। সব কিছুই সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত, যেন শেষই শেষের পরিণাম। অহং বা স্বার্থ সম্ভাব্য উদ্দেশ্য থেকে বিরত হয়। যে হাত একবার কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়, তা সেইখানেই পুষ্ট হতে থাকে, এবং মানুষ জানতে পারে না, কি করে পিছন ফিরতে হয়। সন্ন্যাসীকে দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর কাছে পরাজয় একটি চলমান অধ্যায়। চরম সাফল্য অনিবার্য। জয়ের মত পরাজয়েও তিনি আনন্দময়।

গুরুর প্রতি আনুগত্য একটি ভাবের ব্যাকুল সার্থকতায় পরিণত হয় এবং নূতন নূতন পথের অনুসন্ধান, যার মধ্যে চরিতার্থতা আসতে পারে। অভীষ্টলাভের প্রতিটি কাজ এখন আধ্যাত্মিক সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হয় এবং প্রতিটি উপলব্ধি শিষ্যদের

উত্তরাধিকার সূত্রে না দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বিরাম নাই। এই সঙ্গে শিষ্যত্বের মানদণ্ডও বিরাট উন্নত পর্যায়ে পৌঁচেছে। খাঁটি বলে জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া যায় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে সেবার কাজ করতেই হবে, কারণ, যথেষ্ট সেবা ছাড়া সত্যের বীজ অংকুরিত হয় না। সে পূজা আরাধনা করবেই, কারণ প্রেম বা কর্তব্যনিষ্ঠা ছাড়া মনুষ্যত্ব জাগে না। কিন্তু, আন্তরিকতায় একবিন্দু কলঙ্ক, স্বার্থপরতার জন্য ত্রুটি, গুরু অবশ্যই বুঝতে পারেন। যদিও এই কাজ করার অর্থ সারা জীবন পশুর মত কাটানো, —এবং ঠিক এই প্রকৃতির চেলা গুরুরা কখনো চান না।

ভালবাসা এবং ঘৃণা আজকাল প্রচণ্ড শক্তিশালী। প্রেম বা ভালবাসা যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে না, তখন সব শক্তি জাগ্রত, প্রাণবন্ত ও জীবনদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ঘৃণা আপোস মীমাংসার বিরুদ্ধে একটি প্রত্যাখ্যান। এ সংকীর্ণতা এবং মিথ্যার শেকড় ও ডালপালাকে ছেদন করে। এখন, যা কিছু আন্তরিক, তার পেছনে উদ্দেশ্যের ঐক্য খুঁজে পায়। অহংকার নিজেকে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত করে অত্যন্ত বেশি অহংকৃত হয়। যতক্ষণ না সে তার প্রথম কাজটি সমাধা করে, লোকটি নীরব থাকে। তার পূর্বপুরুষদের কার্যকলাপ ও সহযোগীদের সাফল্য সম্পর্কে সে নিজে সাহস করে দম্ভ বোধ করে না। একটা হিংস্র নীচতা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে থাকে ও তাকে বলে যে, অযোগ্য লোকের স্তুতি অপবিত্রতা।

এবং শেষে জীবনের উদ্দেশ্য একটি ধ্বংসকারী আগুনে পরিণত হয়। লক্ষ্যবস্তু প্রার্থিত হয় তার তার নিজেরই প্রয়োজনে। শিবি-রাণার মত, যার সমগ্র আত্মা উৎসর্গীকৃত, তাঁর বাম অংশ কেঁদে উঠত যন্ত্রণার জন্য নির্দিষ্ট ডান অংশের জন্য।

জার্মান রসায়নবিদ ময়ারের একটি চোখ ও একটি হাত নাইট্রোজেন কমপাউণ্ড আবিষ্কার করতে গিয়ে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে আত্মা নতজানু হয়ে ভাবাবেশে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিল, জ্ঞানের অনুসন্ধান অব্যাহত রাখার জন্য এখনও অনেক বাকী আছে। কাজ—এই শব্দটি যখন এরূপ লোকের দ্বারা উচ্চারিত হয়,তখন অন্য হৃদয়গুলিতে জ্ঞানের শিহরণ বয়ে যায়।

বজ্রের মত শক্তিশালী, ব্রহ্মচারীর মত কঠোর আত্মসংযমী, মহান হৃদয় ও নিঃস্বার্থপর যাঁরা তাঁরাই সন্ন্যাসী হতে পারেন এবং জঙ্গী হিন্দুধর্মের কোন সন্তানই এর থেকে এতটুকু কম হলে চলবে না।

৪

আদর্শের পথে

অজ্ঞতার সবকটি রূপের মধ্যে এখনই কয়েকটি এত সংকীর্ণ ও তার মধ্যে স্বকীয় আদর্শপ্রিয়তার ফাঁদে যেন সহজেই পড়ে যাওয়া যায়। ক্রমোন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে কেমন করে আমরা কেবল আমাদের অতীতেরই পূজা করে থাকি! প্রায় সব ভাল লোকেরাই তাদের প্রথম যৌবনের প্রগাঢ় শক্তি ও অনুরাগ সম্পর্কে সচেতন। তারা পেছন ফিরে তাকাতে অভ্যস্ত ও ভবিষ্যতেও চিরকাল তাই করে থাকে। সেই প্রথম জীবন যে বাহ্যিক আকার গ্রহণ করেছিল, তারা সারা জীবনব্যাপী চেষ্টা করে তাদের অতীত জীবনের সেই বিশেষ রূপটি অন্যের উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে। প্রকৃত স্বাধীনতা একটি জিনিস যার আভাস আমাদের খুব কম লোকই পেয়েছে।

বর্তমান সময়ে এই স্বকীয় আদর্শ অত্যন্ত সংকটের কারণ। এই একটি সময় যখন আমরা আদর্শগুলির পুনরুদ্ধার করতে পারি। আমরা সব সময় আমাদের বিকাশের সেই সূত্রটি পুনরুদ্ধারের জন্য অতীতের গভীরে ডুব দিচ্ছি। যে নাম আমরা বহন করি, তার স্থান ঊর্ধ্বে স্থাপিত। আমরা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের প্রশংসা করে থাকি। মনে হয়, আকাশ পর্যন্ত আমরা আমাদের গুণকীর্তন করি। যাই হোক, এইসবের প্রয়োজন উৎসাহ সৃষ্টির জন্য, এত বেশি আত্মগর্বের জন্য নয়। বক্তা সামনের জনতাকে উদ্দেশ করে ঘোষণা করছে, "হে ঋষিদের সন্তানগণ!" কিন্তু যদি কোন সাধারণ লোক এমন ধারণা পোষণ করে যে, সেও একজন ঋষি, তাহলে সেটা তার তামসের পরিচয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। এমন প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই বক্তার পক্ষে প্রত্যাশিত ছিল না।

অনুরূপভাবে, আমরা যখন বলি খ্রীষ্ট ইউরোপে এশিয়াবাসীর প্রতিনিধি, অর্থাৎ আমরা এশিয়ার আদর্শকে বোঝাতে চাই, ফুটপাথের উপর সম্ভাব্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে নয়। এই বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তার জন্য আমাদের যথেষ্ট সাবধান হতে হবে। বহু লোক তিরিশ কোটি মানুষের জন্য এমন প্রস্তাব করে থাকে যে, তারা যীশু, চৈতন্য আর তুকারামের জীবন-পদ্ধতি অভ্যাস করুক, এবং কোন কিছুই তাদের এ পথ থেকে বিরত করতে পারবে না।

কোন কিছুই বিরত করতে পারবে না তাদের! অবশ্যই নয়, যদি আমাদের প্রত্যেকেই এক-একজন চৈতন্য বা যীশু হতে পারে! খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছিলেন, "একটা ভেড়ী যেমন তার লোমকর্তকের সামনে বোবা হয়ে থাকে, সেরূপ তিনিও তাঁর মুখ খুললেন না।" কিন্তু আমাদের নীরবতা কি এর মত এতখানি অলংকারপটু?

কেবল তামস থেকেই এইসব ভুল হয়। খ্রীষ্টের পদ্ধতি তাকে জয়মাল্য

এনে দেবে না, যে ব্যক্তি খ্রীষ্ট নয়। সে যদি ভেড়ার মত বোবা হয়ে থাকে, তবে সেটা নিছক ভেড়াবৃত্তির পরিচয় হবে, কিছুই হবে না খ্রীষ্টের মত।

তামসিক ব্যক্তি আরও বলে, "যতক্ষণ না আমি তাঁর মত হচ্ছি, আমাকে ততক্ষণ জয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে দাও।" খুব ভাল কথা, যদি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন মনোভাবের পথে তা হয়! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তোমার জন্য, তা নয়। কেবল সেই মানুষ, যে নিজেকে বিস্মৃত হতে পারে, জয়ের জন্য খ্রীষ্টত্বে সে পৌঁছতে পারে। বুদ্ধের পক্ষে বুদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়েছিল, তার আগে তাঁকে ক্ষুদ্রতর পাঁচশ পরিণামের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। প্রতিবার তিনি ভুলেছিলেন নিজেকে, ভুলেছিলেন মৃত্যু, পরবর্তী চিন্তা না করে মিশে গিয়েছিলেন সংগ্রামের মধ্যে। শেষে তিনি লাভ করেছিলেন এই জগতের সাম্রাজ্য, এবং তার ওপরে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তাঁকে এই সাম্রাজ্যের নিশ্চয়তা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, যা তাঁকে আত্মার কাছে করুণার আধার করেছিল।

মায়ার পরপারে প্রত্যেক মানুষেরই নিজের ক্রমোন্নতির উপায় আছে। একটির পর একটি পাথরে পা ফেলে ফেলে আমরা এগোই। আমার সমগ্র আত্মাকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। আমাদের অধিকাংশই এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হব না; আমাদের বেশির ভাগই অব্যবহিত পরিণাম মাত্র। তবু, যাই হোক না কেন তার জন্য নিজেকে অর্থাৎ অহং ভুলতে হবে। কেবল কর্মের মধ্য দিয়ে কর্মের ওপরে যা আছে, সেই উচ্চতায় উঠতে পারি। কারণসমূহ পূর্ণ করে রেখেছে জগৎকে, যে জন্য মানুষ তার সব দিতে পারে। যে দড়ির সাহায্যে আমরা মুক্তি পর্যন্ত নিজেদের নিয়ে যেতে পারি, তা এখন দৃশ্যের আড়ালে। কত আত্মা, কত ক্ষেত্র, সব আত্মার জন্য একটিমাত্র নীতি উপদেশ নয়। কিন্তু সকলের জন্য একটি নিয়ম আছে: কেবল ত্যাগের দ্বারা, অহং বিস্মৃত হয়ে মানুষ চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে।

তোমরা যদি অহং বিস্মৃত হতে পার, তখন যে কোন বিষয় শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ ছাড়া, আমাদের কাছে, আবেদন সৃষ্টি করতে পারবে। পরের মঙ্গলই যে শেষ কথা, আমাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করবে। আমরা আর তত্ত্ব, আদর্শ, পদ্ধতি ও পরিকল্পনা নিয়ে সময় নষ্ট করব না। আমরা বেঁচে থাকব পরের মঙ্গলের জন্য, মিশে যাব সংগ্রামের মধ্যে। সংগ্রাম, সৈনিক ও শত্রু সব এক হয়ে যাবে। আমাদের শুধু কর্মেই অধিকার, কর্মের ফলে কখনোই নয়।

পরিশ্রমসাধ্য কর্মের যুগগুলি অনেকের কাছে ঈশ্বর চেতনাতে পৌঁছানোর সুযোগ। অগ্নিপরীক্ষার জন্য আমরা আকুলভাবে স্পন্দিত, সক্রিয় সেবার জন্য আমরা তৃষ্ণার্ত। এমন নয় যে যোগ্যতা অর্জন করেছি, কিন্তু কামানের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যোগ্য হতে পারি। "যুদ্ধের আগুনে নিজেকে নৈবেদ্যের মত উৎসর্গ করে, ভয়ংকর আতংকজনক মুহূর্তে ভীত না হয়ে দুর্যোধন কি এই সুখ লাভ করেছিল! কী বীরধর্মোচিত প্রশংসা! কী বীরত্বপূর্ণ পথ!" অবস্থা ভাল না হলেও, তার পরিবর্তন সাধন

করে আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল হতে পারি।"—একথা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

সুতরাং, এই জগৎ একটি বিদ্যালয়, আত্মার চর্চার জন্য একটি ক্ষেত্র। মানবতা আয়নার তৈরি একটি বড় হলঘর নয় যে, যাতে একই চেহারা এখানে ভাল, ওখানে মন্দ এইভাবে বারবার প্রতিফলিত হতে থাকবে। নিজের চরমপ্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা আকুল এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তা পেতে চান। আদর্শ জীবন থেকে আমরা যা পেতে পারি, তা হল সেই নিয়ম, যে নিয়ম তাঁদের জীবনের পথপ্রদর্শক, সেই লক্ষ্য, যে লক্ষ্যের জন্য তাঁরা কঠোর চেষ্টা করেছেন। ত্যাগ! ত্যাগ! ত্যাগ! ত্যাগের বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দাও! তোমাদের সময়ের গুরুত্বকে স্বীকার কর, স্বীকার কর তোমাদের স্থানের প্রয়োজনকে উপাদান হিসাবে, যা থেকে তোমাদের আত্মা দুস্তর পারাবারের জন্য তার নিজের নৌকা তৈরি করে নেবে। এটা ভেবো না যে, আগে যাঁরা চলে গিয়েছেন, তোমারটা তাদের সঠিক অনুকরণ হবে। শুধুমাত্র শপথের জন্য তাঁদের দিকে তাকাও যে, তাঁরা যেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, সেখানে তোমাদের ব্যর্থতা চরমতম হবে না। তারপর ভরসা করে ঝাঁপিয়ে পড়। নিজেকে আবিষ্কারের জন্য সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়! এবং তোমার অগ্রগতি, যারা এখনও বেরোয়নি, তাদের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার বহ্নিমান অগ্নিশিখা হোক!

জগন্মাতা কালী

প্রতীক সম্পর্কে দু-চার কথা

আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীক আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারা জাত; কিন্তু কোন প্রতীক কল্পনার মূলেই সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন প্রতীতির সন্ধান মেলে না।

আমরা ভাষারূপী যে প্রতীকচিহ্নের সঙ্গে পরিচিত সে ক্ষেত্রেও একথা সত্য। সমস্ত বিশ্ব জুড়েই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সরল চাহিদাগুলির স্বরূপ মোটা-মুটিভাবে এক। কাজেই প্রতিটি দেশের পক্ষে উপযোগী হবে এমন কথাই আমরা খুঁজে বেড়াই।

তথাপি এও আমরা জানি যে, প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব ভাষায় তার বিশেষ ভাব-ভাবনাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, অন্যরা থাকে উপেক্ষিত। কোন ভাষাতেই আমরা অবিকল এক ধরনের দাঢ্য বা দুর্বলতার পুনরাবৃত্তি দেখি না; আমরা আরও গভীরে গেলে দেখতে পাব যে দেশের পরিবেশ ও প্রকৃতির কারণেই বিভিন্ন ভাবনা ও অভিব্যক্তিতে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়।

উত্তরে আমরা "সায়ংকাল" সংজ্ঞা, দিন ও রাতের মাঝামাঝি সুনির্দিষ্ট একটি সময়কালকে বোঝাতে ব্যবহার করি। ভারতবর্ষে ওই একই সময়সীমা "সন্ধিকাল" অভিধায় অভিহিত হয়, কারণ তথায় আধো-আলোর ক্ষণ বড় একটা নাই—মনে হয়, সূর্য এসে যেন আধারে বিলীন হয়ে যায়।

উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। আমাদের "গ্লোমিং" অর্থাৎ সন্ধ্যালোক শব্দটি বিবিধ ভাবানুষঙ্গের ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ—ঘনায়মান প্রদোষের প্রাণস্পন্দন, ঘরে ফেরার কোমল অনুভূতি, শিশুদের তন্দ্রালু হাসি—স-ব মিলিয়ে এক সমৃদ্ধ ভাবের মূর্ছনা। ভারতীয়দের "গোধূলিকাল" শব্দটির মধ্যেও এই একই ভাবাবেগ অনুরণিত।

পার্থক্যটা চিত্রগত। তা যেন ছবির মত চোখে ভাসে। রাত হয়ে আসছে—রাখাল-বালিকা চারণভূমি থেকে "শ্যামলী-ধবলী"কে গ্রামে স্বগৃহে নিয়ে চলেছে। তারা চলার বেগে রৌদ্রে ঝলসিত পথে "রাঙা ধুলোর মেঘ" সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। স্বয়ং গোপালিকার ছায়া চারণক্ষেত্রের উপরে দীর্ঘতর হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে—সব কিছুই দ্রুত অস্পষ্ট আকার ধারণ করছে, সমস্ত বায়ুমণ্ডল ধুলোয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যেন।

এই "গোধূলি" শব্দটির মধ্যে একান্তভাবেই প্রাচ্যদেশীয় বিশিষ্ট অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়েছে। গরু সম্পর্কে যা কিছু লক্ষণীয়, তাকে জড়িয়ে যা কিছু ভক্তি ! ভালোবাসার আবেগ সব কিছুই বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গোক্ষুরের আঘাতে সৃষ্ট গহ্বরে যে পরিমাণ জল ধরে তাই পরিমাপের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করার পদ্ধতি আর্যজাতির মধ্যে সুপরিচিত।

যদিও প্রধানত প্রকৃতি অনুসারেই ভাষার বিকাশ সাধিত হয়, তবে ব্যক্তিবিশেষ বা জাতির চরিত্র অনুযায়ীও প্রতিটি ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভেদ ঘটে। এ নিয়ে আর বিতর্ক চালান নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মীয় প্রতীকের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কারণ সত্য। সম্যক্ উপলব্ধির অভাবে আমাদের ধারণা-আরোপিত কৃত্রিম মুখাবরণের আড়াল থেকে সেই শাশ্বত জ্যোতিকে অবলোকনের প্রয়াস করতে হয়। কিন্তু এই আবরণও আমরা একইভাবে ধারণ করি না সম্ভবত—কেউ কেউ নিজস্ব ধারায় বাড়তে বাড়তে নানা খাতে এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে মূল কেন্দ্র থেকে বহুদূরে সরে আসে—এবং এ যাবৎ সম্যক সংবিদসঞ্জাত খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম প্রমুখ যেসব মহান ধর্মীয় ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া গেছে তার চরম সীমা চিহ্নিত করে।

এই কাজ করা অথবা পুরাতন ধর্মবিশ্বাসের ধ্বজাকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতিকে নতুন মিলনক্ষেত্রে জড় করাই ধর্মীয় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট সাধনা।

তাই যীশুখ্রীষ্ট ইহুদীদের ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য যারা সুরক্ষিত হয়ে তাঁর মানসশক্তি বলে আত্মিক জয়লাভ করেছিলেন এবং তাঁর জয়ধ্বজা ভালোবাসা ও করুণার রাজ্যে বয়ে নিয়ে গেছিলেন—এই রাজ্যের সন্ধান সংগ্রামী আত্মারা তাঁর আবির্ভাবের আগেও পেয়েছিল কিন্তু প্রেম ও করুণাকেই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ও মর্মশক্তি হিসাবে গ্রহণ করার মত পর্যাপ্ত বলিষ্ঠতা তাদের ছিল না।

আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ধারণা অনুসারে চিন্তা করে এবং নিজস্ব জীবন পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেও ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যের ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার জবাব স্বরূপ বিশ্ববাসীর স্বপ্নাতীত পথের সন্ধান দিতে পারে। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের সম্ভাবনা কি ম্যানিং-এর জীবন সমৃদ্ধতর করতে পারত না? কিংবা প্রোটেস্টাণ্ট চেতনা ফ্রান্সিস হ্যাভারগলের জন্যে যথেষ্ট ছিল না?

এই বক্তব্য সত্য হলে বলতে হয় যে, সব মানুষেরই কল্পনা বা কল্পিত মূর্তি আমাদের সকলের জন্যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। উক্ত কৃত্রিম আবরণ সৃষ্টির মূলে আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারা প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থাকে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে থাকে আমাদের চিন্তাধারার উপরে প্রচলিত প্রথা ও রীতির প্রতিক্রিয়া। সকল আবরণের ধর্ম অনুযায়ীই আলোচ্য আবরণও যুগপৎ দর্শন লাভ ঘটায় ও দর্শনশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে। একমাত্র প্রতিটি প্রতীকমূর্তির পূর্ণ অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে চিরন্তন মানবজিজ্ঞাসার সার্বিক পরিচয় পেতে পারি।

কিন্তু, সব আবরণ যাক ঘুচে।

সব রকম প্রতীক, আবরণ বা প্রতিবন্ধকতামুক্ত স্বয়ম্ভর পবিত্র ও অনির্বাণ শিখার স্পর্শলাভ করাই হোক আমাদের এক ও অদ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা। আমরা যদি বেঁচে থেকে সেই পরমপুরুষের দর্শনলাভ না করতে পারি, তাহলে মরণই আমাদের শ্রেয়—মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কি আছে? আদি পবিত্রাগ্নি আমাদের গ্রাস করুক বা মহাসমুদ্রের তরঙ্গে আমরা মিলিয়ে যাই না কেন, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা যেন জীবাত্মা ও

স্বর্গীয় সুধা, যার জন্তে প্রথমোক্তের আকণ্ঠ পিপাসা,—মাঝখানে আড়াল না রচনা করে। উভয়ের মাঝখানে কোন তৃতীয় পক্ষের ছায়াও যেন না পড়ে।

এ কথা পরম সত্য, তথাপি আমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরসাধনার নিজস্ব নির্বাচিত পদ্ধতি আছে। আমরা এখনও হয়ত খুঁজে বেড়াই কখন এবং কোথায় সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষ আমাদের চর্মচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করে আছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরের অন্তঃস্থলে এই প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে যে সেই পরমক্ষণ একদিন আসবে যেদিন গোপন সংকেত সবুজ হয়ে উঠবে এবং সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার নাম আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করবে এবং যে কোনভাবেই হোক কোন এক সময়, কোন একদিন মহাশান্তিধামের তোরণ অতিক্রম করে সেই পথে প্রবেশ করব—যে পথের শেষে আমরা পাব স্বর্গীয় সত্তার দর্শন।

যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পরমমুহূর্ত আসছে, ততক্ষণ হিন্দুকবির লোকগীতির সহজ সুরে নিজেকে শোনান চলে—

তুলসীরে, তুই এই ধরাতে আসি
সবার সাথে কাটাস দিবানিশি
কেউ কি জানে কখন কেমন বেশে
স্বয়ং তিনি ধরা দেবেন এসে।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাই আমাদের আরাধ্য দেব-প্রতীকের জন্ম দেয়।

মরুভূমিবাসী আরবদের পিতৃশাসিত সমাজের রীতিনীতি অনুসারে পিতাই হলেন পরিবারের মাথা, যিনি প্রশান্তচিত্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, ধীর বিচারক্ষমতাসম্পন্ন, যিনি জাতি-গোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা—শিশুর মত যারা তাঁকে আঁকড়ে ধরে তাদের কাছে তিনি পরম প্রেমময়, তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় সকলেই নিরাপত্তা অনুভব করে।

স্বভাবতই এই আরবীয় সংস্কারপুষ্ট সেমিটিক মন জীবাত্মা ও পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে অর্থাৎ পারস্পরিক ভাববিনিময়ের যোগসূত্র খুঁজতে বসে "পিতা"—এই মহান শব্দ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

ঈশ্বর আমাদের পরম পিতা—চূড়ান্ত বিপথগামী সন্তানের সঙ্গেও তিনি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা—সন্তানের শত পাপও তাঁকে সন্তানের প্রতি বিমুখ করতে পারে না (মানবিক বন্ধন যদি কোন কারণেই ছিন্ন না হয়, স্বর্গীয় পিতার ক্ষেত্রেই বা তাহলে অন্যথা হবে কেন); "পিতা"—এই শব্দটিতে এমনই ঘনিষ্ঠতার সুর যে বলিষ্ঠকায় আফগানেরা মসজিদে মসজিদে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণতি নিবেদনের সময় আরাধ্যকে সম্বোধন করে "তুমি" অথবা "তুই"—যেন পিতার জানু আঁকড়ে থাকা এক নিশ্চিন্ত শিশু।

আর্য-গৃহে স্ত্রীজাতির স্থান সর্বোচ্চে। পাশ্চাত্যদেশে স্ত্রী-ই হল স্বামীর জীবনের অধীশ্বরী ও পরম শ্রদ্ধেয়া, প্রাচ্যে তেমনই জননী হলেন পুত্রের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা পরমারাধ্যা দেবী—তিনি হলেন শান্তি ও শুচিতার আধার।

খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সম্পর্কে যে নিবিড় ধারণা—যেমন, মাতৃস্নেহভুজে আবদ্ধ শিশু যীশু—তার গভীরতার সংস্পর্শে এসে এক প্রগাঢ় অনুভূতি আমাদের আলোড়িত করে। একটি আদর্শ রমণী হৃদয়—যা সাতটি দুঃখের তীরে বিদ্ধ, যা পরম মমতা বুকে নিয়ে প্রজ্বলিত অগ্নির মুখোমুখি হয় অথবা শিশুর দোলনার পাশে স্নেহছলছল মাতৃমূর্তি, কিংবা ক্রুশের সামনে উপাসিকা, আবার, চরম অবমানিত অবস্থাতেও পরম মহিমান্বিতা—এ সবই মানবতার ভাণ্ডারে ক্যাথলিক চার্চের বহুমূল্য দান।

রসেটির সনেটে এই নারীত্বেরই অতুলনীয় রূপের অনুপম বন্দনা :

"এই যে বিধাতার আশিসধন্য মেরী—ঈশ্বরের মনোনীত কুমারী কন্যা। বহুদিন গত—তরুণী তিনি, বাস করতেন গ্যালিলীর ন্যাজারাথে...ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে তিনি নিবেদন করলেন ভক্তিঘন শ্রদ্ধা—দেখালেন ধীশক্তির প্রগাঢ় ঋজুতা ও মহত্তম ধীরতা....এইভাবে শুভ্র কৌমার্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিভাসিত—যেন দেবদূতীর পবিত্রতায় সিক্ত বিকশিত পদ্ম—দেবতার উদ্যানে প্রস্ফুটিত—শান্ত সৌন্দর্যে বিভাসিত।"

পোপের সাম্রাজ্যে যাঁরা ম্যাডোনা মূর্তির সামনে নতজানু হন না তাঁদের স্বয়ং যীশু এই শাশ্বত নারীসত্তার বাণী শুনিয়েছে। "তোমরা যারা মেহনত করছ—কাজের বোঝায় যারা ভারাক্রান্ত, তারা আমার কাছে এসো—আমি তোমাদের নতুন শক্তি দান করব। আমার কাজের জোয়াল তোমাদের কাঁধে তুলে নাও এবং আমার জীবন দেখে শেখ—আমার মত নম্র ও বিনয়ী হও—দেখবে এতে তোমার আত্মা শান্তিলাভ করবে।"—এ কি সনাতন রমণী হৃদয়ের আকুতি নয়।

এই শুধু নয়, তিনি তাঁর প্রকৃতির এই উপাদান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। একবার অন্তত তিনি এ সম্বন্ধে উক্তি করেছেন। ভবিষ্যতের সেনানীদের তরুণ নেতা রূপে নেতৃত্বদানের মহত্তম মুহূর্তে রৌদ্রালোকিত পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর স্বজাতীয়দের শহরকে নিয়তির কালো ছায়া আবৃত করেছে। এই সেই মুহূর্ত যখন দেশভক্তদেরও প্রমাদ ঘটে—নিদারুণ মানবিক যন্ত্রণার কান্নায় তারা বিস্মৃত হয় যে তিনিই প্রভু ও ত্রাণকর্তা। সেই মুহূর্তে তিনি সমগ্র মাতৃত্বের মূর্ত প্রতীক হয়ে বলে ওঠেন,—"ও জেরুজালেম, জেরুজালেম, তুমি সত্যভ্রষ্টা ঈশ্বরপুত্রদের হত্যা কর—ঈশ্বর যখন তাঁদের তোমার কাছে প্রেরণ করেন তুমি তাঁদের প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত কর,—কুক্কুট যেমন তার শাবকদের তার পক্ষপুটে ঢেকে রাখে আমিও তেমনই, তোমার সন্তানদের পবিত্র আশ্রয়ে একত্রিত করেছিলাম কতবার—কিন্তু তুমি তা রক্ষা করতে পারলে না।"

ঈশ্বর-আরাধনায় সমর্পিত প্রাণ আত্মা শিশু হয়ে ওঠে এবং শিশুর একান্ত নির্ভরতা ও সারল্য নিয়ে সে আরাধ্যকে প্রত্যক্ষ করে জননীরূপে। ঈশ্বর পুত্রের ধ্যানে তন্ময় ভক্তের লেখনী থেকে পরম আশ্বাস নিঃসৃত হয়েছে—"হে বৎস, আমার প্রসন্নতালাভের জন্য তোমার খুব বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই। কেবল

তুমি আমাকে নিবেদন কর আত্যন্তিক অনুরাগ। তোমার মা তোমায় স্নেহালিঙ্গনে বেঁধে বাহুতে তুলে নিয়ে যখন আদর করেন তখন তুমি যে ভাষায় এবং সুরে তার সঙ্গে বকবক কর সেই মন নিয়ে সেই সুরেই আমার সঙ্গে কথা বলো।"

কিন্তু কেবলমাত্র ভারতেই ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপলব্ধি করায় পূর্ণতা এসেছে। এই দেশে কালী-প্রতিমাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী, এখানে প্রথাগত অভ্যাসই হল ভগবান সম্পর্কিত আলাপ আলোচনায় তাঁকে নারীরূপে উল্লেখ করা এবং দেবীকে সরাসরি সম্বোধন করা "মা"।

কিন্তু কি অত্যাশ্চর্য এই দেবীমূর্তি। পাশ্চাত্যে যা কিছু কোমল, সুকুমার ও মহার্ঘ প্রায় সবই নারী-বন্দনার উপমা হিসাবে ব্যবহারে নিঃশেষিত। মা তার ছোট শিশুটিকে লালনপালন করেন, তার সঙ্গে খেলা করেন, তাকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দেন। কখনও কখনও মাতৃভুজই শিশুর সিংহাসন হয়ে ওঠে। ছোট্ট শিশুটি সমগ্র বিশ্বকে আশীর্বাদ জানানোর অধিকার অর্জন করেন—পৃথিবী হয় মহিমান্বিত।

প্রাচ্যে সর্বজনগৃহীত প্রতীকমূর্তি হলেন এক বিবসনা নারী।—তিনি এলোকেশী, তাঁর গায়ের ঘন নীল রঙ দেখায় ঘোর কালো, চতুর্ভুজ—দুটি হাতের একটিতে ধরা শাণিত খড়্গ, আর একটিতে রক্তাক্ত ছিন্নশির—অন্য দুটি করে বরাভয় মুদ্রা, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, রক্তরাঙা প্রসারিত জিহ্বায় দেবী নৃত্য করছেন। তাঁর নৃত্যরত চরণতলে বুক পেতে শুয়ে আছেন ভস্মবিভূষিত শুভ্র এক পুরুষমূর্তি।

যুগপৎ ভয়ংকর ও অসাধারণ এই মূর্তি কল্পনা। যারা তাঁকে "ভয়ংকরী" বলে মনে করে তারাও ক্ষমা পেতে পারেন। তারা অবোধ তাই তারা দেবীর বাইরের রূপটাই দেখেন কেবলমাত্র, গভীরে প্রবেশ করতে পারেন না—তারা মন্দিরের বাইরেই থেকে যান, মায়ের কণ্ঠস্বর তাদের কানে পৌঁছায় না। এ-ও একদিক দিয়ে ভালো।

পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে যে মূর্তি চরম ভীতিপ্রদ, সেই মূর্তিই ভারতীয়দের কাছে, সম্ভবত, অন্য যে কোন দেব-দেবীর চেয়ে প্রিয়। অবশ্য "শক্তিস্বরূপিণী" রূপে কেবলমাত্র কালীই সকল ভারতীয়ের আরাধ্য নন। শিখধর্মাবলম্বীরা তাদের তরবারিকেই মনে করেন স্বর্গীয় শক্তির মূর্ত প্রতীক; সব নারীই, বিশেষ করে শৈশবাবস্থায়, দেবীর অবতারস্বরূপ; অনেকের কাছে মহিমময়ী সীতা মহান সত্যের বাণীবহ।

কিন্তু কালী আমাদের কাছে অনেক বেশি আপন। অন্যদের আমরা স্তুতি করি, তাদের চরণে প্রেম নিবেদন করি, কিন্তু কালীর আমাদের উপর অধিকার আছে। আমরা বুঝি বা বুঝি, আমরা তাঁর সন্তান—তাঁর জানু আশ্রয় করে ক্রীড়ারত। আমাদের জীবনটা আর কিছুই নয় তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা এবং যদি হঠাৎ খেলতে খেলতে তাঁর দেখা পেয়ে তাঁর চরণ স্পর্শের সুযোগ পাই তাহলে আমাদের মধ্যে যে দৈবীশক্তি সঞ্চারিত হয় তার পরিমাপ করতে পারে কে? তখন "মা" ডাকে যে ভাবাবেশ দেখা দেয় সেরকম ভাবাবিষ্ট নামোচ্চারণ কি এমনি সম্ভবপর?

শিবমূর্তি কল্পনা

"তামসী জননী! সর্বদা মৃদু চরণে ভেসে
চলেছ আশেপাশে,
তোমার জন্যে সর্বান্তঃকরণে কেউ কি উচ্চারণ
করেনি স্বাগতমন্ত্র?"

—ওয়ালট হুইটম্যান

আমাদের পূর্বপুরুষেরা হয়তো বা এই দৃশ্য দেখেছিলেন পাহাড়ে, অথবা পাহাড়ে নয়, দেখেছিলেন অন্য কোথাও। কোন এক জায়গায় কোন এক সময় হিন্দুদের মনে হয়েছিল যে, তুষার-ধবল, শৈলচূড়া, চন্দ্রালোক এবং স্থির জলের সৌন্দর্য, অন্য যে কোন বর্ণময় প্রাচুর্যপূর্ণ দৃশ্য বা লাবণ্যের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের।

আমাদের মহিমান্বিতা জননী প্রকৃতি দেবী যেন ফুল-পাখিরূপী সূচিশিল্প শোভিত সবুজ রঙের পোশাকে সুসজ্জিতা ছিলেন, তাঁর অবগুণ্ঠন নীল—নানা রত্নখচিত। কিন্তু এত আড়ম্বর, সাজসজ্জা ও জাঁকজমকের মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ অন্য কিছুর চকিত ইঙ্গিত ঝলসে উঠত। এ এমন কিছু যা শুভ্র, শুদ্ধ ও সংযত, যা শান্ত, নীরব ও নিরাবেগ এবং নিঃসঙ্গ চিরকাল। এমন কি বিশ্বসৌন্দর্যেও ছিল এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জনা। হিন্দুরা যেদিকেই তাকাতেন সেদিকেই এই দ্বৈতলীলার পুনরাবৃত্তি দেখতে পেতেন—দেখতেন আলো-ছায়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ এবং কার্য-কারণ সূত্রে এই বিশ্বসৃষ্টি বাঁধা। অধিকন্তু মানুষের জীবনেও এই বৈপরীত্যের লীলা স্ত্রী ও পুরুষ, শরীর ও আত্মা মানবজীবনে দুই-ই সত্য।

এই হল সমাধানসূত্র। প্রতীকতার ক্ষেত্রে পুরুষ হয়ে উঠল আত্মার প্রতীক, এবং বিশ্বচরাচরে ঐশ্বরিক শক্তির যে প্রকাশিত রূপ (যথা, প্রকৃতি) তা নারী তথা জননীরূপে আখ্যাত হল। এই ধারণার মধ্যে এই সুচিন্তিত ঘোষণা লক্ষণীয় যে, ঈশ্বর ও প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, যেমন স্ত্রী-পুরুষের মিলনেই মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ প্রকৃতিই স্বয়ং ঈশ্বর ও আত্মা। "ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি তবে পরস্পরের বৈরী?"—এই আর্তি আজ কেবল মহান কবিরই নয়, উপরন্তু সমগ্র প্রতীচ্য ধর্মজগতের। সুদূর অতীতের অস্পষ্ট শতক থেকেই ভারতীয় ঋষিদের শান্ত সতর্কবাণী ধ্বনিত হচ্ছে, "এসো ভাই, আরও গভীরে দৃষ্টিপাত কর। তাঁরা দুই নয়, এক—একই সত্তার দুই রূপ।" একই সত্তার দুটি নাম—পুরুষ ও প্রকৃতি, পরমাত্মা ও শক্তি।

মানুষই সর্বদা দেবতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। ধুধু প্রান্তরে, বিশাল পর্বতের ছায়ার উদাহরণ ঈশ্বরের বিবিধ গুণাবলী প্রদর্শনের চমৎকার প্রতীক, কিন্তু এই প্রতীক কখনই মনকে এই বিশ্বাসে আবিষ্ট করতে পারে না যে, এই হল স্বয়ং তিনি, আলো ও আঁধার, পর্বত ও ঢাল ইত্যাদি প্রতীক সম্পর্কেও একথা সত্য। এই সকল প্রতীক যুগপৎ মন ও মননকে অভিভূত করতে পারে না—পারে না তেমন উদ্দীপনা জাগাতে যাতে মানুষ ঈশ্বরের প্রতীক জ্ঞানে তার সম্মানরক্ষার্থে জীবনদানেও পশ্চাৎপদ হয় না।

অবশ্য "আদর্শ মেষপালক", "সনাতন পিতা" প্রভৃতি চিত্রগুলির আবেদন স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

এখানে এক বিচিত্র মানসিক বিভ্রান্তি দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। সমস্ত রকম প্রতীকরূপের রহস্য অবশেষে এমন এক সূত্রবদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে যা মনকে আবিষ্ট করে, করে পরিতুষ্ট এবং সংশয়ের অবকাশ রাখে না—ভেদজ্ঞান সব যায় নিঃশেষে মুছে, আমরা ভুলে যাই যে এই-ই শেষ কথা নয়, ভুলে যাই যে এই সীমার আড়ালেই আছেন সেই অসীম।

হিন্দুধর্ম আশ্চর্যভাবে এই মানসিক নিশ্চলতার বিপদ এড়িয়েছে। এ কথা বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে হিন্দুরাই মনেপ্রাণে সবচেয়ে কম পৌত্তলিক, বাহ্যত যদিও তাদের মনে হয় সবচেয়ে গোঁড়া পৌত্তলিক। এর কারণ জ্যোতির্ময় মণির বর্ণাঢ্য দ্যুতির মতই তাদের প্রতীক কল্পনাও বহু-কেন্দ্রিক।

এই পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব একটি মহান তত্ত্ব। ঈশ্বর ও প্রকৃতির সম্পর্ক এই তত্ত্বের একটি দিক। আত্মা ও ভূয়োদর্শন এর দ্বিতীয় দিক এবং গতি ও শক্তি হল এর তৃতীয় দিক।

এই শেষ উদাহরণের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করা দরকার। আমরা সর্বত্র এই দৃশ্য দেখতে পাই যে, পরিপূর্ণ শক্তি ও কর্মক্ষমতা বিকাশের জন্য একজন দ্বিতীয়জনের প্রাণময় স্পর্শের প্রতীক্ষায় থাকে। এই দু-জন ভারতে শিব ও শক্তি পরিচয়ে সুবিদিত।

বীরব্রতী নাইটরা যেমন তাঁর প্রিয়তমা নারীর—যার স্পর্শে সে অনুপ্রাণিত হবে—প্রতীক্ষায় থাকে, শিষ্য যেমন যোগ্য গুরুর সন্ধান করে এবং অবশেষে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করে তার জীবনের পরিপূর্ণ অর্থ খুঁজে পায় ঠিক তেমনই আত্মা নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেতন ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে—তারপর আসে সে-ই মহালগ্ন, দৈবীশক্তির আকস্মিক স্পর্শে এক পরম উপলব্ধির বৈদ্যুতিক শিহরণে সে জেগে ওঠে—দেখে বহির্বিশ্বের যা কিছু, সমগ্র জীবন, কালপ্রবাহ ও প্রকৃতি সব কিছুর মধ্যেই সেই পরম কারুণিক ভগবান বিরাজিত—অন্তরে-বাহিরে সর্বত্রই তিনি।

পশ্চিমে বলে এই হল দৈব প্রত্যাদেশ, আর প্রাচ্যভূমি একে বলে "আত্মজ্ঞান" হওয়া—তাই এ দেশের মূলমন্ত্র "আত্মানং বিদ্ধি"।

এই স্বরূপ উপলব্ধির মহালগ্নেই প্রতীক মূর্তি হলেন কালীমাতা। আত্মা জেগে উঠে চোখ মেলে বিশ্ব ও বিধাতাকে দেখছে—এই হল নিহিতার্থ।

মানবপ্রকৃতি ও প্রবণতা অনুসারে দেবতার উপর নরত্ব আরোপ অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের মানুষের হৃদয় ও অনুভূতির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় থাকা চাই, একমাত্র তাহলেই আমরা উক্ত অভিব্যক্তির রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারব। আমরা রাজা, গুরু এবং পিতাকে পৌরুষের আদর্শ প্রতিমূর্তি হিসাবে গণ্য করি। তাঁকে হতে হবে সর্বোত্তম। তিনি তাঁর সেনানীর সামনে উপস্থিত হবেন নেতা সার্বভৌম হিসাবে। সন্তানদের সব কিছু থাকবে তাঁর নখদর্পণে। তিনি তাঁদের

ভুলের জন্য শাস্তি দেবেন, আবার তাদের নৈতিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। বিশ্বের যাবতীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক তিনি এবং বাছাই আঙুরের প্রতি তিনি সাবশেষ যত্ন নেন—ফালতু যা কিছু কেটে বাদ দেন। তাঁর ভালবাসায় খাদ নেই, তিনি আদর্শ পরিপালক এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতাধর। এখানেই শেষ নয়। তিনি আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক এবং আদর্শ শাসক। পশ্চিমে দেবতার উপর নরত্ব আরোপ করা হয়েছে এইভাবে।

ভারতের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে কী অদ্ভুত পার্থক্য। সেখানে একটি পরীক্ষা, একটিই বিচারের মাপকাঠি—মানুষ ঈশ্বরকে জানে, কি জানে না? এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই সুখকামনা বা কর্মের প্রশ্ন। কেবলমাত্র জ্ঞানযোগেই ঈশ্বর-দর্শনের সাধনা চলে—আত্মা পরম সত্যের সন্ধানে যাত্রারম্ভ করেছে তাই হল একমাত্র প্রশ্ন।

জনপ্রিয় নাটকে কেমন আক্ষরিকভাবে আমরা এই একটি আবেগরই প্রকাশ দেখি। নাটকে কাল্পনিক প্রেমোপাখ্যান মূল্যহীন। জোয়ানের সঙ্গে জ্যাকের মিলন হল কি হল না সেটা সামান্য ঘটনামাত্র—এ ব্যাপারে অতিরিক্ত বাগবিস্তার "নৈব নৈব চ"। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা তন্ময় হয়ে খুঁজি এই জিজ্ঞাসার উত্তর—কখন নাটকের পাত্রপাত্রীর ভগবৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটবে—কখন তারা এই পরমার্থ আবিষ্কার করবে যে, একমাত্র ঈশ্বরই "ভালবাসার ধন"।

ভগবদ্‌সাধনার এই স্তরে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়াই অভীষ্টলাভের বাহ্যিক লক্ষণ হিসাবে স্বীকৃত। ঈশ্বরের প্রতি আকুল অনুরক্তির রক্তিম গোলাপ যখন মানুষের অন্তরে প্রস্ফুটিত হয় তখন সে উচ্চকণ্ঠে জানায় ব্যাকুল প্রার্থনা: "হরিণশাবক যেমন স্রোতস্বিনীর অভিমুখে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে আকুল হয়ে ছোটে, আমার আত্মাও ঠিক তেমনভাবেই তোমাকে চায়, হে ঈশ্বর।"—আর এই আকুল চাওয়ার মুহূর্তে আর কিছুরই প্রাধান্য সে মানে না—এ সত্য এশিয়ায় সুবিদিত। নরদেহের সুখ ও সন্তোষ বিধানার্থে যতকিছু ভোগের আয়োজন সবই বোঝা বিশেষ। গৃহের প্রতি আকর্ষণ, আত্মীয়স্বজনের জন্য মায়া এবং পার্থিব জিনিসে আসক্তি দাসত্ববন্ধনের নামান্তর। আহার, নিদ্রা এবং জৈব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনের প্রতি ভক্তের থাকবে চূড়ান্ত অনীহা ও বীতরাগ। এই দৃষ্টিকোণের দ্বারা প্রভাবিত হিন্দুদের পরমারাধ্য দেবাদিদেব মহাদেব তাই নিঃস্ব, যজ্ঞাগ্নির ভস্ম দ্বারা তার সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত —তাই তিনি তুষারধবল, কেশ পরিচর্যার অভাবে তার মাথায় বিশাল জটা, শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ সম্পর্কে উদাসীন—বহুদূরে নির্জন পাহাড়চূড়ায় পরম মৌনী অনন্ত ধ্যানে নিমগ্ন।

তাঁর সুন্দর চোখদুটি অর্ধ-নিমীলিত, তাঁর প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, তবুও তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয় না—তাঁর অর্ধ-নিমীলিত চোখের সামনে সবই স্বপ্নের মত যাওয়া-আসা করে। শিবমূর্তির অদ্ভুত অবাস্তব পরিকল্পনার এই হল নিহিতার্থ। কিন্তু একটি মৌলিক তত্ত্ব হল যে, তিনিই সকল কর্মের মূলাধার।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সকল শক্তির উৎস তিনি। কপালের মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে তাঁর তৃতীয় নয়ন—অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁর জ্ঞানচক্ষু। অতএব, স্বাভাবিক কারণেই দেবাদিদেব শিব পৌরুষের আদর্শের প্রতীক হিসাবে পূজিত হন। তাঁর বিবিধ নামের মধ্যে "ত্র্যম্বক" আর একটি নাম।

তিনি পশুদেরও পরম আশ্রয়—তাই তিনি "পশুপতি"। যে ভুজঙ্গ সবার কাছেই ভয়াবহ ও অপ্রিয় সেই ভুজঙ্গই তাঁর গলদেশ বেষ্টন করে আছে।

তিনি কাউকে বিমুখ করেন না—উন্মাদ, ক্ষ্যাপা, জড়বুদ্ধি, ছন্নছাড়া সকলের জন্যই ভোলানাথের আশ্রয় অবারিত। এমনকি ভূতপ্রেত তাঁর প্রিয় সঙ্গী, নিত্য অনুচর।

সবাই যা বর্জন করে তাই তিনি গ্রহণ করেন পরমানন্দে উদার চিত্তে। সৃষ্টিকে বাঁচাতে তিনি তাঁর প্রাপ্য হিসাবে কণ্ঠে বিষ ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন।

তাঁর সম্বল এত অকিঞ্চিৎকর! কেবলমাত্র আছে তার বাহন বৃষ, ধ্যানে বসার জন্য বাঘছাল, আর একটি জপমালা—ব্যাস্।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি অল্পে সন্তুষ্ট—তিনি আশুতোষ। এমন অপূর্ব বৈশিষ্ট্য কি আর আছে? প্রতিদিন কেবলমাত্র পবিত্র গঙ্গাজল, সামান্য কিছু শস্যকণা ও একটি বা দুটি সবুজ বেলপাতা নিবেদন করেই তাঁর প্রসাদ প্রার্থনা করা যায়, কারণ দেবাদিদেব পার্থিব দ্রব্যাদি সমষ্টিতে বড় বেশি মোহশূন্য এবং সঞ্চয়ের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, অথচ এর জন্যই আমরা বিবাদ করি, মিথ্যা বলি এবং অন্যকে হত্যা করতেও পিছপা হই না। ভারতীয়দের মর্মতলে নিখিল বিশ্বাত্মার উপরি-বর্ণিত চিত্রই অঙ্কিত আছে—তিনি শিব—মঙ্গলময়, পরম কারুণিক ও অজ্ঞানতানাশী দেবাদিদেব। হিমালয়ের তুষারাবৃত শৌধে আলোর আভাস এবং অমাবস্যার পরে নিস্তরঙ্গ জলে চাঁদের কিরণসম্পাত—এই একই ধারণার পরিচয়বাহী। পরিপূর্ণ ত্যাগ, পরিপূর্ণ নিরাসক্তি এবং অনন্তের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়া—এ সবেরই জলন্ত প্রতিমূর্তি হলেন শিব। যিনি "মধুরের মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, বীর্যবানদের প্রভু এবং তৃতীয় নেত্র বিশিষ্ট ত্রিকালজ্ঞ"।

সমস্ত ভারত জুড়ে তাঁর কত-না ভক্তদের কণ্ঠে প্রতিদিন এই স্তোত্র ধ্বনিত হয়—

> "আমাদের অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও
> অন্ধকার থেকে আলোকে—
> মৃত্যু থেকে অমৃতে দীক্ষা দাও।
> আমাদের অন্তরলোকে আমাদের নিয়ে চল
> হে রুদ্র, অজ্ঞানতা থেকে
> আমাদের চিরকাল রক্ষা কর
> তোমার নয়নমনোহর করুণাময় মুখই
> আমাদের রক্ষা করুক।"

এই হলেন শিব, পৌরুষের দীপ্ত প্রতীক—দেবশ্রেষ্ঠ।

পুরুষ অথবা আত্মরূপে তিনি মায়া তথা প্রকৃতির পতি। এই সম্পর্কসূত্রেই তাঁকে আমরা মা কালীর পদতলে শায়িত অবস্থায় দেখি। তাঁর এই শায়িত ভঙ্গী চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তার পরিচায়ক—এর নিহিতার্থ এই যে, বাইরের জগতের ঘটনাপ্রবাহ আত্মাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারে না। কালী প্রলয়ংকরী নৃত্যভঙ্গিমায় ব্যাপক হত্যালীলায় মেতে উঠেছেন। তাঁর চারিদিকে তাঁর ভয়ংকর লীলার সাক্ষ্য ছড়ানো, তাঁর কণ্ঠে মুণ্ডমালা, তবু তাঁর এক হাতে রক্তাক্ত খড়্গ এবং আরেক হাতে সদ্যছিন্ন শির। অকস্মাৎ অজান্তে তিনি তাঁর স্বামীর গায়ে পা দিয়ে ফেলেছেন—বুকের উপরে পড়েছে তাঁর পা। তার পদস্পর্শে স্বামী জেগে উঠে উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন অপলকে। দেবীর দক্ষিণ হস্তদ্বয় আপনা থেকে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে উপরে উত্থিত হয়েছে এবং লজ্জা ও বিস্ময়ে ভারতীয় গ্রাম্যবধূসুলভ বিশেষ ভঙ্গিমায় তিনি জিভ কাটছেন।

আর সেই পরমপুরুষটি,—তিনি কি দেখছেন? তাঁর কাছে এই কৃষ্ণবর্ণা, বিবস্ত্রা ভীষণা রমণী—যিনি মৃতের করোটি অঙ্গভূষণ করেছেন; প্রচুর রক্তপাত ঘটান এবং সেই রক্ত ডাকিনী-যোগিনীদের আহার্য যোগায়, যিনি উন্মত্ত উল্লাসে হত্যা করেন ও এই প্রাণ হরণে যাঁর বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ নেই এবং যাঁকে পদদলিত করেন একমাত্র তাঁকেই আশীর্বাদ করেন—সকল সৌন্দর্যের মূলীভূত আধার।

তাঁর কালো কেশরাশি আলুলায়িত, ঠিক যেন প্রবল মুক্ত হাওয়া অথবা কালপ্রবাহ —"প্রবাহতাড়িত জাগতিক বস্তুনিচয়ের গমনাগমন চলছে"। কিন্তু তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখলে উপলব্ধি হবে যে কালও অখণ্ড ও নিরবধি এবং এক ও অদ্বিতীয় কালই স্বয়ং ভগবান। মা কালীর ঘন নীলবর্ণ, ঘোর কালোর সমতুল্য—তিনি যেন এক শক্তিময়ী ছায়া এবং তার নগ্নতা জীবন ও মৃত্যুর যত নগ্ন বাস্তবতারই দ্যোতক। কিন্তু শিব বিহনে ছায়া থাকে না। বাইরে থেকে দেখতে যিনি ভীমা, মুণ্ডমালিনী, তাঁরই দিকে মহাকালরূপী শিব শঙ্কাহীন দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর স্বরূপ চেনায় পরমানন্দে তিনি তাঁকে সম্বোধন করেন "মা" বলে। আত্মা ও ঈশ্বরের মিলন মুহূর্তেও এই অনুভূতিই হয়।

কালী সম্পর্কিত ধারণার পটভূমি কি তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? কালী-মূর্তি আমাদের আরাধ্যা দেবীমাত্র নয়, উপরন্তু এই দেবীমূর্তির মাধ্যমে আমাদের জীবনের অপ্রকাশিত নির্মম সত্যসমূহ উচ্চারিত হয়েছে। আত্মোপলব্ধির আলোতে "মা"-কে দেখা যায় কেমনভাবে? তা বিশদভাবে দেখা যাক। তৃণাচ্ছাদিত সবুজ মাঠ, সম্মিত আকাশ, এবং রৌদ্রস্নাত প্রস্ফুটিত ফুলের রমণীয় দৃশ্যাবলী, সর্বজ্ঞ যিনি তাঁকে প্রতারিত করতে পারে না। আপাত-মনোহারিত্বের নীচে নিষ্ঠুর জীবনের রক্তাক্ত প্রকাশ তাঁর তৃতীয় নেত্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তিনি দেখেন একটি জীবন আর একটি জীবন গ্রাস করতে উদ্যত, নদীর দুরন্ত প্রবাহ পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, ধূমকেতু মহাকাশের মাঝখানে ওত পেতে আছে সুযোগমত পৃথিবীর বুকে

আঘাত হানবার জন্য। তাঁর চারিদিকে সমস্ত প্রাণীর আর্ত বিলাপ, ব্যথার কান্না, লোভের হা-হুতাশ এবং ক্ষুদ্র প্রাণীদের ভয়তাড়িত করুণ আর্তনাদ গুমড়ে উঠতে থাকে। নির্দয় দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতার বিভীষিকা সর্বত্র—মনে হয় মহাকাল মানুষের দুঃখে বধির—তিনি মধ্যে মধ্যে প্রবল অট্টহাস্য করে ওঠেন বিশ্ববাসীর ক্রন্দনের জবাবে।

জগৎ সম্পর্কে এবম্বিধ ধারণাই হিন্দুদের মনে পূর্ব থেকেই বদ্ধমূল হয়ে আছে। তারা তাই প্রাস্তিতরে বলে, "মৃত্যু অবশ্যই জীবনের চেয়ে মহত্তর ও শ্রেয়"।

কিন্তু মহৎ আত্মা, দেবদর্শনের পরম সন্ধিক্ষণে কিন্তু এ ভাব প্রকাশ করে না। সেই পরম কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তের প্রার্থনায় কোন দয়াভিক্ষার স্বার্থপরতা থাকে না, থাকে না কোন অবসাদের গ্লানি, থাকে না কোন অলস হাল-ছাড়া ভাব। নত হও, তাহলেই শুনতে পাবে ভারত তার যুগযুগব্যাপী অত্যাচার ও হতাশার দিনগুলিতে কেমন ভাবে তার শাশ্বতী মাতৃত্বের চরণে প্রার্থনা জানায়। কান পেতে শোন, কারণ সত্যের কণ্ঠস্বর হয় মৃদু ও পক্ষান্তরে যা কিছু বিনাশশীল তার আওয়াজ প্রচণ্ড।

"তুমি যদি আমাকে সংহারও কর, তবু তোমাতে ভক্তি আমার এতটুকু টলবে না।" এই শিব-দর্শনে যে দেবমূর্তির সন্ধান আমরা পাই তেমন দেবতা আর কি কোথাও আছে? জীবনে দুঃখের পাত্র যখন পূর্ণ হয় তখনই কি আমরা আমাদের জীবনের মহত্তর সংজ্ঞায় উজ্জীবিত হই না? উভয় জীবনের নিরানন্দ কান্নার অশ্রু-জলেই কি আমরা সেই পরম প্রেমময়ের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করি না?

মাগো, মুখ ফিরাও, আমরাও তোমার সন্তান। তোমার হাতে আমরা নিহত হলেও আমাদের অবিচল নিষ্ঠা ও অটুট বিশ্বাস তোমার চরণেই আমরা নিবেদন করব।

* * * * *

মহালগ্ন বিগত, দেবদর্শনের অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন, দেবতা অন্তর্হিত—যে দেবতা মানুষের ধারণাশক্তির অদ্বিতীয় উদাহরণ—মহত্তর প্রতীক। কাল অবস্থিত এবং আমরা প্রথম যুগের পর্বতাদির মধ্যে ফিরে এলাম। বৈদিক যুগের ধর্মীয় উৎসর্গের উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে—উপজাতিরা সব সমবেত হয়েছে। ওই দেখ, বলীবর্দটি কেমন সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিমায় আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে—তার পিঠবোঝাই যজ্ঞসমিধ।

অগ্নি প্রজ্জলিত হল—যজ্ঞাগ্নির মাঝখান থেকে উঠেছে নীল শিখা আর কিনারায় ঝরে পড়ছে ভস্মীভূত কালো অঙ্গার। কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে লোলুপ লেলিহান অগ্নিশিখা—প্রতিটি শিখার স্বতন্ত্র নাম দিয়েছেন প্রাজ্ঞ ঋষিরা—যথা, অসিত, ভয়ংকর ইত্যাদি। পুরোহিতেরা শাস্ত্র থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করছে—সমবেত ভক্তজন পুরোহিত-দের নির্দেশানুযায়ী পূজাকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য প্রতীক্ষমাণ। এবং আমরা সেই কালাগ্নিতে ভাবীকালের মুখচ্ছবি দেখি—যেদিন সাধকের দৃষ্টি উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদির

উপর নিবদ্ধ হবে এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ ঈশ্বর ও প্রকৃতি, লৌকিক জীবন ও আত্মার বলিষ্ঠ দর্শন গড়ে উঠবে এবং প্রচলিত হবে।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, শিব স্বয়ং বৈদিক যুগের ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের মূলাধার, পবিত্র অগ্নি। বৃষের পৃষ্ঠবাহিত যজ্ঞসমিধ, অগ্নির শুভ্রশিখা এবং সেই শিখার উপরিভাগের সংকীর্ণ অংশের নীলাভ ভাব সবই তিনি।

কালীর ক্ষেত্রে, বলা হয় যে, কালী শিবের বিবিধ শক্তির অন্যতম প্রকাশ। যজ্ঞাগ্নির রাঙা লেলিহান শিখাগুলির অন্যতম হলেন কালী—যিনি যে কাঠ আগুনে বিনিঃশেষে পুড়ে যায় না সেই কাঠকে দগ্ধ করেন, করেন কালো। ওই লেলিহান শিখার চিহ্নস্বরূপই আজও তাঁর রাঙা জিভ বাইরে প্রসারিত।

কালী মায়ের দুই সাধক-কবি

কোন ভাবের সার্থক ব্যাখ্যারই আর এক নাম মহত্ত্ব। আমরা কয়েকজন ব্যক্তির মূর্ত উপস্থিতি এমনভাবে অনুভব করি যেন বিদেশী কবিতার পরিচিত ভাব-স্মরণ। প্রতিটি নিগূঢ় সত্য যোগ্য কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে এবং উপযুক্ত কণ্ঠে যখন শাশ্বত সত্য উদ্গীত হয় তখন তা লক্ষ লক্ষ মনে সাড়া জাগায় —অন্য ভাষায় সে সত্য উচ্চারিত হলে হয়তো এই লক্ষ জনের কাছে তা দুর্জ্ঞেয়ই থেকে যেত।

কিন্তু আমরা নিজেদের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে না দেখলে কোন বাণীরই প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান আমরা পাব না। যে সত্যের মধ্যে আমরা বাস করি অথচ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করি না, সেই সত্যই অন্য কণ্ঠে উচ্চারিত হলে আমরা তা প্রত্যাদেশ জ্ঞানে বরণ করি এবং একমাত্র তাকেই গ্রহণ করি। আমরা নিজেরা যা একদা বলেছি তা মনে হয় নিতান্ত মামুলী আর আমাদের বোধশক্তির ঊর্ধ্বে যা তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্যই থেকে যায়।

কাজেই এমনই ঘটে যে, ভাষ্যকার বা কবিকে ইতিমধ্যেই যা হৃদয়গোচর হয়েছে তেমন কথাই বিশ্বকে শোনাতে হয়। প্রতিটি বার্তাবহর কাছ থেকে আমরা এমন কথাই শুনতে চাই যা আমাদের স্মরণসাধ্য এবং যিনি আমাদের মনোগত ইচ্ছা পূরণ করেন তাঁর কথা শুনি আমরা আনন্দে শুনি এই বিশ্বাস নিয়ে যে আপাতত তাঁর কথাগুলি পুরোপুরি বোধগম্য না হলেও কোন এক সময় তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

সাধকরা কবিশ্রেষ্ঠ। জীবনের প্রেম, ভালোবাসা, শোক-দুঃখ, শৌর্য-বীর্যের টুকরো টুকরো মণি-মুক্তা চয়ন করে তাই দিয়ে মন-ভোলানো রত্নালংকার তৈরি করে লোকের বাহবা কুড়ানো তাঁর কাজ নয়। জীবনকে দেখেন তিনি অখণ্ডরূপে, কারণ মূলত এই দুই উপাদানেই জীবন গঠিত। জীবনের কৃষ্ণতম ও উজ্জ্বলতম দিন কোনটাই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। এবং এই জীবনের উপরই তিনি নব আলোকপাত করেন এমনভাবে যাতে যারা দুঃখ-ক্লেশে জর্জরিত তাদের কাছেও জীবন সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয়। নাট্যকাররা কেবল নাটকীয় মুহূর্ত খুঁজে বেড়ান, কিন্তু সাধক কবির কাছে সমগ্র জীবনই নাটক। বিশ্ব-হৃদয়ের কাছে রিপুতাড়িত ওথেলোর ডেসডিমনাকে হত্যা করা এবং ছোট্ট শিশুর ক্ষুদ্র চাওয়া—দুইয়েরই গুরুত্ব আছে।

পুরানো জীবন-সংগীতকে নতুন সুরে বাঁধতে হলে মরমী সাধককে মানুষের নিত্য দিনের জীবনের এখান থেকে সুর, ওখান থেকে তাল, আর এক জায়গা থেকে লয় সুযোগ মত সংগ্রহ করতে হয়। শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে স্নেহময়ী জননীর গুন-গুনানি গান, অথবা শেষ নিদ্রায় শায়িত সন্তানের পাশে তার বিলাপ, প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্লান্ত মানুষ অথবা নিজেকে প্রিয়জনদের রক্ষা করার মত পর্যাপ্ত শক্তির

অধিকারী নয় মনে করে দিশাহারা মানুষ, বীর শক্তি সহকারে হলকর্ষণরত কৃষক, সূর্যালোকে ক্রীড়ারত শিশুর দল—এই সব কিছুই তাঁর কানে গুঞ্জন তোলে এবং তাঁকে শেখায় তাদের সমগ্র জীবনরহস্য কাহিনী।

নতুন যে ধর্মীয় সংজ্ঞা জন্ম নিল তা কোন সত্যদ্রষ্টা পুরুষের কণ্ঠজাত নয়, পরন্তু তা আপাতদৃষ্টিতে, বীভৎসতার মূর্ত প্রকাশ—এর সঙ্গে জড়িত সব রকম হিংস্রতা ও ভাবভঙ্গিমা আমাদের কাছে চরম অরুচিকর। প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মীয় সংজ্ঞা এমন এক আবেগের পরীক্ষামূলক বিকাশ যা নিজের স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন নয়।

যখন কোটি কোটি লোকের কল্পনা ও চেতনায় এই চিন্তা প্রসার লাভ করল যে এমন এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে যিনি এই নতুন তত্ত্বের শরীরী মূর্তি তখনই এই বিশেষ ধর্মীয় চেতনা ছড়িয়ে পড়ল। তাঁকে সকলে গুরু ও শিক্ষক হিসাবে অভিবাদন জানাল কারণ লোকে মনের যে ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষা হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তিনি তাদের সেই অকথিত ভাবকে ভাষারূপ দিলেন এবং তাদের জীবনই ব্যাখ্যাত হল। তারা হল অগণিত তরঙ্গ আর তিনি হলেন তরঙ্গের শীর্ষ-শোভা।

এইভাবেই জাতির জীবনে আবির্ভূত হলেন রামপ্রসাদ—দেবীর মাতৃভাবের সাধক বাঙালী কবি। তিনি জাতির হৃদয়ের ভাষা অনাড়ম্বরভাবে সাবলীল ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করলেন। এক শতাব্দীও গত হয়নি যখন গঙ্গাতীরে বিশাল জনতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বরচিত সুললিত সঙ্গীত শুনত। তিনি তাঁর রচিত সঙ্গীতের শেষ কলিটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি চীৎকার করে উঠেছিলেন, "সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটেছে" এবং কথাটি উচ্চারণ করেই তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু একে মৃত্যু বলব না, বলব স্বেচ্ছায় অন্য লোকে গমন। লোকের মনে হবে এ যেন গতকালের ঘটনা।

রামপ্রসাদ তাঁর জীবনের শুরুতে ছিলেন খাজাঞ্চি এবং এ কথা নিঃসন্দেহ তিনি যতদূর সম্ভব তাঁর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু সপ্তাহান্তে তাঁর নিয়োগকর্তা হিসাবের খাতা খুলে তার প্রথম পাতাতেই পেলেন এই চতুর্দশপদী কবিতা 'আমায় দে মা তোর তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নই শংকরী'। মালিক দেখলেন প্রতিটি হিসাবের উপরই কবিতার পর কবিতার চরণ লিপিবদ্ধ এবং প্রতিটি পংক্তিতেই "মা মা" আকুতি ধ্বনিত। প্রতিটি হিন্দুই ধর্মীয় খেয়ালীপনার মর্ম বোঝে, তাই রামপ্রসাদের প্রতিভাও তৎক্ষণাৎ স্বীকৃতি পেল। তাঁর নিয়োগকর্তা তাঁকে খাজাঞ্চির নীরস কাজ থেকে রেহাই দিলেন এবং তাঁকে সামান্য কিছু বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করলেন। ফলে কালীভক্ত সাধক এক মনে গানের পর গান লিখে তাঁর দেশবাসীকে উপহার দিলেন—ভক্তিরসে আপ্লুত এইসব লোকসঙ্গীত অবিস্মরণীয়। আশংকা হয়, রামপ্রসাদ রচিত বহু গান আজও পল্লীগ্রামে অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তবে, এ বিশ্বাস পোষণ করা অসঙ্গত নয় যে, আমাদের জীবনের সঙ্গে "রামপ্রসাদী সঙ্গীত" এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে এ সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার নয়।

উত্তরজীবনে রামপ্রসাদ সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। গ্রীষ্মকালে একদিন

গঙ্গায় নিজের ছোট্ট নৌকায় করে ভেসে যেতে যেতে রামপ্রসাদ বাংলার বুদ্ধিমান, তরুণ শাসক সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজকীয় বজরার মুখোমুখি হলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলা রামপ্রসাদকে তাঁর বজরায় গিয়ে গান গাইতে বললেন। কবি তাঁর বীণায় সুর বাঁধলেন এবং রাজকীয় পরিবেশের উপযুক্ত জমকালো মার্গসঙ্গীত মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রোতা তা শুনতে নারাজ—"তোমার নিজের গান, মায়ের গান শোনাও"—ও তরফ থেকে উচ্চারিত হল মধুর আদেশ এবং রামপ্রসাদ হৃষ্টচিত্তে সে আদেশ পালন করলেন।

তাঁর গানের সারল্য অনভিগম্যকে যেমন স্পর্শ করেছে, কোন ভাবকতায় তা সম্ভবপর নয়। তাঁর রচনাতেই, বোধ হয় একমাত্র আমরা এমন এক কবির সাক্ষাৎ পাই যাঁর প্রতিভা শিশুর নানাবিধ আবেগ ও অনুভূতি উপলব্ধি করতে নিয়োজিত হয়েছে। আমাদের ইংরাজী ভাষার কবি উইলিয়াম ব্লেকের কবিতায় অনেকটা তাঁর মত নিষ্পাপ সারল্যের স্বাদ মেলে, কিন্তু কোনমতেই ব্লেক তাঁর সমকক্ষ নন।

রবার্ট বার্ন তাঁর রচনায় উপরমহলের প্রতি প্রশংসনীয় নিস্পৃহতা দেখিয়েছেন, আবার সাধারণ লোকের সামান্য যা কিছু সম্বল, তাদের সাধারণ জীবনযাত্রাই হুইটম্যানের লেখনীর প্রসাদগুণে ফুটে উঠেছে অসামান্য আবেদন নিয়ে। অতএব, এই দুই কবি রামপ্রসাদের সমগোত্রীয় বলা চলে। তবে শেষোক্তের গানে শিশুসুলভ সারল্য ও সৌকুমার্য যে রকম শুভ্র উজ্জ্বলতায় বিচ্ছুরিত হয়েছে সেরকম অবিকল তুলনা মেলা ভার। বয়সের ভার তার মনের অকৃত্রিম সারল্যকে নষ্ট করতে পারে নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও মনের ভারসাম্য আরও পরিণতরূপ ধারণ করেছে। শিশুর মতই তিনি কখনও গম্ভীর, কখনও উৎফুল্ল, কখনও অস্থির, কখনও বা নিরাশ। তবে, শিশুদের এই বিশেষ বিশেষ মেজাজ-মর্জির পেছনে কোন উদ্দেশ্য থাকে না, পক্ষান্তরে রামপ্রসাদের আছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণে গভীর ঐকান্তিকতা। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যের উদ্দেশ্য এক—"মা"-র গুণগান করা।

তাঁর কাব্য যতই অনাড়ম্বর হোক, একেবারেই বিনা আয়াসে তার পূর্ণ রসোপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। এই উক্তিতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কিন্তু। 'ডিভাইন কমেডি'-র রস বোধগম্য করাতে রোম ও ফ্লোরেন্সের সমগ্র ইতিহাসের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। বস্তুত কোন কবির কাব্যের রস পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করতে হলে তার সমসাময়িক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। দান্তের সম্পর্কে যে কথা সত্য, তা যে কবি আমাদের থেকে সাগর ও মহাদেশ তথা জটিল সভ্যতাগর্বী শতকের দ্বারা বিচ্ছিন্ন তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অবশ্য এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাচ্য অভিব্যক্তির আপাত সারল্য কি কিছুটা বিপথগামী করে না? কথিত হয় যে, চৈনিক ও জাপানীরা একটি চারলাইনের নিসর্গ দৃশ্যে চুপিসারে তাদের জাতীয় অস্তিত্বের সমগ্র তত্ত্ব ঢুকিয়ে দিতে পারে এমনভাবে যে ইউরোপীয় তাদের বিবিধ উদ্দেশ্যের বিন্দুবিসর্গও টের পায় না। হিন্দুদের

ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে, পর্বতোপরি বনানী ও তুষারকে বর্ণনা করে যে অনুপম পংক্তি রচিত হয়েছে তা স্মরণযোগ্য—"তারা মহাদেবের শরীরের উপর চিরজীবী সতীকে স্থাপন করেছে।"

জাপানী শিল্পীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বিশিষ্টভাবে রামপ্রসাদ সম্পর্কে সত্য। তিনি কতগুলি ভাঙা খেলনা এবং শিশুর বিভিন্ন মেজাজ-মর্জি—যা কখনও এপ্রিলের বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে, কখনও বা সূর্যালোকের মত হাসিতে ফেটে পড়ে—তাকেই কবিতার উপজীব্য করেছেন এবং এর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আকারে বিবৃত হয়েছে সমগ্র নিখিল রহস্য।

দেবীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছাড়াও এই সাধক কবির সমগ্র জীবনচেতনাই ছিল ভিন্ন জাতের। "নিষ্পাপ শুদ্ধ চিত্তরাই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে পারে"—এই উক্তি প্রাচ্যবাসীরা আক্ষরিক অর্থেই সত্য বলে মানে। তারা মনে করে না মোক্ষলাভে বা পাপমুক্ত পরিবেশে উত্তরণ ঘটাতেই জীবনের চরম সার্থকতা, পরন্তু তারা জানে সাধনার জোরে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষকরণই আদর্শ জীবনের পরাকাষ্ঠা।

এশিয়াবাসীরা মনে করে মানবদেহই সম্যক জ্ঞানলাভের পথে প্রকৃত অন্তরায়। কেবলমাত্র কতকগুলি সাজানো অক্ষরের দ্বারা কোন বক্তব্যের সম্যক অর্থ উপলব্ধি করানো যায় না, মনই মনকে কাছে টানে। অপটু ভাষায় মনের ভাব অব্যক্তই থেকে যায়, আর সবচেয়ে নিপুণ ভাষাতেও মনোভাবের ইঙ্গিত মেলে মাত্র। আমাদের প্রকৃত দুঃখ বা আনন্দকে আমরা কল্পনায় আরও বড় করে দেখি, কাজেই আমাদের কষ্টভোগ আমাদের স্নায়ু-সৃষ্ট নয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যতক্ষণ প্রচলিত ধারায় দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদনের কাজ করি ততক্ষণ, প্রচলিত সূত্রানুযায়ী সত্যস্বরূপ সম্পর্কে আমরা অচেতন থাকি। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়া সহ্য করার মত শক্তি যখন আমরা অর্জন করি তখন সেগুলি আর সত্যোপলব্ধির পথে বাধাস্বরূপ হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই জিতেন্দ্রিয় হতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহধারণ আবশ্যক।

যখন ইন্দ্রিয়ের বাধা টুটে যায় অর্থাৎ যখন মনের অচেতন ও অবচেতন স্তর চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয় তখন সমগ্র চৈতন্য একটি মাত্র লক্ষ্যেই সংহত হয়—সে লক্ষ্য হল অখণ্ড বিশাল জ্ঞানার্জন—যা গতানুগতিক ইন্দ্রিয়জ্ঞান নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষ শাশ্বত জ্ঞান।—এই অবস্থায় আমরা কি প্রত্যক্ষ করি? তখন শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ ইত্যাদির অতীত একটি সত্তাই আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান—তিনি ঈশ্বর—একমেবাদ্বিতীয়ম।

প্রাচ্য ধর্মের পরম লক্ষ্য হল মোক্ষলাভ মুক্তি বা নির্বাণপ্রাপ্তি। যে মানুষ পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী—যে জাগতিক সব শর্তমুক্ত, স্বেচ্ছায় সে হয়তো জাগতিক নিয়ম মেনে চলতে পারে। কিন্তু সে বন্ধন স্বীকার করবে না কিছুতেই। অজ্ঞানতার ঘুমঘোর তার কেটে গেছে—সে এখন চিরজাগ্রত। রামপ্রসাদ বলেছেন:

যেখানে রাত্রি নেই—সেখান থেকে তিনি এলেন আমার মাঝে
আর দিনরাতের কোন অর্থই আমার কাছে নেই
আনুষ্ঠানিক পূজার কোন অর্থই নেই এখন।
আমার ঘুম টুটেছে—আর কি ঘুমাতে পারি ?
তোমরা যাই বল—আমি এখন জেগেই থাকব।
যাঁর ঘুম তাঁকেই দিয়ে
ঘুমকে আমি চিরঘুম পাড়িয়েছি।
বাদ্যখণ্ডে সুর জেগেছে, আমি তাতে গান শিখেছি
আহা সেই গান আমার কানে বাজছে
ধ্যানই হল মহা গুরু
প্রসাদ বলে মনে জ্ঞানের কথা শোন।

কিন্তু তাঁর কাব্যের মূল চরিত্র হল "মা" এবং তাঁকে ডাকতে গিয়ে তিনি পুরোপুরি ছোট শিশু বনে গেছেন। এ তথ্য খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, দেড় শতক আগে অর্থাৎ য়ুরোপীয় শিল্পে শিশুরা বিশেষ স্থান পাওয়ার একশো বছর আগে একজন মহান ভারতীয় সাধক ও গায়ক এমন অভিনিবেশ সহকারে শিশুদের আচার, আচরণ, অভ্যাস, অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই শিশুদের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার একান্ত শরিক হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর গানে তিনি তাঁর আচরণের অনুকূলে যুক্তি উপস্থিত করছেন :

কার কাছে আমি কাঁদব মা
শিশু কাঁদে মায়ের তরে—
আমি নই তেমন ছেলে
অন্য মাকে মা বলব।
যদিও মা তাকে মারে   শিশু কাঁদে মা মা বলে
আঁকড়ে ধরে মায়ের আঁচল।
সত্যি আমি তোমায় দেখি না—
তবু নই হারা ছেলে   আমি কাঁদি মা মা বলে।

কিন্তু কবির মাতৃভূমির জন্য গর্ববোধ ধীরে ধরে পরিণত হয়েছে গোপন হতাশায়। উদ্বেগ অধৈর্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কবি। কবির উক্তি দেবীর নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটেছে, না হলে "মা" হয়ে শিশুর কান্নায় কান না দিয়ে পারে। তিনি দেবীর দাহকার্য সম্পন্ন করে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নেবেন।

মন ডেকো না মা মা বলে
জানো না কি মা গেছে মরে   নইলে সেকি আসত না।
আমি যাব গঙ্গাতীরে,   মায়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করে
আমি কাশী গিয়ে থাকব।

তীর্থযাত্রার প্রশ্নে তাঁর সওয়াল-জবাব যেমন চমৎকার তেমনই গভীর। তিনি মায়ের মন্দ ছেলে, কাজেই তীর্থযাত্রায় তাঁর মন নেই। তাঁর নিজের আচরণের অসমর্থনে যুক্তির অভাব নেই। কেবলই সংশয়ের পরে সংশয়—বিরাগের পরিণামে দেখা দেয় পরম বিরোধিতা :

কেন আমি যাব কাশী,
মায়ের চরণপদ্মে লক্ষ লক্ষ তীর্থস্থান আছে।
পুঁথিতে আছে মানুষ কাশীতে মরে গেলে মুক্তি পায়
আমি জানি শিবও বলেছেন।
কিন্তু সবকিছুর মূলেই ভক্তি, মুক্তি তার দাস
নির্বাণে কাজ কি বল—জলেতে জল মেশান
আমি চিনি হতে চাই না, আমি চিনি খেতে চাই।

শেষের পংক্তি দুটিতে কী অপূর্ব আলোর ঝলক! কৃষকের বিচক্ষণ স্বাভাবিক বুদ্ধির সঙ্গে মহান কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টির মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। এই পংক্তি দুটির মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্মতম অনুভূতি অভিব্যক্তি লাভ করেছে—ব্যক্ত হয়েছে নিজেকে হীন ভাবার গভীরতম আনন্দ। এইখানেই শেষ নয়, ওই একই শব্দের অন্তরালে প্রকাশিত হয়েছে জীবনরহস্য।

অদ্ভুত অথচ মনোহর হল ঘুড়ি ওড়ানোর গান। একজন শিশুর মনে এই ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক যে, তার মা তার খেলনাগুলি নিয়ে খেলুক। সব মা-ই সন্তানের ইচ্ছা পূরণ করেন। এবং তাই কালী হয়েছেন কবির খেলার সঙ্গিনী। ঘুড়ি হল তার খেলার সামগ্রী এবং অন্য ঘুড়ি যাতে কাটা পড়ে সেই উদ্দেশ্যে তাঁর ঘুড়ির সুতো মাঞ্জা দেওয়া। কিন্তু ছেলে মাতৃভক্তিতে এতই মজে আছে যে সে গেছে খেলা ভুলে। তিনি তাই খেলা ছেড়ে চলে এসেছেন—মায়ের দিকই গভীর আনন্দ অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর কণ্ঠে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে গান। তিনি দেখছেন তাঁর সামনে জীবন-খেলাই অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, নীল আকাশে উড্ডীয়মান ঘুড়িটি হল স্বয়ং মুক্ত আত্মা—তবুও মা হেসে খেলে চলেছেন, তিনি জানেন না যেন যে সবই ছায়া মাত্র :

এই ভব বাজারে শ্যামা মা ওড়াচ্ছে ঘুড়ি
লক্ষ লক্ষের মধ্যে তিনি একটা-দুটো সুতো কেটে দেন।
যখন ঘুড়ি অনন্তে উড়ে যায় তিনি হাততালি দিয়ে হাসেন।

আবার কবি রহস্য করছেন, শিশুদের মত লুকোচুরি খেলছেন।

আমি কাকে 'মা' বলি সেই গোপন খবর কি পৃথিবীশুদ্ধ লোককে জানাবার?—কবির প্রশ্ন ("আমি কি হাটে হাঁড়ি ভাঙব")। "যদি বলি তাহলেও কে তাঁকে চিনবে? দেখ ষড়দর্শনও কালীর স্বরূপ সন্ধানে সফল হয়নি।"

কবি দৃঢ়সংকল্পে বলছেন, "ডুব দে রে মন কালী বলে"—কবি রূপসাগরে ডুব দিয়ে

দ্যুতিময় মুক্তো আহরণ করতে চান—বোধ হয়, এই একটি মাত্র উপমাতেই কবি আর শিশুর ভূমিকাভিনেতা নন।

সাধক কবির "শ্যামা মায়ের" সঙ্গে এই যে ঘরোয়া সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তার প্রসাদেই তিনি হিন্দুদের কাছে কেবল প্রিয় ও মহান ব্যক্তি হিসাবে নয়, পরম ভক্ত হিসাবেও শ্রদ্ধেয়। এস. থেরেসার উপস্থিত সরস জবাবের মতই এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যত জিনিস বা মানুষ দেখি রামপ্রসাদের কাছে ঈশ্বর তার চেয়েও বেশি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ছিলেন। এ কথা কি সত্যি বলে ভাবা যায় না যে, দেবতার ঘনিষ্ঠ স্পর্শধন্য আত্মাই সেই শিশু যাকে যীশু সস্নেহে জানুতে বসিয়ে মন্তব্য করেছিলেন : "ঈশ্বরের রাজত্ব এই রকমই"।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মানুষের ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত ভক্তি-ভালোবাসার ব্যাখ্যাতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সন্তানের প্রতি "মা"-এর মনোভাবের মূর্ত রূপ; আর তাই তাঁর সামনে আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে নতজানু হই।

ইনি অল্প কিছুদিন আগে আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেছেন। প্রায় কুড়ি বছর আগে ইনি কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বসে অনুগত জনদের উপদেশ দিতেন। এবং তার মধ্যে ঐশী রূপ এমন বিশালভাবে প্রতিভাত হত যে, যাঁরা তাঁকে জানতেন ও ভালোবাসতেন তাঁরা এখন পর্যন্ত রুদ্ধনিশ্বাসে তাঁকে স্মরণ করেন "আমার ঠাকুর" বলে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রার্থনাগীতি ও অশ্রুতপূর্ব কৃচ্ছ্রসাধনা এমনভাবে সম্যক্ উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করেছিল যে তার মধ্যে "অহংবোধ" আর প্রায় ছিল না। শিষ্যদের সামনে যে রূপে তিনি ঘুরতেন-ফিরতেন তা খোলস ছিল মাত্র, তাঁর অন্তরে যাঁর বাস ছিল সেই মার অভিপ্রায়ানুযায়ীই তিনি কাজ করতেন। বলা হয় যে, তিনি কখনই "আমি" বা "আমার" শব্দ ব্যবহার করতেন না—তিনি বলতেন, "যিনি এখানে বাস করেন" (হৃদয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) অথবা সচরাচর তিনি বলতেন "আমার পবিত্র মা"।

তাঁর স্বাস্থ্য মূলত যে অসাধারণ ছিল তা বোঝা যায়, কারণ তাঁর ধর্মীয় আকুলতার সবরকম চাপ পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর শরীর সহ্য করেছিল। কিন্তু তার শরীরের চেয়েও বিস্ময়কর ছিল তাঁর চরিত্রের জটিলতা ও বহুমুখী বিকাশ—যার জন্য তিনি আর্তজন বা বিপন্ন হৃদয়ের সমস্যাকে নিজের সমস্যা রূপেই অনুভব করতেন। আধুনিক জগতে তিনিই বোধহয় একমাত্র বিশ্বজনীন মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে সমগ্র এমন সংহত রূপ ধারণ করেছিল যে, যে ছোট্ট কক্ষে তিনি বাস করতেন সেখানে আজ পর্যন্ত যেন পরম শান্তি বিরাজ করছে এবং ধ্যানমগ্ন মুহূর্তে তিনি ছিলেন পরম শক্তিমান। সেই ছোট্ট ঘরটিকে আমি শেষবার যখন দেখি, বড়ই ম্লান মনে হচ্ছিল।

তখন ছিল রাত। ঘরে একটি ছোট্ট প্রদীপ, তেলভর্তি কাপে ভাসমান সলতে জ্বলছিল এবং সেই প্রদীপের আলো ঘরের পবিত্র পরিবেশকে দৃশ্যমান করে

তুলছিল। শুভ্র বিছানার চাদরের অপূর্ব শুভ্রতা ঘরের শোভা বাড়াচ্ছিল, আর ছিল গুরুর ছবির সামনে বিশ্বস্ত হাতে সাজানো টাটকা ফুল। প্রদীপ তুলে ধরা হল এবং মনে হল কোন উচ্চলোক হতে নেমে আসা দীর্ঘ ছায়া যেন আভূমি প্রণত হয়ে পূজা নিবেদনরত, তিনি যেভাবে যে জিনিস ব্যবহার করতেন সেসব সে অবস্থাতেই ছিল—আরাম-কেদারাটি বিছানার পাশে, ঘরের এক কোণে জলের বিরাট কলসী, দেওয়ালে টানানো কয়েকটি ধর্মমূলক ছবি—এছাড়া আর কিছু ছিল না সে ঘরে। বাইরে আষাঢ়ের বৃষ্টি বয়ে চলেছে অঝোরে এবং চত্বরের নীচে গঙ্গা বয়ে চলেছে করুণ কলস্বনে দ্রুতছন্দে। আমি অন্য পরিবেশেও এই ঘরে এসেছি। তখন দেখেছি করবীগাছের মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে প্রাঙ্গণের গোলাপের সঙ্গে অস্ফুট স্বরে আলাপন, দেখেছি পিছনের আম্রকুঞ্জের মুকুলিত রূপ এবং শুনেছি প্রার্থনার সময় আশ্রমের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে ঢং ঢং করে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজতে ও ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্থানটিকে হাস্যোদ্ভাসিত হতে। আমি এ স্থানটিকে দেখেছি ভয়ঙ্কর নিদাঘ মধ্যাহ্নে, দেখেছি শীতল ও পুষ্পসুরভিত অবস্থায়। কিন্তু ওই জুনমাসের রাতের মত দারিদ্র্যকে এত সুন্দর মনে হয় নি।

এখানে বহু যশস্বী পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা এসেছেন এবং তাঁরা এখানে সাদর অভ্যর্থনা পাওয়ার গর্বে গর্বিত। যিনি ঠাকুরের কাছে প্রায় সবসময়ই উপস্থিত থাকতেন তেমন একজন বলেছে, "আমাদের ঠাকুরের সামনে তাঁদের মনে হত নিতান্তই শিশু।"

পৃথিবীতে ঐশ্বর্য ও পাণ্ডিত্যের মাপকাঠিতেই মানুষে মানুষে যে শ্রেণীভেদ থাকতে পারে এ তথ্য অন্তত তাঁর জানা ছিল না। তিনি তাঁর জেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন কারণ উক্ত ব্যক্তিটির নাম-ডাকের ভিত্তি ছিল তার বিত্ত। নামী ব্যক্তিদের সঙ্গলাভে তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না, তার চেয়ে বরং তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন উদ্বিগ্না রমণীর গার্হস্থ্য সমস্যার কথা শুনবেন অথবা নামগোত্রহীন কোন বালককে শিক্ষাদান করবেন। তবু তাঁর প্রভাব কারুর উপরই কম ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-খ্যাত জনৈক ধর্মপ্রচারক তাঁর সংস্পর্শে এসে নিজ মত ও পথ পরিবর্তিত করেন—ঈশ্বরের মাতৃভাব তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। ভারতের বর্তমান বহু বিরাট ব্যক্তিত্ব বাল্যকালে তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। লৌকিক পরিচয়ে তিনি ছিলেন পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক—লিখতে বা পড়তে প্রায় জানতেনই না, কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্বে ও পঠন-পাঠনের ব্যাপকতায় বিচার্য এবং এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কান ছিল তীক্ষ্ণ ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। তাই, সংস্কৃতের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর নিখুঁত জ্ঞান ছিল, অনুবাদের সঙ্গে ছিল পরিচিতি এবং বিভিন্ন সময়ে নানা সাহিত্য থেকে যত কিছু তাকে পাঠ করে শোনানো হয়েছে তার কোন কিছুই তিনি ভুলতেন না, ফলে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার ছিল সমৃদ্ধ।

আমরা তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছরের কথাই এখানে বলছি। এই কুড়ি বছর তিনি ছিলেন মহান জ্যোতিস্বরূপ—বঙ্গদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং নেপাল জুড়ে তিনি পরিচিত ছিলেন মহান সাধক হিসাবে। তাঁর কাছে তাই দর্শনার্থী আসার বিরাম ছিল না এবং লৌকিকতাবর্জিত প্রাচ্যরীতিতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হত। তাঁর উপস্থিতিতে দর্শনার্থীরা এমন এক শক্তির মুখোমুখি হত যার মূল্যাবধারণ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না,—যেন এক জ্ঞানসমুদ্র, যার গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি ছিলেন যেন মহান সঙ্গীতের মূর্ত রূপ। তাঁকে স্পর্শ করলে যে গভীর সঙ্গীত বেজে উঠত তার মধুর মূর্ছনায় মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতারা তাদের দৈনন্দিন কাজে ফিরে যেত অধিকতর ধীরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে।

এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য সময়ে তাঁর একান্ত নিজস্ব জীবন কেটেছিল একই উদ্দেশ্যে। সংকল্পবদ্ধ একদল তরুণের সাহচর্যে তাঁরা এই গুরুর শিষ্য হিসাবেই নিজেদের পরিচয় দিতেন। পরমহংসদেবের সেবাকার্যে প্রায় সবসময়ই এক কিংবা দুজন নিয়োজিত থাকতেন এবং অনেকে একসঙ্গে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁর কাছে রাতদিন থাকতেন।

এদের মধ্যে কয়েকজন নিতান্তই বালক ছিলেন, কাজেই এদের গুরুর সঙ্গে এক-সঙ্গে অতিবাহিত জীবনের বৃহদাংশই হাসি, আনন্দ ও কৌতুকে উচ্ছল ছিল। তাঁদের গুরু ছিলেন সদাপ্রসন্ন। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যেন জড়িত ছিল অমায়িক আনন্দ—এ ছাড়া ছিল তাঁর নিয়ত সমাধির ভাবাবেশে আবিষ্ট মুহূর্ত আর ছিল তাঁর বিশেষ মানসিক ভাবের বিস্ময়কর অনুপ্রেরণা। অন্ধকার হলে শিষ্যদের জাগিয়ে দিয়ে তিনি তাদের শোনাতেন, "রাতে যখন আর সবাই ঘুমায়, তখন আত্মসংযমী মানুষ জাগে, জ্ঞানী মানুষের কাছে সেই সময়টাই রাত।" তিনি তারার আলোয় ধ্যানে বসতেন ও বসাতেন, আবার, কতদিন নিজের হাতে পোঁতা বিশাল লতায় দোল খেয়ে, বাগানে সশিষ্য চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করে হাসি, আনন্দ আমোদে সময় কাটাতেন। সময় বয়ে চলত, বাহ্যত কোন পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য চোখে পড়ত না; কিন্তু অন্যের অগোচরে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক আদর্শ বারবারই উচ্চারিত হতে থাকত; এখানে ওখানে বলা এ গল্প-সে গল্পর মধ্য দিয়েই তিনি বুঝিয়ে দিতেন অন্তরে বাহিরে কী প্রচণ্ড সংগ্রাম করে মানসিক প্রশান্তি অর্জন করেছেন তিনি। এইভাবেই চলত তাঁর জ্ঞানবিতরণ। শিষ্যরা সজীব মানুষ ও জড়পদার্থের ব্যাপারে তিনি কিরূপ আচরণ করেন তা লক্ষ্য করার সুযোগ পেতেন; সর্বোপরি তাঁদের সেই "সত্যস্বরূপের" গভীরতায় অবগাহন করার অবকাশ মিলত —তাঁর উপস্থিতির অর্থই ছিল সত্য সমীপে অবিরাম অভিগমন।

শিষ্যদের জীবনের সারসত্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত ধারণা দান করার পরে তাদের মনকেই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া কি বিজ্ঞতম শিক্ষা-পদ্ধতি নয়?—শিষ্যদের মনে তিনি বীজ বপন করতেন, তারপর সেই বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও কুসুমিত হত আপন নিয়মে। এ কথা আমাদের নিশ্চয় করে বুঝতে হবে যে আমাদের উপর বাইরে থেকে চাপানো আদেশ ক্রমে গুণোত্তর প্রকৃতির হতে পারে,

পক্ষান্তরে আমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত আদেশ আমাদের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারা অনুযায়ী আদর্শ বিদ্যাশ্রম বলতে তারা বুঝত, লোকালয়ের বাইরে গুরুর সঙ্গে বনে বাস করা এবং নিত্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে কৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর আপন উপলব্ধি অর্থাৎ দেবীর মাতৃরূপ বন্দনার বাণী প্রচার ও ব্যাখ্যার ভার যাদের উপর অর্পণ করেছিলেন তাঁরা প্রধানত ছিলেন আশপাশ কলেজের স্নাতক—এদের মধ্যে অনেকের মনই আবার,-তৎকালীন ঝোঁক অনুযায়ী, পাশ্চাত্য ভাবধারায় রঞ্জিত ছিল। এখানকার তুলনায় তখন তারা খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করত বেশি। তাঁরা এই ধর্মের মধ্যে পবিত্রতা ও মানবতার যেসব নজির দেখতে পেত তাতে রীতিমত অভিভূত হত এবং নিউ টেস্টামেন্টের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করত। হিন্দুদের মানসিকতায় স্বদেশ-প্রেমের বোধ ছিল না প্রায়, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের প্রভাব তাদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করল। তারা য়ুরোপীয় রুচি ও জীবনযাত্রা প্রণালী গ্রহণ করে বিরাট কিছুর প্রত্যাশায় ছিল। সর্বোপরি তারা মনে মনে এই ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করল যে পৌত্তলিকতাবাদই ভারতকে ধ্বংস করছে। কাজেই এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বাসা বাঁধল যে, তাদের আশু কর্তব্য হল প্রতিটি মূর্তি, প্রতিটি কুসংস্কারের জড় ঝাঁটিয়ে বিদায় করা, জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটানোর জন্য কাজ করা, পর্দাপ্রথার উচ্ছেদসাধন করা ইত্যাদি।

আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, ওই সময় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী ও সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বহু জনই উপরোক্ত মনোভাবপুষ্ট ছিলেন এবং রামকৃষ্ণের তরুণ শিষ্যেরাও তাঁদের অনুগামী ছিলেন।

অকস্মাৎ তাঁরা প্রাচীন গোঁড়া হিন্দু ধরনের কঠোর তপস্বী সদৃশ এই সাধকের মুখোমুখি হলেন—দেখলেন কৃত্রিমতাবর্জিত ও আড়ম্বরশূন্য এক ভদ্র ও রসিক পুরুষকে, যিনি দক্ষিণেশ্বরের বাগানে থাকেন—পরনের কাপড়-চোপড়ের যাঁর কোন ঠিক নেই, ইংরাজদের সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান জনশ্রুতি-নির্ভর। তিনি ইংরাজদের জানেন সাগরপার থেকে আসা অদ্ভুত একদল লোক হিসাবে। এ হেন প্রাচীন ব্যক্তিটিই এমন মন্ত্রে তাঁদের সম্মোহিত করলেন যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা তাদের পক্ষে অসাধ্য ছিল, আর ততোধিক অসম্ভব ছিল তার আকর্ষণমুক্ত হওয়া।

তাঁর পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ পবিত্রতার কাছে তারুণ্যও বশীভূত হত, তবে অনেকে তাঁর স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এ হেন আত্মসমর্পণ থেকে বাঁচার শেষ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার ফলশ্রুতি?—অনেক অনেক পরে এমন একজনের স্বীকারোক্তি: "আমি সবসময়ই তিনি যথার্থই নিষ্পাপ কিনা তার প্রমাণ খুঁজে বেড়াতাম। এই সত্য উপলব্ধি করতে আমার দীর্ঘ ছয় বছর লাগলো যে তিনি পবিত্র নন, কারণ তিনিই স্বয়ং পবিত্রতা।"

তিনি অন্যের কাছ থেকে বাইবেল সম্পর্কে আলোচনা শুনতে ভালবাসতেন।

তখনকার দিনের হাওয়া ছিল খ্রীষ্টধর্মের অনুকূলে। তিনি তাঁর কাছে খ্রীষ্ট-অনুরাগী তরুণরা আসার আগে থেকেই যীশুকে ভক্তি করতেন, কিন্তু তাই বলে কালীর প্রতি তাঁর অগাধ অনুরক্তিতে একবিন্দুও টান ধরে নি। তিনি বলতেন, "চিনি দিয়ে যেমন বিভিন্ন পশুপাখির মূর্তি গড়া হয়, ঠিক তেমনই মাধুর্যের অবতার "মা" বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নানা নামে ও বিবিধরূপে পূজিতা হন। বিভিন্ন ধর্মমত সেই সর্বশক্তিমানের কাছে পৌঁছানোর বিভিন্ন পথমাত্র।

কালীপূজার অনুষ্ঠানে পশুবলি দেওয়ার রীতি আছে। ভারতীয়দের এই বলিদান প্রথা ও ইহুদীদের দেবতার ক্ষমালাভার্থ বলিদান—দুইয়ের তাৎপর্য সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয়দের পশু উৎসর্গের পিছনে পাপক্ষালনের উদ্দেশ্য নেই,—তারা মাকে পশু নিবেদন করে এই আশায় যে "মা" মাংস প্রসাদ করে দেবেন এবং করবেন আশীর্বাদ। গোঁড়া হিন্দুরা শাক্ত হন বা না হন, মাংস এইভাবে শুদ্ধ না করে গ্রহণ করেন না। হিন্দুসমাজের ইংরেজ ভাবধারাপুষ্ট অংশ রক্ষণশীল হিন্দুদের চেয়ে বেশি পরিমাণে মাংস আহার্য হিসাবে গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের এইসব তথাকথিত শাস্ত্রীয় রীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে আপত্তি আছে, এবং সম্ভবত তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তারা এই বিশেষ ধর্মমতের প্রতি মনোনিবেশ করেছে এবং সমস্ত ভয়ংকরতা সহই এই প্রতিমা উপাসনায় তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। এই হল রামকৃষ্ণদেব ও তাঁর "ব্রহ্মময়ী মাকে" ঘিরে সংঘবদ্ধ শিষ্যদের পরিচয়।

রামকৃষ্ণ কেবল কালী-ভজনা করেই ক্ষান্ত দেন নি, উপরন্তু ভারতে প্রচলিত সব দেব-দেবীর প্রতীকের পায়ে তিনি ভক্তি নিবেদন করেছেন—করেছেন তাঁদের অর্চনা। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত অনুযায়ী বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা বিভিন্ন সময়ে বিশেষ ভাবেই নিষ্পন্ন করেছেন এবং অন্তরে অনুভব করেছেন গভীর প্রসন্নতা, প্রতিটি ধর্মকেই তিনি যথোচিত মূল্য দিয়েছেন—তার ক্রমসমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারে দিয়েছেন যথাস্থান।

বস্তুত সবচেয়ে সুপরিণত ধর্মীয় সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন তিনি। "যত মত তত পথ" এই মতবাদ ভারতের ধর্মীয় চেতনায় নতুন নয়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ যেভাবে এই মতবাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন তা অভূতপূর্ব। তিনি দৃঢ়ভাবে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সকলের নিজের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ীই কাজ করা কর্তব্য, কারণ এর দ্বারা বিশ্ব লাভবানই হয়। তাঁর এই মত প্রচারের পেছনে এই নিবিড় প্রত্যয় ক্রিয়াশীল ছিল যে, "যে নামেই ডাকা হোক না কেন বা যে রূপেই ভাবা হোক ঈশ্বর এক ও অখণ্ড।" তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে ভূসির মধ্যে যেমন থাকে বীজ, তেমনই সমস্ত রকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। সর্বোপরি প্রতিটি ধর্মমতের প্রতি ছিল তাঁর অপার শ্রদ্ধা—তিনি বলতেন, "অন্যেরা যেখানে ভক্তিনম্র চিত্তে নতজানু হয়, তুমিও সেখানে ভক্তিতে নত হও। এত জনের পূজা পাচ্ছেন যেখানে, সেখানে ভগবান নিশ্চয়ই স্বমহিমা প্রকাশ করবেন।" জগতের ইতিহাসে এরকম দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিরল।

ধর্মীয় চেতনায় বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যাদের সামান্যতম জ্ঞানও আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, বিভিন্ন ধর্মমত সমসাময়িক বিভিন্ন ভাবার পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় বহন করে—সব ভাষাতেই কিন্তু ওই একসংবিৎ অভিব্যক্তি। রামকৃষ্ণ এক বিশিষ্ট প্রতিমূর্তি ছিলেন—তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে তার ভাষায় ভাববিনিময়ে সক্ষম ছিলেন এবং সকলকেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথনির্দেশ করতে পারতেন। তাঁর মানুষের প্রতি ভালোবাসার অন্ত ছিল না। নিজের কর্ম ও আচরণে আন্তরিক হলেই হল, এরপর জাতি, ধর্ম, ইতিহাস বা সংস্কৃতির স্তরভেদ—কোনকিছুই তাঁর ও অপরপক্ষের মধ্যে ভাববিনিময়ের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। যে কেউ তার কাছে আসুন না কেন, প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতেন এবং তাঁদের স্থান পরিবর্তন ঘটত না। তাঁর আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল জগতের প্রতিটি আত্মার বন্ধনমুক্তি ঘটুক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতি নগণ্য কেউ-ও যদি পথ ভুল করে তাহলে মুক্তিসাধনা অপূর্ণ থেকে যায়—এই ছিল তাঁর অভিমত।

যে প্রেম সকল হৃদয়কে প্লাবিত করে ও মহামুক্তির পথ দেখায় সেই প্রেমেরই আর এক নাম "দিব্যজ্যোতির্ময়ী মা"।

তাঁর সমগ্র সত্তা এই মহৎ আবেগেই মগ্ন ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন চিন্তার স্থান তাঁর মনে ছিল না। তাঁর আত্ম-শাসনের দীর্ঘ বছরগুলিতে সবচেয়ে পতিত যে তাকেও বিনত চরণে তিনি পূজা করেছেন—কায়িক শ্রমেও পরাঙ্মুখ হন নি—নিজহাতে করেছেন তার সেবা। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন দুরন্ত কর্কট ব্যাধির আক্রমণে তার প্রায় বাক বন্ধ তখনও যারাই তাঁর কাছে আসতেন মানসিক শান্তিলাভের আশায়, তাদেরই তিনি যথোচিত শিক্ষাদানের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠতেন।

তিনি তাঁর শিষ্যদের ধাপে ধাপে গূঢ়বিদ্যা আয়ত্ত করাতেন—বাইরে থেকে কিন্তু কিছুই বোঝা যেত না, কেননা কোন কিছু নিয়ে জাঁক বা জাহির করা তাঁর স্বভাব-বহির্ভূত ছিল।

প্রবীণ ব্যক্তিটি বসে বসে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। হঠাৎ চোখের ইঙ্গিতে তিনি একজনকে জাগতিক উপদেশ দিলেন, "ফণা তুলবি (গোখরোর প্রসঙ্গ টেনে) কিন্তু কামড়াবি না," আবার, গভীরতর ভাবনায় মুহূর্তে মন্তব্য, "বাংলা বর্ণমালায় ছত্রিশটি অক্ষর আছে। এর মধ্যে তিনটি অক্ষরই বলতে চায়, 'সহ কর' (বাংলা ভাষার বর্ণমালায় প্রায় একই উচ্চারণবিশিষ্ট "শ", "ষ", ও "স"—এই তিনটি অক্ষর আছে)।

প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই শিক্ষণীয় কিছু থাকে, এমন কি জেলা বিশেষের লোক-সংগীত ও অশিক্ষিতদের অদ্ভুত সব কুসংস্কারের মধ্যেও শেখার উপাদান কিছু কিছু থাকে। রামকৃষ্ণদেবের চোখে মানুষের জ্ঞান পরশপাথর সদৃশ, কিন্তু জ্ঞানের অধিকারীকে তাঁর জ্ঞান দিয়ে প্রথমে ভগবানের চরণ স্পর্শ করতে হবে, তারপরে সেই জ্ঞানের ছোঁয়ায় সবই সোনায় পরিণত হবে। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সামান্য

ঘটনাও তাঁর মন্তব্যের বিষয়বস্তু হত এবং প্রায়শই সেইসব মন্তব্য হত গভীর জ্ঞান-মণ্ডিত। অর্ধ-পক্ক ব্যঞ্জনও তাঁকে রূপকের সন্ধান দিত—তাঁকে মনে করিয়ে দিত এমন আকুল কামনাকারী কথা যার উপলব্ধিতে পূর্ণতা আসে নি বলেই তার মধ্যে কোমলতা ও নম্রতার অভাব। কাছেই মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট শোনা গেল, তারপর ধ্বনির রেশ রেখে ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে গেল। এই ঘটনা তাঁকে মনে করিয়ে দিল যে ঈশ্বর যুগপৎ সাকার ও নিরাকার; আবার এই পরমপুরুষই রূপ ও অরূপ—উভয়েরই ঊর্ধ্বে।

তাঁর চরিত্রের একটি সরস দিকও ছিল। তিনি জাগতিক ব্যাপারে এত চূড়ান্ত ভাবে উদাসীন ছিলেন, সহধর্মিনীকে বলে রেখেছিলেন তাঁর বদান্যতার ক্ষেত্রে সময়মত রাশ টানতে। এ তথ্য জগতের সকল সাধু ব্যক্তির হাসির খোরাক যোগায়।

ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি গভীরতর কোন এক চেতনার আলোড়ন অনুভব করতেন। এক অলোকসামান্য আলোকে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত— তাঁর ঘটত ভাবসমাধি; আর দর্শকরা তাঁকে লক্ষ্য করত সশ্রদ্ধ ভয়ে, সম্ভ্রমে। সমাধিস্থ অবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি মাতৃদর্শন করতেন।

সুতরাং দিনের পর দিন অমুক্ত অনুরাগ ও জনস্ত ত্যাগের সূত্রে শিষ্যদের জীবন গ্রথিত হয়েছিল, একজনের তাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা, "তিনি আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর চেয়েও বড় কথা হল তাঁর সাহচর্যে আমরা কি ভাবে জীবন যাপন করেছি। সে দিনগুলির গুরুত্ব ও মাধুর্য কোনদিনই ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।"

অবশেষে গ্রীষ্মকালে পূর্ণিমার কাছাকাছি এক রাতে শিষ্য-পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি দেহত্যাগ করলেন—যাত্রা করলেন সেই অমরলোকে যেখান থেকে আর ফিরে আসতে হবে না।

সেই মহাপ্রয়াণের মুহূর্তেও তিনি একজনের মানসিক ভাবনার জবাব দেওয়ার জন্য অকস্মাৎ উঠে বসেছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং তখনও, যে শিষ্যের গান ঠাকুর পছন্দ করতেন, তিনি গুরুর কানের কাছে ঈশ্বরের নাম জপ করে চলেছিলেন।

পরে অন্ধকারে ধীরে ধীরে এলেন এক রমণীমূর্তি—তিনি ঠাকুরের পদতলে বসে মৃদুস্বরে কাঁদতে লাগলেন এবং ঠাকুরকে সম্বোধন করলেন "মা" বলে। ইনি পরম-হংসদেবের স্ত্রী—তাঁর অন্যতমা শিষ্যা।

উত্তরকালে সেদিনকার বালকরা যখন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হলেন এবং দেশে বিদেশে তাঁর বাণী প্রচারের ব্রত গ্রহণ করলেন তখন তাঁরা অনুভব করলেন যে, গুরুর নিজের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধিলাভের কাহিনীই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। রামকৃষ্ণদেবের বাল্যকালের পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর শিষ্যরা ওয়াকিবহাল ছিলেন, কারণ তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা গ্রামবাসীরা যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত তখনই তাঁর বালক অনুগামীরা সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করত।

সমগ্র পৃথিবীতে ভারতই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে থেকেই জীবনের প্রকৃত

অর্থ সম্বন্ধে মানুষ সজাগ হয়ে ওঠে উঠতে পারে—সে চারিদিকের কুসংস্কারকে হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে দেয় না। কুসংস্কার যেমন থাকার থাকে, কিন্তু তার জীবন থেকে নিঃশব্দে তা পরিত্যক্ত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, শুকনো পাতা যেন সুপক্ক ফলের বৃন্ত থেকে টুক করে খসে পড়ে।

এই অর্থে বলা যায় যে, তিনি প্রথম থেকেই সজাগ মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি জাতির দীর্ঘসঞ্চিত সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন—তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ধর্ম কেবলমাত্র বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। পরমেশ্বরের থেকে দূরে থেকে কেবলই আপদে-বিপদে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে পূজা করায় তাঁর রুচি ছিল না, বালক অবস্থা থেকেই তাঁর পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের মাধুর্য সম্পূর্ণভাবে আস্বাদন করা। এই সব কিছুর সঙ্গে তিনি কঠোরভাবে জাতরক্ষা করে চলেছিলেন এবং ব্যক্তিগত আরাম বিরাম বলতে তিনি কিছু জানতেন না।

তাঁর কুড়ি বছর বয়সে তাঁর চরিত্রের সব উপাদান একটি মাত্র পরম চাওয়ায় সংহত হল। পরিস্থিতির চাপে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে পুরোহিতের সহকারী হিসাবে কাজ নিতে হল। কোন ধর্মনিষ্ঠ ভক্তজনকে যদি দেবসেবার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাঁর মনে কিরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য। আমাদের পক্ষে এও নিশ্চয়ই স্মর্তব্য যে, রামপ্রসাদ ও অন্যান্য কালী সাধকদের উক্তি দেশের সাধারণ ভাষারই অংশ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ ছিল দেবীর আরতির সময় দেবীর সামনে জ্বলন্ত প্রদীপ ও ফুল আন্দোলিত করা।

কিন্তু তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মা "মা"-কে আপন করে চাওয়ার প্রবল আকুলতায় বিভোর ছিল। একটি মাত্রই প্রশ্ন তাঁর শ্রবণে অবিরত বেজে চলত, "একি সত্য, একি সত্য ?" ফলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অতি সহজ কাজটিও তিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারতেন না। কখনও তিনি সারাদিনই দেবীকে আলোকশিখায় বরণ করে চলতেন, আবার কখনও বা এক নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় বিহ্বলচিত্তে সব ভুলে বসে থাকতেন।

তাঁর হাবভাব দেখে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠল। তিনি পাগল—এই কথাই পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁর আত্মপরিজনরা প্রতিষেধক হিসাবে তাঁর বিবাহের কথাটা ভাবলেন—তাঁরা ধরে নিলেন বিয়ে দিলেই তাঁর মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তিনি ব্যাধিমুক্ত হবেন। এইভাবে একটি নাবালিকার সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন এবং উত্তরকালে এই ছোট্ট মেয়েটিই তাঁর অন্যতমা প্রধান শিষ্যায় পরিণত হয়েছিলেন।

কিন্তু বিবাহোৎসব তাঁর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁর সত্যের জন্য আকুল তৃষ্ণার উপশম ঘটাতে ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর ধরাবাঁধা কাজের গণ্ডি থেকে মুক্তি দিতে হল। মন্দিরের স্বত্বাধিকারী তাঁর প্রকৃত প্রতিভা চিনতে পেরেছিলেন বলে

তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যথায় তাঁকে নিঃসন্দেহে ওই বাগান থেকে বিতাড়িত করা হত।

এই নতুন অধ্যায়ে দক্ষিণেশ্বরের বাগানের এক বিরাট বটগাছ এবং কাঠের কুটিরটি ঘিরে ভিড় জমত। এই গাছটি বাগানের নির্জনতর অংশে নদীর ধারে ছিল। গাছের পাঁচটি কাণ্ড পরস্পর জড়াজড়ি করে উঠেছে এবং গুঁড়ির চারদিক ঘিরে একটি বাঁধানো চত্বর। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি বিরাট শাখা বেঞ্চের এদিক-ওদিক জুড়ে বেড়েছে—জনশ্রুতি প্রচলিত যে, ঠিক এই জায়গায় বসে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম আত্মোপলব্ধি ঘটেছিল। সে যাই হোক না কেন, মোট কথা, এই স্থানটি বহু বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ও কঠোর তপশ্চর্যার আবাস হিসাবে চিহ্নিত। এ কথা ভাবা কিন্তু ঠিক হবে না যে, রামকৃষ্ণদেব ভেবেচিন্তে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীপনা শুরু করেছিলেন। তাঁর জীবনধারা তাঁর অন্তরতম প্রদেশের এক গভীরতর অনির্বাণ চেতনারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া বা শোওয়ার ব্যাপারে কৃচ্ছ্রসাধন করতেন না, এ দুটি ব্যাপারের কথা তাঁর মনেই থাকত না। তিনি জোর করে যে নিজের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতেন তা নয়, নিজের শারীরিক অস্তিত্বের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতেন। সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে বিরামহীন আত্মিক দ্বন্দ্ব চলেছে তাঁর মনে—নিজস্ব প্রকৃতির তাড়নায় ও অন্তরে অনুভূত দুর্নিবার প্রয়োজনের তাগিদে তিনি ক্রমাগত সংগ্রাম করে গেছেন। অবশেষে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটেছে—তীরে পৌঁছেছে তরী। 'মা" স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন—সেই মুহূর্ত থেকে রামকৃষ্ণদেব পরিণত হয়েছেন ছোট্ট শিশুতে—মায়ের ভুজপাশে আবদ্ধ, পরিতৃপ্ত, শান্ত শিশু।

* * *

তিনি এক নিগূঢ় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন—যখনই তিনি কোন বিশেষ মানসিক ভাব ব্যক্ত করতেন তখনই তিনি যথোপযোগী বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপিত করতেন এবং তার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতেন। সামাজিক কৌলীন্যবোধ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রাতের পর রাত মন মালিন্যমুক্ত করার কাজে ব্যাপৃত থেকেছেন।

যখন তিনি সেই অনাদি, অনন্তের সঙ্গে মিলনের ভাবাবেশ থেকে ধীরে ধীরে এই লৌকিক জীবনে ফিরে আসতেন, তখন তাঁর সংবেদনশীল তীক্ষ্ণ চেতনার আলোকে তিনি দেখতে পেতেন যে মানবজীবনের এমন বহু উপাদান আছে যাদের জন্য প্রয়োজনীয় পথের খোঁজ তিনি তখনও পাননি। সুতরাং তিনি এক এক করে সরলতম স্তরে এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে আরম্ভ করলেন। ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে প্রোটেস্টান্টদের উপাসনা-পদ্ধতির ব্যাপারে যে রকম সম্পর্ক, তাঁর ধর্ম ও কৃষ্ণ আরাধনার মধ্যে ঠিক সেই সম্পর্কই ছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজনা শুরু করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে করলেন নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। তিনি ভক্ত বৈষ্ণবদের মতই আহার-বিহার, বেশ-ভূষা শুরু করলেন এবং অন্তে এই উপলব্ধিতেই উপনীত হলেন যে, শ্যাম ও শ্যামা

অভিন্ন—একের উদ্দেশে নিবেদিত ভক্তি অন্যের প্রতি প্রেম হয়ে ফুটে ওঠে। ঠিক এই একভাবে ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কেও একই উপলব্ধি হল তাঁর। এই সব রকম ক্রিয়াকলাপের কর্তা কিন্তু তিনি নন, আসল কারয়িত্রী হলেন তাঁর অন্তরের অন্তস্থিত "মা", তিনি সজ্ঞানে বিনয় দেখান নি, আসল কথা, তিনি ভুলেই যেতেন রামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত শরীরী অস্তিত্বের কথা।

তারপরে এলো তাঁর জীবনের অত্যাশ্চর্য অধ্যায়। তিনি ঈশ্বরের উপলব্ধি করলেন নারীরূপে। তাঁর চরিত্রে সর্বদাই সুকুমার সেবাব্রতের লক্ষণ দেখা যেত এবং রমণীদের প্রকৃত মুক্তির নজিরও তিনি তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়েছিলেন—তাঁর এই বিশেষ বীরধর্মের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শনই মা কালীকে আরাধ্যা হিসাবে বরণ করায় পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি সবসময় একই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধিকে আস্বাদন করতেন—তিনি তাঁর নিজের অতীতকে ভুলে যেতেন এবং অন্যকেও ভুলিয়ে দিতেন। তিনি অন্যদের জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারকেও নিজের হিসাবে গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর পল্লীগৃহে যেতেন এবং স্ত্রীর পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধু খুঁজে পেতেন—তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সত্য অনুভব করে পরিতৃপ্ত হতেন যে, নারীত্বের সোজা পথেও নিগূঢ় জয় অর্জন করা যায়।

এখানেই তাঁর জীবনের সারাৎসার নিহিত। অন্যেরা বিরূপ সমালোচনা করা সত্ত্বেও মায়ের স্নেহদৃষ্টিতে তাঁর সব সন্তানের অস্তিত্বই অপরিহার্য। ঠিক তেমনই জগন্মাতার প্রতিভূ স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে সমস্ত জীবিত জনেরই নিজস্ব মূল্য আছে—জীবনের সুসংবদ্ধ ধারায় সকলেরই স্থান নির্দিষ্ট এবং সকলকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর ধর্ম।

প্রত্যেকের ঘরের দরজাই অখণ্ডের অভিমুখে প্রসারিত প্রশস্ত পথের দিকে অবারিত—এই উক্তি কি এক মহান মতবাদ নয়? আবার যখন শোনা যায়, "পৌত্তলিকতার প্রশ্ন থাক! তা ভালো কি মন্দ সে প্রসঙ্গও দূরে থাক!" কেবল যে যার স্থানে থেকে নিজের সীমিত সাধ্য অনুযায়ী "পরমপ্রভু ঈশ্বরের জন্য হৃদয় পেতে দাও এবং নিজের দৃষ্টি ন্যায়পথে স্থির রাখ"—তখন কি হৃদয়ে অপরিমেয় সান্ত্বনার প্রশান্তি অনুভূত হয় না?

যে কোন ব্যক্তি যে কোন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসুন না কেন, ফিরে যেতেন অমিত সাহস নিয়ে—ভাবান্তরে তার উপদেশামৃতের বিশিষ্ট স্বাক্ষর বুকে নিয়ে। গুরু যেন শক্তির মর্মমূলে হাত রাখতেন এবং তাঁর সেই স্পর্শে লোকের নববল সঞ্চারিত হত।

তিনি কোন সামাজিক প্রথার অবসান ঘটাতে চাননি বা ধ্বংস করেন নি কোন প্রতিষ্ঠিত বিধান; তিনি কেবল নর-নারীকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করার জন্য কাজ করে গেছেন নানাভাবে। তিনি ধর্মসংস্কারকদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় সৌহার্দ্য স্থাপন করেছেন, আবার তৎকালে ধিকৃত নাট্যশিল্পীদের আপন বলে গ্রহণ করতে তাঁর বিলম্ব ঘটেনি, অন্যদিকে একই সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুদেরও তিনি ছিলেন গুরু।

কিন্তু তিনি কি করছেন বা করেছেন সে সম্বন্ধে তিনি কিন্তু বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না। তিনি শিশুর নিষ্পাপ চেতনা নিয়ে কোন ঐশী প্রেরণায় যেন কাজ করতেন এবং শিশুর মতনই সর্বদা ন্যায় কাজ করতেন। তিনি মর্ত্যজীবনে পরিতৃপ্ত ছিলেন এবং সেই জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যার ভার ন্যস্ত ছিল অন্যদের উপর। বহুকাল পূর্বে, প্রথম যৌবনে তাঁর মনে শিক্ষাগুরু হওয়ার কোন বাসনাই ছিল না, তখন তাঁর একমাত্র আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল সত্যসন্ধান এবং এই ব্যাকুলতাই তাঁকে পরম অন্বেষণের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নর-নারীর মধ্যেই তিনি তাঁর অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজতেন বলেই তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছাবার যতরকম পথ আছে সব পথই পরখ করে দেখেছিলেন। একটি পথও বাকী থাকলে তাঁর আত্মার অন্বেষণকার্য শেষ হত না। তিনি কখনই পথনির্দেশকের ভূমিকা নিতে চান নি, শোনা যায়, পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেকে শিক্ষাগুরু হিসাবে কল্পনা করতে পারতেন না। তিনি জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দিতেন অবাধভাবে, যার যেমন শক্তি গ্রহণ করত।

আমরা তাঁর প্রসাদেই জেনেছি যে, মহত্ত্ব, মিল ও সৌন্দর্য পরিণামী ফলমাত্র, কাজেই এ নিয়ে আমাদের চিন্তা করার কিছু নাই, পরন্তু আমাদের চিন্তনীয় মৌলিক বিষয় হল আমাদের আশেপাশে দৃশ্যমান সারল্য, আন্তরিকতা ও আত্যন্তিক ভক্তি।

সুপ্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা যে ব্যর্থ হওয়ার নয় বিশ্ববাসীর কাছে তারই জ্বলন্ত সাক্ষী তিনি। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে অন্য কোন দেশে তাঁর আবির্ভাব সম্ভবপর হত না। কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, তিনি প্রধানত কিংবা কেবলমাত্র ভারতের মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন। কারণ তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির আবেগানুভূতি ও চিন্তাধারা ঠাঁই নিয়েছিল এবং তিনি—কালীভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ—মানবত্তার অবতার ছিলেন।

মায়ের প্রত্যাদেশ

বৎস আমার, ওঠো, জাগো, মানুষ হও, মানুষের কাছে সত্য বাণী প্রচার কর। তোমার ভাগ্যে যা আছে তাই পৌরুষ সহকারে সহ্য কর। তোমার যা করণীয় তা পূর্ণশক্তিতে নিষ্পন্ন কর, ভয় ক'রো না—হোয়ো না নিরুত্তম। ভুলো না আমিই নর ও নারীর জন্মদাত্রী, আমিই জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—আমি জগন্মাতা।

জীবনকে অত গুরুত্বপূর্ণভাবে নিও না। নিয়তি আর কিছুই নয়, তোমাদের মায়েরই লীলা। এসো, কিছুক্ষণের জন্য আমার লীলাসহচর হও। জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন তাকে হাসিমুখে গ্রহণ কর।

অস্ফুটস্বরে এ খেলার প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্যের কথা জানতে চেয়ে কি অসন্তোষ জ্ঞাপন করছ? তুমি কি ভাব যে মা-র কন্দুকক্রীড়া উদ্দেশ্যহীন? তুমি কি জান না, বজ্র তাঁর হাতের খেলনা—তাঁর মণিবন্ধের মোচড়ে বজ্রাঘাতে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, কাজেই কোন পরিকল্পনার প্রশ্ন তুলো না। ধনুক থেকে যখন তীর নিক্ষিপ্ত হয় তখন সে কি জানে কোন্ উদ্দেশ্যে সে নিক্ষিপ্ত হল? তুমিও ধনুকে সংযোজিত শরমাত্র। জীবনের পাতা ধীরে ধীরে খোল—ক্রমে ক্রমেই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি তা প্রকাশিত হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত, হে কালের সন্তান, কিছু জানতে চেও না।

আমার লীলার প্রকাশ নিষ্পাপ, নির্ভুল, এর জন্যেই একা আমার দিনের যাত্রা শুরু। আমারই আনন্দের অভিব্যক্তি হিসাবে তোমরা এই মর্ত্যভূমিতে এসেছ, এবং যখন রাত ঘনাবে, আমার দিনের লীলাখেলার শেষ সাধ মিটবে, তখন তোমাদের আবার আমি আমার আলয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নিজস্ব কোন পরিকল্পনা ক'রো না, কোন প্রশ্নকে মনে স্থান দিও না, কিছু খুঁজো না। সাগরের জল যেমন শূন্য গোলককে পূর্ণ করে, ঠিক তেমনই আমার ইচ্ছা তোমাদের অন্তরকে প্লাবিত করুক।

এই সত্য কেবল উপলব্ধি কর যে, প্রতিটি ইচ্ছার স্বতন্ত্র অর্থ আছে—খেলার কোন দানই নিষ্ফল হওয়ার নয়—ব্যর্থ হবে না কোন প্রয়াসই। কোন কিছুর কামনা কম কর, পরিবর্তে কাজ করে যাও, কারণ বাস্তব কাজের চেয়ে অলীক কামনা বড় নয়। ছোটখাটো প্রয়োজনে তোমাকে হয়তো যত্রতত্র যেতে হবে—কিন্তু তোমার সেই যাওয়াই হয়তো মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ করবে। বহুজনের সঙ্গে তোমার দেখাশোনা ঘটবে, কথাবার্তা হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে স্বল্প কয়েকজনই প্রথম থেকে আমার একান্ত জন। এই সীমিতসংখ্যক অনুগত জনের সঙ্গে গোপন সংকেত বিনিময়ে তুমি যদি সফল হও, তাহলে তোমার সঙ্গে তাঁরাও অনুগামী হবেন, কিন্তু কি সেই গুহ্য কথা?

আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের গভীরতম অনুভূতি মহাকালীর বলির খড়্গের শানিত ঝলকে প্রদীপ্ত, জন্মাবধিই কালীসাধকরা যেন মায়ের খড়্গের রক্তমাংসে গঠিত দেহধারী রূপ। তাঁরা জীবনরসিক নন, তাঁরা মৃত্যু-উপাসক—ঝড়-ঝঞ্ঝার অনুরাগী।

এরকম যাঁরা তাঁরা আগুনের আশায় মশাল হাতে তোমার কাছে আসবেন। আমার কণ্ঠস্বর প্রসবোন্মুখ ধরিত্রীর বুকে কেঁদে বেড়াবে জীবনকে চেয়ে—আমি দেখতে চাই মুকুটশোভিত মানবপুত্রদের। মনে রেখ আমি আকুল প্রশ্ন করব, আবার আমিই সঠিক জবাবের পথ দেখাব। সকলের মধ্যে জননীই সর্বপ্রথম তাঁর সন্তানদের বাঁচানোর জন্য অকুতোভয়ে, পরমানন্দে মরণঝাঁপ দেন।

ধর্মকে যে কোন নামেই ডাকা হোক না কেন, তার মূল বৈশিষ্ট্য একটিই—তার মৃত্যুপ্রেম। কিন্তু বর্তমানে আমার রাজ্য আত্মনিবেদনের শিখায় প্রদীপ্ত হবে এবং অচিন্তনীয় এক ভাবাবেগ মানুষের মনকে অধিকার করবে। অন্যেরা যখন জীবন উপভোগের জন্য তৃষিত তখন আমার সন্তানেরা আত্মোৎসর্গের আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকবে, তখন কষ্টভোগ, পরিশ্রম বা অন্যের সেবা করাটা পরম মধুর লাগবে। এই যুগ এক মহৎ কাল এবং আমি, স্বয়ং কালী, জাতির জননী।

পরাভবে মুষড়ে যেও না, হতাশাকে শান্তচিত্তে গ্রহণ কর। বেদনাকে আনন্দের চেয়ে পৃথক ভেব না—দুইয়ের মধ্যেই আমার লীলার প্রকাশ; দুঃখ পেলেও আনন্দে ঘাটতি পড়ে না যেন, দুঃখের সময় চেয়ে দেখ আমার সস্মিত আনন। এরকম ক্ষেত্রেই আমি মিলনের সংকেত স্থানে দেখা দিই এবং আমার স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করি।

আমার সঙ্গে সংঘাত লাগতে পারে এরকম স্বার্থবোধ নির্মূল কর। আমি যখন কথা বলব তখন গৃহ, মায়া, মমতা, আরাম-বিরাম, বন্ধুত্ব—কোন কিছুর দাবিই যেন বড় না হয়ে দেখা দেয়। আরামের প্রাসাদ থেকে ভয়ংকরের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়—বিলাসকক্ষের আরাম পরিত্যাগ করে জলন্ত নগরীর প্রহরী হও। পৃথিবীর একটি বস্তুর মত আরেকটি বস্তুও অসার—এই সত্য সম্পর্কে অবহিত হও। হাসিমুখে ভাগ্যের মোকাবিলা কর।

নিজের জন্য কৃপাভিক্ষা করো না—আমার আশীর্বাদে তুমি অন্যদের কাছে দয়ার অবতার বলে পরিগণিত হবে। নিজের জীবনের অন্ধকারকে সাহসভরে গ্রহণ কর—তোমার আলো অনেকের আনন্দের রসদ যোগাবে। সবচেয়ে নগণ্য কাজও প্রসন্ন অন্তরে করো এবং কোন উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা রেখ না।

কঠোর পরিশ্রমেও অবিচল থেক—আমি তোমার সহায় হব। সুতোর পাক খুলে বুনন পাকা কর। যে কোন কাজের ভারই পাও না কেন তার দাবি পূর্ণরূপে মিটিও। কোনও কাজের জন্য নিজেকে দায়ী ভেব না—কোন পুরস্কারেরও প্রত্যাশা রেখো না।

বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও দৃঢ়মনা হও,—যখন সূর্য অস্তমিত হবে, আমার খেলা ফুরোবে তখন, হে আমার ছোট্ট শিশুরা, তোমরা জানবে যে, আমি মহাকালী, নর-নারীর স্রষ্টা, জয়ের প্রতীক—তোমাদের মা।

দক্ষিণেশ্বর দর্শন

"যে তোমাতে মতি স্থির রাখে, তাকেই তুমি পরিপূর্ণ শান্তিতে রাখ"—ঈশা

তিনি ছিলেন সীমায় আবদ্ধ এবং তাঁর আত্মা ধরিত্রীর গৃহচূড়ায় অবস্থানরত অবস্থায় মহাকাশের পরম অসীমতার প্রতি দৃষ্টি মেলে নিজের নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করে শিউড়ে উঠল।

তারপর আবির্ভূত হলেন একজন—তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ের অন্তস্তলে ধ্বনিত হল—শোনা গেল মৃদু স্বর, "তুমি সেই নিভৃত, কোলাহলশূন্য স্থানে এসো এবং বিশ্রাম কর ক্ষণকাল। সেই নিভৃত, নিরালা স্থানে তাঁর সঙ্গে তোমার আত্মার বার্তাবিনিময় হতে পারে।" আত্মা উত্থিত হল এবং অনুসরণ করল সেই কণ্ঠস্বর—এ যেন শ্বেতপদ্ম হাতে এবং চরণের চতুর্দিকে লীলায়িত অগ্নিশিখা নিয়ে ঈশ্বর-প্রেরিত দূত। অতঃপর তার দৃষ্টি পতিত হল যেখানে সেখানে যেন প্রবল জলোচ্ছ্বাস, এবং নানা পথ বেয়ে এলেন তিনি প্রভুর উদ্যানে এবং বিশ্রাম মিললো আত্মার।

সেই বাগানে একটি স্থান আছে যেখানে পাঁচটি গাছ একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। তারই তলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনায় বসতেন এবং তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা ও প্রয়োজনবোধে ভারাক্রান্ত আত্মা সে স্থানেই প্রবেশ করল, নৈঃশব্দ্য জানালো অভ্যর্থনা—সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বামপার্শ্বে প্রবহমানা নদী এবং বড় বড় বজরা পাল তুলে দিয়ে পূর্ণবেগে নদী বেয়ে চলছিল। নীচে ঝরা পাতা হাওয়ায় উড়ছিল অথবা ইঁদুরের পদতাড়নায় মর্মর-ধ্বনি তুলছিল। উপরে গাছের ডালে ডালে চাঁদের আলোর প্লাবন—সৌধগাত্রেও জ্যোৎস্নার লুকোচুরি ও আলিম্পন, ও দিকে আবার পাতার কাঁপন, গাছের নাচন—সব মিলে এক বর্ণালী নকশা চিত্র দৃশ্যমান ছিল।

নদী ও গাছের অস্ফুট কানাকানি ও নিশাচর জীবদের নিঃসঙ্গ ডাকই কেবল নিস্তব্ধতার বুক চিরে শোনা যাচ্ছিল…।

"হে প্রভো বিষ্ণু, যাঁদের সঙ্গে আমি তোমার কাছে আসতে অভ্যস্ত ছিলাম, তাঁরা আজ অনুপস্থিত। তাঁরা সুদূর লোকে বসে এই স্থানের কথা ভাবছেন। আমি রাতে তোমার চরণাশ্রয়ে তাঁদের স্মৃতিমন্দির গড়ব।"

এবং প্রভু বললেন, "উত্তম প্রস্তাব। যাঁরা আমার একান্ত আপনার তাঁরা চিরকালই আমার আপনজন; আমি তাদের বোঝা বহন করি, আমি তাদের পথ দেখাই এবং অবশেষে যেখানে তাঁদের থাকার কথা সেই স্বর্গলোকে আমি তাঁদের নিয়ে আসি। আজ রাতে এখানে কেবল একজন নয়, তাঁরা তিনজন উপস্থিত আছে। এ কথা সুনিশ্চিতভাবে জেনে রাখ।"

"আমাদের প্রিয়জনদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত। তারা ভয়ে সংকুচিত হৃদয়ে জগতের প্রতি করুণ দৃষ্টি মেলে কাল কাটায়। বেঁচে থাকাটাই তাদের কাছে বিড়ম্বনা, তাই তারা মৃত্যুকামনা করে। কারুর কারুর জীবন এত

যন্ত্রণাময় যে, আমরাই চাই, মৃত্যু এসে তাদের জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিক। তুমি হয় এদের জীবন স্বস্তিপূর্ণ কর আর নয় এমন আলোকে তাদের হৃদয় উদ্ভাসিত কর যাতে তারা জীবনে স্বস্তিলাভকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে—তোমার চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

সস্মিতবদন পরমপিতা আরও শোনেন, "প্রভু, বিপন্ন লোকদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না—একি হতে পারে! আমাদের চারিদিকে দুঃখ, বঞ্চনা, বেদনা, পীড়নের তাণ্ডব—দুর্যোগতাড়িত, মৃত্যুভয়ে ভীত, প্রিয়জনকে হারানোর আশংকায় মরিয়া মানুষদের জন্য কিছুই করা যাবে না। মানুষ বিষাক্ত পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, অর্ধাহারে কাল কাটাচ্ছে, অন্যদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে—এ সব দেখেও কি আমরা দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করতে পারব না—হতে পারব না তাদের দুঃখ-বেদনার শরিক! এ হতেই পারে না যে, তুমি বলবে এতসব দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা বৃথা।"

"এবং তুমি কি পাবে?" "আর কিছু করতে না পারা যাক, তাদের দুঃখে অংশগ্রহণের অধিকার পেলেই হল। শুধুমাত্র বিপদে তাদের মাথায় হাত রেখে তাদের ভরসা দেওয়া—কায়িক শ্রম করে তাদের দুঃখের বোঝা কিঞ্চিৎ হাল্কা করা। হতাশার নিষ্পেষণে দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্তদের এটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যে, তারা নির্বান্ধব নয়, তাদেরও সমব্যথী সুহৃদ আছে।"

"এই কি সব?"

"না, আরও আছে। তুমি যদি আমাদের যথার্থই বিশ্বস্তভাবে মানবসেবা করার শক্তি দাও, তাহলে তাই হবে আমাদের পরম আশীর্বাদ। আমরা যদি সত্যিই আর্তজনকে সাহায্য করতে পারি—তাহলেই আমাদের পাত্র পূর্ণ হবে। এ যদি না হয়, তাহলে আমাদের এ প্রার্থনা অন্তত পূর্ণ হোক যে, মানুষ যেন স্বার্থচিন্তা বিসর্জন দিয়ে যেখানে যেটুকু সম্ভব কাজ করার স্বাধীনতা পায়। তুমি আমাদের সারাজীবনই নিজের জীবনের চাহিদা মিটাতেই ব্যস্ত থাকার আদেশ দিও না। আমাদের তোমার সঙ্গে থাকার অনুমতি দিও এবং জীবন বা মৃত্যু প্রসঙ্গ মনে রাখতে দিও না।"

এরপর সুদীর্ঘ সময় নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো। অবশেষে তিরস্কারপূর্ণ মৃদু কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, "আমার মূঢ় সন্তানেরা! তোমরা কি এখনও জান না যে, তোমাদের অন্তরের যে ভালোবাসা তা আমারই ভালোবাসা, তোমাদের নিজস্ব নয়। আমার নিজেরই ভালোর জন্য কি তোমাদের আমার সঙ্গে যুঝতে হবে—জানাতে হবে সনির্বন্ধ মিনতি? তোমরা কি জান না যে হতাশা ও দুর্দশার আগুনে তোমাদের পরিশুদ্ধ করে আমি সঠিক পথ নির্দেশ করি? কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও—ভয় পেও না কিছুতেই! অভীষ্ট পথের সন্ধান পাবেই। আমার ভালোবাসা কি কখনও ব্যর্থ হতে পারে?…তোমার অনুরাগ কি আমার চেয়ে বেশি হতে পারে? মনে রেখ—'কর্মেই শুধু তোমার অধিকার, ফলে নয়।' এই সংগ্রামই তোমার জন্য

নির্ধারিত কর্ম। কোথায় এর শেষ—সে প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই··· তোমার প্রেম আমার চেয়ে আলাদা নয়—তোমার ও আমার প্রেম অভিন্ন··· ।"

কথাগুলি মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার ঘটল বিশ্বরূপ দর্শন—সমগ্র বিশ্বই "মা"য়েতে লীন। দেখলো এই বিশ্বময়ীর ভালোবাসার তুলনায় সাধারণ মায়েদের সন্তানস্নেহ নিস্তেজ মিটমিটে আলো মাত্র—প্রত্যক্ষ করল সেই জীবন—সে জীবন কঠিন সংগ্রামবিধ্বস্ত বা সুখী হোক তা তুলনীয় জগন্মাতার শিশু সন্তানদের প্রতি আচরণের সঙ্গে।

* * *

এবং প্রভু সেই স্থানে তাঁর কল্যাণহস্ত প্রসারিত করলেন ও তাঁর ভক্তকে আশীর্বাদ জানালেন।

"এই দিনগুলি তোমার জীবনেও অবশ্যই আসবে :
ঐশ্বর্য যাকে বল, তা স্তূপীকৃত কোর না।
যা কিছু উপার্জন বা অর্জন করবে সব বিলিয়ে দেবে উদার হাতে।
নিয়তি-নির্দিষ্ট শহরে তোমাকে যেতেই হবে।
গুছিয়ে-গাছিয়ে মনের সুখে স্থির হয়ে বসার আগেই
তোমার ডাক আসবে—দুর্নিবার ডাক
সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার।
যারা পেছনে পড়ে রইল, তাদের ব্যঙ্গ হাসি
ও বিদ্রূপের তীরে বিদ্ধ হবে তুমি।
ভালোবাসার আভাস যেখানে মিলবে
সেখানে আবেগমণ্ডিত বিদায়চুম্বনে
সাড়া দেবে তুমি।
যারা তাদের সাধনা-সফল হাত তোমার দিকে
প্রসারিত করতে চাইবে, তাদের
হস্তগত হতে তুমি নারাজ হবে।

মা! সুদূরে আমার ভালোবাসার জন আজ বড়ই বিষণ্ণ ও বিপন্ন। তার হৃদয় আমার সাহায্যপ্রত্যাশী, কিন্তু আমি তাকে কোন সাহায্য করতে পারিনি, তাকে নিরানন্দই রেখে এসেছি, যদিও তাকে জানিয়েছি আমি, আমি তাকে ক-ত ভালবাসি! এমন কেন হয়? আমি জানি সে আমার কথা ভাবে, আমি তার সঙ্গে কথাও বলি। তথাপি, আমি তাকে দেখতে চাই; চাই মুখোমুখি বসে তাকে সান্ত্বনা দিতে।

বাছা আমার! এমন যদি না হবে তবে তুমি কেমন করে তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জীবন সম্পর্কে সচেতন হবে—তোমার বোধশক্তি ও অনুভূতি আছে বুঝবে কেমন করে? তুমি যখন এমন স্তরে উত্তীর্ণ হবে যেখানে আত্মিক যোগাযোগই যথেষ্ট তখন তুমি অনুধাবন করবে যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের চেয়ে আত্মিক যোগাযোগ শ্রেষ্ঠতর, তখন বিশ্বাসের স্থান নেবে আত্মিক দর্শন।

কিন্তু, মা, এখনকার এই আকুল আকাঙ্ক্ষাজনিত যন্ত্রণা উপশমের জন্য আমি কি করতে পারি? আমার প্রার্থনা একবার রঘুনাথ* দর্শনের এবং আমি জানতাম না যে, এই কামনার অর্থ যন্ত্রণা সহস্রগুণে বেড়ে যাওয়া। যখন কেউ দুঃখদুর্দশায়

* শাস্ত্রীয় অষ্টসিদ্ধির অন্যতম হল রঘুনাথ-দর্শন। এর তাৎপর্য হ'ল, অন্যের আঘাত-বেদনাকে নিজের বলে অনুভব করা। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাহিনীতে এ জাতীয় বহু উদাহরণ বিশেষ করে দৈহিক আঘাতের প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত মেলে। কথিত হয় যে, একবার জনৈক হিন্দু ভক্তের সামনে যখন একটি বলদকে নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জরিত করা হচ্ছিল, তখন ভক্তটি চীৎকার করে জ্ঞানহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে

পড়ে তখন তার ছোট্ট জগতে নেমে আসে বিষাদের অন্ধকার—তার জগতের বাইরের পৃথিবী তার নিজস্ব নিরুদ্বিগ্ন ছন্দেই চলে, অনবরত লোকের ব্যস্ত পায়ের আনাগোনা শোনা যায়, পাখিরা নীড় তৈরি করে, শিশুরা সূর্যালোকে খেলে বেড়ায়—সবই চলে যথাপূর্ব। একমাত্র প্রিয়জনেরা যখন কষ্টভোগ করে, তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই কালো মনে হয়।

হে বৎস, স্নেহের আতিশয্য দেখান বন্ধ কর। আমাকে তোমার হৃদয় সমর্পণ কর এবং আমিই হব তার নিয়ামক। পৃথিবীর আনন্দ ও বেদনার নির্লিপ্ত সাক্ষী হও—তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেল না। একমাত্র এইভাবেই তুমি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে ও শান্তিলাভ করবে।

কিন্তু, মাগো, কেবল নিজের জন্যই কেন আমি শান্তির সন্ধান করব? সাহায্য-প্রার্থীর আর্ত আবেদনকে আমি কেমনভাবে অগ্রাহ্য করব। যার আকুল ডাক আমার মর্মবেদনাকে আরও বাড়িয়ে দেবে তাকে উপেক্ষা করে কি আমি শান্তিতে থাকতে পারব? কাজেই তারই অন্তরে শান্তিবারি নিষেক কর। তার হয়ে আমি তোমার কৃপা ভিক্ষা করছি, অন্যথায় তোমার আশীর্বাদলাভের প্রলোভনেও তার বিপদের সময় তাকে নিঃসঙ্গ ফেলে আসার ইচ্ছা রাখি না।

* * *

ওরে মূঢ়মতি, তোমার যত ভালোবাসা সব লৌহনিগড় হয়ে তাকে জীবনযন্ত্রণায় শৃঙ্খলিত করে রাখছে। বাছা রে, আমার হৃদয়ে আশ্রয় নে, তোর প্রিয়জনও নিজ আলয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসবে। তোমারই ভালোবাসার খাতিরে তোমার কণ্ঠস্বরকে জগতের আর সবার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে একাকার হতে দিও না। ওই ভালোবাসা আমার মধ্যস্থিত তাকে নিবেদন কর এবং তা সূর্যাস্তের লগ্নে অনুকূল দখিনা বায়ু-বাহিত হয়ে তার কানে গিয়ে মৃদুস্বরে গুঞ্জন তুলবে, আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে করবে আশার চরণবন্দনা। তোমার এই ভালোবাসা মিলে যাক তুরীয় প্রেমে ও অক্ষয় মুক্তিতে। একমাত্র এই পথেই তুমি তাকে তৃপ্তিদান করতে পারবে। তার কাছ থেকে সরে এসেই তুমি তাকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারবে।

* * *

মা! আমি হার মানছি। আমার একান্ত মিনতি, তোমার হৃদয়ে আমাকে স্থান দাও। আমি আর পেছনের দিকে তাকাব না। তুমি যদি আমাকে ডাক দাও, আমি ঠিক পথ খুঁজে পাব, বর্তমানে আমার দৃষ্টি যদিও চোখের জলে ঝাপসা।

পড়েছিলেন। অন্যান্য পথচারীরা দৌড়ে তার কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাতের চিহ্ন দগদগ করছে। সিদ্ধি অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যাখ্যাক্রমেই সম্ভবত এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, এই পর্যায়ে আমরা আমাদের প্রিয়জনদের আঘাতকে নিজের আঘাত হিসাবেই উপলব্ধি করি গভীরভাবে।

যারা আমার ভালোবাসার ধন তাদের হিতের জন্ম তোমার দয়া থেকে আমার দয়দের উপর কি বেশি আস্থা রাখতে পারি ?

এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তারা হোঁচট খায়, ঘটে তাদের পদস্খলন অথবা তোমার আহ্বানের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে তারা ব্যর্থ হয়, তাহলে, মাগো, কথা দাও, স্বর্গসুখের স্বপ্ন থেকে আমায় জাগিয়ে দেবে। তোমার করুণা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো, তোমার আশীর্বাদ যাদের একান্ত প্রয়োজন তাদের প্রতি অকরুণ হয়ো না, তারা যেন শান্তি পায়—এই আমার একান্ত মিনতি।

নির্বোধ, অজ্ঞান ছেলে। ঐশ্বরিক মহিমার বিরুদ্ধে বৃথাই অসহায় পাখির মত ক্ষুদ্রশক্তির ডানা ঝাপটাচ্ছ। উর্ধ্বে চেয়ে দেখ, হাস। যে মেঘকে মনে হয়েছিল ঘন কালো তা কেটে যাচ্ছে দেখ। হৃদয়ের চারিদিকে দৃঢ়মুষ্ঠি শিথিল হচ্ছে। দুটি আত্মাই স্বস্তির সবল নিঃশ্বাস নিল। দুটি পায়ে খুশির ছন্দ নিয়ে দুজন এলো আমার কাছে। দুটি হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে গেল, কারণ ত্যাগের মূল্যেই জয় অর্জিত হয়েছে।

মা কালীর গল্প

[শিশু লেগেটকে লিখিত, বালী, কলকাতা, বড়দিন, ১৮৯৮]

ছোট্ট আদুরে সোনা, সবচেয়ে প্রথমে কোন্ জিনিস তোমার মনে পড়ে? মায়ের কোলে শুয়ে তার চোখে চোখ রেখে তোমার খিলখিল হাসি —তাই নয় কি?

তুমি কি কোনদিনও মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছ? মা চোখ বন্ধ করলেন যেই ছোট্ট শিশুটি গেল দৃষ্টি থেকে হারিয়ে। আবার চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মা শিশুসন্তানকে দেখতে পেলেন স্বস্থানে। তারপর সন্তানের পালা। চোখ বুজে সে ভাবছে মা কোথায়, মা কোথায়? কিন্তু যেই চোখদুটি খুললো—আঃ, কি আনন্দ!

মা চোখ মুদে কোথায় ছিলেন? সর্বক্ষণই কি যথাস্থানে? যদিও তাঁর চোখ দেখতে তুমি পাচ্ছিলে না, তিনি সেখানেই ছিলেন।

শোন, কেউ কেউ ভাবে ঈশ্বর ঠিক এইরকমই। তিনি আমাদের বিশালহৃদয়া মা—অপার তাঁর মহিমা—সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁর সন্তান। ঈশ্বর তাঁর জগতের সঙ্গে লীলাখেলায় মগ্ন, মা তাঁর নয়ন মুদিত করেন। তারপর, মা লুকিয়ে আমাদের দিকে সস্নেহ পলকপাত করেই আড়ালে চলে যান এবং আমরা তার দুলাল-দুলালীরা মাকে সেই অবস্থায় ধরে ফেলার জন্য চেষ্টা করি। আমাদের মধ্যে যদি এক-জনেরও প্রয়াস ফলবতী হয় অর্থাৎ একবারমাত্র একমিনিটের জন্য হলেও ঈশ্বরের চোখে চোখ রাখতে পারে তাহলে তাহবে কি ঘটে জান?..............সেই ভাগ্য-বানের নিগূঢ় সব রহস্য অধিগত হয় এবং সে দৃঢ়চেতা, জ্ঞানী ও স্নেহময় হয়ে ওঠে, আর সে-ই মুহূর্তের স্মৃতি তার হৃদয়ে থাকে চির অমলিন।

এবং আলোচ্য লুকোচুরি খেলায় তুমি যখন জিতে যাবে অর্থাৎ মা উঁকি দিচ্ছেন এই অবস্থায় মাকে দেখে ফেলবে তখন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে—তোমার মনোমত কিছু। তাঁর অন্য সব শিশুসন্তানেরা তোমার সঙ্গে খেলতে আসবে। পাখির ছোট্ট ছানাটি আসবে। পুঁচকে মেষশাবক তোমায় ভালোবাসবে, বনের পশু খরগোশ তোমার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে এবং রাস্তার দরিদ্র ছেলেরা—যারা ঠাণ্ডা ও ক্ষুধায় কাতর এবং যারা গৃহহীন ও অনাথ বলে "মা"-র সবচেয়ে বড় স্নেহের ধন —তোমায় হৃদয়ে স্থান দেবে এবং তোমার উপর আস্থা স্থাপন করবে। আমরা সকলে "মা"-র কোলে বসে আছি, কিন্তু এরা আছে তার নিবিড় নৈকট্যে বুকের কাছে।

এবং মুদিতনয়না "মা"-কে আমরা কি বলি? তিনিই "মা কালী"।

*　　　*　　　*

তুমি কয়েক মিনিটের জন্যও কি কখনও অসুখী বোধ করেছিলে? এবং মা, কাকী, জেঠি, কিংবা ধাইমা অথবা অন্য কেউ এসে কি তোমাকে কোলে তুলেছে ও আদরে সোহাগে তোমার মুখে হাসি ফুটিয়েছে?

কখনও কখনও ঈশ্বর ঠিক এইভাবেই আমাদের কাছে আসেন। আমরা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, কারণ সেই দুটি চোখ যে খোলে না। আমরা তাই এই খেলা বন্ধ করতে ব্যগ্র হই। এ খেলা খেলতে আমাদের ভালো লাগে না। আমরা মনে করি আমরা বহুদূরে একা পড়ে আছি এবং তাই আমরা হারিয়ে যাই। আমরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠি। ভাবি চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, মার চোখ এখনও বন্ধ! আমরা আর খেলব না। এইরকম অনুভূতিই হয় আমাদের মাঝে মাঝে।

কিন্তু চোখ দুটি সত্যি বন্ধ থাকে না। চারিদিকই অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই আমাদের ওরকম মনে হয়। তুমি যে মুহূর্তে ভয়ে চীৎকার করে ওঠ, তখনই "মা"-র গভীর দুটি স্নেহসমুদ্র আঁখি খুলে যায়, তিনি গভীর স্নেহে সন্তানের পানে তাকান। আর তুমি! তোমার যদি সেই মুহূর্তে মায়ের চোখে চোখ পড়ত তাহলে তৎক্ষণাৎ খেলা বন্ধ করে প্রাণভরে ডাকতে, "কালী! কালী!" তুমি "মা"-র কাঁধে তোমার কচি মুখটি লুকাতে এবং কান পেতে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে।

ক্ষুদে সোনা, তুমি ভুলে যাবে না তো যে, করুণাময়ী "মা কালী" সর্বত্র বিরাজ করছেন। যদি তোমার মনে হয় তিনি অনেক দূরে আছেন তার অর্থ মাত্র এই যে, তুমি তাঁর চোখ দেখতে পাচ্ছ না। তোমার লৌকিক মা যখন চলে যান তুমি তখন তাকে দেখতে পাও না। কিন্তু মা কালী আছেন সবসময় কাছাকাছি— চিরস্নেহময়ী এবং সন্তানদের সঙ্গে খেলতে সদাই প্রস্তুত।

এবং তুমি কিছুক্ষণের জন্য খেলা বন্ধ করার কথা মনে রাখবে কি? কয়েক মিনিট খেলা বন্ধ রেখে কচি-কচি কোমল হাত জোড় করে মা কালীকে প্রার্থনা জানিও, "মাগো! তোমার চোখদুটি আমায় দেখতে দাও!"

* * *

আমাদের পরমেশ্বরী মাতা আর এক ভিন্ন ধরনের লুকোচুরিও খেলেন। এ যেন অনেকটা পরীর গল্পের মতন। তিনি অন্য লোকের হৃদয়ে সংগোপনে থাকেন। যে কোন জীব বা পদার্থের অন্তরালে তিনি আত্মগোপন করতে পারেন। যে কোনদিন জন্মদাত্রী মায়ের চোখে তুমি পরমাশক্তি মা-র নয়নের প্রতিফলন দেখতে পার—অথবা যে ছোট্ট বিড়ালছানাটি নিয়ে তুমি খেলছ তার চোখে, কিংবা নীড়চ্যুত বিহঙ্গের চাউনিতে তুমি সেই মহিমময়ী মায়েরই চোখের ছায়া দেখবে হয়তো। এইসব বিভিন্ন রূপের ঈশ্বর তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবেন!

যখনই ব্যক্তিবিশেষের জন্য বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন অনুভব করেন তখনই আমাদের তাঁর লীলাখেলার সঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্যে ডাক দেন। তিনি স্বয়ং একবার বলেছিলেন (মা কালী একজনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন এবং সেই পুণ্যবানই বলেছিলেন যে মা তার মধ্যে থেকে কথা বলছেন), "আমার অবোধ সন্তানেরা, তোমরা এদের জন্য যা করবে তা আমার চরণেই গিয়ে

পৌঁছাবে"। একি মিষ্টি পরীর গল্প নয়? দেখ, কি মজার মজার জায়গায়ই না তিনি লুকাতে পারেন! আবার তিনি বলেন, "পাথর যেখানে তুলছ সেখানে আমি আছি, আবার কাঠ যখন কাঠবে তখনও আমাকে দেখতে পাবে!" তুমি কি কখনও পাথর তুলে বা এক টুকরো কাঠ কেটে দেখতে চেয়েছ ভিতরে কি আছে? কখনও ভেবেছ যে, সর্বভূতে, সর্বত্র ঈশ্বর বিরাজ করছেন? কী অপরূপ লীলা! শুভক্ষণ এলে তুমি যে কোন স্থানে দেবীকে দেখতে পাবে!

যখন ছোট্ট শিশুটি মার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে তখনও সন্তানটিকে কি মা ভালবাসেন? নিশ্চয়ই, তা নইলে তিনি নিজে লুকান কেন? আবার, মার নিজের নয়ন যখন নিমীলিত থাকে, মার কি তখন শিশুটির প্রতি আসক্তি থাকে না? নিশ্চয়ই থাকে—দেখছ না মা কেমন সব সময় হাসছেন!

মা কালীর ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। তাঁর নেত্র যদি দীর্ঘদিন মুদিতও থাকে তাহলেও আমাদের ভয় পাওয়া অনাবশ্যক। তিনি সবসময়ই হাসছেন। শুভক্ষণ উপস্থিত হলে ঈশ্বর তাঁর খেলা বন্ধ করবেন এবং আমরা 'মা'-এর চোখের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি মেলে এই পৃথিবীর গণ্ডি অতিক্রম করে সহসা চলে যাব "ঠিকানা-না-জানা অন্য প্রান্তে"।

অতএব যখনই মহা-আহ্বান আসবে তখনই আমরা ছুটে যাব খেলতে। মনে রেখ, ছোট্ট সোনা, মা তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য তোমায় ডাকছেন, দেখ তুমি কিছু করতে পার কিনা। কেউ যদি তোমাকে কিছু করতে বলেন তখনই ধরে নিও যে "মা" বলছেন, ক্ষুদেবাবুটি! উঁকি দাও তো! আগন্তুক কেউ যদি তোমায় আদর করেন, তখন বুঝে নিও যে, কালী মা-ই বলছেন, "এই যে আমি!"

* * *

এছাড়া অন্যতর তাৎপর্যও আছে। তুমি তোমার মা-বাবা, খুড়ি, জেঠিকে ভালোবাস—ভালোবাস ধাত্রীকেও, আরও অনেককে। নিশ্চয়ই ভালোবাসবে। তাঁরাও সকলে তোমাকে ভালোবাসেন—সকলেই স্নেহশীল ও বড় ভালো।

কিন্তু বহু, বহুদূরে মার এক ভাই থাকেন—সম্ভবত ভাই—নাম তাঁর "হল্"। তুমি কি তাঁকেও ভালোবাস? তুমি তো তাকে কখনও দেখনি—তিনি কখনও তোমার সঙ্গে খেলেন নি। তবু তুমি তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব কর কেন?

মা যে তাকে ভালোবাসেন। আর মা যাঁকে যাঁকে ভালবাসেন তাঁদের সকলের প্রতিই তোমার আন্তরিক টান—তাই না সোনা? এবং তাই আমরা মা কালীর প্রিয়পাত্র যারা তাদের সকলকেই আপনজন মনে করি। যে শিশুদের সঙ্গে তিনি খেলা করেন তারা, আর মেষশাবক, ফুল, মহীরুহ, ছোট্ট মাছ—সবই আমাদের প্রিয়। কারণ এ সবই মায়ের ভালোবাসার রঙে রঙীন। তিনি নক্ষত্র দেখতে ভালবাসেন, আকাশও তার মন টানে—তাই তারকাখচিত আকাশ আমাদেরও হৃদয় কাড়ে। আমরা তার সন্তান, কাজেই তার পছন্দই আমাদের প্রভাবিত করে। তিনি আমাদের 'মা', অতএব এর অন্যথা হওয়া সম্ভবপর নয়।

পরিশিষ্ট

KALI THE MOTHER

AND

CHRONOLOGY OF THE WRITINGS AND SPEECHES OF SISTER NIVEDITA

CONCERNING SYMBOLS

Our daily life creates our symbol of God. No two ever cover quite the same conception.

It is so with that symbolism which we knew as language. The simple daily needs of mankind, seem, the world over, to be one. We look, therefore, for words that correspond in every land.

Yet we know how the tongue of each people expresses some one group of ideas with especial clearness, and ignores other altogether. Never do we find an identical strength and weakness repeated: and always if we go deep enough, we can discover in the circumstances and habits of a country, a cause for its specific difference of thought or of expression.

In the North we speak of a certain hour as "twilight," implying a space of time between the day and night. In India, the same moments receive the name of "time of union," since there is no period of half-light,—the hours of sun and darkness seeming to touch each other in a point.

The illustration can be carried further. In the word *gloaming* lies for us a wealth of associations,—the throbbing of the falling dusk, the tenderness of home-coming, the last sleepy laughter of children. The same emotional note is struck in Indian languages by the expression *at the hour of cowdust.*

How graphic is the difference! Yonder, beyond the grass, the cow-girl leads her cattle home to the village for the night. Their feet as they go strike the dust from sunbaked path into a cloud behind them. The herd-girl herself looms large across the pasture—all things grow quickly dim, as if the air were filled with rising dust.

The word *cowdust*, indeed, strikes a whole vein of expression peculiar to this Eastern land. Everything about the cow has been observed and loved and named. As much water as will lie in the hole once made by its hoof is a wellknown measure amongst the Aryan folk!

It is unnecessary to argue further that while the facts of nature determine the main developments of speech, yet every language and group of languages differs from every other as the characters of individuals and of nations.

Something of the same sort is true of religious symbols. Short of perfect realization, we must see the Eternal Light through a mask imposed by our own thought. To no two of us, probably, is the mask quite in the same place, and some reach, by their own growth, diverging points so distant from the common centre that they mark the extreme limits hitherto achieved of those great areas known as the Christian, or the Buddhist, or the this-that-or-the-other consciousness.

To do this, or even to carry a whole race to a new rallying-place round a standard planted on the old frontier is the peculiar mission of religious genius.

So Jesus swept down in His might on the old Jewish entrenchments of justice—righteousness—and carried the banner off bodily to that outpost of love and mercy which struggling souls had reached, indeed, before Him, but which none had yet been strong enough to make the very heart and focus of vitality.

And so every one of us, simply by thinking his own thought, and living his own life to the full, may be answering his brother's cry for God in ways beyond the dreaming of the world. Are Catholic possibilities not richer for the life of Manning, or Protestant for Frances Ridley Havergal ?

These things being true, the imagery of all men has its significance for us: The mask is created by our own thought directly, and indirectly through the reaction of custom upon thought. Like all veils, it brings at once vision and the limiting of vision. Only by realizing the full sense of every symbol can we know the whole thought of Humanity about God.

But down with all masks !

The Uncreated Flame itself we long for, without symbol or, veil or barrier. If we cannot see God and live,—let us then die—what is there to fear ? Consume us in primal fire, dissolve us into living ocean, but interpose nothing, no, nor the shadow of anything, between the soul and the divine draught for which it thirsts !

True. Yet for each of us there is a chosen way. We ourselves may still be seeking it, where and when still hidden from our eyes. But deep in our hearts is rooted the assurance that the moment will yet come, the secret signal be exchanged, the mystic name will fall upon our ears, and somewhere, somewhen, somehow, our feet

shall pass within the gates of Peace, we shall enter on the road that ends only with the Beatific Vision.

Till them, well says the old Hindu poet of the folksong to himself:—

"Tulsi, coming into this world,
Seek thou to live with all—
For who knows where or in what guise,
The Lord Himself may come to thee?"

Our daily life creates our symbol of God.

To the Arab of the desert, with his patriarchal customs, the father of the family,—just and calm in his judgments, protector of his kindred, loving to those who played about his knees as babes,—may well stand as the type of all in which men feel security.

Naturally, then, it was the Semitic mind that flashed across the dim communing of the soul with the Eternal, the rapturous illumination of the great word "Father.,"

God our father,—bound even to the most erring of His children by a kinship that misdoing cannot break (for if the human tie be indissoluble, shall the divine be less so?); father,—by a tie so intimate that to this day the stalwart Afghan, prostrating in the mosque, says "Thee" and "Thou" to the God of Hosts, as might an infant on its father's knee!

In the Aryan home, woman stands supreme. As wife in the West—lady and queen of her husband—as mother in the East,—a goddess throned in her son's worship,—she is the bringer of sanctity and peace.

Profound depths stir within us, in presence of the intensely Christian conception of God—a child in His mother's arms. This ideal of the heart of a woman—pierced by its seven sorrows, on fire with love, mother beside the cradle, worshipper beneath the cross, and glorified in great humility,—has been one of the richest gifts of the Catholic Church to humanity.

Peerless in its own way is the womanhood of Rossetti's sonnet;—

"This is that blessed Mary, pre-elect
God's Virgin. Gone is a great while, and she
Dwelt young in Nazareth of Galilee......
Unto God's will she brought devout respect—

Profound simplicity of intellect,
And supreme patience......
Thus held she through her girlhood,
As it were an angel-watered lily,
That near God grows, and is quiet."

Jesus Himself—to those who kneel before no Madonna in the Vatican—sounds this note of the eternal feminine. "Come unto me, all ye that labour, and are heavy laden and I will refresh you. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls." Is it not a woman's cry ?

Nay, He is conscious of this element in His own nature. Once at least He speaks of it. In that sublime moment when He, the young Leader of the armies of future, stands on the sunlit mountains, and looking down upon the city of His race sees the dark shadow of destiny wrapping it about, in that moment when the Patriot forgets, in a sob of human anguish, that He is Master and Redeemer, in that moment He becomes all motherhood. "O Jerusalem ! Jerusalem ! Thou that killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee,—how often would I have gathered thy children together, like as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not !"

The soul that worships becomes always a little child : the soul that becomes a child finds God oftenest as mother. In a meditation before the Blessed Sacrament, some pen has written the exquistic assurance : "My child, you need not know much in order to please Me. Only love Me dearly. Speak to me, as you would talk to your mother, if she had taken you in her arms."

But it is in India that this thought of the mother has been realised in its completeness. In that country where the image of Kali is one of the most popular symbols of deity, it is quite customary to speak of God, as "She", and the direct address then offered is simply "Mother."

But under what strange guise ! In the West, art and poetry have been exhausted to associate all that is tender and precious with this thought of woman-worship. The mother plays with the little One, or caresses or nurses Him. Sometimes she even makes her arm a throne, whereon He sits to bless the world.

In the East, the accepted symbol is of a woman nude, with flowing hair, so dark a blue that she seems in colour to be black, four-handed—two hands in the act of blessing, and two holding a knife and bleeding head respectively,—garlanded with skulls, and dancing, with protruding tongue, on the prostrate figure of a man all white with ashes.

A terrible, an extraordinary figure ! Those who call it horrible may well be forgiven. They pass only through the outer court of the temple. They are not arrived where the Mother's voice can reach them. This, in its own way is well.

Yet, this image, so fearful to the Western mind, is perhaps dearer than any other to the heart of India. It is not, indeed, the only form in which the Divine Energy presents Herself to Her worshippers. To the Sikh, She is absorbed, embodied in his sword ; all women, especially as children, are Her incarnations ; glorious Sita carries the great reality to many.

But Kali comes closer to us than these. Others we admire ; others we love ; to Her we belong. Whether we know it or not, we are Her children, playing round Her knees. Life is but a game of hide-and-seek with Her, and if, in its course, we chance to touch Her feet, we can measure the shock of the divine energy that enters into us ? Who can utter the rapture of our cry of "Mother" ?

THE VISION OF SHIVA

Dark Mother! Always gliding near with soft feet,
Have none chanted for Thee a chant of fullest welcome?

Walt Whitman

It may have been that the forefathers saw it in the mountains. Or it may have been elsewhere. Somewhere it came to the Hindu mind that the beauty of snowpeaks and moonlight, and standing water, was different from all other loveliness of colour and profusion and many-channelled scene.

It was as though Nature, the great Mother, were clothed in raiment of green, broidered with birds and flowers and fruits, and veiled in blue, adorned with many jewels, and yet as if, amidst all the restless pomp and clamour of her glory, would shine through now and then, a hint of something different. Something white and austere and pure; something compelling quiet; something silent and passionless, and eternally alone. Even the beauty of the world, then, suggested a twofold essence. Wherever the Hindu looked, he found this duality repeated,—light and shadow, attraction and repulsion, microcosm and macrocosm, cause and effect. Nay, he looked into human life itself, and he found humanity as man and woman, soul and body.

Here was a clue. On the plane of symbolism, the soul of things somehow became associated with the manly form, and the manifested energy (Nature, as we call it) with that of woman and motherhood. In this conception will be noted the deliberate statement that God and Nature are necessary to each other as the complementary manifestations of One, just as we find in the male and female together, Humanity. That is to say, Nature itself is God, as truly as Nature's soul. "Are God and Nature then at strife?" cries, not only a great poet, but the whole heart of our Western religion today. And far back from out of the dim centuries comes the hushed whisper of the Indian sages—"Look closer, brother! they are not even two, but one!" Under this aspect, the One Existence is known as Purush and Prakriti, Soul and Energy.

The highest representation of the Divine is always human. The shadow of a great rock in a weary land is a beautiful presentment of some imaginary qualities of God, but not for one moment does

it delude the mind into the belief that here at last it has the thing itself. So with the Light and the Door, the Mountain and the Shield. These were not images that could take captive both brain and heart, firing a man to die in their defence. Very different was it with those other pictures, the Good Shepherd, the Eternal Father!

Here a strange mental confusion is imminent. The mystery behind all form is at last named in a formula so convincing, so appealing, so satisfying, that distinction ceases; we forget that even this is not final, that beyond the expression, and apart from it, lies the whole immensity.

Hinduism has avoided this danger of fixedness in a very curious way. Of all the peoples of the earth, it might be claimed that Hindus are apparently the most, and at heart the least, idolatrous. For the application of their symbols is many-centred, like the fire in opals.

This Purush and Prakriti utters a great principle. The relation of God to Nature is one demonstration of it. The soul and experience offer us another. The dynamo and the force that charges it would be a third.

This last illustration deserves a moment's attention. Everywhere we see the phenomenon of one waiting to be touched by another, in order to manifest power and activity. The two are known in India as Shiva and Shakti. As the knight waits for the sight of his own lady, powerless without the inspiration of her touch, as the disciple waits for the master, and finds in him at last the meaning of all his life before, so the soul lies inert, passive, unstirred by the external, till the great moment comes, and it looks up at the shock of some divine catastrophe, to know in a flash that the whole of the without,—the whole of life, and time, and nature, and experience—like the within, is also God.

It is the beatific vision, says the West: it is realisation of the Self, here and now, declares the East.

Of such a moment is the Kali image symbol—the soul opening its eyes upon the world and seeing God.

We have seen that anthropomorphic representation of the Divine is absolutely necessray to human nature. But to learn the manner and method of that expression, we must know the whole heart and feeling of a people. To us, ideal manhood includes the king, the master, and the father. He must be supreme. He goes

forth before His armies as general and sovereign. He counts the very hairs of His children's heads. He avenges their wrongs, and He protects from pestilence. He owns the vineyard of the world, and Himself prunes and cares for the chosen vine. Perfect in love, perfect in administration, perfect in power ; ideal householder, ideal judge, ideal ruler. Such is the anthropomorphism of the West.

How strangely different is that of India ! There, life has one test, one standard, and one alone. Does a man know God or not ? That is all. No question of fruits, no question of activity, no question of happiness. Only—has the soul set out on the quest of realisation ?

How literally this is the one passion we may see in popular drama. There, the romantic motive is of no account. That Jack should have his Joan (or not have her) is a mere incident, passed over with no superfluous words, at the beginning of things. But we sit for hours absorbed, enthralled, to know—when shall these men attain to God ? Or even, when shall they discover that nothing but God is worth the having ?

And of this stage of development, renunciation is accepted as the outward sign. For in that moment when the red rose of the love of God springs and blossoms in a man's heart,—so that he crise out : "Like as the hart panteth after the waterbrooks, *so* longeth my soul after Thee O God !"—in that moment, as Asia knows well, everything else falls away from him. All the manifold satisfactions of the flesh become a burden. Home and kindred and intercourse with the world are a bondage. Food and sleep and the necessities of the physical life seem indifferent or intolerable. And so it comes that the Great God of the Hindu imagination is a beggar. Covered with the ashes of His sacrificial fire, so that He is white like snow, His hair growing untended in huge masses, oblivious of cold or heat, silent, remote from men, He sits absorbed in eternal meditation.

Those human eyes of His are half closed. Though worlds are uttered and destroyed with every breath, it is nothing to Him. All comes and goes before Him like a dream. Such is the meaning of the curious unrealism of the image. But one faculty is all activity. Within it has been indrawn all the force of all the senses. Upright in the middle of the forehead looks forth the third eye,

the eye of inner vision. It is natural then, that Shiva the Great God, set forth as ideal manhood, should be known amongst other names as the Wondrous-Eyed.

He is the Refuge of Animals. About his neck have wound the serpents, whom none else would receive.

Never did he turn any away. The mad and the eccentric, the crazed, and the queer, and the half-witted amongst men—for all these there is room with Shiva. His love will embrace even the demoniac.

He accepts that which all else reject. All the pain and evil of the Universe He took as His share, to save the world, when He drank the poison of things, and made His throat blue for ever.

He possess so little! Only the old bull on which he rides, and the tiger skin of meditation, and a string or two of praying heads—no more.

And last of all, He is so easily pleased! Could any trait be so exquisite as this? Only pure water and a few grains of rice, and a green leaf or two may be offered to Him daily, for the Great God in matters of this world is very very simple, and sets no store by things for which we struggle and lie and slay our fellow-men. Such is the picture that springs to the Indian mind, as representing the Soul of the Universe—Shiva, the All-Merciful, the Destroyer of Ignorance, the Great God. Such is the form in which are uttered finally those first faint suggestions of the light of Himalayan snow peaks and the new moon shining on still waters. Perfect renunciation, perfect withdrawnness, perfect absorption in eternity,—these things alone are worthy to be told concerning Him Who is "the Sweetest of the Sweet, the most Terrible of the Terrible, the Lord of Heroes, and the Wondrous-Eyed."

Listen to the prayer that rises to Him daily from many a worshipper, through the length and breadth of India:—

"From the Unreal lead us to the Real,
From Darkness lead us unto Light,
From Death lead us to Immortality.
Reach us through and through ourself,
And evermore protected us,—
O Thou Terrible!—from ignorance,
By Thy sweet compassionate face.

Such is Shiva—ideal of Manhood, embodiment of Godhead.

As the Purush, or Soul, He is Consort and Spouse of Maya, Nature, the fleeting diversity of sense. It is in this relation that we find Him beneath the feet of Kali. His recumbent posture signifies inertness, the Soul untouched and indifferent to the external. Kali has been executing a wild dance of carnage. On all sides She has left evidances of Her reign of terror. The garland of skulls is round her neck ; stlll in Her hands She holds the bloody weapon and a freshly-severed head. Suddenly She has stepped unwittingly on the body of Her Husband. Her foot is on His breast. He has looked up, awakened by that touch, and They are gazing into each other's eyes. Her right hands are raised in involuntary blessing, and Her tongue makes an exaggerated gesture of shyness and surprise, once common to Indian women of the villages.

And He, what does He see ? To Him, She is all beauty – this woman nude and terrible and black who tells the name of God on the skulls of the dead, who creates the bloodshed on which demons fatten, who slays rejoicing and repents not, and blesses Him only that lies crushed beneath Her feet.

Her mass of black hair flows behind Her like the wind, or like time, "the drift and passage of things." But to the great third eye even time is one, and that one, God. She is blue almost to blackness, like a mighty shadow, and bare like the dread realities of life and death. But for Him there is no shadow. Deep into the heart of that Most Terrible. He looks unshrinking, and in the ecstasy of recognition He calls Her *Mother.* So shall ever be the union of the soul with God.

Do we understand what the background is form which such a thought as this could spring ? For the Kali-image is not so much a picture of the deity, as the utterance of the secret of our own lives.

The soul in realisation beholds the mother—how ? The picture of green lawns and smiling skies, and flowers steeped in sunshine, cannot deceive the All-Knower. Under the apparent loveliness, He sees life preying on life, the rivers breaking down the mountains, the comet poised in midspace to strike. Around him rises up the wall of all the creatures, the moan of pain, and the sob of greed, and the pitiful cry of little things in fear. Irresponsible without

mercy, seems the spirit of time—deaf to the woes of man, or answering them only with a peal of laughter.

Such is the world as the Hindu mind is predisposed to see it. "Verily," says the heart wearily, "Death is greater than Life, yea and better !"

Not so the supreme soul in its hour of vision ! Now coward's sign of exhaustion, no selfish prayer for mercy, no idle resignation there ! Bend low, and you shall hear the answer that India makes to the Eternal Motherhood, through all her ages of torture and despair. Listen well, for the voice is low that speaks, and the crash of ruin mighty :—

"Though Thou slay me, *yet* will I trust in Thee !" After all, has anyone of us found God in any other form than in this—the Vision of Shiva ? Have not the great intuitions of our life all come to us in moments when the cup was bitterest ? Has it not always been with sobs of desolation that we have seen the Absolute triumphant in Love ?

Behold, we also, O Mother, are Thy children ! Though Thou Slay us, yet will we trust in Thee !

* * *

The hour is gone, and the vision is passed away, the vision of the greatest symbol, perhaps, that man has ever imagined for himself. The hour is past, and we are back amongst the mountains in the early ages.

There is a gathering of the tribes for a Vedic sacrifice. Yonder, the bull majestically paces towards us, laden with wood for the sacrificial fire.

Now it is lighted, and from the central mass rises the blue-throated flame, while round the edge, leaving the fuel black and charred, curl those greedy red tongues of fire, to each of which the wise men give its separate name—the Black, the Terrible, and so on. The priests chant texts, and the people wait upon the worship. And we see faces-in-the-fire of the time to be when the eyes of the poet shall rest upon the sacrifice, and shall fashion therefrom this mighty vision of God and nature, the soul and life.

For scholars say that Shiva is but the fire of Vedic rites personified. He is the wood borne upon the bull, and the flame which is white, with a patch of blue colour at the throat.

As for Kali, She, it is claimed, was one of His powers, one of the red licking flames, which char and blacken the wood that is not consumed. In token of which we see to this day Her protruding tongue.

TWO SAINTS OF KALI

Greatness is but another word for interpretation. We feel the very presence of some persons as if it were the translation of poems from a foreign tongue. Every profound truth waits for the life that shall be all its voice and when that is found it comes within the reach of multitudes to whom it would have remained inaccessible.

But We cannot find truth in a word, unless it is illumined by our own experience. That statement which we have lived but have not spoken, even to ourselves, when uttered by another's lips, we hail as revelation. And that alone. What we have ourselves once said seems commonplace, and that which is too far above we do not understand.

So it happens that the interpreter, the poet, must be for ever telling to the world those things of which it has already won heart-knowledge. This is the sign that we demand always from the messenger—that he speak of a common memory. And to him who does this we listen gladly, believing that life will yet bring the significance of those words of his that do not, for the nonce, explain themselves to us.

Highest of all the poets stands the saint. His task is not to take the brilliant patches of love, and sorrow and heroism, and fit them into jewelled settings for the admiration of the many. He takes the whole of life, all the grey, sombre stuff of which it is chiefly made, and the blackest and the brightest with this, and throws on the whole a new light, till even in the eyes of those who suffer it, life is made beautiful. The dramatist deals only with dramatic motives, but to him all is dramatic. The petty needs of childhood are no less related to the World-Heart than the passion by which Othello slays Desdemona.

But that new tune to which he sets the old song of living has to be caught in snatches from the people, a note here and a cadence there. The mother crooning her babe to rest, or wailing beside it in its last long sleep ; the man panting for his advirsary, or finding himself inadequate to the protection of those he loves ; the peasant guiding the plough with patient strength,

the child-folk playing in the sunlight, all these have whispered him in the ear, and taught him the whole of their mystic lore.

It is not then the voice of the prophet, but the great heart of the vulgar, that brings a new religious intuition to the birth. All that violence and gesticulation that repel us, are but the dim experimental utterance of an impulse not yet fully conscious of itself.

It is when the idea has been elaborated in this way by the imagination and conscience of the myriads, that there arises a man who seems to embody it in his own person. And he is hailed as Master and Teacher by all, because he interprets their own lives, and speaks the words that already they were struggling to express. He is the crest of the wave, but all these are the wave itself.

Born thus of his nation's life and speaking straight to its heart was Ram Prasad, the great Bengali poet of the Motherhood of God. Not a century has passed since a crowd stood with him by the Ganges side, listening to his recital of his own finest work. As the pronounced the last words the old man exclaimed, "It is achieved," and on the moment died. It was not death. It was translation. And the people feel that it happened yesterday.

He had begun life as a book-keeper, and no doubt tried, when he remembered them, to perform his duties faithfully. But when at the end of a week his employer called for his books, he found on the first page a sonnet beginning—"Mother! make me thine accountant. I shall never prove defaulter," and verses scribbled all over the accounts. One cry, "Mother! Mother!" rang through every line, and as the Hindu dose not live who cannot understand a religious freak, his genius was recognised at once. A small pension was settled on him, and he was set free from wage earning for the rest of his life.

The result is a collection of folksongs, full of the sentiment of Kali-worship, left to the memories of his people. Many it is to be feared, remain about the villages of Bengal, unrecorded to this day. But they are so integral a part of the life that there is good reason to trust that they will never be lost.

In after days, Ram Prasad became famous. Drifting down the Ganges one summer day, his little boat encountered the royal barge of Siraj-ud-dowla, the brilliant young governor of Bengal.

and he was ordered to come on board and sing. The poet tuned his vina, and racked his brain for songs in the grand old classic style, fine enough to suit the presence. But the Mohammedan would have none of them—"Sing me your own songs—About the Mother!" he commanded graciously, and his subject was only too glad to obey.

No flattery could touch a nature so unapproachable in its simplicity. For in these writings we have perhaps alone in literature, the spectacle of a great poet, whose genius is spent in realising the emotions of a child. William Blake, in our own poetry, strikes the note that is nearest his, and Blake is by no means his peer.

Robert Burns in his splendid indifference to rank, and Whitman in his glorification of common things, have points of kinship with him. But to such a radiant white heat of child-likeness, it would be impossible to fiind a perfect counterpart. His years do nothing to spoil this quality. They only serve to give him self confidence and poise. Like a child he is now grave, now gay, sometimes petulant, sometimes despairing. But in the child all this is purposeless: in Ram Prasad there is a deep intensity of purpose. Every sentence he has uttered is designed to sing the glory of his Mother.

For all his simplicity, however, our author is not to be understood without an effort. Nor need this surprise us. It takes the whole history of Rome and Florence to make the Divina Commedia comprehensible. In fact we can never understand any poet without some knowledge of the culture that produced him, and what is true of Dante may be expected to prove still more applicable to one who is removed from us by oceans and continents, as well as by the complex civilising centuries.

Indeed it may be questioned whether the apparent artlessness of Oriental expression is not always somewhat misleading. Into four lines of landscape, we are told, the Chino-Japanese can slip the whole theory of his national existence, without ever a European suspecting double purpose; and much the same is the case with the Hindu. A wealth of such associations goes for instance to the appreciation of the great line describing the mountain-forests against the snow,—"They make eternal Sati on the body of Mahadev."

What is said of the Japanese artist is pre-eminently true of Ram Prasad, only it is in the broken toys and April shower and sunshine of a child's moods that he hides the mysteries of the universe.

Apart from his passion of devotion to the Divine Motherhood, there is a whole conception of life in his mind which is unfamiliar to us. The East takes such an utterance as "the pure in heart shall *see* God" very literally. It places the ideal existence, not in salvation—or in the condition of being delivered from sinfulness—but in this very power of direct perception of the Divine.

It seems to the Asiatic mind that the body is an actual hindrance to cognition. It is not that meaning is conveyed by language, but that mind is drawn near to mind. In unskilled speech, words may serve only to conceal thought, but in the most skilled they cannot do more than suggest it. Nerves do not create suffering, for the joy and sorrow that we share in imagination can be far keener than our own. And so this convention, of sight—sound—touch—taste—smell, under which we become aware of the notmyself, is merely a formula which deadens the Real for us till we are strong enough to bear it ; and we must stay in the body, or return to it, till we have in some way mastered these conditions.

When limitation is broken, however, when every dim stratum and substratum of our being has become conscious, and the whole consciousness is gathered up into the single tremendous act of knowledge,—not the conventionalised, formulated awareness of the senses, but direct absolute knowledge,—what is it claimed that we perceive ? That which came before as many, as seeing and hearing and the rest, is known now to be One, and that One—God.

And so it happens that the great goal of Eastern religion is known as Mukti or Nirvana, or Freedom. The man in whom this perception is perfected is liberated from conditions—he may subject himself to them at will, but he is not bound by them. He has left the sleep of ignorance behind him, and is for ever awake. Says Ram Prasad :—

"From the land where there is no night
    Has come One unto me.
And night and day are now nothing to me,
Ritual-worship has become for ever barren.

My sleep is broken. Shall I sleep any more ?
Call it what you will—I am awake—
Hush ! I have given back sleep unto Him
whose it was.
Sleep have I put to sleep for ever.

The music has entered the instrument,
And of that mode I have learnt a song.
Ah ! that music is playing ever before me,
For concentration is the great teacher thereof.
Prasad speaks—Understand, O Soul, these
words of Wisdom."

But the great burden of his verses is the Mother. And in calling upon Her he becomes the ideal child. It is curious to reflect how a century and a half ago, almost a hundred years before the birth of childhood into European art, a great Indian singer and saint should have been deep in observation of the little ones—studying them, and sharing every feeling, almost without knowing it himself.

Once, indeed, he seems to justify himself—

"Whom else should I cry to, Mother ?
The baby cries for its mother alone—
And I am not the son of such
That I should call any woman my mother !
Tho' the mother beat him,
The child cries, 'Mother, O Mother !'
And clings still tighter to her garment.

True I cannot see Thee,
Yet am I not a lost child !
I still cry 'Mother, Mother !' "

But indignant pride gives way to secret despair, mingled with an angry impatience. God must be dead—no living mother could so long resist a baby's cries. He will hold a funeral in effigy, and retire from the world for ever.

"Mind, stop calling 'Mother, Mother !'
Don't you know She is dead ?—
Else why should She not come ?

I am going to the banks of the Ganges,
To burn the grass image of my Mother,
And then I'll go and live in Benares."

When the question of his going on pilgrimage, however, is seriously mooted, he makes a reply of wonderful beauty and profundity. Naughty as he is he does not want to go, and is willing to support himself with reasons. Doubt leads to doubt and a frown culminates in a supreme defiance :—

"Why should I go to Benares ?
Why Mother's lotus-feet
Are millions and millions
Of holy places.

The books say, man dying in Benares
Attains Nirvana.
I believe *it*. Shiva has said *it*.
But the root of all is devotion
And freedom is her slave.
What good is there even in Nirvana ?
Mixing water with water—— !
See I do not care to *become* sugar,
I want to *eat* sugar !"

What a flash is in those last two lines ! The shrewd *motherwit* of a peasant joins with the insight of a great poet, not only to express the finest of fine emotions—the joy of being the inferior, but to hint in the same words, at the secret of existence.

Quaint beyond quaintness is the song of the kite-flying. To the child mind it is quite natural that its mother should play with its toys. All mothers do so. And now Kali becomes the playmate. Her toy is the Indian kite, of which the string is covered with powdered glass that it may cut through others. But the boy forgets his game, so completely is it She that fascinates him. He breaks away and looks on with grave joy at Her, while his lips involuntarily frame a song. It is the game of life, that is played before him ; the kite released is the soul, gone to freedom ; and still the

Mother laughs and plays on, as if She knew not that all these were shadows :—

"In the market place of this world,
The mother sits flying Her kite.
In a hundred thosand,
She cuts the string of one or two.
And when the kite soars up into the Infinite
Oh how She laughs and claps her hands !"

Again he is making a mystery out of nothing, playing hide and seek, as babies love to do.

"The name of her whom I call my Mother, shall I tell that secret to ths world ?" he says (lit. "Shall I break the pot before the *market* ?") "*Even then who knows Her ? Lo, the six philo*sophies were not able to find out Kali !"

That is almost the only simile in which he ceases to be a child, when he adjures himself to "Dive deep, O soul, taking the name of Kali !" into that ocean of beauty from which he is to bring up the lustrous pearl.

So much then for the art-form in which this worship of tender appeal has been enshrined. To the Hindu mind the poet's familiarity with his Mother makes him not only dear and great, but infinitely devout. It proves, as did the repartee of S. Teresa, that God is more real to him than the objects and persons that we see *about us daily. Is it not true* that a soul so close to the Divine might well have been that child who was taken on Christ's knee when He said :—"Of such is the kingdom of heaven."

It is not as the interpreter of man's love to God, but as the great Incarnation of the spirit of the Mother towads Her children, that we pass on and kneel at the feet of Ramakrishna Paramahamsa.

Here is one who has but lately gone out from amongst us. Less than twenty years ago he was teaching in the Temple-Garden of Dakshineshwar, near Calcutta. And so large loomed the Divine through him, that many of those who knew and loved him then, speak his name to this day with bated breath, calling him, "Our Lord."

For in the case of Ramakrishna, innumerable prayers and unheard-of austerities had culminated in a realisation so profound that there

was scarcely a memory of selfhood left. The man who lived and moved before his disciples was a mere shell, that could not fail to act as the indwelling motherhood willed. He never used, it is said, the expression. "I" and "mine," preferring ' He who dwells here" (indicating His own heart), or usually "My holy Mother."

That his original physique must have been extraordinary, we can infer, since it stood the strain under which his religious yearning hurried it, for fifty years. But far more wonderful was the complexity and many-sidedness of character and of development, that made him feel the perplexities of every heart as if they were his own. His was, probably, the only really universal mind of modern times. Yet the whole was wrought to such a unity that the peace of it fills to this day the little chamber where he dwelt, and abides like a mighty presence under the great tree of meditation. That little room, how poor, even to meanness, it looked when I last saw it!

It was night, and a tiny lamp—a cup of oil with a floating wick—illumined the exquisite purity of bed-linen and the fresh flowers placed by faithful hands before the Master's picture. The lamp was lifted, and the long shadows seemed to come down, from some dim upper abode, and prostrate themselves in worship. All was as he had used it, the lounge beside the bed, a huge water jar in one corner, a few religious pictures on the walls and nothing more. Outside the heavy rain of June fell steadily, and below the terrace the Ganges moaned and hastened on. I have seen it in other moods—seen it when the oleanders nodded and whispered to the roses on the terrace, when the great mango groves behind were full of blossoms, and the clang of the bells for evening worship broke the silence to make the place like a smile at time of prayer. And I have seen it in the terror of an Indian noon, full of coolness and flower fragrance. But never did it look so poor as that June night, and never was poverty made so beautiful.

Here great scholars and potentates have been proud to be received—"And they seemed," said one who was often present, "like children before our Lord!"

He, at least knew nothing of the difference made by wealth and learning in the world. He dismissed the most important man of his district with a frown from his presence because he stood upon his riches and his name ; he would leave companies of distinguished

persons to themselves; and he would spend hours listening to the confidences of an anxious woman about her home, or in the instruction of some nameless lad. Yet his touch fell on none lightly. A great preacher, known to the West as to East, changed his teaching when he knew him, in this new thought of the Motherhood of God. And many of the strongest men in India today, sat at his feet in their boyhood. An unlettered peasant, from the Brahmins of the villages, scarcely able to read and write he seemed, yet if original thought and wide reading are enough, he was a profound scholar. For he had a remarkable ear and memory that made him retain the sounds of the Sanskrit perfectly, with the translation, and as a vast quantity of literature was read and recited to him from time to time, he had acquired in this way an uncommonly large store.

In those years of which we are now speaking, the last twenty of his life, he was a great light, known as a saint throughout Bengal, the North-West Provinces and Nepal, and much visited, in the informal Eastern way. Men felt themselves in his presence to be dealing with forces that they could not gauge, drawing on wisdom which they were unable to fathom. As if he were great music, they touched there the state that mighty music hints at, and went away saner, sweeter, stronger to their daily tasks.

Yet all this time his real inner life was lived amongst that group of young men who had forsworn the common motives of existence, to call themselves his disciples. He was rarely without one or two in immediate attendance, and many were with him day and night for weeks and months together.

Some were more boys, and it was fitting that laughter and frolic should make a large part of the life together. Their Master was never sad. A gentle gaiety seemed the very air he breathed, broken indeed by the constant trance of rapture, and by the wonderful inspiration of his mood afterwards. "When it is night to all beings, then is the man of self-control awake: when all beings, are awake, then is the night of the man of knowledge," he would chant, waking them during the dark hours to come out and meditate in the starlight, while many a day was spent swinging on the elephant creeper that his own hands had planted, amidest laughter and picnicking in the garden. The stream of days flowed on, without apparent plan or purpose,—yet all unnoticed a few leading ideas were being insisted

on; a story here and there was building up the knowledge of that tremendous struggle through which he had attained to peace; they were watching him deal with men and things: above all, they were bathing in that ocean of the Real to which his presence was a perpetual access.

And is not this the wisest of all teaching, to make sure of essentials, and leave the minds of the instructed to work out their own results, like the young plant growing up from seed? For we may be sure of one thing,—the order that is imposed upon us may become geometrical, but only the order that we create ourselves can become organic. It was the old Indian ideal of a university, to live in the forest with the *Master* and realise the meaning of culture in the touch of his personality.

These men to whom Ramakrishna Paramahamsa entrusted the mission and teaching of his "Divine Mother"—for he never dreamt of them as his own,—were chiefly graduates from the neighbouring colleges, many of them deeply tinged with the Western reaction which was the temper of that day. The distance between them and Christianity was shorter than would now seem possible. They were touched by its evidence of purity and enthusiasm for humanity, and full of a very genuine love for the New Testament. Occidental influences had stirred them to ideas of patriotism otherwise foreign to the Hindu temperament. They were looking for great things from the adoption of a more European taste and style of living. Above all, they had conceived the idea that India being ruined by idolatry, and that the one thing incumbent on them was to do what in them lay, to sweep away every image and relic of degraded superstition, and to work for her emancipation from caste, from the zenana system, and from whatever else had till now been considered her distinctive institutions.

Speaking broadly, many of the finest minds of the Indian universities of that time felt thus, and these young disciples of Ramakrishna were among their following.

Suddenly they found themselves face to face with this ascetic saint of the old orthodox Hindu pattern. Gentle, without solemnity or affectation, full of humour, living in his garden almost nude, knowing little of the English save on hearsay, as a queer folk

from overseas, the old man held them by a spell they could neither analyse nor break.

His perfect sincerity and gigantic purity made themselves felt even by youth, but against his intellect some made a desperate resistance. Long, long after, one of them said, "I was always looking for something that would prove him to be holy! It took me six years to understand that *he was not holy,* because he had become holiness itself!"

He was glad to hear all they could tell him of the Bible. Christianity was in the air in those days, and he had loved Christ and worshipped Him long before they came to him; but he bated no jot of his own devotion to Kali. "As sugar," he said, "is made *into various figures of birds and beasts, so one sweet Mother Divine* is worshipped in various climes and ages under various names and forms. Different creeds are but different paths to reach the Supreme."

The ritual of Kali-worship is the only existing provision in India for animal sacrifice. This means something entirely different from the Jewish notion of propitiation. There is no idea whatever of making compensation for sin: the whole intention is to offer meat-food first to the Mother, for Her use and blessing. No meat is eaten by the orthodox Hindu without being consecrated in this way, whether he be otherwise a Kali-worshipper or not. But the Anglicised portion of the community, while consuming vastly more animal food than their conservative brethren, take great exception to these preliminaries, and have perhaps concentrated on this particular creed in consequence, all the horror with which idolatry as a whole inspires them. These were the associations of the disciples with Her whom their Master called his "Divine Mother."

But it was not Kali only; there was not a symbol in India that he had not worshipped and did not love; not a worshipper, by whatever rite, whose special need he had not felt in his own nature, and borne till it was satisfied; not a prayer, or ecstasy, or vision that he did not reverence and understand, giving it its true place in a growing knowledge.

His was in fact the most perfect religious culture that the mind can conceive. The doctrine that "different creeds are but different

paths to reach God," propounded in a general way, was not new in India. But taught as this man taught it, with his strong contention that it was the actual duty of men to follow their own faith, for the world gained by many-centredness; with his intense conviction "in what-soever name or form you desire to know God, in that very name and form you will see Him"; with his assurance that rites and ceremonies contain religious experience, as the husk contains the germ; and above all, with that love that said of every faith, "Bow down and adore where others kneel, for where so many have worshipped, the Lord will manifest Himself"—it was unique in the world's history.

To those who have learnt even a little of the authenticity of the religious consciousness, it is not difficult to see intellectually that creeds may bear to each other the relation of contemporary languages all expressive of that one consciousness. But Ramakrishna in the garden of the Kali-temple, was a direct embodiment of the impulse to speak to each in his own language and tell him how to reach the goal. In this man's love there was no limitation anywhere. Let one be sincere, and neither race, nor history, nor stage of development could cut him off. Each who came to him had his own place given to him, and kept it. His longing was for the salvation of every soul in a whole world. A universe from which one, most insignificant, was missing, could not have seemed perfect in his eyes.

Love such as this carries all hearts at last. Only such love deserves the name of God the Mother.

He was entirely abandoned to this great passion. There was nothing in him that remembered anything else. In the long years of self-discipline he had knelt to worship the very lowest, doing menial service for them with his own hands; in the last days of his life when he lay dying of cancer in the throat and speech was agony, he would insist on teaching all who came to him for help.

This was the secret that his disciples learnt by degrees. But on the outside, how free from display it was!

The old man sits chatting quietly with his boys. Now, with a twinkle of the eyes, he gives worldy advice to one—"Raise the hood (alluding to the cobra), but do not bite!" Again in a deeper moment, 'There are thirty-six letters in the alphabet, and three of them say suffer.'" (Bengali has three s's, which are so pronounced.)

Everything taught its lesson, even the folklore of the district, and the quaint superstitions of the uneducated. In Ramakrishna's eyes, doubtless, much of human learning was on a level at bottom with the legend of the philosopher's stone ; but let a man see to it that he touched the feet of God, and whatever was his would become pure gold. Little incidents that occurred would all become the text of some remark, often of great profundity. Even a half-cooked vegetable would furnish a metaphor, it was like the aspirant who, falling short of perfection, is not yet all humility and tenderness. The bell, whose distinct strokes could be heard from the neighbouring temple die away into a long common vibration would remind him that God is both with form and without form too, and He is that which transcends form and formlessness.

There was wit too. All the saintliness in the world would not prevent a laugh at the man who was so indifferent to worldly interests that he permitted his wife to limit his charities.

And then, even as he talked with them, something would stir him deeper. A great light would come on his face, and he would pass, as they awed, sat and watched, into the state of divine ecstasy, the inner vision of the Mother.

So, day by day, unutterable love and burning renunciation were woven into the texture of their lives, till one exclaimed, "It was not what he taught us, but that life that we lived with him! And that can never be told!"

At last came a summer night towards the time of full moon, when his disciples gathered round him, perceiving him to be passing into that beatitude from which there would be no return.

Even at that moment he rose suddenly to answer a thought in the mind of one. And then he left them, while one, whose music he had loved, chanted over him the name of God.

Later, in the dark, came a woman, sitting at his feet crying softly, and calling him "Mother." It was that disciple who had been his wife.

During their afterlives, when the boys had become men, and had begun to carry the message of their great Teacher far and near, they found that nothing he had given them was more precious than the story of his own early struggle and attainment. With the outer

circumstances of his boyhood they were familier, having mixed freely with his relatives and village neighbours, whenever these chose to visit Dakshineshwar.

India is probably the one country in the world where a man can be awake to the meaning of his life from his infancy without having a whole growth of superstitions become heart of his heart at the same time. No doubt superstition is there, but it is possible for it to drop away imperceptibly as, to use Ramakrishna's own expression, the dried petals drop from the ripening fruit.

In this sense he seems to have been awake from the beginning. He had inherited the long-garnered knowledge of his race, that religion is no matter of belief but of experience. The worship of the Great God of Getting-on disgusted him; and he longed to attain the sweetness of Divine Union even in boyhood. With all this he kept caste strictly, and without thought of personal comfort.

At twenty years of age, however, all these elements became absorbed in one supreme desire. Pressure of many circumstances had assinged to him the duty of acting as assistant priest in the Kali-temple at Dakshineshwar. We must think how it would work on a strongly religious temperament to find itself set apart for the service of God. We must remember also that the utterances of Ram Prasad and many another devotee of Kali were part of the common language of the country. It was as if his chosen way were pointed out to him. It was only for him now to traverse it.

His duty was to swing lights and flowers before the image, in the beautiful Arati ceremony.

But his whole nature had gone down in passionate yearning for the Mother Herself. One question, "Is this real? Is this real?" rang eternally in his ears. And he could not perform even this simple task efficiently. Sometimes he would swing the lights all day, sometimes he would forget them altogether, lost in a maze of agonised supplication.

The tale went about that he was mad, and as, everywhere, people will try by a dose of this world to drive out the other, his relations decided that the distraction of a wedding would give him his only chance of a cure. It was in this way that he was married to a little

girl who long afterwards came to him and became one of the greatest of his disciples.

But a wedding-feast proved no mitigation of a struggle so tremendous, so overwhelmingly actual, and he had to be released from his stint of work. No doubt he would have been dismissed also from the garden but that the owners of the temple had recognised his genius and protected him.

The associations of this new period cluster thick round a great banyan-tree, and a wooden hut that once stood near it. The tree stands in the wilder part of the garden, close to the river, in perfect seclusion. Five stems grow together, and round the entwined trunk is built a terraced seat of brickwork. At the north-western corner a great bough of the Bo species has grown down across the bench, and tradition says that this covers the exact spot in which realisation was achieved. Be this as it may, the place was the scene of continuous meditation and austerity for many years. Not that the asceticism seems to have been premeditated. It would appear rather to have been the inevitable result of something deeper. Ramakrishna did not forbid himself to sleep or eat: he was unable to do either. He did not force himself to neglect his person, he entirely forgot it.

Driven on by his own nature, impelled from within by that irresistible necessity that had called him into being, without one rest or relaxation, for twelve long years at least, he persisted in that inner warfare. Then, at last, the goal was attained. The Mother revealed Herself. From that moment his personality was that of a little child, satisfied that he was in Her arms.

He had discovered a great secret, when he would break a disposition, he would reduce it to a concrete instance, and battle with it there. It was so that he had night after night performed that act of cleansing that was to rid him of social pride.

Now as he came slowly back to life out of the rapture of Eternal Union, having perceived the whole of Nature as himself, he yet, with his quickened senses, saw many elements in human life for which he had not actually traced the path. And so, one by one, he took these as questions on the simples plane. Beginning with that worship of Krishna which is related to his own as the Catholic Church to the Protestant, he made himself in all ways

one with it. He ate and dressed and talked like the lovers of Hari,—and he ended by identifying devotion to Krishna with the love of Kali. So it was with Mohammedanism, and so with Christianity. It was not he who did these things. It was that Great Love that he felt within and called his Mother. He was not humble, but he seemed to have forgotten that Ramakrishna had ever been.

Then came the strangest phase of all. He would realise God as a woman! It was the flowering point of a certain tender chivalry that had always marked him, and makes his life the true emancipation of Indian women. His method, here and always, was the same,—to forget his own past and cause it to be forgotten. So he made every detail of their lives his own, and went to visit his wife in her village home, that he might find his friends entirely amongst her acquaintances and share every joy and sorrow of their hearts. Till at last he satisfied himself that the secret victory could also be attained in the straight path of womanhood.

And herein surely lies the gist of his life. As a mother's love justifies the existence of *all* her children, however unsympathetically they be judged by others, so he, the embodiment of the World-Mother, would take up whole areas of living and assert the place of each in the complete harmony of life.

And is it not a great doctrine,—*that* every man's cottage-door stands open on some high-road to the Infinite? Is it not immeasurably consoling, this cry of "No more idolatry! No more condemnation!" but to every man where he stands, using the means that lies to his hand—"Fix thine heart upon the Lord thy God, and let thine eyes look right on!"

It was as a seal upon this teaching that whoever came to Ramakrishna afterwards went away with profound courage. For the Master put his finger always upon the core of strength, and even his limitations became as wings upon the feet to the man so touched.

So with social customs and public movements, he destroyed no institutions: he did everything to make men and women strong in them. His friendship was given unhesitatingly to the leaders of reforming sects, and as readily to the despised artists of the theatre, while at the same time he was worshipped by the orthodox.

And yet he appeared quite unconscious of what he did. He seemed to act on divine instinct, like a child, and like a child, to be always superbly right. He was content to live, and leave to others to explain. Long ago, in early manhood, it had been no desire to become a teacher, but the longing to find the Real, that had driven him forth on the supreme quest. Now, it was because he would satisfy his unspeakable yearning over men and women that he tried every path to find God. Had one been left untrodden, his own soul would have gone seeking still, He never became the director of any, for in afterlife, it is said, he could not even imagine himself a teacher. He scattered his knowledge broadcast, and each took what he would.

We learn in him greatness, and harmony, and beauty are all results. *Our concern is not with them, but with those more* elemental matters of simplicity and sincerity and whole-hearted devotion that lie close to us.

He is a witness to the world that the old Indian wisdom was not in vain. It is of course true that in no other country could he have occured. But it is not true that he expresses the mind of India alone, or even chiefly. For in him meet the feeling and thought of all mankind, and he, Ramakrishna, the devotee of Kali, represents *Humanity.*

THE VOICE OF THE MOTHER

Arise, My child, and go forth a man! Bear manfully what is thy lot to bear; that which comes to thy hand to be done, do with full strength and fear not. Forget not that I, the giver of manhood, the giver of womanhood, the holder of victory, am thy Mother.

Think not life is serious! What is destiny but thy Mother's play? Come, be My playfellow awhile,—meet all happenings merrily.

Murmurest thou of need of purpose? Think'st thou the ball is purposeless, with which the Mother plays? Know'st thou not that Her toy is a thunderbolt, charged with power to shatter the worlds, at the turn of Her wrist? Ask not of plans. Needs the arrow any plan when it is loosed from the bow? Such art thou. When the life is lived, the plan will stand revealed. Till then, O child of time, know nothing!

My sport is unerring. For that alone set forth on the day's journey. Think it was for *My* pleasure thou camest forth into the world, and for that again, when night falls, and My desire is accomplished, I shall withdraw thee to My rest. Ask nothing. Seek nothing. Plan nothing. Let My will flow through thee, as the ocean through an empty shell.

But this thing understand. Not one movement shall be in vain. Not one effort shall fail at last. The dream shall be less, not greater, than the deed. Thou shalt go here or there for some petty reason, and thy going shall subserve great ends. Thou shalt meet and speak with many, but some few shall be Mine from the beginning. With these thou shall exchange a secret sign, and they shall follow with thee.

And that sign?

Deep in the heart of hearts of Mine own flashes the sacrificial knife of Kali. Worshippers of the Mother are they from their birth in Her incarnation of the sword. Lovers of death are they,—not lovers of life—and of storm and stress.

Such shall come to thee with torch unlit for fire. My voice cries out over the teeming earth for lives, for the lives and blood of the crowned kings of men. Remember that I who cry have shown

also the way to answer. For of every kind has the mother been the first, for protection of her flock, to leap to death.

Religion, called by whatever name, has been ever the love of death. But today the flame of renunciation shall be lighted in My lands and consume men with a passion beyond control of thought. Then shall My people thirst for self-sacrifice as others for enjoyment. Then shall labour and suffering and service be counted sweet instead of bitter. For this age is great in time, and I, even I, Kali, am the Mother of the nations.

Shrink not from defeat, embrace despair. Pain is not different from pleasure, if I will both. Rejoice therefore, when thou comest to the place of tears, and see Me smile. At such spots do I keep My tryst with men, and fold them deep into My heart.

Uproot every interest that would conflict with Mine. Neither love, nor friendship, nor comfort, nor home, may make its voice heard when I speak. Pass from a palace to plunge into the ocean of terror,—from the chamber of ease to stand guard in a burning city. Know that as the one is unreal, so also is the other. Meet fate with a smile.

Look for no mercy for thyself, and I shall make thee bearer of great vessels of mercy to others. Accept bravely thine own darkness and thy lamp shall cheer many. Fulfil gladly the meanest service, and leave high places unsought.

Be steadfast in the toil I set thee. Weave well the warp into the woof. Shrink from no demand that the task makes on thee. Feel no responsibility. Ask for no reward.

Strong, fearless, resolute,—when the sun sets, and the game is done, thou shalt know well, little one, that I, Kali, the giver of manhood, the giver of wamanhood, and the withholder of victory, am thy Mother.

A VISIT TO DAKSHINESHWAR

"Thou wilt keep him in perfect, whose mind is stayed on Thee."—Isaiah.

He was not in the vastness. And the Soul, lying on a housetop on the Earth, and looking forth into the uttermost of space, realised the solitude and trembled.

Then came one whose voice spake within the heart, saying very gently, "Come thou away into that quiet place and rest a while. There it may be that thou shalt speak with Him." And that soul arose, following after, as it were, the Angel of the Presence,—who bore white lilies, and about his feet played flames, and his eyes to look into were like mighty waters—and came by many ways unto the Lord's own garden, and rested there.

And there was in that garden a place where five trees grew together, beneath which oftentimes had the Master sat and prayed and entered into glory. Thither went the soul, laden with sorrowful queries and needs, and being received into the silence, waited.

On the left flowed the river, and the great barges went past swiftly, with sails full set. Beneath, the dead leaves stirred in the breeze, or rustled under the footsteps of a mouse. And on the branches above fell the flood of moonlight, dropping through and making spaces on the brickwork, all outlined by quivering leaves and moving stems.

The whispers of river and trees and lone night-creatures were the only sounds that could be heard....

"Those with whom I was wont to come, O Master, are absent now. In far distant lands think they upon this place. I would make memorial for them at Thy feet tonight!"

And the Lord said—"It is well. My own are ever Mine. I bear their burdens; I guide their footsteps; and at last I bring them to that haven where they would be, there are three here tonight, My child, not one. Be assured."

"Some whom we love, O Lord, are in fetters of suffering. With hearts cramped by fear they look out upon their world. One longs for death because life is bitter: to others, life comes so hard that we almost ask for death for them. We pray Thee, give these ease, or that light that makes ease of no account."

And the Lord, smiling, listened—"It cannot be, O Lord, that for the People we can do nothing! In the midst of terrible calamity,

shrinking from the gaze of death, or striveing against the blow that will rob them of the beloved ; sleeping hard in the air of poisonous swamps, ill-fed, ignorant, and oppressed, it cannot be that we, so much more fortunate, can share *nothing* with them. It cannot be that Thou wilt tell us it is vain to struggle."

"And what would you have ?"

"Only the right to share their danger, if nothing can be done. Only to hold their heads and hearten them—to perform some menial service for them—not to feel utterly cut off from fellowship, while they tread the winepress of despair !"

"Is this all ?"

"Nay, if it were granted to us to serve truly—that would be blessedness. If we might indeed bring help, then the cup were full. But even without this we pray to be allowed the freedom where men do what they can, without thought of self. Command us not forever to think of the necessities of life. Grant us to give, and leave with Thee, and remember not whether life or death we shall take away."

And there was long silence. And at last the Voice, very gentle and reproachful—

"O foolish Children ! Have ye yet to learn that this love that speaks in your hearts is not yours but Mine ? Must ye struggle and plead with me for My own ? Know ye not that difficulties and discouragement but point out the way in which I would guide you ? Strive on and fear not ! That way shall be found ! Can *My* love be baffled ?...Is yours more than its feeblest utterance ? Remeber—"Thy right is only to action : thy right is never to the fruit thereof." May be this struggle is itself your action. Yours not to ask how it shall end...Your love is not separate from Mine. Know that these two are one...."

And as the words died away, those souls rested for a moment in the sight of a Universe that was all Mother—of a love of which the love of human mothers for their children is but a feeble glimmer—of a life that whether hard or happy-seeming, was all alike the dealing of that Universe-Mother with Her babes.

* * *

And the Master put forth His hand in that place and blessed His worshippers.

"These are the days that must happen to you :
You shall not heap up what is called riches.
You shall scatter with lavish hand all that you earn or achieve.
You but arrive at the city to which you are destined.
You hardly settle yourself to satisfaction, before you are called, by an irresistible call, to depart.
You shall be treated to the ironical smiles and mockings of those who remain behind you.
What beckonings of love you receive you shall answer with passionate kisses of parting.
You shall not allow the hold of those who spread their reached hands towards you."

Walt Whitman

Mother ! Far away, one whom I love is very sad today. His heart calls to mine for help, but though I tell him how I love him, I leave him still uncheered. How is it ? I know he thinks towards me, I know I talk with him. Yet I long to see him, and hear him, and comfort him face to face !

My child, if this were not so, the sense-life would not be yours, or would not hold you. When you have reached that place where the communion of souls is enough, you will find that it is *more* than the knowledge of the senses, faith will already be swallowed up in sight.

But, oh Mother, what can I now do to ease this craving pain? I prayed for the vision of Raghunath* and did not know that it meant torture multiplied a thousandfold. When one is in trouble oneself, one's own little world lies in gloom ; outside, the busy feet

* The vision of Raghunath is one of the eight perfections. It consists in feeling the sufferings of others as if they were our own. Many stories of the saints, especially those of the stigmata, give us special cases of it. It is told of a Hindu devotee, that when a bullock was smitten cruelly in his presence he screamed and fell down fainting ; and when the passers-by ran to his assistance, he was found to bear the marks of the lashes on his own back.

The allusion here is perhaps to one of the earlier steps in the acquirement of this perfection, when we have a deepened appreciation of the pain of those we love.

pass up and down beneath the windows, the birds build nests, and the children play in the sunshine, as before: but the universe becomes all black when the beloved suffers.

Cease, My child, from inordinate affection. Give me your heart, and let Me govern it alone. Be the *witness* of earth's joys and sorrows, sharing them not. Thus only can you keep yourself from entanglement, and attain to peace.

But peace for myself, dear Mother. why should I seek? How can I turn a deaf ear to his voice that calls me, adding another pang to the heartache of a life, and go away myself, and be at peace? Give *him* that inner peace! Let me win it for him, if Thou wilt be kind! But I cannot will to fail him in his need and loneliness, even to gain Thy bleesing!

* * *

Ah foolish one! Every thought of love that you send out to answer his, becomes a fetter of iron to hold him in life's anguish. Hide you yourself in my heart, My child, and he, too, will come home to Me. For your *love's* sake, let your voice cease to be one with the voices of the world. Let it come to him only in Mine, when that is borne on the south wind at the time of sunset, calling him gently to worship at My feet. Let it be one with transcendent love, with infinite freedom. Only thus can you satisfy him. Only by withdrawing yourself can you bring him peace.

* * *

Mother! I yield. Take me, I pray Thee, into Thine own heart. Let me not look back. If Thou wilt call me I shall find my way there, surely, though my eyes now are blind with tears.

And for those I love, shall I trust Thy mercy less than I trust mine own?

Yet if at the last they seem to stumble, if the foot slip, or Thy voice fail them by the way, promise, dear Mother, once more to wake me from the dream of bliss. Cast me out from Thy heart, I beg of Thee, and let those who so need Thee, go in before to peace!

Silly, Silly child! Like a helpless bird you beat your wings of littleness against My grace! Look up and laugh! For already the could that seemed so black is passing. Already the clasp of hands

about the heart is lossened. *Two* souls draw the breath of strength and relief. The feet of *two* who come to Me are shod with gladness. The hearts of two beat high, for the conquest born of renunciation.

Baby darling, what is the very first thing you remember? Is it not lying on mother's lap, and looking up into her eyes, and laughing?

Did you ever play hide and seek with mother? Mother's eyes shut, and baby was not. She opened them, and there was baby! Then baby's eyes shut, and where was mother? But they opened again, and—oh!

When mother's eyes were shut, where was she? There all the time? But you could not see her eyes. Yet she was there.

Baby, some people think God is just like that. A great great Mother—so great that all this big world is Her baby. God is playing with Her world, and She shuts Her eyes. Then, all our lives long, baby darling, we try to catch the Great Mother peeping. And if any of us can do that, if any of us can look into the eyes of God, just once, just for a minitue,—do you know what happens?...That person at once knows all secrets, and he becomes storng and wise and loving, and he never, never forgets that moment.

And when you win like that, when you catch the Mother looking something else happens. Something lovely. All Her other children come and play with you. The little birds come, and the wee lambs love you, and the wild rabbits touch your feet, and the poor children in the streets, who are cold and hungry perhaps—poor children that the Great Mother loves most of all, because they seem to have no father or mother, and perhaps no home—poor children trust you and make a place for you with them. We are all sitting on the Mother's lap, but these sit closet of all to Her breast.

And what do we call the Mother with Her eyes shut? We call her Kali.

* * *

Were you ever, for a very few minutes, unhappy? And did mother, or nurse, or auntie, or someone else, come and pick you up, and love you, and kiss you, till you were not unhappy any more?

Sometimes God is like that too. We get so frightened because those eyes will not open. We want to stop the game. We don't like it. We feel alone and far away and lost. Then we cry out. It

has grown quite dark, and still the Mother's eyes are shut. Let us play no longer, so we feel sometimes.

But the eyes are not shut, really. We think so, because it is dark all round. Just at that moment when you cried out, the beautiful eyes of the Mother opened and looked at Her child like two deep wells of love. And you, if you had seen, would have stopped playing all at once, and saying "Kali ! Kali !" you would have hidden your little face on the Mother's shoulder, and listened to the beating of her heart instead !

And so, wee one, will you remember that the Great Mother Kali is everywhere ? Even when She seems to be far away, it is only that you cannot see Her eyes. This mother goes away, and you cannot see her. But Kali is always there, always loving, and always ready to play with Her child.

And will you sometimes remember to stop playing, just for a minute, and to fold your little hands, and say "Dear Mother Kali, let me see Your eyes !"

* * *

There is another game of hide-and-seek that the Great Mother plays. This is more like a fairy story. She hides sometimes in other people. She hides in anything. Any day you might see Her eyes, just looking into mother's, or playing with a kitten, or picking up a bird that had fallen from its nest. Uuder all these forms you may find God playing a hide-and-seek !

When there is something to do for someone—Kali is calling us to play. We love that play. She Herself said once (She was hiding in someone, and He said it was Her) "Inasmuch as ye did it unto one of the least of these, My little, once, ye did it unto Me." Is not that like a fairy story ! And what funny places She, the Great Mother, can hide in ! Another time She said "Lift the stone, and thou shalt find Me. Cleave the wood, and there am I !" Did you ever lift a stone or break a piece of wood to see what was inside ? Did you ever think *that* was God—at the heart of things ? How beautifully Kali plays ! You might find Her *any* where !

* * *

Does mother love baby when she is hiding from her ? Why of course ! else why should she hide ? Even when her eyes are shut,

is Mother loving baby? Why yes, see how she is laughing all the time!

And so with Kali. We need never be frightened, though Her eyes are long shut. She is laughing all the time. In Her own good time God will stop playing and we shall look into Her eyes, and get away and away behind the world—straight "to the other end of nowhere," all at once.

So let us always run to play when we are called. Remember, little one, if any need anything you can give, your Mother is calling you to find Her! If anyone ask for something you can do, it is really Mother saying "Peep childie!" or when a new person comes for you to love, Kali is saying "Here am I!"

* * *

There is something else. You love mother and father and auntie and nurse, and—, and—. Of course you do. Besides, they love you, and they are all so good and kind.

But far far away, mother has a brother, a big brother, like Holl. Do you love him too? Why? You never saw him. He never played with you.

No, but mother loves him. And you love all the people mother loves—don't you dearie? And so we love all the people Kali loves *all* the children She plays with, and the lambs, and the flowers, and the great trees, and the little fishes. She loves all these, and She loves too the stars in the sky. And so do we. For we are Her children and everything that She loves we love too, because She is the Mother, and we cannot help it.

CHRONOLOGICAL TABLE
of the
WRITINGS AND SPEECHES OF SISTER NIVEDITA

1897 September 15: first report of 'Vedanta Teaching in Wimbledon'.

October 1: second report of the same.

November: third report of the same.

December 16: fourth report of the same; all the four are published under the general title of 'Vedanta Missionary work in The Brahmavadin'; the writer's name is given as Margaret E. Noble.

1898 March 11: lecture on 'Influence of the Spritual thoughts of India in England' delivered at the Star Theatre, Calcutta, as reported in The Brahmavadin of April 1.

'The Birthday Festival of Sri Ramakrishna' written for the Brahmavadin of March 16, under the general title of Vedanta Missionary Work, Calcutta; the writer's name is given as 'An English Lady'.

October: 'The Sociological Aspect of the Vedanta Philosophy' written for the Brahmavadin. 'Amarnath' written for the Prabuddha Bharata.

Christmas: 'The Story of Kali' written at Bally (Bengal) for Baby Legget.

'Voice of the Mother' written; both include in the book 'Kali the Mother'.

1899 February 13: Lecture on 'Kali, and Her Worship' delivered at the Albert Hall, Calcutta, as reported in the Prabuddha Bharata of April and June.

May 24: 'A Visit to Dakshineshwar'.

May 28: Lecture on 'Kali Worship' delivered at the Kali Temple, Kali-ghat, Calcutta, as reported in the Prabuddha Bharata of October and November, 1932.

June 4: 'An Intercession' written; both included in the book 'Kali the Mother'.

1900 April: 'The Project of the Ramakrishna School for Girls' written and published in America, reprinted in The Brahmavadin of 1901.

October 22 : lecture on 'New Interpretations of Life in India' delivered at the Sesame Club, London ; reproduced from the Prabuddha Bharata of June 1902 ; reprinted in the same in October 1927 under the title 'Seeing India With Other Eyes'.
First publication of 'Kali the Mother' by Swan Sonnenschein & Co. Ltd., London.

1901 'The Setting of Warp' written at Wimbledon.
May 10 : 'Of the Hindu Woman as Wife' written at Wimbledon.
'The Indian Sagas' written at Wimbledon and Norway.
July : 'Noblesse Oblige : A Study of Indian Caste' written in Norway ; first published in the Brahmavadin in 1902. 'The Wheel of Birth and Death' written in Norway and at Wimbledon; all these are included in the book 'The Web of Indian Life'.
November 30 : Lecture on 'The Education of Hindu Women and their Ideals' delivered under the auspices of the Foreign Press Asssociation, at the rooms of the Society of Arts in John Street, Adelphi, London ; as reported in The Brahmavadin of November.
'Lambs Among Wolves', published in The Westminister Review.

1902 'The Eastern Mother' written in Calcutta ; included in the book 'The Web of Indian Life'.
February 4 : Lecture delivered in reply to a public reception at the Mahajan Sabha, Madras, as reported in the Amrita Bazar Patrika of February 8, and titled here 'India Has No Apology to Make.'
September 26 : Lecture on 'Swami Vivekananda' delivered at the Gaiety Theatre,Bombay, as reported in the Mahratha of October 5,
October 2 : Lecture delivered at the Hindu Ladies Social Club. Bombay, as reported in the Hindu of December 15, and titled here 'How and Why I Adopted the Hindu Religion'.
'Swami Vivekananda As a Patriot' published in the New India of October 2, as reported in the Brahmacharin.
October 6 : Lecture on 'Indian Womanhood' delivered at the Gaiety Theatre, Bombay, as reported in the Bombay Gazette of October 7.
'Indian Women as they strike an English Woman' written for the Brahmacharin reproduced from the Bengalee of October 15.

December 23 : 'An Open Letter to Hindu Woman' written ; reproduced from the Hindu of December 24.

1903 Introduction to the 'Ideals of the East'—a book written by Kakasu Okakura and published by John Murray, London.
Reprint of 'Lambs Among Wolves' by R. B. Brimley Johnson, London.
February : 'The Synthesis of Indian thought' written ; reproduced from the Hindu of December 24.
June : 'The Immediate Problems of the Oriental Woman' written at Darjeeling.
'The Gospel of the Blessed One' written at Wimbledon and Darjeeling.

1904 January 24 : Lecture on 'Swami Vivekananda's Mission' delivered in Patna, reproduced from the Behar Herald of January 30.
March 20 : Lecture on 'Islam in Asia' delivered under the auspices of Calcutta Madrassa, at the Corinthian Theatre, Calcutta ; reproduced from the Englishman of March 21.
April 1 : Lecture on 'Bodh-Gaya', reproduced from the Brahmavadin of 1904.
May : First edition of 'The Web of Indian Life' published by W. Heinemann & Co.
August : New impression of 'The Web of Indian Life' published by W. Heinemann & Co.

1905 February 5 ; Lecture on 'Swami Vivekananda's Mission to the West' delivered at the Belur Math ; reproduced from the Brahmavadin of 1905.
February 14 : 'Saraswati Puja' written for the Statesman.
February 16 : 'Our Zenana Terrace' written for the Statesman.
First edition of 'Aggressive Hinduism' published by G. A.Natesan & Co., Madras.
'Manual Training as a Part of General Education in India', published originally in the Prabuddha Bharata as 'Manual Training in Education'.

1906 January : 'Ship of Flowers' published in the Indian World and also in The Modern Review of 1931.

'The Indian Amulet' published in the Indian World.

March : "The Swadeshi Movement", reproduced from The Indian Review.

April : Beginning of the publication of 'The Master As I Saw him' serially in the Prabuddha Bharata ; beginning of the publication of 'Notes of Some Wanderings with The Swami Vivekananda' serially in the Brahmavadin.

July : New edition of "The Web of Indian Life published by Henry Holt & Sons. New York.

'The Task of the National Movement in India' published in the Indian Review of July, 1906 ; reprinted in the Civic and National Ideas as 'The Indian National Congress'.

August ; note on Abanindra Nath Tagore's 'Bharat Matas' published in the Prabasi. Note on 'India the Mother' published in the Indian World, September : note on 'The coronation of Sita and Rama' publisned in the Prabasi.

'A memoir on Gopaur-Ma written for the Prabuddha Bharata ; included in the studies from an Easterm home with the addition of an introductory paragraph.

October : Note on 'Sainta Genevieve watching our Paris' published in the Pravasi. November ; note on 'Millet's Angelus'. Published in Prabasi.

1907 January and February ; 'The Function of Art in Shaping Nationality' published in The Modern Review in two Parts ; included in 'Civic and National Ideas' in 1911 as 'The Function of Art in shaping Nationality' and 'The Message of Art.' March ; A Study of Benaras, reproduced from the Modern Review ; originally published in The Brahmavadin as 'Benares and the Home of Service.'

March—May : 'Glimpses of Famine and Flood in East Bengal in 1906' published in four instalments in The Modern Review of 1907.

May : Note on 'The Passing of Shah Jahan' published in the Modern Review, included in Civic and National Ideals in 1911. Note on Guido Reni's 'Beatrice cenci' published in The Modern Review. Note on Richter's 'Queen Louise' published in the Prabasi.

June 24 : 'Our Master and His Message', an introduction to the complete works of swami vivekananda, written.

Note on 'Jules Breton's Song of the Lark' and 'The Gleaner' under the title Peasant girls' published in the Prabasi. First edition of 'Cradle Tales of Hinduism' published by the Longmans, Green & Co. London.

July: 'Some Problems of Indian Research', published in The Modern Review.

August: 'The Final Recension of the Mahabharata', published in The Modern Review.

First Edition of 'Glimpses of Famine and Flood in East Bengal in 1906' by the Indian Press, Alahabad.

September: 'The Relation between Buddhism and Hinduism' published in The Modern Review.

October: note on Nanda Lal Bose's 'The Death Bed of Dasharatha' published in the Modern Review

1908 January 5: Lecture on 'Family Life and Nationality in India' delivered before the London Posilivist Society at Essex Hall, London, as reported in the Prabuddha Bharata of February and March.

January—April: 'The Civic Ideal; Civic Symbolism in Medieval Europe' as 'Evolution of the European City'; 'Civic Ideal in Classical Cily: Pompeii' as 'A City of Classical Europe: Visit to Pompeii' and 'Civic Elements in Indian Life', published serially in The Modern Review.

March: Note on Abanindra Nath Tagore's 'Sita' published in The Modern Review.

April: Note on Nanda Lal Bose's 'Sati' published in The Modern Review; included in 'Civic and National Ideals' published in 1911.

May: Note on Nanda Lal Bose's 'Kaikeyi' published in The Modern Review.

June: Note on Nanda Lal Bose's 'Vikramaditya and the Vetal' published in The Modern Review.

July: 'The Place of the Kindergarten in Indian Schools' and 'The Cities of Buddhism', published in The Modern Review.

October: 'Elephanta, the Synthesis of Hinduism', published in The Modern Review.

1909 July. 'Mediaeval Sinhalese Art' published in The Modern Review.

October: Review of E. V. Havell's 'Indian Sculpture and Paintings' published in the Modern Review. Occasional Notes Written for the Prabuddha Bharata; reproduced in the same in June 1929, with the title 'Synthesis of Ideals'.

November: 'Havell on Hindu Sculpture' published in The Modern Review; included in 'Civic and National Ideals' in 1911 under the title 'Indian Sculpture.

December: 'Havell on Indian Painting' published in The Modern Review; included in 'Civic and National Ideals' in 1911 and titled 'Indian Painting'.

'Unity of Life and Type in India' published in The Brahmavadin.

1910 January: Note on Abanindra Nath Tagore's 'Shah Jahan Dreaming of the Taj' published in The Modern Review; included in 'Civic and National Ideals' in 1911.

January, July, August: 'The Ancient Abbey of Ajanta', published in the Modern Review.

February 1: First edition of 'The 'Master As I Saw Him' published by the Udbodhan Office.

'The Northern Tirtha: A Plirgim's Diary' first published serially in The Modern Review.

March; Note on Nanda Lal Bose's 'Damayanti's Swayamvara' published in the Modern Review.

March 12; 'Papers on Education-IV' and 'Papers on Education-V' published in the Karma Yogin as 'Papers on National Education'.

March 19: 'The New Hinduism' published in the Karma Yogin..

March 26: 'Primary Education; A Call for Pioneer', published in the Karma Yogin.

April: 'The Indian Ash or Tree of Healing' published in the Modern Review.

September: 'The Hindu Sacred Year' published in the Hindusttan Review included in the 'Studies from an Eastern Home'.

October: 'The Dread Seven' published in the Modern Review; included in the 'Studies from an Eastern Home'.

November 2: 'The Unity of India' publshed in the Karma Yogin.

December: 'The Present Position of Woman' submitted to the First Universal Races Congress.

1911 January: 'The Historical Significance of the Nothern Tirtha' first published in the Modern Review.

First Edition of 'The Northern Tirtha : A Pilgrim's Diary' published by the Udbodhan Office. February-March : 'Papers on Education—I', published in the Prabuddha Bharata.
March : 'Fa-Hian' published in The Modern Review. April-May : 'Papers on Education—III', published in the Prabuddha Bharata.
May: 'The Festival of Ras' published in the Modern Review ; included in the 'Studies from an Easter Home', 'Western Etiquette in Relation to Eastern Needs' reproduced from the 'Prabuddha Bharata of July, August and September ; reprinted in the same in May 1928, with the title 'Etiquette—Eastern and Western'.
May-June : 'Papers on Education—III', published in the Prabuddha Bharata.
August : note on Samarendra Nath Gupta's 'Abhimanyu' published in The Modern Review. 'The place of Foreign Culture in a True Education', published in the Modern Review.
First Edition of 'Civic and National Ideals' by the Udbodhan Office.
November : 'Play' published in the Prabuddha Bharata.
November & December : 'Star Pictures' published in the Modern Review.
December : 'Death and the Beloved' published in the Modern Review.

1312 January : 'Star Pictures' in the Modern Review. February : 'A Note on Historical Research' published in the Modern Review.
March-April : 'The History of India and its Study' and 'A Note on Co-operation', published in the Modern Review.
June : 'Rajgir : An Ancient Babylon', Published in the Modern Review.
'The Rise of Vaishnavism under the Gupta's' and 'The Old Brahminical Leaving'. published in the Review.
Reprint of 'Civic and National Ideals' by the Udbodhan Office.
December : 'Hinduism and Modern Transition' published in the Prabuddha Bharata.

1913 First Edition of 'The Notes of Some Wanderings with The Swami Vivekananda, published by the Udbodhan Office.

First Publication of 'Studies from an Eastern Home' by Longmans, Green & Co., London.

1914 First Edition of 'Hints on National Education in India' by the Udbodhan Office.
October : Third new impretsion of 'The Web of Indian Life' by Longmans, Green & Co., London.

1915 First Edition of 'Footfalls of Indian History' by Longmans, Green & Co., London.
First Edition of 'Religion & Dharma' by Longmans, Green & Co., London.

1916 New Impression of 'Cradle Tales of Hinduism' by Longmans, Green & Co., London.

1917 Second Impresssion on of 'Cradle Tales of Hinduism' by Longmans. Green & Co., London.

1918 July. Fourth new impression of 'The Web of Indian Life' by Longmans, Green & Co., London. Second Editio of 'Civic and National Ideals' by the Udbodhan office.
Second Edition of 'The Master As I Saw Him' published by the Udbodham office.

1919 September : 'Shiva or Mahadeva' published in the Modern Review.
October : 'Buddha and Yasodhara' published in the Modern Review.
First Edition of 'Siva and Buddha' published by the Udbodhan office.

1921 September and October : 'Kedarnath and Badrinarayan' an article published in the Prabuddha Bharata.
Second Edition of 'The Northern Tirtha : A Pilgrim's Diary' by the Udbodhan office—title changed to 'Kedar Nath And Badri Narayan ; Pilgrim's Diary.'
'Indian Nationality, a Mode of Thought', published in the Modern Review.

1922 Second Edition of 'Notes of Some Wanderings With The Swami Vivekananda' by the Udbodhan Office.

1923 Third Edition of 'The Master As I Saw Him' by the Udbodhan Office.

1926 Third Impression of 'Cradle Tales of Hinduism' by Longmans, Green & Co., London.

1927 Second Edition of 'Aggr ssive Hinduism' by Udbodhan Office.

1928 Fourth Impression of 'Cradle Tales of Hiaduism' by Longn ans, Green & Co.. London.
Second Edition of 'Kedar Nath And Badri Naray.n : A Pilgrim's Diary' by the Udbodhan Office, Reprint of 'Lambs Among Wolves' by the Udbodhan Office.

1929 'On the Infinence of History in the Development of Modern India', published in the Prabuddha Bharata of March as 'Passing into the Modern Age'.
Third Edition of 'Civic and National Ideals' by the Udbodhan Office.

1930 February : Beauties of Islam' published in the Prabuddha Bharata.
Fourth Edition of 'The Master As I Saw Him' by the Udbodhan Office.

1935 May : 'Bodh-Gaya', published in the Prabuddha Bharata.

1939 Fifth Edition of 'The Master As I Saw Him' by the Udbodhan Office.

1948 Fourth Edition of 'Civic and National Ideals' by the Udbodhan Office.
Sixth Edition of 'The Master As I Saw Him' by the Udbodhan Office.
Third Edition of 'Notes of Some Wanderings With The Swami Vivekananda' by the Udbodhan Office.

1950 First Edition of 'Kali The Mother' by the Advaita Ashrama.
Third Edition of 'Aggressive Hinduisr ' by the Udbodhan office, Calcutta.
Fourth Edition of 'Hints on National Education in India' by the Udbodhan Office.

First Indian Edition of 'The Web of Indian Life' by the Advaita Ashrama.

1952 First Indian Edition of 'Religion and Dharma' by Advaita Ashrama.

1953 Seventh Edition of 'The Master As I Saw Him' by the Udbodhan Office.

Second Edition of 'Kali The Mother' by the Advaita Ashrama.

1956 New Edition of 'Footfalls of Indian History' by the Advaita Ashrama.

1957 Fourth Edition of the 'Notes Of Some Wanderings With The Swami Vivekananda' by the Udbodhan Office.

1958 New Edition of 'Cradle Tales of Hinduism' by Advaita Ashrama.

1959 Eighth Edition of 'The Master As I Saw Him' by the Udbodhan Office.

1963 Ninth Edition of 'The Master As I Saw Him' by the Udbodhan Office.

1966 Fourth Edition of 'Aggressive Hinduism' by the Udbodhan Office.

1967 Fifth Edition of 'Civic and National Ideals' by the Udbodhan Office.

Fifth Edition of 'Hints on National Education in India' by the Udbodhan Office.